পনেরোই আগস্ট

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

বঙ্গভঙ্গ

পূর্ণাবতার

কেরী সাহেবের মুন্সী

লালকেল্লা

বিপুল সুদূর তুমি যে

জোড়াদীঘির উদয়াস্ত

কোপবতী

পদ্মা

সিন্ধুনদের প্রহরী

নীলমণির স্বর্গ

শাহী শিরোপা

হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে

ভূমিকা

পনেরোই আগস্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের সূচনা কাল বঙ্গভঙ্গের অবসানে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে—আর সমাপ্তি ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট। এই গ্রন্থ রচনাশেষ ১৯৭৭ সাল,—ঘটনার শুরু ও ঘটনা-শেষের মাঝে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান,—কোন ঘটনা ত্রিশ বছরের পুরানো হলেই পণ্ডিতেরা তাকে ইতিহাস পর্যায়ে স্থান দেন। কাজেই পনেরোই আগস্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো এরও পাত্রপাত্রীগণ দুই শ্রেণীর—কাল্পনিক ও বাস্তব, ঘটনাগুলিও তাই, তবে একটু বিশেষ আছে, এসব ঘটনা ও পাত্র-পাত্রীর অনেকে ঐতিহাসিক হলেও দূরবর্তী কালের নয়—হাত বাড়ালেই যেন তাদের স্পর্শ করতে পারা যায়। আর চিহ্নিত পনেরোই আগস্টের পরে এক প্রজন্ম কাল গত হলেও ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীদের স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ অনেকের হয়েছে, যাঁদের হয়নি তাঁদের কাছেও তারা সজীব সত্য। এটি হল ঐতিহাসিক রস। এই রসের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে কল্পিত ঘটনা-প্রবাহ ও কল্পিত পাত্রপাত্রীদের জীবনরসকে। এই প্রক্রিয়া সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসেই হয়ে থাকে—তাই বলে সবগুলি যে সমান রসোত্তীর্ণ এমন নয়। এখানিও হয়তো নয়।

কোন্ পন্থা অনুসরণ করে দেশ স্বাধীন হ'ল? সরল প্রশ্নের সরল উত্তর, কোন বিশেষ এক পন্থায় নয়, নানা পন্থার সমাহারে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কার্জন কৃত বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে দেখা দিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, সাধারণ লোকের মুখে যা স্বদেশী আন্দোলন বা বয়কট, যার প্রধান নায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ('বঙ্গভঙ্গ উপন্যাস দ্রষ্টব্য)। সরকার কৃত নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিল সশস্ত্র বিপ্লব—যার প্রধান পুরুষ খুব সম্ভব অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তীকালের শ্রীঅরবিন্দ)। (এই প্রসঙ্গেও দ্রষ্টব্য বঙ্গভঙ্গ উপন্যাস)।

১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে বয়কট বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'ল, তবে প্রত্যাহৃত হ'ল না সশস্ত্র বিপ্লব। উনুনের আগুন প্রয়োজন শেষে নিভে যায়—মনের আগুন নেভে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠলে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপান্তর দেখা দিল সসৈন্য বিপ্লবে। দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে দলে টানা আর বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। সশস্ত্র

বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণাম বহুকাল পরে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে অধিকার। আর সসৈন্য বিপ্লবের সার্থক চরম দৃষ্টান্ত ঘটলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নেতাজী কর্তৃক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন (I.N.A.), আর জাপানের সহায়তায় সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ।

এই তিনটি বাদে চতুর্থ একটি পন্থা দেখা দিল ১৯২০ সালে—যদিচ দীর্ঘকাল আগে দীর্ঘকাল ধ'রে তার ভূমিকা রচিত হচ্ছিল দেশান্তরে। গান্ধীজি দেখা দিলেন নিরস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্র নিয়ে। আগের তিনটি এবং এটি এই চারটি মিলে দেশকে পরাধীনতা মুক্ত করলো। তিনটি বিশেষ গুণে কংগ্রেসের প্রতিভূরূপে গান্ধীজি প্রাধান্যলাভ করেছেন—তাঁর পন্থার অভিনবত্ব, এক ডাকে লক্ষ লক্ষ লোক সমাবিষ্ট করবার ক্ষমতা আর তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদু। এখন রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকগণ অনন্তকাল ধরে এই চারের মধ্যে কৃতিত্বের ও গুণাগুণের বিচার-বিতর্ক চালাতে থাকুন—ঔপন্যাসিকরূপে আমাদের তাতে প্রয়োজন নেই। যে-সব উপাদানে উপন্যাসখানির দেহ আংশিকভাবে গঠিত আমরা তার বর্ণনা করলাম।

কিন্তু এইসব আন্দোলন ও বিপ্লব তো উপন্যাস-দেহের একমাত্র, এমন কি প্রধান অঙ্গ নয়। প্রধান অঙ্গ কতকগুলি নরনারী, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কথা সকলেরই পরিজ্ঞাত। কাল্পনিক নরনারীদের খবর কে রাখে। ভারতযুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হয়েছিল (সর্বাংশে সত্য নয়—পাণ্ডবগণ, যাদবগণ উদাহরণ)। এই আঠারো অক্ষৌহিণীর মধ্যে কয়জনের বিবরণ আমরা জানি—কিম্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন। যে-সব সৌভাগ্যবানদের নাম ২৪ পয়েণ্টে মুদ্রণের সুযোগ পেয়েছিল তাদের কথাই চ'লে এসেছে আমাদের কাল পর্যন্ত। পনেরো আনা লোকের বর্জাইস অক্ষরের মুখ দেখবার সুযোগ হয়নি—হারিয়ে গিয়েছে তাদের বিবরণ। অথচ তাদের বাদ দিলে কি ভারতযুদ্ধ সম্ভব হ'তো? রামায়ণ ও মহাভারত থেকে দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক। যে-ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চের আর্তরব শুনে আদিকবির মুখ-নিঃসৃত শ্লোকের মধ্যে রামায়ণ পুঞ্জীভূত অতলে হারিয়ে গিয়েছে সে, আর জরা নামে সেই ব্যাধ যার মৃগ-লুব্ধ শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন তথা মহাভারতের কাহিনীর অবসান—আজ কোথায় তার চিহ্ন। ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই মহাকাব্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত দুই ব্যাধ। মহাকবির অভিসম্পাত "ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" উপেক্ষা করে আজ একজন জীবিত। অপরজনও মহাভারতের মতোই অক্ষয়। অথচ তারপর হাজার হাজার বছর গিয়েছে শত শত কবি এই দুই কাব্য-কামধেনু দোহন করে পাত্র ভরেছেন, হায় এক বিন্দু সুধা জুটে ওঠে নি তাদের ভাগ্যে। কারণ

আর কিছুই নয়, তারা বর্জাইস অক্ষরে মুদ্রিত নাম। রামায়ণ মহাভারত টেনে এত কথা বললাম তার কারণ আর কিছুই নয়, পনেরোই আগস্ট উপন্যাসে যে ভারতযুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত তার পাত্রপাত্রীদের অধিকাংশই যে বর্জাইস অক্ষরে মুদ্রিত নাম, হয়তো দু' একজন স্মলপাইকা পর্যন্ত উঠেছে—তার বেশি নয়।

আমাদের এই সামান্য উপন্যাসের কাল্পনিক পাত্রপাত্রী কেউ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কুন্তী দ্রৌপদী গান্ধারী নয়; ইতিহাসের ফুটনোটে বর্জাইস অক্ষরের মুদ্রণে এদের স্থান, তাই বলে এদের মূল্য কম নয়। পুরাকালের ভারতযুদ্ধে নিহত আঠারো অক্ষৌহিণীর স্ত্রী পুত্র পরিজনের অশ্রু কাব্যের পত্রপুটে ধরে রাখবার কথা তো মহাকবির মনে পড়ে নি, তারা ছিল পুরাণকথার উপেক্ষিত; আর এই নব্যকালের ভারতযুদ্ধের অগণিত নরনারীর দুঃখের হিসাব কে রেখেছে? পুরাণ বলো ইতিহাস বলো, সর্বত্র বুকের রক্তের লোহিত সমুদ্র, অশ্রুর লবণাম্বুর সমুদ্র তো দেখলাম না। তাই বলে তাদের দুঃখ মিথ্যা! নব্য ইতিহাসের পাতা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণগণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুখরিত কিন্তু ক্ষুদ্র দিনাজশাহী শহরের নগণ্যদের দীর্ঘনিঃশ্বাস নিঃশব্দে বিলীন হয়ে গিয়েছে অনন্তে।

দিনাজশাহী শহরের কয়েকটি নগণ্য মধ্যবিত্ত পরিবার এই কাহিনীর প্রধান পাত্রপাত্রী আর ঘটনার আবর্ত যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে সুদূর মফঃস্বল ও কলকাতা শহরের আরও কতকগুলি মধ্যবিত্ত সমাজের নরনারী। ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে যত রকম রাজনৈতিক পন্থা দেখা দিয়েছে দেশে, সমস্ত প্রতিফলিত উপন্যাসখানিতে। শচীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দলের লোক, সুশীল সশস্ত্র বিপ্লবী দলের, ভূপতি সসৈন্য বিপ্লবী দলের, রাধা প্রাণের জ্বালায় যোগ দিয়েছে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে, যোগ দিয়েছে এবং মরেছে, অরবিন্দর প্রায়শ্চিত্ত হলো একটি মেয়েকে না পেয়ে—আর একজনকে পেয়েও হারিয়ে; মলিনা আর শুভ্রা তলিয়ে গেল নিজেদের অশ্রুর আবর্তে; আর রুক্মিণী যমজ পুত্রের একটিকে দান করলো গান্ধীর হাতে আর একটিকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। সংসারের দুঃখ এত রকমেরও আছে! আর সর্বোপরি মাথা তুলে দণ্ডায়মান অবিনাশ চক্রবর্তী যাঁর কাছে দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম অভিন্ন। আর ইংরেজ সরকারের প্রথম সারির দরবারী যজ্ঞেশ রায় শেষ পর্যন্ত হলেন প্রথম সারির কংগ্রেসী, দিনাজশাহী শহর আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলেন পাকিস্তানে আর স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে হল তাঁর জীবনসংশয়, স্বাধীনতার ঘোষণা মুমূর্ষুর কানে ঢুকলো কিনা তিনিই জানেন। মহৎ দুঃখের তাপে এইসব নগণ্য নরনারী সমুজ্জ্বল। এদেরই সুখ-দুঃখের, স্বার্থত্যাগের, প্রাণত্যাগের, সর্বস্বত্যাগের কাহিনী এই উপন্যাস পনেরোই আগস্ট।

ঐরে আবার লব কুশের লড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ওরে থাম, থাম।

কিন্তু, কে কার কথা শোনে। বীরত্ব যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিস্তেজ কেবল বাহুদ্বয় ও রসনা অতি মাত্রায় সবল ও সক্রিয়।

ওরে থাম, থাম।

দুজনে যুগপৎ বলে দাঁড়াও পিসিমা আগে কুশকে লবকে পরাস্ত করি। এই বলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের লড়াই আরম্ভ হয়।

তবে ডাকি তোদের মা-কে।

বাঃ রে, এ লাঠি তো কিনে দিয়েছেন মা নিজে।

সে কি মারামারি করবার জন্যে!

তবে আর লাঠি দিয়ে কি করে।

কি করে এখনি দেখতে পারি, ঐ লাঠি ভাঙবে তোদের পিঠে।

দাঁড়াও তার আগে কুশের লবের মাথাটা ভেঙে নি।

লব ও কুশ যমজ ভাই, দুজনের বয়স ছয় বৎসর, চেহারা অবিকল এক, কে লব কে কুশ চিনতে পারা যায় না।

ওদের বাবা প্রস্তাব করে ছিল দুজনের পোষাকের রঙ আলাদা করে দি, তাই দিয়ে চিনতে পারা যাবে।

মা বলল, বেশ তোমার কথা, নিজের ছেলেকে শেষে চিনতে হবে পোষাক দিয়ে, এমন কথা শুনলে পাড়ার লোকে হাসবে না।

প্রসঙ্গটা ওখানেই থেমে যায়।

লব ও কুশ দুজনেরই পরনে খাকি রঙের হাফ প্যান্ট, হঠাৎ যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় ফালতু খাকি রঙের কাপড় তখন সস্তা, গায়ে হাত কাটা টুইলের শার্ট, পা দুটো আপাততঃ খালি, হাতে ছোট লাল রঙের লাঠি, রথের মেলায় মা কিনে দিয়েছিল। ইস্কুল ছুটি হয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি জলযোগ সেরে নিয়ে বাইরের ঘরের বারান্দায় লড়াই সুরু হয়ে যেতো। আগে বাড়ীর লোকে চিন্তিত হতো, এখন না হলে চিন্তিত হয়।

পিসিমা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, লড়াইটা বাড়ীর ভিতরে করলেই হয়, বাইরে করলে পথের লোকে যে দেখে।

বাঃ রে, লোকে না দেখলে লড়াই করার মজা কি।

দু'জনের এক উত্তর, কাজেই একবার লিখে দু'বার লিখবার পরিশ্রম বাঁচানো যায়।

লড়াই যখন স্বাভাবিক নিয়মে থামলো না, স্বাভাবিক নিয়মে আবার লড়াই করে থামে, পিসিমা বাড়ীর ভিতর থেকে একটা ছড়ির ডগায় এক টুকরো সাদা ন্যাকড়া বেঁধে নিয়ে এসে দুজনের চোখের সামনে সবেগে আন্দোলিত করতে লাগলো, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে লব কুশ অস্ত্র সম্বরণ করলো। যোদ্ধা বলেই তারা জানতো যুদ্ধের প্রকরণ পদ্ধতি। তবে একদিনে জানে নি, কয়েক দিন চেষ্টা করে শিখিয়ে দিতে হয়েছে, শাদা নিশান নাড়ালে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়। যোদ্ধদ্বয় নিশানের সম্মান রক্ষার্থ সংযত হয়ে দাঁড়ালো।

তোদের মামলাটা কি ?

মামলা আবার কি! লড়াই।

আরে লড়াই তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু লড়াইটার কারণ কি ?

কারণ এই লাঠি, বলে দুজনে একসঙ্গে লাঠিগুলো দেখালো।

হায়, অবোধ শিশুদ্বয় অজ্ঞাতসারে সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি যাবতীয় যুদ্ধের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নয়, অস্ত্রের জন্য যুদ্ধ। "কারণ এই লাঠি।"

আচ্ছা, তোরা দাঁড়া, আমি মিটিয়ে দি।

তার চেয়ে লড়াই করে মিটিয়ে ফেলি।

পিসিমা বললে, তবে কর লড়াই, আর এসে পড়ুক বাবা।

তোমার বাবা তো কাশী গিয়েছেন।

আমার বাবা নয় তোদের বাবা।

তবে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দাও পিসিমা।

কুশ বলল, আমি তো মেটাতেই চাই, ঐ লবটা।

আবার ফের! লবটা কি। বল্ লবদাদা।

বাঃ রে, দুজনে সমান, তোকে দাদা বলতে যাবো কেন ?

আমি নিশ্চয় বড়, তাই তো লোকে বলে লব কুশ। কই কেউ তো বলে না কুশ লব।

তার আমি কি করবো, যারা বলে তাদের জিজ্ঞাসা কর গিয়ে।

কি ঠাকুরঝি, ব্যাপার কি ? বাইরের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে শুধালো রুক্মিণী।

ব্যাপার আবার কি, লড়াই।

থামলো যে ?

শাদা নিশান উড়েছে যে।

ভালই হয়েছে, ইউরোপের লড়াইটা থেমেছে, এখানকারটাও না হয় থামলো।

কতক্ষণ থেমে থাকবে জানি না, শীগ্‌গীর মীমাংসা করে দাও, কে বড় ছোট, কে কাকে দাদা বলবে—বড়ই জটিল সমস্যা বউদি।

সে তো কবে মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। দুজনে যখন সমান, পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতে পারে। কিন্তু অন্যের কাছে উল্লেখ করতে হলে দু'জন দুজনকে দাদা বলবে।

কি রাজি ?

খুব রাজি।

তখন লব লব্ধ অধিকারের শর্তে দু'জনে আবৃত্তি ও সম্বোধনের মাঝামাঝি স্বরে বলে চলল—এই লব, এই লব।

এই কুশ, এই কুশ—

নাও এখন থামাও, ঐ দাদার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গিয়েছে।

শচীন এখন নবীন স্বদেশী স্কুলের হেডমাস্টার। স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও কাজ মিটিয়ে আসতে তার প্রায়ই কিছু দেরী হয়।

মনে থাকে যেন—বলে পরস্পরকে শাসাতে শাসাতে দুজনে অন্তঃপুরের দিকে অন্তর্মুখীন হলো। তাদের মা আগেই চলে গিয়েছিল, মলিনা, দরজাবন্ধ করতে উদ্যত হল, ঘরটা বাইরের, সমুখেই সদর রাস্তা, সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখাই নিয়ম ও নিরাপদ। মলিনা দরজায় হাত দিয়েছে, এমন সময়ে সদর রাস্তা থেকে ছুটে এসে এক সন্ত্রস্ত অপরিচিত যুবক তার সম্মুখে দাঁড়ালো; তার মুখ চোখ শঙ্কিত, চুল ও চাদর অসজ্জিত; সে হাত জোড় করলো; মলিনা ইঙ্গিতে ঘরের মধ্যেকার প্রকাণ্ড ফরাশের দিকে ইঙ্গিত করলো, যুবকটি এক লহমার মধ্যে ফরাশের তলায় আত্মগোপন করলো। প্রায় ঘরজোড়া ফরাস পাতা, অনেক গুলো তক্তপোষ মিলিয়ে তৈরি। মলিনার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটতে না কাটতেই শচীনের গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়ালো, শচীন গাড়ী থেকে নেমে প্রবেশ করলো ঘরে।

চলো দাদা, ভিতরে চলো।

নারে, আমাকে কিছুক্ষণ এখন এখানেই বসতে হবে।

কেন, স্কুল থেকে ফিরে তো রোজ ভিতরে যাও, আজ আবার নূতন নিয়ম কেন ?

স্কুল থেকে বের হ'তে যাবো এমন সময় এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা,

একসঙ্গে বাল্যকালে পড়তাম এই ইস্কুলেই, বন্ধুত্ব ছিল।

হাঃ, পুলিশের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব।

কেনরে, পুলিশ কি মানুষ নয়?

ঐ চাকুরিতে ঢুকলে আর মানুষ থাকে না।

নারে, এ তোর ভুল।

তা তোমার বন্ধুটি কি বলল?

আমি কি বললাম আগে শোন্। আমি বললাম, সুরেন ভেতরে এসো না; স্বদেশী স্কুলে ঢুকলে জাত যাবে না।

ভাই শচীন, পুলিশের জাত সহজে যায় না। আর স্বদেশী স্কুল কেন, স্বদেশীর বড় আড্ডা তোমার বাড়ীতেই যাচ্ছি—তুমি এগোও। তাই ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি। বেশি দেরী হবে না, তুই ভিতরে যা।...ঐ যে আসছে, শোন্ দুজনের মতো চা পাঠিয়ে দিস। এসো, এসো, সুরেন।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার সুরেন চৌধুরীর প্রবেশ।

চা পান করতে করতে শচীন শুধালো, সুরেন, এখন তুমি কোথায় পোস্টেড?

সে দুঃখের কথা না তোলাই ভালো, আমার post to pillar অবস্থা চলছে।

সেটা আবার কি রকম?

খাতায় পত্রে আমি পোস্টেড লালবাজারে, কিন্তু কার্যতঃ আজ দেখো দিনাজ-শাহীতে, কাল হয়তো যেতে হবে নাটোরে, তারপরে বগুড়া, রংপুর, ভবিতব্য যেখানে টেনে নিয়ে যায়।

এখানে ভবিতব্যটা কে, তোমার উপরওয়ালা?

ঠিক উপরওয়ালা নয়, বলা উচিত সামনেওয়ালা। একটা অনেক দিনের ফেরারী আসামী, তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আশা করি আমার বাড়ীতে তার সন্ধানে আসোনি?

সুরেন হো হো শব্দে হেসে উঠল, সে হাসি পুলিশী নয় নিতান্তই মানবিক বলল, কোন্ পুকুরে কোন মাছ পাওয়া যাবে এ যদি এখনো না জানলাম তবে বৃথাই আঠারো বছর এ চাকুরি করলাম।

তা আমার পুকুরে কি মাছ আশা করো?

ব্যাং ব্যাং শামুক গুগলি বড় জোর এক আধটা শোল মাছ।

কেন আমিও তো স্বদেশীঅলা।

হাঁ সবাই স্বদেশীঅলা, তবে যারা খাঁটি সুরেন বাড়ুজ্জের চেলা তারা খুন

জখমের পথে নাই, আর তাদের পালা তো মিটে গিয়েছে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে। এখন যারা স্বদেশীঅলা, তারা এই, এই—বলে বোমা ছুঁড়বার ও পিস্তল চালাবার ভঙ্গী করে দেখালো। এরা যেমন আদর্শবাদী তেমনি কর্তব্য-পরায়ণ, আবার যেমন বেপরোয়া তেমনি ধূর্ত।

শচীন বলে উঠল, 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।'

তোমার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই সব ফেরারীদের ধরবার জন্যে পাঞ্জাব থেকে মনথো বলে এক নূতন সাহেব এসেছে, তাকে নিজেদের মধ্যে আমরা মন্থরা বলে থাকি। এই সব ছেলেদের রেকর্ড দেখে একদিন বলে উঠল, আমাদের দেশে হলে এরা হীরো বনে যেতো, আর এখানে এদের আমরা কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছি। লোকটা আইরিশ। শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম 'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।' তা তোমার বাবাকে দেখছি নে।

তিনি অনেকদিন কাশীবাসী হয়েছেন।

সুশীলের মৃত্যুর পরেই বুঝি।

হাঁ, সেই আঘাতের ফলে বলতে পারো। এমন সময়ে লব ও কুশ বাড়ীর ভিতর থেকে বের হয়ে সদর রাস্তায় গেলে, দেখতে পেলো সুরেন।

ছেলে দুটি?

আমার।

যমজ দেখছি।

হাঁ, বাবা নাম দিয়েছেন লব কুশ।

আশা করি এবারেও লব কুশের হাতে পিতার পরাজয় হবে।

অর্থাৎ তোমাদের আসামী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।

দেখো শচীন একটা কথা বলি। প্যারাডাইস লস্টের শয়তানের কথা মনে আছে তো? তার মধ্যে কোথাও এক কণা দৈব স্ফুলিঙ্গ ছিল, নইলে অমন তেজ অমন দার্চ্য পেলো কোথায়? নিতান্ত পাষণ্ড পুলিশের মধ্যে এক পাই রকমের মনুষ্যত্ব না থেকে পারে না, যত জঘন্য উপাদানেই সে গড়া হোক না কিন্তু বেঁচাচে ঢালাই সেটা যে মনুষ্যত্বের। এবারে উঠি, কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তাহ'লে এ পুকুরে নিতান্তই কোন ঘড়েল কুমীর মিলল না।

ভরুপোনের উপরে তো দেখছিলে।

তলায় না হয় উঁকি মেরে দেখো।

সুরেন ইন্সপেক্টারের মুখে আবার সেই হো হো শব্দে মানবিক হাসি।

দাঁড়াও, আমি একটা চাদর নিয়ে আসি আমিও বের হবো।

দু'জনে বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলে মলিনা ঘরে ঢুকে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, নিন এবারে বের হন, আর কোন ভয় নেই।

লোকটি তক্তপোষের তলা থেকে বের হ'য়ে এসে মলিনাকে নমস্কার করলো, বলল, আগে নমস্কার করবার মতো পরিস্থিতি ছিল না, আজ খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

হাঁ, এ বাড়ী সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এ শহরে এরকম নিরাপদ বাড়ী আরও দুটো তিনটে আছে, মানে আমাদের মতো লোকের পক্ষে নিরাপদ। এবারে যাওয়ার অনুমতি দিন।

অনুমতি দেওয়ার মালিক বউদি, তিনি আসছেন, কিছু জল খেয়ে যেতে হবে।

আমাকে খাওয়াবেন, আমার মতো ফেরারীকে।

ক্ষতি কি, এই মাত্র দেখলেন তো পুলিশকেও খাওয়ালাম, যে নাকি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।

লোকটি শুধু বলল, তা বটে, বলে একখানা চেয়ারে বসল।

এমন সময়ে রুক্মিণী খাবারের থালা ও জলের গেলাস নিয়ে প্রবেশ করলো। মলিনা পরিচয় করিয়ে দিল, বউদি।

লোকটি প্রণাম করলো।

রুক্মিণী বলল, বসুন, তারপরে টেবিলের উপরে থালাখানা ও জলের গেলাস রেখে বলল, নিন্ খেয়ে নিন্।

বাপরে এ-ত।

মলিনা বলল, এত আর কই, থালা গেলাস বাদ দিয়ে সামান্যই।

লোকটি ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছিল, খেতে শুরু করে দিল। খেতে খেতে বলল, বউদি, এবারে এঁর পরিচয় করিয়ে দিন।

পরিচয় হয়নি বুঝি। ইনি আমার ননদ, আদি অকৃত্রিম ও একমাত্র।

আর নন্দাই। বলে ফেলেই মলিনার সীঁথির দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝেছি, এখনো অনাগত।

তিনজনেই হেসে উঠ্ল, পর মুহূর্ত্তেই দুঃখের একটি অতি সূক্ষ্মরেখা দাগ টেনে দিল সেই হাসির নীচে। হাসি কান্নাকাটি কেউ কাউকে অবাধে পথ ছেড়ে দিতে রাজী নয়। রমণীর কথা মলিনা ও রুক্মিণীর মনে পড়ে গিয়েছে।

আপনার পরিচয় তো পেলাম না।

সেটা গোপন করবার জন্যেই এত চেষ্টা। মনে করুন না কেন, আমাদের নাম ধাম আত্মীয় স্বজন কেউ নেই।

রুক্মিণী বলল, ও বুঝেছি আপনারা আনন্দমঠের সন্তান।

কুসন্তান বউদি, কুসন্তান।

ভবানন্দও তো সুসন্তানের মতো কাজ করেনি।

সে আর যাই করুক, স্বজন আর বান্ধব হত্যা তো করেনি।

তবু তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

আমাদেরও হবে কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত ইতিমধ্যেই আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। না বউদি আর দেরী করা চলবে না, অন্ধকার হয়ে এসেছে, এবারে পালাতে পারলো। তারপরে মলিনার দিকে তাকিয়ে বলল—এই দেখুন খালা গেলাস-গুলো বাদ দিয়েই খেয়েছি।

তার রসিকতায় এবারে আর হাসি ফুটলো না। কোথায় বুঝি পুরানো ক্ষতস্থানে আঘাত পড়েছে, তার ব্যথা যে নূতন ক্ষতের চেয়ে বেশি।

আর নয় বউদি, চললাম। এভাবে পথে পথে বউদিরা বাধা সৃষ্টি করলে বাড়ীতে নিজের বউদি কি দোষ করেছিল।

নিজের বউদি ছিল নাকি!

লোকটি জোর করে সমস্ত পুরানো স্মৃতি সরিয়ে দিয়ে বলল, না ছিল না।

তারপরে মলিনার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি খাওয়ার সময়ে কথা বলবেন না?

মলিনা বলল, আগে ঘর থেকে বের হবেন না, দেখে আসি রাস্তায় লোকজন আছে কি না।

ক্ষণেক পরে সদর দরজার কাছে, দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, আসুন। গেটের কাছে পৌঁছতেই মলিনা প্রশ্ন করলো, এই কিছুক্ষণ আগে বললেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, তবে আবার স্বজন হত্যার কথা বললেন কেন?

এখানে স্বজন মানে দলের লোক।

তাদেরও হত্যা করেন নাকি!

প্রয়োজন হলে করি বই কি। একটু থেমে বলল, মেয়েরা জন্ম উকীল, জেরায় জেরায় পেটের কথা টেনে বের করে। নমস্কার—বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মলিনা যখন ফিরে ঘরে ঢুকলো, রুক্মিণী দেখল তার মুখ আরও গম্ভীর।

বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'জনে ভিতরে গেল।

সে রাতে দিনাজশাহী শহরে তিনটি তরুণী নারী অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়ে দিল।

২

সে রাতে ঘুম ছিল না তিনটি নারীর চোখে, রাত্রিটা চোখের জলের, অন্ধকারে চোখের জলের হিসাব কে রাখে।

বাপ সাধ ক'রে নাম রেখে ছিল রাধা; মা রেগে বল্ল, সেকেলে নাম বিচ্ছিরি, ও বাদ দাও।

বাপ বল্ল, তোমার সেকেলে বেনারসী শাড়ীখানা কি বাদ দিতে পারো?

মা বলল, তবে বেনারসী শাড়ীর মতো ও-নাম তোলাই থাকবে। ওর নাম লীলা। কেমন সুন্দর নয়?

হাঁ বিলিতি ফ্রকের মতো, দেখতে সুন্দর তবে টেঁকসই নয়।

তবে একটা পাথুরে নাম দাও, যা চিরকাল টিকে থাকবে।

রাধা তো সেইরকম নাম, শতশত বছর টিকে আছে,

বড় কাঁদুনে মেয়ে।

এবারে আপত্তির আসল কারণটার কাছ ঘেঁষে শর নিক্ষেপ করলো তারাচরণ চক্রবর্তীর স্ত্রী। তার ধারণা রাধা নামটা পয়মন্ত নয়, দেখো না রাধার জীবনটা কেঁদে কেঁদেই গেল।

বাপ মায়ের টানাটানির ফলে মেয়ের নাম দুটো বাইরে আর অন্দরে ভাগাভাগি হয়ে গেল, বাইরে সবাই ডাকে রাধা, আর মা মাসি পিসির দল ডাকে লীলা, অক্ষর বিকারে নীলা, নীলে ইত্যাদি।

রাধাকে যে এভাবে কাঁদতে হবে কে জানতো। রায়বাহাদুর বাড়ীর ছোট ছেলে সুশীলকে জন্মে অবধি দেখছে, ছেলেবেলায় অনেক সময়ে গিয়েছে তাদের বাড়ী, বয়স বাড়বার সঙ্গে আসা-যাওয়া কমেছে, কমেছে তবে একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়নি, মলিনা আর সে একই বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তো, মলিনার দু'ক্লাস উপরে। দেখা শোনা হওয়ার বাধা ছিল না। মলিনাদের বাড়ীর কেউ আসতো না তাদের বাড়ীতে, তারা বড়লোক, বনেদীঘর। এমন সময়ে যখন সেই বাড়ী থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো, তারাচরণবাবু স্ত্রীকে ডেকে বললেন,

দেখো, রাধানামের গুণ। স্ত্রী বলল, ওদের বাড়ীর সবাই লীলা বলে ডাকে, আমি জানতাম বড় ঘর থেকে ওর সম্বন্ধ আসবে। আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি।

ওই বিলিতি ফ্রকের গুণে মুগ্ধ হওয়ার লোক রায় বাহাদুর নয়।

মুখে যে যা বলুক, বাপ-মা দুজনেই বিস্মিত হয়েছিল, সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল রাধা নিজে।

সেদিন থেকে যখন তখন তার বাইরে যাওয়া বন্ধ হ'ল, ইস্কুলে যাওয়া তো আগেই বন্ধ হয়েছিল। রাধা বুঝলো তার কেমন যেন পরিবর্ত্তন হচ্ছে, পাছে সেই পরিবর্ত্তনটা কারো চোখে পড়ে তাই সে সর্ব্বদা শঙ্কিত। বিয়ের প্রস্তাবে এক রাতের মধ্যে বালিকা হয় কিশোরী, কিশোরী হয় যুবতী। এ হঠাৎ পরিবর্তন কি চেপে রাখা সম্ভব। মেঘ যেন চাঁদকে চাপা দিতে পারে, তাই বলে কি চাপা পড়ে চাঁদের আলোটা।

তারপরে হঠাৎ একদিন নিদারুণ সংবাদ এলো সুশীল মারা গিয়েছে। সুরু হল রাধা নামের সার্থকতা, সুরু হ'য়ে গেল চির মাথুর পালা, রাধার আঁধার রাতের প্রহরগুলো চোখের জলে ভেসে যায়। রাধা কাঁদে, আজও কাঁদছিল। রাধার এ নিত্য দুঃখ।

শৈশবে যে মেয়েটি পিতামহীর কোলের কাছে শুয়ে রূপকথার রাজপুত্রের কাহিনী শোনে, বাল্যে সেই রূপকথার রাজপুত্র রূপধারণ করে দেখা দেয় তার কল্পনা জগতে, আর কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র কল্পনার রাজপুত্র সম্ভাবনার জগতে প্রবেশ করে। রাধার সম্ভাবনার জগতের দিগন্তে ক্ষণেকের জন্য তার উষ্ণীষ দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হ'ল। তখন ক্ষোভে ক্রোধে নৈরাশ্যে তার মন ভেঙে পড়লো। বোঁটা ভেঙে পড়লেও ফুল তো খসে পড়ে না, গাছের সঙ্গে সে লেগে রইলো বটে, কিন্তু সে সৌরভ, সে সৌন্দর্য্য আর তেমন করে জৌলুষ দেয় না। কুমারীর এ দুঃখ তো বলবার নয়, যে বোঝে সে বোঝে। তার মা বুঝলো, তবে তারও তো কিছু করবার নেই, বলবার নেই।

রাধা শুনেছিল পুলিশের হাতে সুশীলের মৃত্যু হয়েছে, সেই থেকে পুলিশ দারোগা ইন্সপেক্টার তার শত্রুপক্ষ। সংবাদপত্রে পুলিশের কোন পদাধিকারীর মৃত্যুর খবর বের হলে কেটে নিয়ে সযত্নে একটা গোপন খাতায় সেঁটে রাখতো; আর অনুমান করতে চেষ্টা করতো এদের মধ্যে কোনটি সুশীলের মৃত্যুর কারণ।

মা বলতো, ওগো মেয়ের বিয়ের সন্ধান করো।

বাপ বলতো, দেখি।

এই দেখি শব্দটি অন্তর্গূঢ় উক্তি—অর্থাৎ দেখি আর কোন পাত্রপক্ষ উমেদার হ'য়ে আসে কি না তা হলে অল্পে সারা যাবে। রায় বাহাদুরের আগ্রহপূর্ণ উমেদারি দেখে বুঝেছিল সামান্য কিছু দিলে এমন কি না দিলেও সারা যাবে। সাধে কি তিনি অল বেঙ্গল লোন আফিসের প্রধান আড্ডাধারীর পদ পেয়েছিলেন।

রাধা রাতের বেলায় কাঁদে আর দিনের বেলায় ভাবে আঃ একটা বোমা বা পিস্তল পেলে হাতের কাছে প্রথম যে পুলিশটাকে পেতো তাকে খতম করে ফেলতো। কিন্তু সংসার যদি হাতের কাছে সব সুযোগ ইচ্ছামতো জুগিয়ে দিত তবে আর তার নাম সংসার কেন ?

মলিনার দুঃখ নৈমিত্তিক, একটা নিমিত্ত পেলে তার চোখের জলের বাঁধন ভুলে যেতো। আজ খুলে গিয়েছিল। ঐ ফেরারী আসামীকে সে আশ্রয় দিতে গিয়েছিল কেন ? শুধু কি দেশপ্রেমের টানে ? আদৌ নয়, সে প্রেম অনেক ঘনীভূত। তাকে দেখে হঠাৎ কেন জানি রমণীর কথা তার মনে পড়ে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সে বিশ্বাস করেনি রমণী গোয়েন্দা, পুলিশে শুধু তার প্রাণটা নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তার মানের উপরে হস্তক্ষেপ করে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে চেষ্টা করেছিল, আর কারো কাছে না হোক সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে মলিনার কাছে। তার এ দুঃখ আভাসে জানতো একমাত্র রুক্মিণী।

মা বলতো, ওগো মেয়ের যে বিয়ের বয়স পার হল।

স্বামী বলতো দেখি—এ দেখি শব্দটাও অন্তর্গূঢ়। যজ্ঞেশবাবু ছোট ছেলেটিকে জানিয়ে দিলো মেয়েটিকে এত শীঘ্র দূরে পাঠাতে চান না।

মা ভাবতো, আহা একটি মনের মতো জামাই পেলে সুশীলের স্থান সে অধিকার করতো। অবোধ নারী কি করে জানবে সংসারে এক জনের অভাব কখনো পূরণ করতে পারে না অপরে। প্রত্যেকের যে স্বতন্ত্র ভূমিকা।

হঠাৎ মলিনার মনে পড়ে যায় ফেরারী আসামীটির সেই উক্তিটা, দরকার হলে তারা দলের লোককেও খতম করতে দ্বিধা বোধ করে না। তবে কি রমণী দলের লোকের হাতেই···না, না, তাহ'লে রমণীর দেহের উপরে "গোয়েন্দা" লেবেল মেরে রাখবে কেন ? এ নিশ্চয় পুলিশের কারসাজি। ওরা না পারে কি।

তারপর যখন পিতামাতা কাশীবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন মলিনা ধরে বসলো সঙ্গে যাবে। মায়ের বিশ্বাস কাশীবাসী হ'লেই লোকে সন্ন্যাসী হয়ে যায়—তাই তিনি কিছুতেই রাজি হ'লেন না।

ওদিকে রুক্মিণী বলল, মা, ঠাকুরঝি গেলে আমি একা লবকুশকে সামলাতে পারবো না।

বাপ বললো, না, না, ও যাবে কেন, এখানে থাকলে শচীন ওর বিয়ের যোগাড় করতে পারবে, খবর পেলেই আমরা আসবো।

যজ্ঞেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী কাশীবাসের জন্য প্রস্থান করলে সংসারের ভার পড়লো রুক্মিণীর উপরে, সে এখন সংসারের কর্ত্রী। শচীন কর্তা তবে নামে মাত্র। নবীন স্বদেশী বিদ্যালয় তার সংসার। দশটার আগে সেখানে যায় আর স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও যত বিলম্বে সম্ভব বাড়ী ফেরে।

মলিনা মাঝে মাঝে বলে, দাদা বাড়ীতে আসে খেতে আর ঘুমোতে।

রুক্মিণী বলে যে, তাই বা কই আসে। দশটার আগে খেয়ে যায়—তারপর সারাদিন আর খাওয়া নেই, আবার সেই রাত দশটা।

ছোটদার অভাব এখনো ভুলতে পারেনি, চাপা মানুষ মুখে কিছু বলে না, তাতেই ভোগে বেশি।

রুক্মিণী ও প্রসঙ্গে আর যায় না, কারণ, সে জানতো শুধু সুশীলের অভাব নয়, আরও কিছু অভাব দেখা দিয়েছে স্বামীর মনে। একদিন অনেক রাতে জেগে উঠে দেখে শচীন জেগে আছে।

একি, তুমি ঘুমোও নি।

না;

সে কি !

এ রকম তো প্রায়ই হয়।

লব কুশ তো এখন বড় হয়েছে, পাশের ঘরে শোয়, শৈশবে না হয় ওদের কান্নায় ঘুম ভেঙে যেতো, কিন্তু এখন তো সে ভয় নেই। শরীর ভালো তো ?

শরীরের ব্যাপার নয়।

তবে কি ?

কিছুদিন থেকে একটা শূন্যতা অনুভব করছি।

খুবই স্বাভাবিক। সুশীল চলে গেল। তোমার বাবা মা কাশীবাস করতে গেলো। আমার মা গত হওয়ার পরে বাবা উদাসীন হয়ে বেরিয়ে গেলেন, কখনো থাকেন হরিদ্বারে, কখনো নৈনিতালে, কোথায় কখন থাকেন স্থির নেই। এতেও মানুষে শূন্যতা অনুভব না করে তবে আর কিসে করবে ?

আরও কিছু আছে। একদিন বলবো তোমাকে, বুঝবে কিনা জানি না।

আমার কোন দোষ দেখেছ নাকি ?

আরে, না না, এ কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

তবু বলো।

আজ আর নয়, সে অনেক কথা, তাহ'লে আজ আর মোটেই ঘুম হবে না। নাও এখন ঘুমোনো যাক।

রুক্মিণী পাশ ফিরে শোয়, কিন্তু ঘুম আসে না, এবারে তার জাগরণের পালা। মনে পড়ে এ বাড়ীতে বউ হ'য়ে আসবার পর থেকে দুই বাড়ীতেই দুঃখের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্বামীর জেল, পিতার অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থায়, সুনীলের শোচনীয় মৃত্যু, মায়ের পরলোক গমন, পিতার সংসার ত্যাগ, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাশীবাসে প্রস্থান, আর আছে রমণীর শোচনীয় মৃত্যু। সে জানতো, আর কেউ জানতে পারনি মলিনার মন পড়েছে রমণীতে, হয়তো মলিনা সচেতন হয়ে উঠবার আগেই রুক্মিণী সচেতন হয়েছে। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, এভাবে তাকে আর বেশি দিন থাকতে দেওয়া উচিত নয়। মাঝে মাঝে স্বামীকে বলে, মলিনার বিয়ে দেবে না, ওর যে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়!

মেয়েদের বিয়ের বয়স কি কখনো সত্যি পেরিয়ে যায়, দেখোনি ষাট বছর বয়সে কুলীন কন্যার বিয়ে হ'তো।

আঃ কি মুস্কিল, তোমরা তো কুলীন নও, আর কালটাও আলাদা।

আচ্ছা দেখি—এ দেখি শব্দটা আদৌ অন্তর্গূঢ় নয়, এর সরল অর্থ হচ্ছে আপাততঃ রক্ষা করো।

না, না, আর দেখি না।

আজ এত তাড়া দিচ্ছ কেন?

তবে বলি, এতদিন বলিনি হয়তো বলা উচিত ছিল। মলিনার মন এক জনের উপরে পড়েছিল।

তার মানে এখন আর পড়ে নাই।

এখনো প'ড়ে আছে।

হেঁয়ালি রাখো, কে সে?

তোমার ছাত্র রমণী চৌধুরী।

বলো কি! কই, আমি তো কিছু লক্ষ্য করিনে।

এসব পুরুষের চোখে পড়ে না!

রমণী তো গত হয়েছে।

ভালোবাসা তো অত সহজে গত হয় না।

অসহায়ভাবে শচীন বলে, এখন উপায়?

তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ফেলো, পুরোনো ক্ষত নিরাময় হয়ে যেতে পারে।

তা এতদিন বলোনি কেন ?

ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে ঠাকুরঝির মন ঘুরে যাবে, তার তো কোন চিহ্ন দেখছি না।

রমণীর মৃত্যু আর সুশীলের মৃত্যু তো প্রায় একদিনে, সে তো পাঁচ-ছ বছর হ'ল।

হ'লই তো।

আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলবো ?

এ না হ'লে আর পুরুষ মানুষ। সে কি স্বীকার করবে, দাদা আমি রমণী-বাবুকে ভালোবাসতাম !

শচীন কোণঠাসা হ'য়ে প্রস্থান করতেই লব কুশ তীর ধনুক হাতে প্রবেশ করে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে—আচ্ছা মা, লব কুশের মায়ের নাম তো সীতা, তবে তোমার নাম রুক্মিণী কেন ?

কোথায় শিখলি ?

কেন ইস্কুলে।

তবে সেখানেই জিজ্ঞাসা করিস।

তুমি ভাবছো করিনি। করেছিলাম, মাষ্টার মশাই বললেন তোমরা তো আসল লব কুশ নও। তারপরে দুজনে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, মা আসল লব কুশ কোথায় ?

কেন রে ?

দেখতে চাই।

দেখা পেলে কি করবি ?

তাদের সঙ্গে লড়াই করবো।

সেই ভয়েই তোদের সঙ্গে দেখা করে না। ও ঠাকুরঝি, তোমার গুণধর ভাইপোদের সামলাও, আমার সব কাজ মাটি হ'ল।

পিসিমার ডাকে দুজনে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

রুক্মিণীর দুঃখ ঝাঁঝরির মতো সছিদ্র, জলে ভরে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়। রাধা আর মলিনার দুঃখ নিশ্ছিদ্র পাত্র যেমন ভ'রে ওঠে তেমনি ভরা থাকে। রুক্মিণীর অনেক কাজ, সেই কাজগুলোই ছিদ্র, সেই তার রক্ষার পথ। শ্বশুর ও শাশুড়ী কাশী যাওয়ার পরে সমস্ত সংসারের ভার এই ছেলে মানুষের উপরে পড়েছে, ঝি চাকর আত্মীয় স্বজন নিয়ে পরিবারটি নেহাৎ ছোট

নয়, অবশ্য মাথার উপরে এখনো আছেন শৈলেন দাদা, তবে নামে মাত্র, তিনি প্রাচীন হ'য়ে পড়েছেন।

যজ্ঞেশবাবুদের কাশী রওনা হওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, যজ্ঞেশ আমাকেও নিয়ে চলো, বাকি দিন কটা কাটাই বিশ্বনাথের চরণতলায়।

যজ্ঞেশ রায় বললেন, খুড়ো তুমি গেলে সংসার অচল হয়ে পড়বে।

শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, শৈলেন খুড়ো নিজে চলতে পারে না সংসার চালাবে কি করে?

আরে, তুমি কি চালাবে? তুমি মাথার উপরে বসে রাশ টেনে থাকবে।

কেন, শচীন তো আছে।

ছেলেমানুষ।

যজ্ঞেশ, তুমি যখন সংসার আরম্ভ করেছিলে তখন বয়স কত ছিল?

সে আলাদা কথা।

বাপ-মা কখনো ভাবে না ছেলে সাবালক হয়েছে।

মোটকথা শৈলেন খুড়োকে থেকে যেতেই হ'ল। আর শচীন অ'তশয় বিচক্ষণ, তাঁকে না জানিয়ে বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজে হাত দিত না। তাঁর ঘরটা লবকুশের আশ্রয় ও পলায়নের স্থান। মা বা পিসিমার আক্রমণের আশঙ্কা দেখবামাত্র বই টেনে নিয়ে তারা শৈলেন দাদুর কাছে মাদুরের উপরে "গোপাল অতি সুবোধ বালক, সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া পড়িতে বসে।" রুক্মিণী সে ঘরে ঢোকে না, মলিনা ঢুকে প'ড়ে বলে, দাদা তুমি ওদের প্রশ্রয় দিয়ে মাটি করলে।

আর ওরা ছেলেমানুষ বলে তি'নি তাকান লবের দিকে, লব ইঙ্গিতে কুশকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, ও ছেলেমানুষ। কুশ ইঙ্গিতটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, ও ছেলেমানুষ!

শৈলেন খুড়ো বলেন, তোরা দু'জনেই।

খুশি হয়ে তারা আবার গোপালের দৃষ্টান্তে পড়তে আরম্ভ করে।

এই তিনটি ছেলেমানুষের, লব কুশ আর শৈলেন খুড়োর ভার রুক্মিণীর উপরে। আর শচীনও যেন কেমন হ'য়ে পড়েছে, কলকাতার সে উদ্যমী যুবক আর নেই, তাকেও দেখাশোনা করতে হয়। অবশ্য মলিনা সাহায্য করে, কিন্তু সে যে নিজেই ভারাক্রান্ত তা এড়ায় না রুক্মিণীর চোখ। মাতা গত, পিতা প্রবাসস্থ; সুশীলের ক্ষতি অনেকটা সয়ে এসেছে কিন্তু ক্ষতচিহ্নটা তো আছে, চোখ পড়তেই আবার নূতন করে সব কথা মনে পড়ে। সে

রাতে ফেরারী আসামীর স্মৃতি পুরাতনের পর্দা টেনে সরিয়ে দেয়, সুশীল এসে দাঁড়ায়, রমণীও। অনেক সাধাসাধির পরেও মলিনা বিয়ে করতে রাজি হয়নি। হঠাৎ রুক্মিণীর মনে হ'লো কোন স্বদেশীওয়ালার, তখন স্বদেশী-ওয়ালা মানে বিপ্লবীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেও হ'তে পারে। এক বিপ্লবীর ক্ষতি আর এক বিপ্লবীতে হয়তো পূরণ করবে। কিন্তু কোথায় তেমন নিরীহ বিপ্লবী বিয়ের প্রস্তাবে যে রাজি হবে। তা'ছাড়া কোন বিপ্লবীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে শচীন রাজি হবে না, বিপ্লবীদের প্রতি তার যতই মমতা থাকুক বোমা পিস্তল সে আদৌ পছন্দ করে না। এইসব পরের চিন্তায় রাত কেটে যায় তার অনিদ্র। রুক্মিণীর দুঃখ পরস্মৈপদী, রাধা মলিনার আত্মনেপদী। কখন ঘুমিয়ে পড়ে রুক্মিণী।

দুঃখের মধ্যে সুখের স্বপ্ন দ্বিগুণ মধুর। রুক্মিণী স্বপ্নের কানে শুনতে পায় ঘোড়ার গাড়ী এসে থামে তাদের বাড়ীর দরজায়, স্বপ্নের চোখে দেখে গাড়ী থেকে নামেন শ্বশুর শাশুড়ী। ঘুমের পাতলা চাদরখানা সরে যায়, সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন বুঝতে পেরে হতাশ হয়। কিন্তু তবু কেন থামে না ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ, তবু কেন চলতে থাকে দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। তবে কি স্বপ্ন নয়? উঁকি মেরে দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। মনে হ'ল ভোরের স্বপ্ন নিশ্চয় বাবা মা ফিরেছেন।

ওঠো ওঠো, ধাক্কা দেয় শচীনকে, শীগ্‌গীর ওঠো; বোধহয় বাবা মা এসেছেন।

মলিনা ডাকে, দাদা বউদি নাচে এসো, কাশী থেকে বাবা মা ফিরে এসেছেন।

সবাই নামতে সুরু করে, ইতিমধ্যে শৈলেন খুড়ো দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ করেন যজ্ঞেশবাবু—একাকী।

সবাই একসঙ্গে শুধায়—মা?

তাঁকে বিশ্বনাথ চরণে স্থান দিয়েছেন!

মুহূর্তমাত্র স্তম্ভিত থেকে দুই নারী কেঁদে ওঠে, মলিনা সেখানেই ডুকরে মাটিতে শুয়ে পড়ে, আর রুক্মিণী ঘরের মধ্যে এসে খাটের উপরে লুটিয়ে পড়ে।

শচীন বলে, বাবা ভেতরে চলুন।

যজ্ঞেশবাবু বাইরের ঘরে এসে সোফার উপরে বসেন। শৈলেন খুড়ো বলেন, একটা খবর দিলে না।

সময় পাওয়া গেল না শৈলেন খুড়ো। প্রথম দিনে সাধারণ রকমের

জর, দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ জ্বরটা প্রবল হয়ে উঠে সবশেষ করে দিল।

কি হয়েছিল ?

এই যে দেশজোড়া ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী চলছিল তারই শেষ ঢেউটা কাশীতে পৌছে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে পৌছে দিল বিশ্বনাথের চরণতলায়। তোমাদের সব ভালো তো ?

কেউ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

নীচের তলায় কান্নার শব্দে জেগে উঠে লব কুশ নেমে এসে দাদাকে দেখতে পায়, আনন্দে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, দিদা কোথায় ?

তিনি স্বর্গে গেছেন দাদু, বলে তিনি ওদের কাছে টেনে নেন।

ওরা গম্ভীর হয়ে যায়, যে কথা তখনো বুঝবার বয়স হয়নি, সে কথাও একরকম ক'রে বোঝে। আর বয়স্করাই বা এর চেয়ে বেশি কি বোঝে। শিশুরা নিছক শিশু নয়।

৩

এই পাঁচ ছয় বছরে ভূমণ্ডলের অনেক দেশের মানচিত্র আগাগোড়া পাল্টে গিয়েছে; তিন তিনটে ডাকসাইটে সম্রাট ও সাম্রাজ্য ধনে প্রাণে লোপ পেয়েছে; ইংরাজদের সাম্রাজ্য ভেঙে না পড়লেও ঘা খেয়েছে আর ঘা খাওয়া বাঘের মতো আচরণ শুরু করেছে ভারত সাম্রাজ্যে; সাম্রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ-দানের পুরস্কার স্বরূপ শত শত নিরস্ত্র নরনারী হতাহত হয়েছে জালিয়ানওয়ালা-বাগে আর সমগ্র ভারতবাসী রাওলাট আইন পেয়েছে পুরস্কার স্বরূপ। আর ভগবানও বুঝি বা ভাগ্যবানের দিকে, নতুবা ষাটলক্ষ নিরীহ নরনারী শিশু 'ওয়ার ফিভার" বা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে প্রাণ হারালো কেন ? সংখ্যাটা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এত সামূহিক পরিবর্তনের মধ্যে একটি বিন্দু শুধু অপরিবর্তিত, সেটি আমাদের পূর্বপরিচিত অল বেঙ্গল লোন অফিসের দোতালার আড্ডাটি। পরিবর্তন নাকি সংসারের নিয়ম, সেই নিয়ম রক্ষার্থে সেখানে অবশ্যই কিছু রদবদল হয়েছে, তবে আমূল কিছু নয়, বদল হয়েছে কুশী লবের, পালা অপরিবর্তিত। সে পালার নাম নিষ্কাম উপার্জন ব্রত।

এই দেখো না কেন, আবার গান্ধী বলে কে একটা এসে জুটেছে, কথা নেই বার্তা নেই হুট ক'রে হরতাল ডেকে দিলে—গেল গোটা একটা দিনের রোজগার

মাটি হয়ে।

এতক্ষণ অন্যান্য আড্ডাধারীরা শায়িত অর্ধশায়িত নানা ভঙ্গীতে ফরাসের উপরে অবস্থান করছিলেন, ভগ্নউরু দুর্যোধনকে ঘিরে অন্যান্য যোদ্ধাদের মতো, এক্ষেত্রে ভগ্নউরু কুরুপতি অক্ষয় ফৌজদার, উপমাটা নিছক ব্যাপক নয়।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে হরিপদ উকীল হাঁকলো, পীতাম্বর বা শীতল কে আছিস, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দে। জলটা পান করে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, দেখো অক্ষয়ভায়া, এ লোকটা জ্বালাতে কম জ্বালাবে নয়। রুজি রোজগার মাথায় উঠবে। আরে তবু না হয় ধর্মঘট বল, শব্দটা জানি, না হরতাল! বাপের জন্মে শুনিনি!

হরিপদ বাবু, হরতাল শব্দটার অর্থ হাটে তালা লাগিয়ে কেনা বেচা বন্ধ করে দেওয়া। শব্দটা গুজরাটী।

রাখো হে ছোকরা। গুজরাটী তো গুজরাটে থাক, এখানে কেন?

শুধু এখানে নয়, সারা দেশে।

তার মানে সারা দেশের লোক আজ রোজগার করতে পারলো না।

চটছেন কেন। তিনি নিজেও তো রুজি-রোজগার অনেকদিন ছেড়েছেন।

ছেড়েছেন! রোজগার করলো কবে যে ছাড়লো। পীরের কাছে মামদোবাজি করতে এসো না। না জানি কি। বাপের পয়সায় ব্যারিস্টার হয়ে এসে ভাবলেন ফিরোজ শা মেটা হয় কি রাস বিহারী ঘোষ হয়। চুলের বিলিতি ছাঁট দেখে তো কেউ মামলা দেবে না, ভিতরে কিছু থাকা চাই—বলে হরিপদ দত্ত নিজের গুরুভার মাথাটা দেখায়—তার পরে আবার বলে চলে, আদালতে আদালতে ক্যা ক্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায় তখন বড়ভাই দিলে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান করে। সেখানে বুঝি ট্যাঁ ফোঁ করতে গিয়েছিল, সাহেবরা মেরে ঠাণ্ডা করে ঘরের মাল ঘরে ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছে আর এখানে এসে বাবুর হরতাল ডাকা হচ্ছে। লোকটা নিজে নেংটো আমাদেরও নেংটো করে ছাড়বে। ভাবলাম যাই আদালতে, সত্যি কি আর কেউ আসবে না। ওমা, না মানুষ না পক্ষী, বটতলায় মাছি উড়ছে, যাতায়াতে গেল আটগণ্ডা পয়সা বেরিয়ে। কি বলো অক্ষয়দা?

কিন্তু অক্ষয়দা সমর্থন করতে পারলো না হরিপদকে, বললো, আজ ইস্কুল না বসায় হাড়ে বাতাস লেগেছে।

আর এদিকে যে আমার হাড়ে দুর্ব্বো গজালো।

আজ আদালত বসবে না বলেই তো আমি যাইনি।

ওহে সুবোধ, এখনো তোমার গায়ে কলেজের গন্ধ লেগে আছে, ছুটি পেলেই ফূর্তি। খাচ্ছ বাপের হোটেলে বুঝবে কি। তাপরে একটু থেমে বলল, ওহে সুবোধ, তোমার ঐ কল্‌কাতার কাট ছাড়ো তো।

কল্‌কাতার কাট কোথায় দেখলেন, চুল তো সেদিন গোবিন্দ পরামানিককে দিয়ে কাটালাম।

কি মুস্‌কিল, চুলের কাট নয় চুলের কাট নয়, তোমার ঐ কোট প্যাণ্টলুনের কাট। এখানকার গেঁয়ো মক্কেল তোমার ঐ কল্‌কাতাই কাট দেখলে ভড়কে যায়। শুকুদ্দিন খাংকাকে দিয়ে কোট প্যাণ্টলুন তৈরি করিয়ে নাও, মক্কেলে ছেঁকে ধরবে। আবার এদিকেও বেশ—বলে আঙুলের মুদ্রায় রজত মুদ্রা দেখিয়ে দিল। —বলি পড়েছ তো প্রভাত মুখুজ্জের উকীলের বুদ্ধি গল্পটা? একটু থেমে আবার গর্জ্জন করে উঠল,—ঐ আর একজন। হয়ে এলেন ব্যারিস্টার, মক্কেল না জোটায় সাহিত্য ফেঁদে বসলেন। শোনো বীরেন ভায়া, যত সাহিত্যিক দেখবে জানবে সব মক্কেল-হীন উকিল ব্যারিস্টার।

সুবোধ বলল,—রবি ঠাকুর।

তাকে না হয় মাপ করে দিলাম, তুললো তো ঘরে লাখটাকা।

হরিপদ ভায়া, আজকে তোমার মুখে একেবারে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটেছে, ব্যাপার কি? এক দিনের রোজগার বন্ধ হওয়া কি এতই দুঃখের!

তুমি বুঝবে কি বীরেন ভায়া—

বীরেন বাধা দিয়ে বলল, বুঝি আর না বুঝি, আমি বাপু বাপের হোটেলে খাচ্ছি না।

বটে। তুমি একসঙ্গে তিন পুরুষের হোটেলে খাচ্ছ। বাবা ঠাকুর্দা তার বাপ মিলে টাকা জমিয়ে গিয়েছে আর বলা হচ্ছে বাপের হোটেলে খাচ্ছি না।

আশা করি, এতক্ষণে তোমার ব্যক্তিগত শোকপ্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে, এবারে একটু কাজের কথা বলি, বলে বীরেন চৌধুরী আরম্ভ করলো—গত এক বছরের মধ্যে আমাদের আড্ডার তিনজন লোক গত হয়েছেন, তারাচরণ বাবু, ভবানী-গোবিন্দ বাবু আর খুদু মৈত্র। একদিন আমাদের উচিত তাঁদের জন্যে শোক প্রকাশ করা।

মুহূর্ত্তে মানসাঙ্কে ব্যাপারটা কষে নিয়ে হরিপদ দেখল না এর মধ্যে খরচপত্র নেই, কেননা উপলক্ষটা শোক প্রকাশ, কোন প্রকার উৎসব নয়। একবার এক বিদায়ী হাকিমকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনে সম্মতি প্রকাশ ক'রে ফেলে আড়াই টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে শোক ভুলতে তার সময় কম লাগেনি।

না, এর মধ্যে খরচপত্র নেই। বলল, এ অবশ্য উচিত, ওঁরা ছিলেন আমাদের মূল আড্ডাধারী, তা ছাড়া আদর্শপুরুষ!

কিসের আদর্শ? বলাবাহুল্য, নিষ্কাম উপার্জ্জন ব্রতের।

অক্ষয় ফৌজদার বলল, কাকে সভাপতি করা যায়?

তার ধারণা ছিল, সে যখন বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানটা তার জুটে যাবে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে সুবোধ চৌধুরী বলল, যজ্ঞেশ রায় মশায় এসেছেন তাঁকে এই উপলক্ষ্যে আহ্বান করলে হয়।

ফৌজদার নীরব ধিক্কারে তার দিকে তাকালো, ভাবটা এই যে এসব অপোগণ্ড ছোক্‌রার দল মানীর মান জানে না।

না, না, তাঁকে বিরক্ত ক'রে কাজ নেই, স্ত্রীবিয়োগ হওয়ার পরে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

বীরেন ভায়া যা বল্‌ল সত্যি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে আগের মানুষ আর নেই।

অশ্বিনী রায় স্বল্পভাষী ব্যক্তি, এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, তাকিয়া আশ্রয় করে সমস্ত শুনছিল। তার অভিজ্ঞতা এই যে খরচপত্র কম করতে গেলে কথাবার্তার পরিমাণও কম করতে হয়—অভিভাষণের সূত্রে অতিব্যয় এসে পড়ে। এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বল্‌ল—সভাপতির কি দরকার, এই তো কয়জন লোক, একজনকে স্থির করে নিলেই হবে, দরকার হলে অক্ষয়দা আছেন।

ফৌজদার সমর্থন সূচক কিছু বলতে যাবে এমন সময়ে যুগপৎ এসে ঢুকলো ন-চ এবং খ-চ। পুরাণাদিতে কয়েকটি চিরন্তন যুবকের নাম পাওয়া যায়, যেমন রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দিনাজশাহী শহরে সেইরূপ ন-চ এবং খ-চ। এদের পূর্ণাঙ্গ নাম নবীন চক্রবর্ত্তী ও খগেন চংদার কিন্তু পিতৃদত্ত নামদুটো অনেক কাল ছাইচাপা পড়ে গিয়া বিস্মৃতপ্রায়, এখন সংক্ষিপ্ত আদ্যক্ষর-যুক্ত নামদুটোই এদের পরিচয়। ন-চ ও খ-চ বল্‌লে সবাই চিনবে। এদের মধ্যে রক্তসম্বন্ধ বা সামাজিক সম্বন্ধ নাই, তবে সংসারে সম্বন্ধ তো মাত্র ওদুটো দিয়ে হয় না, একত্র গতিবিধি, একত্র ওঠাবসা, একত্র দর্শন প্রভৃতির ফলে এরা দু'জনে একটি যুগ্মকে পরিণত হয়েছে। অল বেঙ্গল লোন আফিসের এরা নিত্য সদস্য নয় তবে নৈমিত্তিক বটে। সর্ব্বত্র এদের অবারিত দ্বার, তার একটি কারণ সর্বদা নূতন ও বিস্ময়কর সংবাদ নিয়ে তাদের আবির্ভাব ঘটে। তারা প্রবেশ করলেই সকলে এমনভাবে তাকায়, ওহে নূতন খবর কিছু আছে?

আজও সেইভাবে আড্ডাধারীরা তাকালো—আর যে খবর ন-চ খ-চ বল্ল সকলে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি মনোভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তাদের বক্তব্যটা সংলাপে লিখছি, কিন্তু তার আগে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক এরা পরস্পরকে ন-চ খ-চ বলে সম্বোধন করে, বলে যে সংক্ষেপের মার নেই।

ন চ—শুনেছেন খবর ?

খ চ—আহা আমাকে বলতে দাও।

ন চ—বলো না, ঠেকাচ্ছে কে।

খ চ—কাল রাত থেকে—

ন চ—তারা চক্রবর্ত্তীর—

খ চ—মেয়ে রাধাকে—

ন চ—পাওয়া যাচ্ছে না।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, কি বাজে কথা বলছ।

ন চ—ন চ, বাজে কথা—

খ চ—বলে যা বলে যা

আবার সবাই শুধালো, জানলে কি করে ?

ন চ—তারাচরণবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম বললাম।

খ চ—তুমি কেন, আমি বল্লাম।

ন চ—তুমিই বলেছিলে তবে ভেবেছিলাম আমি :

খ চ—চলো না, একবার মাসিমার কাছে খোঁজ নেওয়া যাক, আহা সেদিন তারাচরণবাবু মারা গেলেন।

ন চ—ওটা তো আমি বললাম।

খ চ—তুমি বলেছিলে সত্য তবে ভেবেছিলাম আমি।

এইভাবে তারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন সংলাপে বিসর্পিল গতিতে যা প্রকাশ করলো তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে কাল রাত থেকে রাধাকে পাওয়া যাচ্ছে না, চারদিকে খোঁজ করা হয়েছে, শেষ অবধি তারাচরণবাবুর পুরানো মুহুরী থানায় গিয়ে এজাহার করে এসেছে।

আড্ডাধারীরা এই দুঃসংবাদ আন্তরিক দুঃখিত হল, তাদের ইচ্ছা এই দুটি অদ্ভুত জীবের কাছে থেকে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে কিন্তু সে সুযোগ তারা দিল না, যেমন অকস্মাৎ প্রবেশ করেছিল প্রস্থানও করলো তেমনি অকস্মাৎ।

বীরেন চৌধুরী বল্ল, ওরা আর বসবে কেন, গেল নূতন জায়গায় খবরটা

ছড়াতে।

অক্ষয় ফৌজদার বলল, সোমত্ত মেয়ে, সোমত্ত মেয়ে—কি বলো হে হরিপদ?

হরিপদ এই সংবাদে গুম হয়ে গেল, মনে পড়ে গেল তার ছোট মেয়েটার কথা, যে অনেক কাল আগে এক ধনী মক্কেলের সঙ্গে বার হয়ে গিয়েছিল।

আচ্ছা আজ উঠি, রাত হয়েছে, বলে হরিপদ বের হয়ে গেল।

সত্যিই রাত হয়েছিল। এই দারুণ সংবাদের বজ্রপাতের পরে আর আড্ডা জমলো না, আড্ডাধারীরা নিজ নিজ চিন্তার সূত্র টেনে যে যার বাড়ীর রওনা হ'ল।

৪

ও ঠাকুরঝি, শীগ্‌গীর এসো, তোমার গুণধর ভাইপোদের হাত থেকে আমার চরখাটা রক্ষা করো।

মলিনা গৃহান্তরে বোধ করি অন্য কাজে নিযুক্ত ছিল, কথাটা শুনতে পায়নি। রুক্মিণীর দ্বিতীয়বার আর্ত আহ্বানে এবারে সাড়া দিল—বৌদি আসছি।

ঘরে ঢুকে দেখল রুক্মিণীর চরখার অধিকার নিয়ে রীতিমত লব কুশের লড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, মায়ের দুটো চারটে বড় চাপড়েও যুযুধানদের হুঁশ হয়নি।

দেখো, আমার চরখাটা বুঝি যায়।

যাক। বোমা গেল বন্দুক গেল এবার চরখা কেটে দেশ উদ্ধার হবে—অমন চরখার যাওয়াই ভালো।

বোমা বন্দুকে আপত্তি করছে কে ঠাকুরঝি, কিন্তু বেচারা চরখার দোষ কি।

পুরোপুরি দোষ। আমি ওদের বোমা বন্দুক চালাতে শিক্ষা দেব।

তা দিও, কিন্তু চরখাটা ভাঙলে বাবা মনে কষ্ট পাবেন।

শেষের কথাটুকুতে মনে কষ্ট পেলো মলিনা, বলল, তোরা আয় আমার সঙ্গে, দেখি তোদের তীর ধনুকে হাত কেমন। গাছের পাকা পেঁপেগুলো কাকে সব খেয়ে ফেলল, কাক তাড়া দেখি।

তীর ধনুকের এমন সজীব লক্ষ্য পাওয়ার আশায় চরখা দখলের কথা তারা ভুলে গেল, ছুটলো তীর ধনুকের সন্ধানে, তবু যাওয়ার আগে একবার না বলে পারলো না, যাই বলো পিসিমা, তীর ধনুকে এমন মজার শব্দ হয় না, কেমন ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ করে—

কুশ বল্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন সরু সুতো বের হতে থাকে। আমাদের দুটো ছোট চরখা কিনে দিয়ো না পিসিমা—

তোদের কিনে দেবো ছোট ছোট পিস্তল—

বেশ মজা হবে, সামনেই রথের মেলা।

লব বল্‌ল, মেলায় গিয়ে এক রাশ হাঁড়ি কুড়ি কিনে আনবে, পিস্তলের কথা ভুলে যাবে।

না, রে, না, ভুলবো না, আপাতত আর পেঁপেগুলো রক্ষা কর।

লব কুশকে নিয়ে মলিনা প্রস্থান করতেই প্রবেশ করলেন, যজ্ঞেশবাবু—

কি বউমা, সকালে উঠেই চরখা নিয়ে বসেছ, বেশ বেশ।

রুক্মিণী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল, সারাদিন তো কাজে সময় পাই না, এই সকাল বেলায় ঘণ্টা খানেক আর বিকালে ঘণ্টা খানেক যা পাই।

খানিকটা সুতার নমুনা দেখে শ্বশুর বলে উঠলেন, দিব্যি মিহি সুতো হয়েছে দেখছি, ক্রমে আরও মিহি হবে।

না বাবা, আর মিহি হবে মনে হয় না।

কেন হবে না। আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষের আঙুলের ডগায় প্রাচীন-কালের মসলিনের স্মৃতি আছে, নিশ্চয় হবে।

বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন, বসুন, বলে একখানা আসন পেতে দিল পুত্রবধূ।

আসন গ্রহণ করে শ্বশুর বলতে আরম্ভ করলেন, বাড়ীতে আমাদের দুজনের সংসার, ঝি চাকর ছিল, কাজকর্ম একরকম তারাই সব করতো। তোমার মা সারাদিন ঐ চরখা নিয়ে প'ড়ে থাকতেন। কিছুদিন অভ্যাসের পরে বেশ মিহি সুতো কাটতে পারতেন।

সে সব সুতো কি হ'ল বাবা ?

তা বলিনি বুঝি। প্রথমে সুতো বানিয়ে একখানা ধুতি আর একখানা শাড়ী বুনিয়ে নিয়ে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করে এলেন। পাণ্ডা ঠাকুর খুব খুশি, বললেন, মা কতজনে কত কি দেয়, কিন্তু নিজের হাতে কাটা সুতোর ধুতি শাড়ী এই প্রথমে।

তাদের কথোপকথন আরম্ভ হ'তেই মলিনা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল, এবারে বল্‌ল তা আর খুশি হবে না, নিজে আর গিন্নি পরবে।

পরবে বইকি মা, মানুষে পরলেই দেবতার পরা হ'ল। মানুষের মুখেই দেবতা খান, মানুষের দেহেই দেবতা ভোগ করেন।

একি ভণ্ডামি নয় বাবা, সোজাসুজি মানুষকে দিলেই হয়, মাঝখানে আবার

একটা দেবতা দাঁড় করানো কেন?

ঐটুকু বুঝতে পারলেই মা সব কথা বোঝা হয়ে যায়।

আমি তো বুঝি না।

ক্রমে বুঝবে মা, বয়স হলেই বুঝবে, আর তাই বা বলি কি করে আমিই কি ছাই বুঝি—বয়স তো কম হল না।

বাবা, আমাকে ছোট দুটো চরখা গড়িয়ে দিয়ো।

কেন বলো তো?

নইলে তোমার নাতিদের হাত থেকে এই চরখাটা বাঁচানো কঠিন হবে।

না, না, চরখাটা যেন নষ্ট না হয়। তোমার মা যাওয়ার সময়ে বলেছিলেন, এই চরখাটা বউমাকে দিয়ো আমার আশীর্বাদ বলে—সে এর মর্ম বুঝবে। শচীন, শচীন—

পিতার ডাক শুনে শচীন এসে উপস্থিত হল।

দেখো শচীন, ছোট ছোট দুটো চরখা গড়িয়ে দাও দাদুভাইদের জন্য, বউমা বলছেন নইলে ওদের হাতে এই চরখাটা নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই দেবো বাবা।

আর দেখো খানিকটা পাঁজ এনে দিয়ো বউমাকে।

শচীন চরখার উপরে খুব খুশি নয়, স্বদেশীর পর থেকে দেশী মিলের কাপড় ছাড়া ব্যবহার করে না, চরখা পর্যন্ত পৌঁছয়নি তার কল্পনা।

শচীন প্রস্থান করতেই প্রসঙ্গ বদলে যজ্ঞেশবাবু শুধালেন, হাঁ মা, তোমরা রাধার কোন খবর পাওনি?

না বাবা।

ভাবলাম তোমাদের সমবয়সী তোমাদের জানালেও জানাতে পারে। আর আগে যদি বা না জানিয়ে থাকে পরে নিশ্চয় জানিয়েছে। অনেকদিন হয়ে গেল কিনা—বলে রহস্যময় ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে তিনি চুপ করে রইলেন।

বাবা, কার মনে কি আছে আগে তো বোঝা যায় না তবে—

পুত্রবধূর বাক্যটা সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি তার বক্তব্যের সূত্র ধরে আরম্ভ করলেন, ঐ যে কথাটা বললে মা, কার মনে কি আছে ওর মূল্য হাজার টাকা, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, এতদিন তোমাদের কাউকে বলিনি। আমরা কাশী যাত্রার আগে একদিন তারাচরণবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, বললাম, তারাবাবু, যা হওয়ার তো হ'য়ে গেল, আমরাও কাশীবাস করতে চললাম, এখন রাধা মায়ের ভালো দেখে একটা বিয়ে হয় এই আমাদের শেষ ইচ্ছা, আমার

কথা শুনে তারাবাবু অধোমুখে নীরব হয়ে থাকলেন। বুঝলাম যে সৎপাত্রে রাধাকে দিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তারাবাবুর তার অভাব। আমি জানতাম কিনা তিনি বিশেষ কিছু সঞ্চয় করেন নি, থাকতেনও নিতান্ত গরীবের মতো।

তাঁর নীরবতা দেখে আমার বড় কষ্ট হল, ভাবলাম অর্থাভাবে এমন মেয়েটা সৎপাত্রস্থ হতে পারবে না। অদৃষ্ট বিরুদ্ধ না হলে ওর তো আমার ঘরেই আসবার কথা ছিল। তখন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, তারাবাবু ওর তো আমার ঘরেই আসবার কথা। দেখুন আমার ধৃষ্টতা মনে করবেন না। এই ছোট পুঁটলিটা রাখুন, এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার নোট আছে, রাধামায়ের বিয়ের আশীর্বাদ।

তারাবাবু পুঁটুলিটা নিয়ে একবার মাথায় ঠেকিয়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, রায় মশায়, আপনার আশীর্বাদই রাধার পক্ষে যথেষ্ট, আপনার টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি বলে আমাকে অভিমানী বা অহঙ্কারী মনে করবেন না। দেখুন আমার গরীবী চাল দেখে লোকে আমাকে নিঃস্ব মনে করে, আমি দরিদ্র নই রীতিমত ধনী, অল বেঙ্গল লোন অফিসে আমার নামে আড়াই লক্ষ টাকা আমানত আছে—জানতাম আমার অভাবের পরে সমস্তই রাধা মা পাবে। আমার টাকার কথা আজ আপনি প্রথম জানলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপনাকে সামলিয়ে বললেন, তোমার ঐ কথাটা লাখ কথার এক কথা—কার মনে কি আছে কেউ জানতে পারে না। কে জানতো তারাবাবু আড়াই লাখ টাকার মালিক, কে জানতো তারাবাবু নগদ পাঁচ হাজার টাকা ফেরৎ দেবেন যিনি মক্কেলের কাছা খুলে ফিসের টাকা আদায় করেন। আর কেই বা জানতো মা, ঐ নীরস রূঢ় অর্থগতপ্রাণ উকীল মেয়ের ভাগ্য বিপর্যয় সহ্য করতে না পেরে ছয় মাসের মধ্যে শুকিয়ে মারা যাবেন। মা, মানুষের প্রত্যেকের মন পৈতৃক আমলের পুরোনো কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে কি আছে আর নেই সে নিজেও জানে না।

মলিনার চোখের ইশারায় রুক্মিণী বুঝলো আর অধিকক্ষণ এই দুঃখের পথে শ্বশুরকে বলতে দেওয়া উচিত হবে না, মানসিক ক্ষতি থেকে শারীরিক ক্ষতি হ'তে কতক্ষণ। বলল, বাবা আপনার স্নানের জল হয়েছে, উঠুন, এরপরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রুক্মিণী একখানা খামের চিঠি পেলো, বুঝতে

পারলো না কে তাকে লিখবে খামে চিঠি, দেখল নাম ঠিকানা মেয়েলি ছাঁদে লিখিত। কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখল, ডাক ঘরের মোহর অস্পষ্ট, তখন খুলে দেখল, মস্ত চিঠি। প্রথমেই নজর বুলিয়ে নিয়ে দেখ্‌ল চতুর্থ পৃষ্ঠার নীচে নাম —তোমার স্নেহের রাধা। রাধার চিঠি! যে রাধা আজ বছর দুই হ'ল বাড়ী ছেড়ে উধাও হয়েছে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থানে সন্ধান করে যার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছে সেই রাধার চিঠি। নিরিবিলি চিঠিখানা পড়বার উদ্দেশ্যে, কি জানি কি আছে চিঠির মধ্যে, সে তাড়াতাড়ি তেতালায় চিলেকোঠার ঘরে এসে দুয়ার দিল, তারপরে উৎকট আগ্রহে চিঠিখানা কোলের উপর ফেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়তে সুরু করলো। রাধা লিখছে—শ্রীচরণেষু বউদি, আমার এই অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে নিশ্চয় হয় খুব ভীষণ আনন্দিত নয় ভীষণ দুঃখিত হবে। তোমরা আমার খবর যতদিন জানো না আমিও ততদিন জানি না তোমাদের খবর। মনে মনে বেশ জানি যে তোমরা আমার যথাসাধ্য খোঁজখবর করেছ, পাওনি, আমিও যথাসাধ্য আত্মগোপন করে চলেছি যাতে না পাও। বউদি, তোমরা আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছ জানি, সোমত্ত বয়সের মেয়ে না বলে উধাও হলে লোকে যা ভাবে তাই নিশ্চয় ভেবেছ। আর দশজন যেমন ভাবে তোমরা যদি তেমনি ভেবে থাকো তবে দুষবো না তোমাদের। তোমরা ভেবেছ আমাকে কেউ বাড়ী থেকে বের ক'রে এনেছে, কথাটা এক হিসাবে মিথ্যা নয় (এখানে রুক্মিনী চমকে ওঠে), কিন্তু যে বের করে এনেছে সে আজ নিজেই আজ কয়েক বছর সংসার আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারনি কি তাকে বউদি! (রুক্মিনী এত নির্বোধ নয় যে বুঝতে পারবে না। মনে পড়লো তার সুশীলের কথা, যাওয়ার দিনে হঠাৎ একটা প্রণাম করেছিল—তখন কি জানতো চিরবিদায়ের প্রণাম!) তার নামটা স্পষ্ট করে না লিখলেও নিশ্চয় সে নামটা এখনো অস্পষ্ট হয় নি তোমার মনে। রুক্মিনী বোঝে সুশীলের শোচনীয় স্মৃতি তাকে ঘর ছাড়া করেছে, তার মনে হ'ল এ-ও একরকম সহমরণ। এভাবে দেখলে রাধা মোটেই অন্যায় করে নি। তবু অনেক কালের সংস্কার বলে ওঠে, এ ভালো নয়, এ ভালো নয়)। বউদি, এতকাল কাউকে মনের কথা বলতে পারি নি, কয়েক বছরের স্মৃতি ভারা হয়ে জমতে জমতে এতদিনে ধরাশায়ী করে দিত। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে, একটা বিশেষ কারণে ধরাশায়ী না হয়ে এখনো মাথা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ কেমন করে সম্ভব হ'ল ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাই। যেদিন প্রথম দুঃসংবাদ পেলাম কেমন যেন একটা

কুয়াশার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সে কুয়াশার রাজ্য পার হ'তে অনেকদিন লেগেছিল। কেমন ক'রে কি উদ্দেশ্যে পথে নামলাম যদি কখনো দেখা হয় বলবো। কিন্তু যে ব্রত অবলম্বন করেছি দেখা না হ'লে বিস্মিত হয়ো না, অন্ততঃ আমি হ'ব না। যতদিন বাবা ছিলেন পথে নামতে পারিনি, বাবা সকলের উপহাসের পাত্র ছিলেন, মায়ের কাছেও অনাদর আর অপমান ছাড়া কিছু পাইনি, সংসারে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিলাম আমি, জীবনে তাঁর মুখে একদিন মাত্র হাসি দেখে ছিলাম যেদিন তোমাদের বাড়ী থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, তারপরে আগেও যেমন অন্ধকার ছিল তেমনি অন্ধকার। বাবা গত হলেন, সংসার ত্যাগের শেষ বাধা অন্তরিত হল। অবশ্য মা রইলেন। মায়েরা তো দুঃখ পাওয়ার জন্যেই জন্মেছে। যে অবিবাহিত মেয়ে একবার বাড়ীর দরজার চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছে, সেই কুলত্যাগিনীর জন্যে এতটুকু ক্ষমা নেই মায়েদের মনে। কাজেই যা অসম্ভব তার প্রকাশ না ক'রে ভীষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এ বিষয়ে সঠিক লেখা সম্ভব নয়, লিখবার নিষেধ আছে। তবে এইটুকু জেনো, যে পুলিশের হাতে আমার স্বামীর জীবন গিয়েছে হয়তো তাদের হাতেই আমার জীবনটাও যাবে? বউদি, সাতপাক ঘুরবার আগে স্বামী বলে উল্লেখ করে কি অন্যায় করলাম। তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে জানি না, আমার শাস্ত্রে এ বিধান আছে। জানি, তুমি ভাবছ ঐ অতটুকু মেয়ে রাধা এত জানলো কি ক'রে? কালে কি জ্ঞানের মাপ হয়! দুঃখ যাকে ছুবলেছে সে হয় মরে, নয় নীলকণ্ঠ হয়। আর তা ছাড়া কালও তো কম যায়নি। আমি কোথায় আছি, কাদের সঙ্গে আছি এসব জানাবার উপায় নেই। পাছে ডাকঘরের মোহর দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করো তাই লোক পাঠিয়ে অনেক দূরে ডাকঘরে পোস্ট করলাম। একটা অনুরোধ বউদি, যারা এখনো এই হতভাগিনী রাধাকে মনে রেখেছে তাদের বলো রাধা অসৎ পথে যায় নি। পারো যদি মাকে বুঝিয়ো, কি বলবে কেমন করে বলবে তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো। ইতি—স্নেহের রাধা।

পুঃ—বাবা ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমাকে করে গিয়েছিলেন। গৃহত্যাগের ঠিক আগে ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দিয়েছি সমস্ত টাকার অধিকার এখন থেকে মায়ের—জানিয়েছি যে আমি আইনতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত (উকীলের মেয়ের এটুকু জ্ঞান অবশ্যই আছে)। বউদি, আমার দুঃখের বিবরণ আর তা থেকে মুক্তির উপায়ের বিবরণ জানেন একমাত্র কৈলাসদা। কৈলাসদাকে দেখেছ আমাদের বাড়ীতে। গোড়াতে ছিলেন বাবার মুহুরী,

তিনি গত হওয়ার পরে আত্মীয়ের মতো আমাদের সংসারে থেকে গেলেন, একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার মনে করে মা তাকে ছাড়তে চান নি। কৈলাসদা ভীষণ ভালো আর পরোপকারী। এখন যে তিনি কোথায় আছেন, এমন কি জীবিত আছেন কিনা তাও জানিনে। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়ে গেলেও আমার প্রসঙ্গ তিনি তুলবেন না। এমন কি মায়ের কাছেও বলা নিষিদ্ধ। এ পথের বিধিবিধান বড় কঠোর। আর নয়, লিখবার ঝোঁকে এমন দু'একটা কথা লিখে ফেলেছি খুব সম্ভব যা লেখা উচিত হ'ল না। যাকগে। রাধা।

চিঠিখানা বার পাঁচ সাত পড়ে মেঝের মধ্যে লুটিয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো, সুশীলের জন্য, রাধার জন্যে, মায়ের জন্য, শাশুড়ীর জন্যে, একটি দুঃখের স্মৃতি হাজারটা দুঃখ টেনে আনে। এমন ভাবে আরও কতক্ষণ থাকতো জানে না, এমনে সময়ে হঠাৎ লব কুশ এসে দরজায় ধাক্কা দিল।

কি রে, কি হয়েছে!

মা শীগ্‌গীর নীচে এসো, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান?

আমার সঙ্গে! ভদ্রলোক!

তবে কি অভদ্র লোক হ'লে ভালো হ'তো?

যা যা, পাকামি করিস নে। নীচে আর কেউ নেই?

না, বাবা, দাদা সব কোথায় গিয়েছেন।

আর তোর পিসিমা?

পিসিমা আছেন বটে, কিন্তু তিনি যে দেখা করতে চান তোমার সঙ্গে।

নাম বলেন নি?

নাম বল্‌লে চিনতে পারবেন না বলেছেন।

চল্ তবে। কোথায়?

বৈঠকখানায়।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করে রুক্মিণী দেখলো ফরাসের উপরে উপবিষ্ট একজন সুবেশ যুবক।

যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, চিনতে পারছেন বউদি? নিশ্চয় পারেননি, আর কেমন করেই বা পারবেন! সেদিন যে ব্যক্তি ভয়তরাসে ফরাসের তলায় ঢুকে বসেছিল আজ সে নিশ্চিন্ত মনে ফরাসের উপরে উপবিষ্ট।

তাহলে মনে হচ্ছে ভয়তরাসের কারণটা গিয়েছে!

হ্যাঁ, গিয়েছে।

পুলিশ এত সুবোধ বালক হল কবে থেকে?

পুলিশ চেষ্টার ত্রুটি করেনি, তবে আমার দিকে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, পারবে কেন পুলিসে। প্রমাণাভাবে খালাশ। জানো বউদি, আড়ালে ওঁকে বলি Bombcase!

উনি বুঝি শুধু বোমার মামলা করেন?

বোমারও করেন, পিস্তলেরও করেন, যখন যেমন।

দাঁড়ান ঠাকুরঝিকে ডেকে আনি, দুজনে শুনবো।

এখন আর বলতে আপত্তি নেই, তবে ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তাতেই আমাদের পেট ভরবে।

কিন্তু আমার ভরবে না, সেদিনকার মুলতুবি জলখাবারটার কথা ভুলিনি।

রুক্মিণী মৃদু হেসে অন্দরমহলের দিকে গেল।

৫

কল্যানীয়েষু, শচীন, তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে স্বাধীনতা আন্দোলনের রীতিমতো একখানা ইতিহাস লিখতে হয়। কিন্তু তার সময় কই, আর তেমন বহুদর্শিতাই বা আমার কোথায়? আরও এক কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদি পর্বে আমরা আছি—এর যুদ্ধ পর্বগুলি, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণপর্ব প্রভৃতি এখনো ভবিতব্যের গর্ভে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুরাণ রচনা সম্ভব হলেও ইতিহাস রচনা অসম্ভব। তবে এখন পর্যন্ত যেটুকু হয়েছে তার সম্বন্ধে আমার মন্তব্য লিখতে পারি। তাই লিখবো। কিন্তু সে প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে আমার সম্বন্ধে তোমার উদ্বেগ নিরসন করে নিই।

তুমি জানতে চেয়েছ আমার এখানে থাকা-খাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে? টাকা-পয়সা আছে কিনা? প্রয়োজন হলে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে পারো লিখেছ। তা পারো জানি, আর প্রয়োজন হলে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা লিখবো। তবে এখনো নয়। আছি হৃষিকেশে, গঙ্গার ধারে, দিবারাত্রি কানে প্রবেশ করছে গঙ্গার কুলকুল রব। ওপারে নীলকণ্ঠ পাহাড়ে ঘন বনের ছায়া। পাহাড়ে আর ছায়াতে মিলে সত্যই নীলকণ্ঠের নীলিমা। এসব গিরি-গুহার নামকরণ যারা করেছিল তারা কবি। থাকি এক গৃহত্যাগী সাধুর

আস্তানায়, আমার সঙ্গে তাঁর খুব মিল হয়ে গিয়েছে। খাওয়ার জন্যে টাকা-পয়সা কিছুতেই নেন না; দিতে চাইলে ব'লে প্রয়োজন হলে চেয়ে নেব। আজ এক বছরের উপরে আর প্রয়োজন হল না—অর্থাৎ নেবেন না। লোকটি বাঙালী তবে দীর্ঘকাল উত্তরপ্রদেশে প্রবাসী। স্বনাম বলেন নি, এ অঞ্চলে প্রায় কেউ স্বনাম বলে না, ব্যতিক্রম এক আমি, ভাবছি নামটা গোপন করবো কিনা। যাক, এবার কাজের কথায় আসি।

ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের পূর্বসূত্র টেনে দূর অতীতে গিয়ে কাজ নেই, কার্জনের দুর্বুদ্ধি থেকে সুরু করলেই যথেষ্ট হবে। এর তিনটি প্রধান ধাপ, বঙ্গভঙ্গ, বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন। শেষ ধাপটা থেকে দুদিকে দুটো পথ গেল। দেশের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য অনুসন্ধান করে বিস্মৃতির তমসা থেকে স্বদেশের নিমজ্জিত মূর্তি উদ্ধার। আর একটা পথ গেল অতীতের দিকে নয় বর্তমান দুরবস্থার দিকে, এলো বোমা, (পিস্তল আরও পরে এসেছে) ১৯০৮ সাল থেকেই এর সূচনা ধরা যাক। বাঙালীর ছেলে মরীয়া হয়ে উঠে মরতে ও মারতে আরম্ভ করলো। বহুদিন নিরুদ্ধ আত্মোচ্ছাস প্রচণ্ড উৎসের বেগে উৎসারিত হয়ে শত্রুমিত্র সকলকে চমকে দিল। কেউ হিসাব করেনি, কেউ পরিকল্পনা করেনি, হঠাৎ আসা বন্যায় জীর্ণতরী নির্দ্বিধায় ভাসিয়ে দিয়েছে। একে বলা যেতে পারে কর্মকাণ্ডের রোমাণ্টিকতা। ব্যবহারিক দিক থেকে এর মূল্য সামান্যই কিন্তু নৈতিক মূল্য অপরিসীম। বাঙালী ভীরু, বাঙালী ঘরমুখো, বাঙালী চাকুরিসর্বস্ব, বাঙালী সাহেব জুজুর ভয়ে অস্থির এইসব অলীক দুর্নামের যবনিকায় নিজেকে সে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল নিজের কাছে থেকে। হঠাৎ মানিকতলার বোমা সশব্দে সেই পর্দাখানাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে সরিয়ে দিয়ে "বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, কি অপরূপ রূপে দেখা দিলে জননী।" এই গেল প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা অনুশীলন সমিতি থেকে। এ আর পূর্বচিন্তাহীন রোমাণ্টিকতা নয়—এর মধ্যে পরিকল্পনা আছে, লক্ষ্যের স্থিরতা আছে এবং বহুজনকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নিয়ে সুনির্দিষ্টস্থানে পৌঁছবার ইচ্ছা আছে। রডা কোম্পানীর পিস্তল চুরি, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশী সৈন্যদলকে গোপনে ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টা, আর বিদেশে জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে জাহাজবন্দী বন্দুক গুলিগোলা দেশে নিয়ে এসে ব্যাপক বিপ্লবের পরিকল্পনা—এরও ব্যবহারিক মূল্য বেশি নয়, কেবল কয়েকটি মহৎপ্রাণ দানের দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া। কিন্তু পরোক্ষ লাভ বিপুল। বিপ্লবীরা দুটি গুরুতর কথা বুঝলো,

যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বৃটিশের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব—আর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। যদিচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে এ পালা শেষ হয়ে গেল, তাই বলে ভেবো না আর কখনো এমন ঘটবে না। কিম্বা এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তো ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। দেখো যারা দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনাকারী তাদের স্মৃতিতে ফরাসী বিপ্লব ও হাতের কাছের রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল ফরাসী দেশে ও রাশিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের হাতে একটা বন্দুক রাখবার অধিকার ছিল, এ দেশে সে অধিকার নেই। সর্বনাগরিক বন্দুক ছাড়া দেশব্যাপী সশস্ত্র-বিপ্লব সম্ভব হয় না।

তবেই দেখা গেল তিনটিপন্থা—constitutional agitation—অর্থাৎ গলাবাজি; তাতে একেবারে কিছু হয় না এমন বলি না, গাঁয়ে একটার জায়গায় দুটো পাঠশালা হতে পারে, প্রাচীন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হ'তে পারে, এমন কি দুটো চারটে বেশি চাকুরিও জুটে যেতে পারে দেশীলোকের ভাগ্যে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি নয়। বয়কটে সম্ভাবনা ছিল, সেটা বুঝেছিল ইংরাজ, তাই বেশিদূর গড়াবার আগেই তা শেষ করে ফেলল। তৃতীয় পদ্ধটা সম্ভাবনার মধ্যে রয়ে গেল, ভবিষ্যতে যদি কখনো আবার বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তেমন কোন ভারতীয় নেতা তার সুযোগ নিতে পারে তবে কতদূর কি হতে পারে বলা যায় না। কিন্তু সে ভরসায় তো বসে থাকা যায় না—চতুর্থ কোন পন্থা আছে কি?

এদেশে নিরস্ত্র, আর এ দেশের লোকচিত্তে অন্তর্নিহিত একটা ধর্মপ্রাণতার স্রোত প্রবাহিত। এই দুটিকে মূলধন স্বরূপ গ্রহণ করে বিপুল সংগঠনী প্রতিভা নিয়ে কোন মহাশক্তিশালী ব্যক্তি যদি এসে উপস্থিত হন তবে চতুর্থপন্থা হয়তো সার্থকতায় নিয়ে গেলেও নিয়ে যেতে পারেন।

না, শচীন এবারে লেখা বন্ধ রাখতে হ'ল। নীচে থেকে লক্ষণ দাসজি থালা পাকিয়ে সঙ্কেতে জানিয়েছেন যে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়েছে। বোধ করি কিছুই বুঝলে না, তাই ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। লক্ষ্মণদাসজি আমার গৃহহীন গৃহ-স্বামীর নাম। যে বাড়ীটায় থাকি সেটা একটা টিলার গায়ে তৈরি, কতকটা অংশ নীচে, কতকটা উপরে। উপরের অংশে আমি থাকি, নীচের অংশে থাকেন লক্ষ্মণদাসজি, আর সেখানেই আহারাদির ব্যবস্থা। খাদ্য তৈরি হ'লে উপরওলাকে জানাবার উপায় একখানা থালা বাজানো। থালা বেজেছে, কাজেই এখন পত্র সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে ভোজ্য লক্ষ্মীর দরবারে রওনা হচ্ছি। আগামী কালকে আবার পত্রখানার বাকি অংশ লিখবো ইচ্ছা রইলো।

না, শচীন আজকেও আর লেখা হ'ল না, কেন হল না জানাচ্ছি, যেটুকু লিখেছি। এ পত্র সেইভাবেই ডাকে যাবে।

মাসখানেক আগে গান্ধীজির নামে সাবরমতী আশ্রমের ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে তাঁর সুবিধামতো সময়ে ও স্থানে আমাকে দেখা করবার অনুমতি দিলে আমি অনুগৃহীত হব। এতদিন উত্তর না পেয়ে ভেবেছিলাম হয় চিঠিখানা পৌছয়নি, নয় উত্তর দেবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আজ সকালবেলা উত্তর এসেছে। লিখেছেন মহাদেব দেশাই নামে গান্ধীজির একজন সেক্রেটারি। তিনি জানিয়েছেন যে বর্তমান মাসের ২৩শে রবিবার বাপু (গুজরাটি ভাষায় এর মর্ম বাবা) সাহারানপুরে আর্য্যসমাজী পাঠশালায় বেলা ১০-১৫ মিনিটে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে উপস্থিত হবেন, কারণ বাপুর সময় রক্ষা করবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি। সে তারিখটা আগামী কল্য। তাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইগে। সাহারানপুর অবশ্য কাছেই তবু আর্যসমাজী পাঠশালাটা শহরের কোথায় খোঁজ নেওয়া আবশ্যক। দর্শনের ফলাফল জানাতে ভুলবো না। আমার কি মনে হয় জানো বাবা শচীন, ঐ যে চতুর্থ পন্থার কথার উল্লেখ করেছিলাম, হয়তো তাঁর সন্ধান ইনি জানেন। আজ এই পর্যন্ত। রায়মশায়কে নমস্কার জানিয়ো আর তোমরা সকলে আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি বাবা

রাতে খাওয়ার পরে শচীন চিঠিখানা পড়ছিল এমন সময় রুক্মিণী ঘরে ঢুকে বলল, বাবার চিঠি তো বার দুই পড়লে এখন এই চিঠিখানা দেখো।

কালকে দেখলে হয় না, এ তো লম্বা চিঠি দেখছি।

না এখনি পড়ে ফেলো, মলিনাকে দেবো বলে এসেছি।

খুব জরুরি মনে হচ্ছে।

পড়লেই বুঝতে পারবে।

চিঠির শেষ পৃষ্ঠা উল্টে দেখে শচীন চমকে উঠল—বলল, এ যে রাধার লেখা দেখছি। কি আশ্চর্য।

পড়লে আরও আশ্চর্য হবে, পড়ে ফেলো, ঠাকুরঝি অপেক্ষা করে আছে পড়বে বলে।

শচীন পড়তে সুরু করলো।

৬

সকাল বেলা রাধাদের বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব হয় নি, স্কুল-কলেজের যাত্রীদের খাইয়ে বিদায় করতে হয়েছে, হয়েছে বাবার ও শৈলেন দাদার খাওয়া-দাওয়া দেখতে। কাজেই দুপুর বেলা আড়াইটে নাগাদ মলিনা ও রুক্মিণী দুজন রওনা হ'ল রাধাদের বাড়ীর দিকে। রুক্মিণী ঘরের বউ হলেও এই শহরেরই মেয়ে, কাজেই প্রকাশ্য পথে যাতায়াতে বাধা ছিল না তার।

চিঠিখানা খুঁটিয়ে দুজনেই পড়েছে তবু সব রহস্য উদ্ধার হয় নি। ঐ কৈলাস দাদার প্রসঙ্গ নিয়ে দুজনেরই বেধেছে, কৈলাসকে অবশ্য দেখেছে ওদের বাড়ীতে। কিন্তু রাধার অন্তর্ধানের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কটা কি? এখন ওরা বুঝলো লোকে যা ব্যাখ্যা করেছিল, রাধার মা যা সন্দেহ করেছিল সেটা অপ্রকৃত। ওরা কোন কালেই লোকের ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না, এখন রাধার চিঠি সে বিশ্বাস সর্বতোভাবে উন্মূলিত করল। তা যেন হ'ল কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি? মনের এই চিন্তা মলিনার মুখ দিয়ে প্রশ্নাকারে বেরিয়ে পড়লো— ভাই বউদি, কৈলাস দাদার ব্যাপারটা কি তোমার মনে হয়।

কি জানি ভাই, কিছু বুঝতে পারছিনা, তবে লোকে যা ভেবেছে তা নিশ্চয় নয়।

কেন নয়?

তুমিই তো কতবার বলেছ লোকের ধারণা ভুল। তার পরে এই চিঠি। চিঠির বয়ান- আমাদের দুধ পুকুরের জলের মতো স্বচ্ছ, ওর ভিতর দিয়ে রাধার মনের তলা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বাঁচালে বউদি, আমি তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শুনবো আশা করছিলাম। আচ্ছা বউদি, রাধা স্বদেশী দলে যোগ দেয় নি তো।

স্বদেশী দলে! অত্যন্ত বিস্মিত হয় রুক্মিণী।

অবাক হলে কেন? আজকাল মেয়েরাও যোগ দিচ্ছে ঐ সব দলে, সঞ্জীবনী কাগজে পড়েছি। আনন্দমঠের শান্তির কথা ভেবে দেখো না।

সে তো ভাই গল্প।

গল্প হ'লে বুঝি সত্যি হ'তে নেই।

কি জানি ভাই, গল্প আর সত্যির মধ্যে তফাৎ কোথায় জানিনে।

আমি বুঝিয়ে দি—

এমন সময় তারা দেখল একদল স্কুলের ছাত্র বন্দেমাতরম্ হাঁকতে হাঁকতে

আসছে। মলিনারা পাশ দিয়ে দাঁড়ালো, ছেলেদের দলটা চলে যেতে ওরা লক্ষ্য করলো শেষের দিকে আছে লব আর কুশ।

মলিনা তাদের ইশারায় ডাক দিল, কাছে এলে শুধালে, হাঁ রে, সবাই মিলে বন্দেমাতরম্ হাঁকছিস কেন?

দেশবন্ধু আসবেন যে।

দেশবন্ধু কে?

তারা জানে না।

জানো নাকি বউদি?

হবেন কেউ, এলেই দেখা যাবে। এই যে আমরা রাধাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছি।

বউদি, রাধার চিঠির কতদূর কি বলবে আগে থেকে ভেবে নিয়ো। কৈলাসের কথাটা না তোলাই ভালো।

আমারও তাই মনে হয়।

দু'জনে প্রবেশ করলো রাধার বাড়ীতে। বাড়ীর চেহারা দেখে তারা চমকে উঠ্‌ল। উঠোনে গতকাল ঝাঁট পড়ে নি, আস্তাকুঁড়ে দীর্ঘকালের ছাই পাশ জমে রয়েছে, এখানে ওখানে উঠেছে আগাছা, ঘরের দরজা গুলো খোলা, সদর দরজাটা ভেজানোমাত্র ছিল বলে তারা অনায়াসে ঢুকতে পারলো, সব শুদ্ধ মিলে লক্ষ্মীছাড়ার অবস্থা। রাধার অন্তর্ধানের পরে এই প্রথম তারা এলো, এই কয়মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন যেন টলে গিয়েছে। প্রথম দু'চার মুহূর্ত তারা হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলো, ভাবলো বাড়ীতে কি লোক আছে। অবশেষে একটা ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ধাক্কা দিল, ভিতর থেকে খুলে গেল দরজাটা আর যিনি সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তাঁর চেহারা ও কাপড় দেখে তারা বুঝলো লক্ষ্মীহীন গেরস্তালির মালিক হওয়ার যোগ্য বটেন। রাধার মা।

উভয় পক্ষের বিস্ময় কাটবা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, এসো বউমা, এসো মা, ভিতরে এসে বসো।

ওরা প্রণাম করলো।

রাধার মা বললেন, কত কাল পরে তোমাদের দেখলাম মা, কতদিন আসোনি, আর আসবেই বা কেন!

ওদের মুখে কথা জোগায় না, কি দিয়ে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পায় না। কিন্তু ভাববার কারণ ছিল না, রাধার মা একাই পূর্বপক্ষ উত্তর পক্ষ ক'রে চললেন।

কেউ আর আসে না মা, আর আসবেই বা কেন। একি ভদ্র গেরস্তর বাড়ী

আছে। আমিও কোথাও যাইনে। আগে নদীতে স্নান করতে যেতাম, সেখানে বুড়িরা আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ছুঁড়িরা হাসে। লজ্জায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, বাড়ীর কুয়াতেই স্নান সেরে নিই। কর্তা গেলেন, তারপরে, তারপরে আর কথা জোগালো না মুখে, কপালে করাঘাত ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ওরা দেখ্‌ল আর কথা না বললে চলে না, কিন্তু কি দিয়ে আরম্ভ করবে। হঠাৎ রুক্মিণীর মুখ দিয়ে বের হ'য়ে গেল, মাসিমা, রাধার চিঠি পেয়েছি।

কার চিঠি?

বুঝতে পারছেন না, রাধার চিঠি।

রাধা কে?

কেন আপনার মেয়ে।

আমার তো কোন মেয়ে ছিল না, আমি তো ও নামে কাউকে চিনিনে।

সে কি রাধাকে চিনতে পারছেন না।

না, না, আমার কি মেয়ে ছিল? তবে সে গেল কোথায়!

কি বলছেন মাসিমা। তার বিয়ের কথা হয়েছিল আমাদের সুশীলের সঙ্গে—সব ভুলে গেলেন। কালকে আমরা তার চিঠি পেয়েছি।

কেউ নাম ভাঁড়িয়ে চিঠি লিখে থাকবে।

সে কি কথা মাসিমা, আমরা যে তার হাতের লেখা চিনি, এক সঙ্গে আমরা পাঠশালায় পড়েছি।

এতক্ষণ রাধার মা নিজের সঙ্গে যুঝছিলো, আর পারল না, এবারে ভেঙে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো—ঐ কালামুখীর কথা আমার সঙ্গে বলো না, কালামুখী নিজের মুখ পুড়িয়েছে, আমার শ্বশুর-কুলে কালি দিয়েছে—না, ও আমার মেয়ে নয়।

মাসিমা, আপনি রাধার উপরে রাগ ক'রে তাকে ভুল বুঝছেন। সে লিখেছে যে অসৎ পথে যায় নি।

মুখ পোড়াবার পরে কেউ কি বলে যে অসৎপথে গিয়েছে।

মলিনা বল্‌ল, আপনি যদি ও ভাবে রাধার নামে বলেন, তবে আমরা উঠি।

পাছে ওরা উঠে যায় সেই ভয়ে রাধার মা তার আঁচল চেপে ধরলো, না, মা না, যেয়ো না, যেয়ো না, একটু বসো। আমার বাড়ীতে আর কেউ আসে না, আর আসবেই বা কেন, কুলত্যাগিনীর বাড়ীতে কে আসতে চায়। তোমরা এসেছ, অনেক দিন পরে তোমাদের সামনে কাঁদলাম, এতদিন নিজে একা একা বসে কেঁদেছি, চোখের জল আর ফুরোতে চায় না, পোড়া চোখে এত জলও আছে।

তারপরে একটু থেমে বললেন, হাঁ মা, পোড়ারমুখীর চিঠিখানা এনেছ।

সঙ্গে তো আনিনি।

আমার যে দেখবার ইচ্ছা তা মনেও করো না, কেবল দেখতাম হাতের লেখা তারই তো বটে না কেউ তার নামে লিখেছে।

বেশ তো, কালকে এনে দেখিয়ে যাবো।

কি লিখেছে? টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বুঝি। সব টাকা তো তার নামেই আছে। আমি তো এক পয়সাও খরচ করিনি।

তবে খরচ পত্তর চলে কি ক'রে?

খরচ! গাছে কাঁচকলা আছে, গাছে লঙ্কা আছে, ক্ষেতের চাল আছে—আর কি চাই!

তারপরে আবার ভেবে বল্লেন, চিঠিখানা দেখতে চাই বটে তবে ভেবো না যে ও আমার মেয়ে। কালামুখী মরেছে, মরেছে, না চিঠিতে আমার দরকার নেই। তবে হাঁ, মরার খবর পেলে চিঠিখানা দেখিয়ে যেয়ো, বহরমপুর গিয়ে গঙ্গায় ডুব দেবো। তোমরা ভাবছ ডুব দিয়ে আবার ফিরে আসবো, মনেও ভেবো না তেমন কথা। ডুব দেবো আর উঠবো না, এতদিন ডুবে মরিনি ঐ খবরটা পাওয়ার আশায়।

রুক্মিণী বল্ল, মাসিমা, আপনার মতো সতী লক্ষ্মীর মেয়ে কখনো অসৎ পথে যেতে পারে?

এই কথা শুনে আবার তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। একটু থেমে বললেন, মা সত্যি কথা বলি তবে, আমার মেয়ে তো মন্দ নয়, অসৎ পথে ওকে নিয়েছে ঐ পোড়ারমুখো হারামজাদা।

কে সে?

ঐ কৈলেস, কর্তার মুহুরি ছিল। পাঁচ টাকা মাইনে নেবে শুনে কর্তা নেচে উঠে ছোকরাকে রাখলেন, বল্লেন, লোকটা সরল, পাঁচ টাকাতে থাকতে রাজি, কুড়ি পঁচিশ টাকার কমে তো মুহুরি পাওয়া যায় না।

বললাম কর্তা, পাঁচ টাকায় কখনো ভালো লোক থাকে—এর মন ভালো নয়। তিনি বললেন, তোমার নিজের মন মন্দ বলে সকলকেই মন্দ দেখো। তা মা লোকটা কাজের ছিল বটে, কাছারীর কাজ করে, বাজার করে, ফাইফরমাস করে, আবার খামারে গিয়ে ধান মেপে নিয়ে আসে। কর্তা আড়ালে বলেন লোকটা বামুনের গরু, খাটে বেশি, খায় কম আর মাইনে পাঁচ টাকা, তাও চায় না, যখন খুশি দিই, অনেক পুণ্যে এমন লোক মেলে।

তারপরে কর্তা গত হ'লে বললাম, বাবা কোথায় আর যাবে, আর আমাদেরও দেখা-শোনার একটা লোক চাই, এখানেই থেকে যাও, না হয় মাইনের বিষয়ে বিবেচনা করবো।

সে বল্‌ল, হাঁ মা, তা যদি রাখেন তবে ভালো হয়, কোথায় আর নতুন জায়গায় যাবো। তবে মাইনে আর চাইনে, কর্তা গেলেন কে মাইনের টাকা জোগাবে।

তখন রাধা বল্‌ল, কেন কৈলাসদা, বাবা তো টাকা রেখে গিয়েছেন।

আরে রাধা, ও তো কলসীর জল খরচ হবে, নতুন তো আর আসবে না। না, মা, পেটে খেতে পেলে এখানেই থাকবো।

রাধা বল্‌ল, মা কৈলাসদাকে রাখো, ওর সঙ্গে লেখা-পড়া শিখবো, বেশ হবে।

থেকে গেল লোকটা। রাধা সকাল সন্ধ্যা বই নিয়ে বসে ওর কাছে পড়াশোনার নামে সকাল সন্ধ্যা কি গুজগুজ ফুস ফুস করে—আমি-কি অতশত বুঝি! মাঝখানে আটদশ দিনের জন্য লোকটা ছুটি নিয়ে গেল, ভাবলাম বুঝি পালালো। রাধা বল্‌লে, না, মা, আবার ফিরে আসবে। এলোও বটে ফিরে, না ফিরলেই যে ভালো ছিল তখন কি জানি। তার পরে একদিন সকাল বেলায় ওদের আর দেখা নেই। একদিন যায়, দু'দিন যায়, কোথায় তারা! পাড়াপড়শীরা শুধায়, রাধা কোথায় গেল? বলি মাসির বাড়ীতে, কাউকে বলি পিসির বাড়ীতে। আর কৈলাস, তার সঙ্গেই তো পাঠিয়েছি। কিন্তু কতদিন আর কথা চাপা দেওয়া যায়—সকলে বলে রাধা বেরিয়ে গিয়েছে কৈলাসের সঙ্গে, সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখা আর কাল সাপ পোষা এক কথা, তার আবার দুধের ভাঁড় ঐ কৈলেস মুহুরি, রেগে বল্‌লাম, বেশ, গিয়েছে তো গিয়েছে, তোমরা আর এসো না না আমার বাড়ীতে। সেই থেকে তোমরা ঐ যে বলো বয়কট না কি তাই করলো আমাকে।

তারপরে শোন মা, একদিন পুলিস এসে বল্‌ল, পুলিসকে খবর কে দিল জানি না, বল্‌ল, আপনার মেয়ে ফেরারী আসামী কৈলাসের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে দুজনেই এখন ফেরার। পেলে দুজনকেই এনে হাজতে পুরবো। আর আপনি জেনে শুনে ঐ ফেরারী আসামীকে বাড়ীতে রেখেছিলেন, যেমন কর্ম এখন তেমনি ফল পেলেন। আপনাকে যে হাজতে নিলাম না সে কেবল অসহায় বিধবা বলে।

কেউ কেউ বল্‌ল, পুলিসকে কিছু দিন নইলে আবার আপনাকে নিয়ে

টানাটানি করবে।

দিলাম দু'খানা চুড়ি, রাধার বিয়ের জন্তেই তুলে রেখেছিলাম। দেখলে তো মা সংসারে কার ধন কে খায়—

বলে হা হা করে হেসে উঠল।

ওরা বুঝলো ঘোর বিকারের হাসি।

সংসারে হিন্দু বিধবার মতো অসহায় জীব অল্পই আছে।

সেই মূর্ছিত প্রায় নারীর পাশে দু'জনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকে, কি বলা যায়, কি করা যায় ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ পরে মলিনা বললে, বউদি, এঁকে এ অবস্থায় রেখে কি করে যাওয়া যায়।

যাওয়ার কথাই ওঠে না এখন, একে সুস্থ করে না তুলে যাওয়া যায় না। চুলে হাত দিয়ে বলল, দেখো দেখি চুলে জট প'ড়ে গিয়েছে, কতদিন মাথায় তেল পড়েনি কে জানে। দেখো তো ভাই ঘরে নারকোল তেল আছে, কিনা।

মলিনা অনেক খুঁজে পেতে একটা বোতলে গণ্ডুষ মাত্র অবশিষ্ট নারকোল তেল পেল—এই নাও বউদি।

এসো জট ছাড়িয়ে মাখিয়ে দি।

তখন দু'জন ধীরে ধীরে মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করলো—দেখেছ দিতেই শুষে নিচ্ছে, কত দিন যে তেল পড়েনি।

তেল মাখানো হলে কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে এলো মলিনা, শুধালো এখন?

এখন আর কি স্নান করিয়ে দি, একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে এসো।

ওরা যখন শায়িত নারীকে স্নান করাচ্ছিল তখন খানিকটা জ্ঞান হয়েছে রাধার মায়ের। সেই প্রথম জ্ঞানের আলো আঁধারির মধ্যে বুঝতে পারলো না ঠিক কি হচ্ছে, পরে বোধহয় মনে হ'ল কেউ স্নান করিয়ে দিচ্ছে। কে! কে স্নান করিয়ে দিচ্ছে!

অস্পষ্ট জড়িত ভাবে বলল, রাধা মা, আর জল দিয়ো না, ঠাণ্ডা লাগছে।

ওরা সাড়া দিল না, সুখ মিথ্যা হলেও সুখ, সে সুখটুকু ভঙ্গ করা কেন।

স্নান ও কাপড় বদলানো শেষ হ'লে রুক্মিণী বলল, মলিনা, বোধহয় আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি।

সে কি, এত বেলাতেও না খেয়ে আছেন।

তাইতো মনে হচ্ছে, তুমি একবার পাকঘরে গিয়ে দেখে এসো তো অবস্থাটা কি ?

কিছুক্ষণ পরে মলিনা ফিরে এসে বল্‌ল, বউদি তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। উনুনে ভাতের হাঁড়ি চড়ানো আছে, উনুন জ্বলে জ্বলে নিভে গিয়েছে, আর ভাত পুড়ে হয়ে গিয়েছে কয়লা।

তবেই দেখো, আবার ভাত চড়িয়ে দিতে হয়।

ঘরে চাল ছাড়া আর কিছু নেই, না তরিতরকারি, না একটু তেল ঘি ; নুন থাকলেও থাকতে পারে।

রুক্মিণী গোটা তিনেক টাকা বের করে দিয়ে বল্‌ল, দেখো তো কাছাকাছি মুদির দোকান আছে কিনা।

মলিনা পাড়ার মেয়ে, সব খোঁজ রাখে, বলল, ছিদাম মুদির দোকানে মোটামুটি সব পাওয়া যাবে।

তবে যাও ভাই, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুজনের চেষ্টায় আলু ও কাঁচকলা সিদ্ধ ভাত নামলে রুক্মিণী বল্‌ল, এ পর্যন্ত সহজে হ'ল, এবারেই কঠিন।

মাসিমা ওঠো, ওঠো।

তখন তার জ্ঞান হয়েছে, অনেকদিন পরে শরীরে তেল জল পড়ে শরীরটাও সুস্থ।

ও মা তোমরা, আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখছিলাম, না, কিছু না, বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দিলেন।

এ কি স্নান করিয়ে কাপড় বদলে দিয়েছ দেখি। নিজের মেয়ে আর পরের মেয়েতে তফাৎ দেখেছ।

ওরা বুঝে নিয়েছে এসব কথার উত্তর দিলেই জঞ্জাল পাকিয়ে উঠবে।

মলিনা, যাও মাসিমার ভাতটা এখানে নিয়ে এসো।

ভাত কোথায়, সে তো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

দেখোই না।

মলিনা থালায় ভাত গেলাসে জল নিয়ে এসে সম্মুখে রাখলো।

অনেক দিন পরে থালায় সুসজ্জিত অন্ন দেখে দুই চোখে ধারা নামলো।

খেয়ে নাও মাসিমা।

খাবে কি, চোখে যে দেখতে পায় না।

মলিনা হেসে বল্‌ল, মাসিমা, তুমি নিজের হাতে না খেলে আমি খেয়ে

খাইয়ে দেবো।

না, না আমি নিজেই খাচ্ছি। আর না খেয়েই বা কদিন থাকবো, শত দুঃখেও পোড়া পেট যে খিদে ভোলে না।

নাও, তুমি এবারে শুয়ে বিশ্রাম করো, আমরা ততক্ষণে ঘরদোরগুলো একটু গুছিয়ে দি।

এই বলে তারা তক্তপোষের উপরে বিছানায় রাধার মাকে শুইয়ে দিয়ে ঝাঁটা জল নিয়ে গৃহ সংসার কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। আঁস্তাকুড়, রান্নাঘর, বাইরের ঘর শয়নঘর সব জঞ্জালে একাকার। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় সমস্ত এক রকম দাঁড়িয়ে গেল। সব শেষে যে ঘরটায় ঢুকলো সেটার সঙ্গে ওদের সবচেয়ে বেশি পরিচয়—রাধার ঘর। তারা দেখল, তক্তপোষের উপরে বিছানা গোটানো অবস্থায় পড়ে আছে, মশারির একটা কোনা তখনো দড়িতে বাঁধা ঝুলছে। লেখার টেবিলের উপরে দোয়াতটায় কালি জমে শুকিয়ে গিয়েছে, প'ড়ে আছে গোটা দুই নিঃশেষ প্রায় পেন্সিল। আর একদিকে কেরোসন কাঠের একটা ছোট আলমারিতে এক গাদা খাতা ও বই। কৌতূহল বশে সেগুলো নামাতেই চোখে পড়লো একখানা মোটা বাঁধানো খাতা, তার মধ্যে পাতায় পাতায় খবরের কাগজ থেকে কাটা, সংবাদ আর ছবি। ছবিগুলোই প্রথমে চোখে পড়লো কানাই দত্ত, প্রফুল্লচাকি, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ, বারিন, যতীন মুখুজ্জে এমন কত জনের। আর সংবাদগুলোও সেইজাতের। বোমা ও পিস্তলে পুলিশ, গোয়েন্দা, ইন্সপেক্টারদের মৃত্যুর সংবাদের নীচে পেন্সিলে লেখা মন্তব্য—বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। খাতাখানার শেষ পৃষ্ঠায় সঞ্জীবনী পত্রিকা থেকে কাটা একটি সংবাদ ও একখানি ছবি। এ সংবাদ ও ছবিখানার সঙ্গে রুক্মিণীরা অত্যন্ত পরিচিত—পুলিশ হাজতে মৃত সুশীলের মৃত্যুসংবাদ ও ছবি। নীচে রাধার হস্তাক্ষরে লাল পেন্সিলে বড় বড় করে লেখা—"দেবতা আমার স্বর্গ আমার, আমার বীর আমার স্বামী। যেমন করেই হোক তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই। এই কাজে জীবন উৎসর্গ করে সেই পুণ্যে, চলে যাবো তোমার কাছে।"

পড়তে পড়তে দু'জনের চোখে জল ভ'রে এলো। জল যতই মোছে, ততই বাড়ে, চোখের জল বড় অবাধ্য।

বউদি, এবার বুঝলে কি।

ভাই আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, তুমিই বরঞ্চ বুঝতে পারোনি।

মলিনা বুঝে ওঠে না, সে বুঝতে পারেনি, বুঝেও ভুলে গিয়েছিল। রাধা

দু'দিন দেখেছিল সুশীলকে—আর সে যে নিত্য, বিস্মৃত বিদ্যুৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তার মনে ঘন ঘন দুঃখের চাবুক চালাতে লাগে।

রুক্মিণী আরও আবিষ্কার করে কতকগুলো বই, মুক্তি কোন্‌পথে, ভবানী মন্দির, বর্ত্তমান রণনীতি, আনন্দমঠ, গীতা।

সে বলে, মলিনা চলো এই খাতাখানা আর বইগুলো নিয়ে, নইলে পুলিসে কোনদিন দেখতে পেলে মাসিমাকে নিয়ে টানাটানি করবে।

সেই ভালো।

মাসিমা, এবারে আমরা আসি, বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করে গেলাম, কালকে আবার আসবো।

রাধার মা কিছু বল্‌ল না, নীরবে শুধু কাঁদতে লাগলো।

পথে যেতে যেতে রুক্মিণী বল্‌ল, মলিনা, এবারে বুঝতে পেরেছ রাধা কোন্‌ পথে গিয়েছে।

সে পথ কি মেয়েদের জন্মেও খোলা ?

মলিনার এই উক্তি ভালো লাগলো না রুক্মিণীর। কিন্তু তখন আর উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় ছিল না, বাড়ীতে এসে ঢুকেছে, সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রফুল্লমুখ স্বয়ং শ্বশুর।

কোথায় গিয়েছিলে মা ?

রাধার মায়ের বাড়ীতে।

আমার এ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়নি, বড় ভুল হ'য়ে গিয়েছে। শীগ্‌গীরই একদিন যাবো। আর এদিকে সংবাদ শুনেছ ?

ওরা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে দাঁড়ায়।

দেশবন্ধু আসছেন যে।

আমাদের শহরে ?

শুধু আমাদের শহরে নয়, আমাদের বাড়ীতেই পায়ের ধূলো দেবেন বলে টেলিগ্রাম এসেছে।

কবে বাবা ?

পরশু। ভিতরে যাও, শচীনের কাছে সমস্ত শুনতে পাবে।

৭

ওরা ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলো শচীন আছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে আছে পনেরো-কুড়ি জন নানাবয়সের পুরুষ, সকলেই পাড়ার লোক, অনেকেই স্বদেশী স্কুল ও কলেজের ছাত্র। ওদের দেখে শচীন বল্‌ল, মলিনা, তোমরা ভিতরে যাও, আমাদের সভা ভাঙতে আজ রাত হবে, আমার দেরী দেখলে তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়ো। ওরা ভিতরে চলে গেল। পরের দিন দেশবন্ধু আসবেন। তাঁর সম্বর্ধনার, থাকবার ও জনসভার ব্যবস্থাপনা এই সভার প্রধান কর্মসূচী।

রাত দশটা বাজে দেখে মলিনা ও রুক্মিণী খেয়ে শুয়ে পড়লো। রুক্মিণী রাত জাগতে পারে না, তার পরে আজ রাধার বাড়ীতে পরিশ্রম হয়েছিল শোবা-মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম এলো না মলিনার চোখে। ঘুম সুখের পায়রা, দুঃখীর কাছে ঘেঁষে না।

রাধার আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেকে বারে বারে ধিক্কার দিল মলিনা। সুশীলের জন্যই যে সে গৃহত্যাগী হয়েছে, কুলত্যাগের কলঙ্ক মাথায় নিয়েছে, আর খুব সম্ভব মিলেছে গিয়ে কোন দূর জঙ্গলের স্বদেশী দলে যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। কার সঙ্গে গেল, কে তাকে সন্ধান দিল সে কথা তো খুলে লিখেছে চিঠিখানাতে, তবু এখনো অনেক রহস্য অজ্ঞাত, কিন্তু একটা সূতো যখন হাতে এসেছে ক্রমে ক্রমে অবশ্যই সমস্ত জানতে পারা যাবে। কিন্তু যার জন্যে কুলত্যাগিনীর অপবাদ নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে আর সুনিশ্চিত ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে সে আত্মসমর্পণ করলো সেই সুশীল তার কে? সুশীলকে অবশ্যই সে দেখেছে, শহরের একই পাড়ার ছেলে মেয়ে তারা, কিন্তু সে দেখা যে দশজনের একজন রূপে। পরে যখন বিয়ের কথা হ'ল, বিয়ে স্থির হয়ে গেল তারপরে তো আর দেখা হয়নি সুশীলের সঙ্গে। তবু তার জন্যে এত ত্যাগ আর চরম বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ! প্রতিশ্রুতির মানুষ কি এত সত্য হয়ে ওঠে। আর সে, মলিনা, তার সঙ্গে কত প্রভেদ রাধার। রাধা প্রস্তাবিত যে ব্যক্তিকে বর হিসাবে একবারও চোখে দেখেনি—তার সঙ্গে মলিনার কোথায় মিল! রমণীর সঙ্গে অবশ্য তার বিয়ের প্রস্তাব হয় নি, হয়তো আদৌ হতো না, তবু মনে মনে মালা বদল তো হয়েছে। কিন্তু বদল কথাটা কি সত্য হ'ল! তার গলার মালা অবশ্য প্রত্যেক দিন পড়েছে রমণীর গলায়—কিন্তু রমণীর গলার মালা! মনে তার একটুকু সন্দেহ নেই যে তার মালাও পড়েছে মলিনার কণ্ঠে। না, না, এতটুকু সন্দেহ নেই। প্রেমের চোখ

কখনো ভুল দেখে না। তবে সে দেখা তো মরীচিকা দেখা হতে পারে। মরীচিকা মিথ্যা, কে বলুন। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে অবশ্যই সত্য। ফুলের মালা শুকিয়ে যায়, মনের মালা কি কখনো শুকোয়। আজ তাকে ভুলে গিয়ে সে কিনা সুখে জীবন যাপন করছে! রাধার দৃষ্টান্ত সবলে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল দুঃখের দরিয়ায়। সে ভূগোলে পড়েছিল পৃথিবীর একভাগ স্থল তিনভাগ জল, সে জল আবার লবণাম্বু। আজ বুঝলো ভূগোলের সত্য জীবনের সত্য হয়ে উঠেছে। সুশীলের মৃত্যুর ফলে মা গেলেন, তারাচরণবাবু গেলেন, বউদির মা গেলেন, বাবা গৃহত্যাগী হলেন, গৃহত্যাগী হ'ল রাধা, আর উন্মাদিনী হয়ে গৃহ আঁকড়ে রইলেন রাধার মা। তারা শুধু কয়েকজনে একটুখানি ডাঙার মতো মাথা জাগিয়ে রয়েছে। কে তাকে সত্য পরিচয় দেবে রমণীর। সংবাদপত্রে অবশ্য পড়েছিল যে গোয়েন্দা সন্দেহে রমণী নিহত হয়েছিল—সে কথা তখনো বিশ্বাস করেনি, আজও করে না, কার কাছে পাওয়া যাবে তার যথার্থ পরিচয়।

হঠাৎ মনে হ'ল ঐ যে ফেরারী আসামীটি, দাদার মুখে যার নাম শুনেছিল অরবিন্দ রায়, সে জানলেও জানতে পারে। বেকসুর খালাস পাওয়ার পরে বারে বারে যাতায়াতে অরবিন্দর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলে কি জানা যাবে না? ওরা নিশ্চয় এসব ব্যাপারের সন্ধান রাখে। কিন্তু তখনি আমার মনে হয় যে যদি গোয়েন্দা বলে সমর্থন করে। তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? যে—সুশীলের মৃত্যু পুলিশের হাতে সেই পুলিশের গোয়েন্দা যদি প্রমাণ হয় রমণী, তবু কি তাকে মনের বেদীতে বসিয়ে রাখা সম্ভব হবে! কিন্তু না, তার নারীর অন্তর্যামী বলে, না এ কখনোই সম্ভব নয়। অরবিন্দর মুখে প্রথমদিনেই সে শুনেছিল দরকার হলে স্বপক্ষের লোকের উপরেও তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়, আরও শুনেছিল সন্ত্রাসবাদীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, একজন অন্যদলকে শত্রু মনে করে। শত্রুকে গোয়েন্দা মনে করা অসম্ভব কি। স্থির করলো অরবিন্দ এলে কথাপ্রসঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করবে। এতদিনে যেন সে একটা কূল দেখতে পেলো। কূল দেখতে পেলে মনে আশা জাগে, আশায় সান্ত্বনা থাকে, সান্ত্বনায় নিদ্রা। মলিনা ঘুমিয়ে পড়লো।

পিতার ডাকাডাকিতে যখন তার ঘুম ভাঙলো আকাশ ছেয়ে গিয়েছে আলোয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। যজ্ঞেশবাবু বললো, চলো মা একবার রাধাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, কালকে আর সময় পাওয়া যাবে না।

মলিনা বল্‌ল, বউদি ?

না, না, তাকে এখন ডাকা চলবে না, সে সংসারের কাজ করছে করুক।

দু'জনে রাধাদের বাড়ী বলে রওনা হ'ল।

রাধাদের বাড়ী থেকে ফিরবার সময় পিতা বল্‌লো, দেখলে তো মা, কত ক'রে বললাম আর এখানে কেন, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন।

বাড়ীঘর দেখবে কে ?

সে ব্যবস্থা আমি করবো।

আপনাদের অসুবিধা হবে।

তার চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধা হচ্ছে এখানে আপনার।

না, না, এখানে কোন অসুবিধা নেই।

বাবা, কালকে বউদি আর আমি এসে দেখে গিয়েছি কি অবস্থায় ছিলো।

সে তো কতক শুনেছি রুক্মিণীর কাছে। আসলে স্বামীর ভিটে ছাড়তে চান না।

আর তাছাড়া, বাবা, রাধার হঠাৎ গৃহত্যাগে মাসিমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা, রাধার হঠাৎ কি হ'ল জানো ?

কালকে ঐ যে চিঠি পেয়েছি যার কথা বউদি আপনাকে বলেছেন তার বেশি আর কি করে জানবো।

সে যে অসৎপথে যায়নি একথা খুলে না লিখলেও আমি বিশ্বাস করতাম।

কিন্তু বাবা সে বোধহয় স্বদেশীর দলে ঢুকেছে।

চমকে উঠে যজ্ঞেশবাবু বল্‌লেন, সে কি কথা ! কি করে জানলে ?

তখন রাধার ঘরে সেইসব খাতাপত্র ও বই আবিষ্কার থেকে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলো, সুশীলের মৃত্যু সংবাদ, ছবির কথাও বলল্‌, বাদ দিল কেবল "দেবতা আমার স্বর্গ আমার আমার স্বামী আমার বীর" ছত্রটা।

এ তো বড় আশ্চর্য। আরও খোঁজ নেওয়া দরকার, তবে খোঁজ পাবই বা কোথায় ? পুলিসকে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।

মলিনা বাঞ্ছিত সুযোগ পেলো, বল্‌ল, কেন বাবা ঐ যে অরবিন্দবাবু আসেন, উনি তো এক সময়ে স্বদেশী দলে ছিলেন, উনি জানলেও জানতে পারেন।

মন্দ বলোনি, তবে কি জানো, স্বদেশী দল এখন আর একটি দুটি নয়—সেই চট্টগ্রাম থেকে বোম্বাই, পেশোয়ার অবধি ছড়িয়ে পড়েছে এই মহাসমুদ্রে কে

কার খোঁজ রাখে।

তবু জিজ্ঞাসা করতে দোষ কি। তবে শুনেছি একদলের লোক অপর দলের খোঁজ জানে না।

মলিনা অভীষ্ট জাতব্যটা বাপের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল, আর হয় তো একদল অপরদলকে শত্রু বলে মনে করে।

এ রকম একটা কানাঘুঁষাও শুনেছি বটে। তবে কি জানো, অরবিন্দর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়—তার উপরে নির্ভর করে কি এত গোপন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায়—আর তার সুযোগই বা কোথায় ?

কেন বাবা, সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে কতক্ষণ। দেশবন্ধু আসছেন, স্বেচ্ছা-সেবক ও খবরদারি করবার জন্য অনেক লোকের দরকার হবে ; এ কয়দিন অরবিন্দবাবুকে আমাদের বাড়ীতে থাকতে বলো না কেন।

এ মন্দ যুক্তি নয়। একবার কাছে পেলে জেরার কৌশলে পেটের কথা টেনে বের করে ফেলবো।

তা তুমি পারবে বাবা।

পারবো তো বটে, তবে তার দেখা পেলে হয়, কোথায় থাকে কে জানে।

বাড়ীতে ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখলো অরবিন্দ বসে আছে। সে উঠে নমস্কার করলো।

আরে বসো বসো, তোমার কথাই হচ্ছিল মলিনার সঙ্গে।

মলিনার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল ; তার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, ওঁদের সঙ্গে আমার প্রথম দিনেই পরিচয় হয়েছিল, গোপনে আশ্রয় না দিলে হাজতে যেতে হতো, আরও কি হতো কে জানে।

সে সব কথা আমি শুনেছি ওদের কাছে। দেখো, আমি বলছিলাম কি দেশবন্ধু পায়ের ধূলো দেবেন শহরে, থাকবেন আমাদের বাড়ীতে। এখন, তাঁর তত্ত্বতালাস করবার জন্যে অনেক লোকের দরকার হবে। তোমার যদি অসুবিধা না থাকে একদিন আমাদের বাড়ীতে থাকো না কেন।

এ আর বলতে। দাশ মশায়ের সেবা করতে পারা তো গৌরবের বিষয়। উনি আদালতে আমাদের পক্ষে না দাঁড়ালে আমাদের অনেককেই হয় ফাঁসিতে নয় দ্বীপান্তরে যেতে হতো, উনি আমাদের মুরুব্বি।

তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি ?

আজ্ঞে না, সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

বেশ, এবারে হবে। আর দেখো রাতের বেলায় তোমার সঙ্গে আমার কিছু

কথা আছে, তোমাদের স্বদেশীদল সম্বন্ধে।

এখন আর তাতে বাধা নেই।

তবে সেই কথাই রইলো।

তারপরে মলিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা দুপুরের খাওয়ার তো দেরী আছে, এখন অরবিন্দবাবুকে কিছু খেতে দে।

আর বাবু কেন, স্যার।

কথা জানো কি, আজকাল ছোকরার দল নাম ধরে ডাকলে রাগ করে। আচ্ছা, তোমার যখন আপত্তি নেই তখন আর বাবুতে কি দরকার।

যজ্ঞেশবাবু প্রস্থান করলেন।

মলিনা বলল, আমি কিন্তু বাবু বাদ দেবো না।

কেন বাদ দেবেন না, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড।

বয়সে দাদা তো আরও বড়।

তবে বাবুর বদলে দাদা, কেমন রাজি তো।

সংক্ষেপে 'হাঁ' বলে মলিনা ভিতরে চলে গেল।

৮

এমন সময়ে যজ্ঞেশবাবু প্রবেশ করলে দেশবন্ধু বললেন, আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করছিলাম শহরের দেবদারু গাছগুলোর পাতা, কলার গাছ আর বাঁশের ঝাড় আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। এ কি করেছেন রায় মহাশয়, দশ হাত পর পর তোরণ আর কলাগাছ এ যে যজ্ঞের ব্যাপার করেছেন।

পাশ থেকে একজন যুবক বলে উঠল, করবেনই বা না কেন উনি যে স্বয়ং যজ্ঞেশ।

হেমন্ত, তুমি বড় ফাজিল হয়েচ, প্রবীণের সঙ্গে কথা বলতে জানো না, সুভাষকে দেখে Manners শেখো, দেখো তো, ও কেমন শিষ্টভাবে বসে আছে।

এই প্রশংসায় সুভাষের মুখ লাল হয়ে উঠল।

দেখেছ বেচারী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

আজ্ঞে, আপনার তিরস্কারে আমার মুখটাও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে কিন্তু আমার রঙটা কিনা বর্ণচোরা দেখা পাওয়া যায় না।

দেশবন্ধু হো হো করে হেসে উঠলো, বুঝলেন যজ্ঞেশবাবু, হেমন্তর সঙ্গে কথা বলে এঁটে ওঠা যায় না। আর এঁর সঙ্গে, সুভাষচন্দ্রকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে, হিসাব করে কথা বলতে হয়।

স্যার, সকাল বেলাতেই আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন, আমি তো চুপ করে আছি।

তা যা বলেছ সুভাষ, আমি উকীল মানুষ কথা বলাই আমার যে ব্যবসা।

আর হেমন্ত ?

ও এম-এতে ফার্স্ট হয়েছে, মাস্টার হবে, তাই কথা বলবার অভ্যাস করছে। তুমি এক্সেকিউটিভ অফিসার, তোমার বেশি কথা বললে চলবে কেন ? দেখছেন যজ্ঞেশবাবু আমার সব চেলাদের।

সবাই এক একটি রত্ন, আর হবেই বা না কেন, এসেছে কার সঙ্গে।

এমন সময়ে একটি যুবক প্রবেশ করলো, রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, মুখে হাসি, চোখে বিদ্যুৎ, যেন জলভরা বর্ষার মেঘ।

তাকে দেখে দেশবন্ধু বলে উঠলো, এ আর একটি রত্ন।

যুবকটি বলল, রত্ন বলে রত্ন, একেবারে কালো মানিক।

শুনলেন তো ?

আরও কিছু শুনেছি। ও বাড়ীতে গান গেয়ে এতক্ষণ আসর জমিয়ে রেখেছিলেন।

হাঁ গান পেলে আর কাজির কথা নেই, হাতের কাছে একটা হারমোনিয়াম দিন, ও আহার নিদ্রা ভুলে যাবে।

যারা শোনে তাদেরও মনে থাকে না আহার নিদ্রার কথা, বললেন যজ্ঞেশবাবু।

এবারে দেশবন্ধু বললেন, কি কাজি, আজ বিকালের সভায় গান হবে তো ?

হবে।

জমিয়ে দেওয়া চাই। নূতন কিছু আছে।

যা ছিল এতক্ষণ এঁদের শোনালাম।

তবে ?

লিখে ফেলবো।

তুমি দেখছি যে রবিবাবুকে ছাড়িয়ে যাবে।

ঐটি বলবেন না স্যার, আর সকলকে ছাড়ানো যায় কিন্তু—

বঙ্কিমকে ?

বঙ্কিমচন্দ্র যে আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ, সকলের আগে ওঁর পূজা, ওঁকে ছাড়াবার এড়াবার প্রশ্ন ওঠে না, আহা কি গানই না লিখেছেন বন্দেমাতরম্— এই বলে বিনা ভূমিকায় বন্দেমাতরম্ গানটি গাইতে আরম্ভ করলেন। মুহূর্ত মধ্যে স্বরের জাদুতে ঘরের সমস্ত চিত্রার্পিতবৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেশবন্ধুর দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো, মুছবার প্রয়াস করলেন না। সুভাষের চোখের কোলেও জল জমে উঠছিল, তবে পডবার আগেই মুছে ফেলছিলেন। সুভাষ এখনো ছেলেমানুষ। এ দেশের মহাপুরুষেরা চোখের জলে লজ্জা পায় না।

প্রকাণ্ড হলঘরের মেঝে জোড়া শতরঞ্চির উপরে শাদা জাজিম পাতা, ইতস্তত ছড়ানো অনেকগুলো তাকিয়া। সমস্ত ঘরটা লোকে ভরে গিয়েছে। একদিকে আগন্তুক, আর একদিকে শচীন, ভূপতি, নৃপতি, স্বদেশী কলেজের প্রিন্সিপাল রমণী চাটুজ্জে আর ছোট বড় উকীলের দল। দরজার আড়ালে মেয়েরা।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ তার নাতিকে মৃদুস্বরে বোঝাচ্ছিল—ঐ যে, ঐদিকে সুন্দর মতো লোকটি বসে আছেন এঁকে চিনে রাখ, ওঁর নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

উনি কি করেছেন দাদু?

অনেক কিছু করবেন।

তবে এখনো কিছু করেন নি?

সে কি রে? আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করেছেন, যা পাশ না করলে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যায় না।

উনি যদি ম্যাজিস্ট্রেট তবে এখানে কেন?

ছেড়ে দিয়েছেন রে ছেড়ে দিয়েছেন।

উনি তো ছেলেমানুষ দাদা।

হাঁ, এখনো চারাগাছ, ক্রমে বনস্পতি হবেন। মনে রাখিস ওঁর মতো হ'তে হবে, আই সি এস পাশ করতে হবে।

পাশ করে ছেড়েই যদি দিতে হয় পাশ করে কি লাভ?

সমস্যাটা এড়িয়ে গিয়ে বৃদ্ধ বলে, আর মাঝখানে ঐ যে বনস্পতির মতো বসে আছেন উনি হচ্ছেন দেশবন্ধু।

বনস্পতি মানে কি দাদু?

মানেটা ঠিক দাদুরও পরিজ্ঞাত নয় কিন্তু তাকে রক্ষা করে দিলেন যজ্ঞেশবাবু

—তিনি দেশবন্ধুর সম্মুখে হাত জোড় করে বললেন, একবার কষ্ট করে উঠতে হবে।

না জানি সেখানে আবার কি যজ্ঞের ব্যাপার করে রেখেছেন। আচ্ছা যজ্ঞেশবাবু, দুদিনের জন্যে এ বাড়ী দুটো আবার ভাড়া করতে গেলেন কেন, আপনার বাড়ীতে আমাদের এই ক'জনের কি কুলোত না!

উকীলদের মধ্যে থেকে একজন বলল, এ বাড়ী দুটোও ওঁর।

যাক, তবে ভাড়ার খরচটা বেঁচে গেল, সেটা না হয় আমাদের চাঁদা দেবেন। ওঠো সুভাষ। বুঝলেন যজ্ঞেশবাবু, সুভাষকে খাইয়ে সুখ নেই, ও ভাত গুনে গুনে খায়। আর এই ভোজনে ব্রাহ্মণ হেমন্ত আর কাজি। ওহে কাজি মনে রেখো, অন্নটা পরের হলেও পেটটা নিজের।

সেই জন্যেই তো যত পারি ভরিয়ে নিই।

"শরীরং জন্মজন্মনি পরান্নং দুর্লভং লোকে।"

সংস্কৃত শুনেই বুঝেছি হেমন্ত। সুভাষ, চলো খাওয়ার জায়গায় যাওয়া যাক নইলে এর পরে খালি পেটে আরও কত কি আওড়াতে সুরু করবে। কাজি তুমি নিস্তেজ কেন?

আজ্ঞে বিকাল বেলার সভার জন্যে গান রচনা করছি—

এই আড্ডার মধ্যে গান আসবে কেন।

আমার গানও যে আড্ডা ভালোবাসে—এই বলে সে উচ্চস্বরে গেয়ে উঠল, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে কাণ্ডারী হুঁশিয়ার"

আচ্ছা রায় মশায়, এই পাগলগুলোকে নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারেন।

পারি যদি মাপ করেন, পাগলের দলটি আরও বড় করুন।

অন্ততঃ একজনকে পেয়েছি—

কে আবার?

এক আপনি। চলুন যাওয়া যাক।

বিকালবেলায় পদ্মার ধারে পাচআনির মাঠে বিরাট জনসভা হ'ল। দেশবন্ধুর বক্তৃতায় আর কাজি নজরুল ইসলামের দুপুর বেলাকার সেই অর্ধসমাপ্ত গানের পূর্ণ সমাপ্ত রূপে সভাস্থল মাতিয়ে দিল। বক্তৃতার বিষয় শীঘ্রই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে, মহাত্মা গান্ধী এখন বিহারে তারপরে আসবেন

বাংলায়, এখানেও ধরে আনতে চেষ্টা করবো, দলে দলে জেলে গিয়ে ভর্তি হয়ে ইংরাজের জেল ভ'রে তুলতে হবে, আপনারা সকলে প্রস্তুত হোন।

রাত্রিবেলা আহারান্তে যজ্ঞেশবাবুর বাড়ীর দোতালার একটি কক্ষে দেশবন্ধুকে ঘিরে কয়েকজন লোক উপবিষ্ট। দেশবন্ধুর দলের সুভাষ ও হেমন্ত; আর স্থানীয় লোকদের মধ্যে শচীন ভূপতি নৃপতি। এমন সময়ে যজ্ঞেশবাবু একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে দেশবন্ধুকে বললেন, আপনার সঙ্গে একটি লোকের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

লোক কোথায়, এ যে নিতান্ত ছোকরা। স্বদেশীঅলা বুঝি।

আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন, এর নাম অরবিন্দ রায়।

অরবিন্দ প্রণাম করলো দেশবন্ধুকে।

কিহে, তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দায়রার হুকুম হ'লে দেখতে পেতেন, কিন্তু গোড়াতেই ফাঁসিয়ে দিলেন বি. সি. চক্রবর্তী।

চার্জ কি, খুন না ডাকাতি?

আজ্ঞে চার্জটা ছিল খুনের কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে খালাস।

যাক, চার্জটা সত্য কিনা তা আর জিজ্ঞাসা করবো না, তবে এখন কি মনে করে!

আজ্ঞে, আপনি তো ব্যবসা ছেড়ে দিলেন, এখন আমাদের মতো ঘন ঘন আসামী হওয়ার প্রবণতা যাদের তাদের না জানি কি দশা হবে।

দেখো হে বাপু, রোজার কাছে মামদোবাজি করো না। তুমি চলো ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়। কিছুদিন আগে তোমাদেব বড় কর্তাকে ডেকে পাঠালাম।

চেনেন নাকি তাঁকে?

বিলক্ষণ! দু'বার প্রায় ফাঁসির দড়ি কেটে তাকে নামিয়ে আনলাম আর চিনবো না। সে-সব কথা এখন থাকুক। তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, এবারে তোমরা কি করবে, এতদিন তো এক পথে চললে এবারে গান্ধীজি অহিংস অসহযোগের নূতন পন্থা নিয়ে এসেছেন, তোমরা কি পুরানো পথেই চলবে না আমাদের সঙ্গে আসবে?

অরবিন্দ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, আপনি কি হিংসাকে নিন্দনীয় মনে করেন?

মোটেই নয়। নিন্দনীয় মনে করলে এতগুলো ফাঁসির আসামীর হয়ে

লড়লাম কেন। হিংসাও একটা পন্থা আর সেই আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত এটাই দেশোদ্ধারের প্রশস্ততম রাজপথ। যা সর্বদেশে সর্বকালে লোকে আচরণ করছে আমি নিন্দা করলেই তা নিন্দনীয় হয়ে যায় না। দেখো বাপু আমি বাঙাল মানুষ, সোজা কথা বলতে ভালোবাসি দেশের কাজের জন্ম হিংসাকে নিন্দা করি না।

তবে স্যার, হঠাৎ অহিংস পন্থা অনুসরণ করতে লোককে উপদেশ দিচ্ছেন কেন?

তার মানে এ নয় যে আগের পথটা খারাপ।

তবে লোকে ছাড়বে কেন?

যার ছাড়বার নয় সে ছাড়বে না, আমি বললেও ছাড়বে না, গান্ধীজি বললেও ছাড়বে না। তবে কি জানো, আমার ও গান্ধীজির মধ্যে এ বিষয়ে কিছু প্রভেদ আছে। আমার কাছে অহিংসা হচ্ছে পলিসি, আর ওঁর কাছে ক্রীড বা জীবনের নীতি, উনি বলেন ধর্ম।

উনি বললেন আর আপনি অমনি বিশ্বাস করলেন।

কই একবারও তো বলিনি যে বিশ্বাস করেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এতদিন ধরে তো হিংসার পথে চলা গেল, এবারে নূতন পথটার পরীক্ষা করতে বাধা কি। তাঁকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত। পরীক্ষায় ফেল করলে তখন তো পুরানো পথ থাকলোই খোলা।

স্যার আমি আপনাকে মিছে বকাচ্ছি, আমাদের বড় কর্তার সঙ্গে কি কথা হ'ল আপত্তি না থাকলে শুনতে চাই।

তোমাদের বড় কর্তা বড় বলেই তাঁকে বেশি বোঝাতে হ'ল না। তিনি বললেন যে তাঁরা আগেই স্থির করে রেখেছেন যে গান্ধীজির নূতন পন্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন তবে ক্রীড হিসাবে নয় পলিসি হিসাবে। গান্ধীজির আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা এখন কিছুকালের জন্ম খুন-খারাপি থেকে বিরত থাকবেন।

এসব কথা জানি।

জানো তবে জেরা করেছিলে কেন, উকীলের পেট থেকে কথা বের করবে, তত বিদ্যা এখনো তোমার হয়নি বাপু।

অপরাধী করবেন না স্যার, আমার তত বিদ্যা নেই তবে এটুকু বুদ্ধি আছে যাতে জানি আপনার পেট থেকে কথা বের করা আমার মতো লোকের সাধ্য নয়।

বেশ, তাই যদি হবে আর কি কথা হয়েছিল নিজে থেকে বলো দেখি, আমি

যা শুনেছি তার সঙ্গে মেলে কিনা।

আপনি জানেন যে জেলে ঢোকবার সময়ে আমাদের কতকগুলো শপথ গ্রহণ করতে হয়।

খুব জানি, আনন্দমঠ থেকে শপথ বাক্যগুলো আমিই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর শপথ ভঙ্গের দণ্ডগুলোর অধিকাংশও আনন্দমঠ থেকে গৃহীত, দুটো একটা আমার নিজস্ব চিন্তার ফল। ধরো একটা যেমন কেউ যদি দলের বিশেষ কোন নির্দেশ অমান্য করে তবে মৃত্যুদণ্ডের উপরেও মৃত্যুর চেয়েও যা দুরপনেয় এমন কলঙ্ক তার উপরে চাপিয়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে অরবিন্দ শুধালো, যেমন—

যেমন ধরো লোকটা যে গোয়েন্দা ছিল জানিয়ে দিতে হবে।

হাঁ তাতে সুবিধা এই যে পুলিসের দৃষ্টি আসল আসামীর দিক থেকে অন্য-দিকে যাবে।

ওহে ছোকরা পুলিস তেমন ফুলিস নয়—যদিও আদালতে সেই কথাটাই আমরা সর্বদা প্রমাণ করতে চাই।

দেশবন্ধুর এই শেষোক্ত উক্তিতে অরবিন্দর মুখের উপর দিয়ে যে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া ভেসে গেল সেই বাতির আলোকে কারো চোখে তা পড়লো না।

আচ্ছা, আর কি কথা হয়েছিল বলো—রাত হ'ল।

শপথ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে গান্ধীজির পন্থা অনুসরণ করতে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে।

মুক্তিটা সাময়িক না চিরকালীন ?

দুই রকমেরই আছে।

তুমি কোন রকমের ?

আমি চিরকালীন মুক্তি চাই জানিয়ে দিয়েছি।

এতদিন ও পথে চলবার পরে হঠাৎ পরিবর্তন হ'ল কেন ?

পরিবর্তন হঠাৎ হয়নি। পথে চলেছি সত্য কিন্তু সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারিনি যেন হোঁচট খেতে খেতে চলছিলাম, এমন সময়ে গান্ধীজির মত থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়ায় কুয়াশা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

তার মানে হিংসা নিন্দনীয় বলে বুঝেছ ?

না স্যার ঠিক তা নয়, অহিংসা প্রশংসনীয় বলে মনে হচ্ছে।

ওহে বাপু একেই বলে নিজেকে বাজি রেখে নিজের সঙ্গে পাশা খেলা।

এখনো তোমার শিক্ষার অনেক বাকি। তা এখন কি করবে ভাবছ ?

দেশকে মা বলে জানবার আগে যাঁকে মা বলে জেনেছি তাঁর কাছে যাবে।

সংসারে তোমার আর কে আছে ?

কেউ নেই, বিধবা মা আর আমি।

বিষয়-আশয় ?

সে-সব বালাই নেই।

তবে যে স্বদেশী দলে শপথ নিলে, তোমার মায়ের চলবে কি করে ভাবলে না ?

সেই ভেবেই তো দীর্ঘকাল যাওয়া স্থগিত রেখেছিলাম। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মা বললেন, বাবা তোমার পথে তুমি যাও, আমার জন্তে ভেবো না।

তোমার চলবে কি করে মা ?

আমাদের শাস্ত্রকারেরা সে কথা আমার হয়ে ভেবে গিয়েছেন, তাই তাঁরা হিন্দু বিধবাদের খাওয়া পরার খরচের চেয়ে নিখরচের ভাগ বেশি মিশিয়েছেন। তাতেও যখন কুলোবে না, হরেক রকম ব্রত উপবাস তো রয়েইছে।

অরবিন্দ মুখ নীচু করলো, বেশ বোঝা গেল চোখের জলটা দেখাতে চায় না।

দেশবন্ধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, যাও বাবা, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও, তাঁর সেবা করো, সেই সেবা থেকেই দেশমাতা সেবা গ্রহণ করবেন।

এসব কথা যিনি বললেন তিনি নিতান্ত ঘরের লোক, তখন আর দেশের নেতা নন।

শোনো আর একটি বিষয়ে মায়ের কথা শুনো, তিনি বিয়ে করতে বললে বিয়ে করতে রাজি হয়ো।

অরবিন্দ তখনো মুখ তোলেনি সেই অবস্থাতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করলো।

দেশবন্ধু স্বগতভাবে বললেন, এমন মা যে দেশের সে দেশের আবার ভাবনা।

তবে ঐ কথাই রইলো রায় মশায়, আপনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আর এই দুইজন আপনার জয়েণ্ট সেক্রেটারি, রবিবাবুর ভাষায় যুগ্ম সচিব। তোমাদের নাম দুটো কি হে ; মস্ত মস্ত নাম-একবার শুনে মনে রাখতে পারি না।

পাশেই নব নিযুক্ত যুগ্ম সচিবরা দাঁড়িয়েছিল, বলল, আজ্ঞে আমি নবীন

চক্রবর্তী, আর ইনি খগেন চংদার।

আর একটু সংক্ষেপ করেনিই, চক্রবর্তী আর চংদার।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, দাস মশায়, ওদের নামের আরও সংক্ষিপ্ত রূপ আছে, সেই রূপেই ওদের এখানে সকলে জানে।

আছে নাকি! কি শুনি।

ন-চ আর খ-চ। যুগ্ম সচিব হওয়ার আগে থেকেই ওদের যুগ্মরূপে সবাই অভ্যস্ত, যুগ্ম নামে ন-চ আর খ-চ।

চমৎকার নাম। হোলির সময়ে হিন্দুস্থানীরা সারারাত করতাল বাজায় খচ মচ শব্দ ক'রে, তোমাদের নাম দুটো হবে স্বদেশী হোলির করতালের শব্দ—নচ খচ।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, স্বভাব-গম্ভীর সুভাষের মুখেও হাসির রেখা দেখা ছিল।

রায় মশায়, এ জেলায় তিনটে মহকুমা, তাদের জন্যে তিনজন সভাপতি আপনি স্থির করবেন। আর খচ মচ, ভুল হ'ল, নচ খচ তোমাদের কাজ হবে প্রত্যেক গঞ্জে গ্রামে হাটে বাজারে কংগ্রেসের পতাকা তুলে একখানা চালাঘর স্থির করা, লোকের চোখে যাতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব জেগে থাকে। আর যেখানেই জনসভা করবে লক্ষ্য রাখবে বক্তাদের মধ্যে যেন হিন্দু মুসলমান দু-ই থাকে।

যুগ্মরা সবিনয়ে বলে উঠল, আজ্ঞে তাই হবে।

রায় মশায়, এবারে একবার আপনার নাতিদের ডাকুন আশীর্বাদ করে গাড়ীতে উঠি।

লব কুশ এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো।

বাঃ বাঃ, চমৎকার দীপ্তিমান ছেলে দুটি। ওহে শচীন, শচীন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, এরা তো তোমার স্কুলে পড়ছে।

আজ্ঞে হাঁ।

এখনো নিতান্ত ছেলে মানুষ। আর বছর দুই পরে এদের স্বদেশী স্কুলে ভর্তি করে দিয়ো।

শচীন বলল, আমাদের স্কুলটাই তো স্বদেশী স্কুল।

ও তো নামে, আমি বলছি এমন স্বদেশী স্কুল যা নামেও বটে কাজেও বটে।

তেমন স্কুল তো জানি না।

তুমি না জানো আমি জানি। হুগলীতে গৌরহরি সোমের স্কুলে নিয়ে

গিয়ে ভর্তি করে দিয়ো। সেখানে কোন খরচ দিতে হয় না। রায় মশায়, সেখানে পড়লে আপনার নাতিরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হ'তে পারবে না তবে মানুষ হয়ে উঠবে।

সেই আশীর্বাদই ওদের করুন।

দেশবন্ধু বললেন, কি হে শচীন রাজি তো।

আপনার আদেশ অমান্য করি সাধ্য কি।

তখন যথাবিধি নমস্কার ও প্রণামাদি অন্তে সদলে দেশবন্ধু ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলেন। যজ্ঞেশবাবু, শচীন, ভূপতি, নৃপতি প্রভৃতিও সঙ্গে চল্‌ল।

যজ্ঞেশবাবু বল্‌লেন, এই তিনদিন আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব চলছিল আজ মণ্ডপ অন্ধকার।

আপনাদের আতিথেয়তা ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারবো না, ঐ যে সঙ্গে সঙ্গে টিন বোঝাই কাঁচা গোল্লা চল্‌ল।

হেমন্ত বল্‌ল, কাঁচা গোল্লা না পৌছলেও টিনগুলো নিশ্চয় পৌছবে কলকাতায়।

তুমি কি বলো হে কাজি—শুধালেন দেশবন্ধু।

হেমন্ত বল্‌ল, কাজির এখন কি আর কিছু বলবার উপায় আছে, মুখে যে কাঁচাগোল্লা ভর্তি।

গাড়ীগুলো রেল স্টেশনের দিকে চল্‌ল।

৯

ক'দিনের কর্মব্যস্ততায় শচীনের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। ঘুমোবার আশায় রাতের আহার কোন রকমে সমাধা করে এসে শুয়ে পড়লো—কিন্তু ঘুম এলো না, শরীর ক্লান্ত, মন সেই ক্লান্তির সঙ্গে সায় দিলে ঘুম আসতো, মন অত্যন্ত বিচলিত। যথেষ্ট কারণ ছিল। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে স্বদেশী স্কুল ও কলেজের কর্তব্য নিয়ে আজ দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গিয়েছে। মোটের উপর দেখা গেল তিন রকম মতবাদ নিয়ে তিনটি দল। ভূপতি একদলের নেতা, ঠিক তার বিপরীত কোটিতে রমণী চাটুজ্জে কলেজের প্রিন্সিপাল, আর মাঝখানে শচীন, বলা বাহুল্য প্রত্যেকের সঙ্গেই অন্য শিক্ষকগণ আছেন।

ভূপতি বল্‌ল, দেখো ভাই, সরল কথা ভালোবাসি। কোথাকার কে গান্ধী

এসেছেন, মক্কেলহীন ব্যারিস্টার, এখন তিনি অহিংসা দিয়ে ইংরেজ তাড়াবেন। ঐ বাংলায় যাকে বলে সবাই গেল ম'রে কর্তা হল হরে, তিলক গেলেন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ গেলেন, ফিরোজ শা মেটা, গোখলে গেলেন এই মওকায় নাম ক'রে নেবার মতলবে আছে লোকটা। ও সব আমাদের স্কুল-কলেজে চলবে না।

রমণী চাটুজ্জে বললেন, এ তোমার অন্যায় ভূপতি। এর মধ্যে রেষারেষি কোথায় দেখলে। যাঁদের নাম করলে তাঁরা সবাই একটু একটু করে এগিয়ে দিয়েছেন এখন গান্ধী যদি আর একটু এগিয়ে দেন ক্ষতি কি! আর তা ছাড়া কার মধ্যে কি শক্তি আছে আগে থেকে কে বলতে পারে।

বলতে পারি আমি, আরম্ভ করলো শচীন, দেখো না যে গান্ধীর শক্তি না থাকলে দেশের বড় বড় ব্যারিষ্টারদের স্বমতে আনলেন কি করে? চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরু ব্যবসা ছাড়লেন এ কি গান্ধীর শক্তির ফলে নয়! আর তিনিও তো ব্যবসা ছেড়েছেন অনেক কাল।

ভূপতি এত সহজে ছাড়বার নয়—সে বলল, লোকটা হঠযোগী হ'তে পারে, কিন্তু পলিটিশান কিছুতেই নয়।

নয় কি হয় যথাকালে দেখা যাবে, এখন দেশবন্ধু যে কথাগুলি বলে গেলেন সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নাও। আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে স্কুল কলেজ বন্ধ করবে কি না।

ভূপতি বলল, শচীন, অবশ্যই বন্ধ করবো, তবে তা মদের দোকানে পিকেটিঙ করবার জন্যে বা খদ্দের বেচবার জন্যে নয়।

তবে কি জন্যে শুনি।

ঐ মওকায় পুলিশগুলিকে ধরে পেটাবো, বিলিতি কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দেবো—যেখানে সম্ভব থানা ডাকঘর লুট করবো।

অর্থাৎ ভূপতি তুমি এখন কাজ করতে চাও যা একেবারে দেশবন্ধুর অভিপ্রেত নয়। আর তা ছাড়া তুমিও মওকার সুযোগে আছ, শুধু গান্ধী নয়।

আপনি কি করবেন চাটুজ্জে মশায়?

রমণী চাটুজ্জে এদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় তাই সকলকে তুমি বলে সম্বোধন করেন। তিনি বললেন, আন্দোলনের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে তবে স্কুল কলেজ বন্ধ করতে আমি রাজি নই।

কেন?

কর্তার নিষেধ।

সকলেই জানে কর্তা বলতে স্যার আশুতোষ।

শোন কেন তবে। এখানে আসবার আগে দেশবন্ধু একদিন কর্তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, দুজনের বাড়ী তো সিকি মাইলের ব্যবধানে, বল্লেন, স্যার আশুতোষ আর কেন! এবারে গোলামখানা ছেড়ে বের হয়ে এসে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করুন।

স্যার আশুতোষ বললেন, বেশ বেশ, আমাকে এক কোটি টাকা এনে দাও দেখিয়ে দিচ্ছি কি ক'রে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হয় আর যতদিন না পারছ এই গোলামখানার দিকে ঘেঁষো না।

দেশবন্ধু বললেন, এটা তো বেকার সৃষ্টির কারখানা।

নিতান্ত ভুল বোঝনি ; জেনে রাখো এখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি করবো যাদের মঁয় ভুখা হুঁ হুঙ্কারের গর্জনে বেটারা দেশ ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না। পরে আমাকে লিখলেন, রমণী, তোমার কলেজ যেন বন্ধ না হয়। দু'চার দিন ধর্মঘট হয় হোক কিন্তু গোলামখানা বলে কলেজ তুলে দিলে দেশের গুরুতর ক্ষতি করবে। আরো লিখেছেন, দরকার বোধ করলে চাকুরি ছেড়ে দেবে তবু কলেজ তুলে দেবার ধাপ্পায় ভুলো না।

শচীন বলল, চাকুরি ছাড়বার কথাই ওঠে না, আর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আপনি যদি আন্দোলনে যোগ না দেন তবে আমাদের আপত্তি করার কি থাকতে পারে।

ভূপতি মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে, বোমা গেল পিস্তল গেল, এখন হাতজোড় করে বলতে হবে, বাবা ইংরেজ তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাও, যেন ঐ কথাটির জন্যেই ইংরেজ এতদিন অপেক্ষা করেছিল।

এসব তর্কের পরিণাম যেমন হয় তার ব্যতিক্রম হ'ল না, কথায় কথা বেড়ে চল্‌ল, সেই সঙ্গে বেড়ে চলল তিক্ততা। শেষ পর্যন্ত নিছক ক্লান্তির ভারে সভাভঙ্গ হল। ভারি মন ও গরম মাথা নিয়ে শচীন বাড়ীতে ফিরে স্নান করলো, একবার পাতে বসে উঠে পড়লো পেট ভরে ঘুমিয়ে নেবে আশায়, কিন্তু ঘুম এলো না। তার বদলে এলো মূর্তিমতী নিদ্রানাশিনী রুক্মিণী।

তবু ভালো যে ঘুমোও নি, আমি ভাবছিলাম গিয়ে দেখবো নাক ডাকছে।

তুমি তো জেগে থাকতে বলেছিলে।

আহা আমার কত অনুগত।

এবারে ভূমিকা ছেড়ে সেই জরুরি কথাটা বলে ফেলো যার জন্যে জেগে থাকতে বলেছিলে।

রুক্মিণী হঠাৎ একটু রুষ্ট ভাবে বল্‌ল, দেখো আমি কিছুতেই লব কুশকে

সেই ভজ গৌরাঙ্গের পাঠশালায় ভর্তি হতে দেবো না।

দেখো এক সঙ্গে দুটো ভুল করলে। ভজ গৌরাঙ্গ নয়, গৌরহরি সোম আর সেটা পাঠশালা নয় আশ্রম।

গৌরাঙ্গ আর গৌরহরি একই কথা হ'ল। আর আশ্রমও যা আখড়াও তাই। ওসব ইল্লুতে জায়গায় ছেলে পাঠাতে পারবো না।

ইল্লুতে জায়গা কি করে জানলে।

আখড়ায় নেড়া-নেড়ির দল ছাড়া আর কি হবে। তা ছাড়া লেখাপড়া না শিখলে খাবে কি?

ওখানে লেখাপড়াও শেখায়।

আর কি শেখায় শুনি।

চরখায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে ভিক্ষে করে চাল নিয়ে আসা।

কেন?

খাবে কি।

ওমা আমার লব কুশকে শেষে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

ক্ষতি কি, এ দেশের বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য সবাই তো ভিক্ষাজীবী ছিলেন।

তুমি ঠাট্টা করছ কিনা বুঝতে পারছি না।...আচ্ছা, দেশবন্ধু তাঁর ছেলেকে সেখানে পাঠালেন না কেন?

আরে, তার যে বয়স অনেক হয়ে গিয়েছে।

তাই অপরের কচি ছেলেগুলোকে আখড়ায় পাঠাতে চান।

শচীন স্কুল থেকে তর্ক করে বিরক্ত হ'য়ে বাড়ীতে এসেছিল বিশ্রামের আশায়, দেখল এখানে তর্ক জটিলতর, কারণ তর্ককর্তা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে যে ব্যক্তি তর্কে প্রবৃত্ত হয় সে হয় নির্বোধ, নয় দুঃসাহসী। শচীন কোনটাই নয়। কাজেই নীরব হয়ে থাকলো। শচীনের কাছে থেকে সাড়া না পেয়ে রুক্মিণী অবিরল চোখের ধারায় শ্রেষ্ঠ যুক্তি প্রয়োগ করলো।

পুরাকাল থেকে আর্য ললনাগণ এহেন অবস্থায় যে-সব উক্তির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত রুক্মিণী তাই প্রয়োগ করলো, এ হেন পাষাণের হাতেও বাপ-মা সমর্পণ করেছেন, মনের দুঃখ যে বুঝতে পারে না, কথা বললে উত্তর দেয় না, এখন মরণ হলেই বাঁচি ইত্যাদি।

শচীন দেখলো অবিলম্বে রণনীতি পরিবর্তন আবশ্যক নইলে সারারাত এর জের চলবে, ঘুমের দফা ইতি। তখন সে বলল, একটা গুরুতর কাজের কথা

বলবো ভেবেছিলাম তা তুমি যখন শুনবে না—

যা বলছিলাম তার চেয়ে গুরুতর আর কি হ'তে পারে।

পারে বলেই আমার বিশ্বাস, তুমিও অনেকবার বলেছ, মলিনার বিয়ের কথা—

শচীনের বক্তব্য শেষ না হ'তেই মুহূর্ত মধ্যে রুক্মিণীর অসমাপ্ত খেদোক্তি সমাপ্ত হয়ে গেল এবং "উঠিয়া বসিল রোগী শয্যার উপরে।"

কি, পাত্র ঠিক হয়েছে নাকি ?

তোমার যখন শুনবার ইচ্ছা নেই আর রাতও হয়েছে, থাক বরঞ্চ কালকে হবে—

না, না, কালকে অনেক কাজ আছে আর তা ছাড়া রাত এমনই বা কি বেশি হয়েছে—

কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয়েছে তুমি চাও না যে মলিনার বিয়ে হয়।

রুক্মিণী গালে হাত দিয়ে বল্‌ল, ওমা এমন অপবাদ দিয়ো না, আমি কতবার কতদিন ঠাকুরঝির বিয়ের কথা তুলেছি, তুমিই তো কান দাও না। বলো না সত্যি পাত্র বুঝি ঠিক করেছ।

না এখনো তেমন কিছু ঠিক হয়নি তবে মনে মনে আঁচ করে রেখেছি, আগে থেকে জানাজানি হলে সব মাটি হয়ে যাবে।

জানাজানি হবে কি করে, আমি তো আর কাউকে বলছি না।

বটে, ভোর না হ'তেই সুসংবাদ প্রচার করতে পাড়ায় বেরিয়ে পড়বে—

কখনো না, মাইরি বলো না সে পাত্র কে ?

এখনো তাকে বলা হয় নি, তবে মনে মনে স্থির করে রেখেছি।

সত্য কথা বলতে কি মুহূর্ত কাল আগেও এ বিষয়ে শচীনের মনে এ বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না, স্ত্রীর সারারাত্রি ব্যাপী নাসিকাক্রন্দনের হাত থেকে বাঁচবার আশায় প্রসঙ্গটা তুলেছিল, এখন দেখল মহাসঙ্কট, কোন একটা নাম না করলে রাতভোর পীড়াপীড়ি চলবে, তাই মজ্জমান ব্যক্তি হাতের কাছে যা পায় তাই ধরে ফেলবার নীতি অনুসরণ করে বলে ফেল্‌ল, অরবিন্দকে কেমন মনে হয় ?

শচীনের আশা ছিল নামটা শুনে রুক্মিণী হতাশ হবে কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টো।

দেখো, আমি অনেকবার অরবিন্দর কথা ভেবেছি কিন্তু তুমি কি ভাববে, বাবা কি ভাববেন ভেবে বলতে সাহস করিনি—

আর তাছাড়া মলিনা রাজি হবে কিনা, এখন তো তার বয়স হয়েছে সেটাও

বিচারের বিষয়।

সে ভয় যে আমার মনেও না ছিল তা নয় কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি অরবিন্দর সম্বন্ধে ওর আচরণের বদল হয়েছে।

এ খবর শচীনের কাছে নূতন বটে, শুধালো, কি করে জানলে?

মেয়েরা ওসব জানতে পারে।

তবু শুনি না।

যখন থেকে জানলো যে অরবিন্দ স্বদেশী পথের লোক, তার উপরে ফেরারী আসামী, বেশ লক্ষ্য করলাম ঠাকুরঝির মনটা ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ওর তো স্বদেশী ধাত কিনা। বাবা দাদা দুজনেই স্বদেশীর জন্যে জেল খেটেছে আর সুশীলের ঐ পরিণাম—

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে রমণীর প্রতি ওর মনের টান ছিল, সে বেচারী মারা গেল—

বুঝলে না সেই টানেই ওকে টেনে নিয়ে এনেছে অরবিন্দর দিকে—

কিন্তু লোকে যে বলে যে তার গোয়েন্দা বলে দুর্নাম ছিল।

এ কথা ও কোনদিন বিশ্বাস করেনি, আমিও করি না।

কেন করো না?

করি না এই জন্যে যে দেশবন্ধুর কাছে স্বীকারোক্তির সময়ে অরবিন্দ বলেছিল যে দলের বেয়াড়া লোককে দরকার হ'লে ওরা খুন করতে বাধ্য হয়—আর তার উপরে চাপিয়ে দেয় কোন একটা কলঙ্ক—

এত কথা জানলে কি ভাবে?

যে ভাবে মেয়েরা সংসারের সমস্ত গোপন কথা জানে—

কি হাত গুনে?

না মশাই না না, আড়ি পেতে। তোমরা যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি ও আমি আমি পর্দার আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়েছিলাম—হঠাৎ দেখলাম ঠাকুরঝির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল—

কি রমণীর গোয়েন্দা দুর্নাম মিথ্যা কলঙ্ক জেনে?

সে কলঙ্ক যে মিথ্যা এ ধারণা তার গোড়া থেকেই ছিল, নূতন করে আর জানবে কি?

তবে হঠাৎ উজ্জ্বলতার হেতু?

তুমি যে এমন গবেট তা জানতাম না।

গবেট না হ'লে আর তোমাকে বিয়ে করি!

তবে আর বলবো না।

না, না, ঘাট হ'য়েছে, আমি গবেট নই, গবেট তুমি।

আবার ?

আর নয়, এবারে খুলে বলো, ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে গেল কেন ?

যখন মলিনা শুনলো অরবিন্দদের দলের মুরুব্বি গান্ধীর কর্মপদ্ধতিতে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছে, আর সেই জন্যে শপথ থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করবার অনুমতি দিয়েছে—তখনই গো তখনই, সেই জন্যেই গো সেই জন্যে, এবারে বুঝলে তো গবেট।

মুখে না হ'লেও শচীন মনে মনে স্বীকার করলো প্রজাপতির নির্বন্ধ বিষয়ে পুরুষেরা সত্যই গবেট। তারপরেই আর একটা সঙ্কট মনের মধ্যে দেখা দিল—মলিনার মন তো বুঝলো কিন্তু অরবিন্দর মন ? ভাবলো আর একবার না হয় প্রজাপতির দালালের দ্বারস্থ হওয়া যাক। বলল, বেশ মলিনার মন না হয় অনুকূল হ'ল কিন্তু অরবিন্দর মন তো প্রতিকূল হ'তে পারে।

প্রতিকূল! এখন কোন রকমে কূলে ওঠবার জন্যে ওর মন আকুলিবিকুলি করছে।

এত কথা বুঝলে কি করে ?

এ কয়দিন তো আমাদের এখানেই আছে। দুবেলা যখন সবাই খেতে বসে পরিবেশন করি আমি আর ঠাকুরঝি। অরবিন্দর পাতে আমি কিছু দিতে গেলেই সাগ্রহে বলে, দিন বউদি। আর মলিনা কিছু দিতে গেলেই গম্ভীর হয়ে বলে, না, না।

একেই বলো, অনুকূলতার চিহ্ন ?

হাঁ গো হাঁ। পুরুষে চায় যে ভালবাসার লোক একটু সাধাসাধি করুক।

তারপরে ?

তারপরে আর কি, মলিনা শুনবে কেন, হাতের উপরে হাতা উপুড় করে ঢেলে দেয়, তখন চার চোখে যে বিদ্যুৎ বিনিময় হয়—

কই, আমরা তো কিছু দেখতে পাইনে।

তোমাদের চোখ থাকে খাদ্যের দিকে, আমাদের চোখ খাদকের দিকে।

তা হ'লে দুদিকের অবস্থাই বেশ অনুকূল বলে শচীন স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, এই দুর্ভাগা ভগ্নীটির জন্যে তার একটু বিশেষ মমতা ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাসটি এড়ালো না রুক্মিণীর কান, কেন গো, হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো কেন ?

কেন বলো তো ?

এ তো অতি সহজ কথা। মনে আক্ষেপ হচ্ছে, আহা এই পূর্বরাগের পালাটা বাদ গেল তোমার ভাগ্যে, অদৃষ্ট একেবারে ঘাড়ে ধরে এনে বসিয়ে দিল ছায়া মণ্ডপে বিয়ের আসনে।

সেই জন্যই তো এখন ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছি ধীরে সুস্থে—এই বলে তাকে কাছে টেনে নিল শচীন (তার পরে আঃ ছিঃ ছিঃ ব্রজেশ্বর)।

আঃ হ'য়েছে, হ'য়েছে এখন ছাড়ো।

শচীন পুনরায় আরম্ভ করলো, আড়ি যখন পেতেছ তখন নিশ্চয় শুনেছ যে অরবিন্দর কিছু বলতে কিছু নেই এমন ঘরে ননদের বিয়ে দেবে।

কিছু নেই কেন, এম-এ ডিগ্রি আছে, তোমাদের হাতে দুটো স্কুল কলেজ, ভগ্নাপতিকে একটা চাকরি দিতে পারবে না।

শচীন সংক্ষেপে বল্‌ল, সে একটা কথা বটে। বাবাকে বলে তাঁর মন বুঝে নিই। আর তোমার উপরে ভার রইলো ওদের মন বুঝবার।

রুক্মিণী শুধালো, অরবিন্দর ঘরের কথা তো শুনলাম, এবারে তার বাইরের কথা বলো তো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কোথায় ছিল, কিভাবে দিন কাটলো নিশ্চয় বলেছে ; বলো শুনি।

সে আর শুনে কি করবে রুক্মিণী, সে-সব চরম দুঃখ কষ্টের কথা। দলের নিয়ম যত কঠোর, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তত সরল, অর্থাৎ ওটা না থাকার মধ্যে। কোনদিন ভাতের সঙ্গে ডালের উপরে তেঁতুল পাতার টক হ'ল তো সবাই বেঁচে গেল।

আহা, পুরুষ মানুষ এত কষ্ট ক'রে খেতে পারে কি।

কষ্টের এখানেই শেষ নয়। দলের ট্রেনিং শেষ হ'য়ে গেলে এক একজন এক এক দিকে যেতে বাধ্য হয়।

কেন ?

দলের জন্য লোক যোগাড় করতে হবে। অল্পবয়সী স্বাস্থ্যবান চরিত্রবান ছেলেমেয়ে চাই দলের জন্য।

মেয়েও ?

নয় কেন ?

ওতেই যে গোলমাল শুরু হয়। কিন্তু এসব যোগাড় করে কি ভাবে ?

মফঃস্বল শহরে গিয়ে ওরা যে যেমন পারে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়, মাইনে নাম মাত্র, কাজ সহজেই জুটে যায়। কেউ দোকানে খাতা লেখে, কেউ

বাবুদের চাপরাশি আরদালি হয়, কেউ উকীলের মুহুরী হয়, অধিকাংশই হয় পাঠশালা বা স্কুলের শিক্ষক। তারপরে একদিকে যেমন মনিবের বিশ্বাসভাজন হ'য়ে ওঠে তেমনি মনিবের ছেলেমেদের নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে, দেশের দুঃখের কথা বলে, দেশের বড় বড় বীরপুরুষদের কাহিনী শুনিয়ে যখন বুঝতে পারে হ্যাঁ একে দলে নেওয়া যেতে পারে তখন একদিন কলকাতা থেকে মুরুব্বি এসে পড়ে ঝুন দিয়ে বোঝে মেকি কি সাঁচ্চা, দলে ভর্তি করে নেয়। সমস্তই দুঃখ আর কঠোর পরীক্ষার কথা, কত শুনবে। কালকে বাবার মন বুঝে নিই, তোমার দায়িত্ব যেন মনে থাকে। নাও এখন ঘুমোও।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে শচীন যখন প্রস্তাবটা যজ্ঞেশবাবুকে বলবার জন্যে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলো, যজ্ঞেশবাবু বললেন, এই যে শচীন এসেছ ভালই হ'য়েছে, তোমাকে ডাকতে পাঠাবো ভাবছিলাম। নাও এই চিঠিখানা পড়ো।

এই বলে তিনি একখানা খামের চিঠি এগিয়ে দিলেন শচীনের দিকে।

শচীন চিঠিখানা হাতে নিল, মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, না জানি কি দুঃসংবাদ।

না, না, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, অত্যন্ত সুসংবাদ। মলিনার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে ; ধনী পরিবার, পাত্র অত্যন্ত উপযুক্ত, নাও পড়ো।

শচীন খাম খুলে চিঠিখানা পডতে শুরু করলো।

১০

বাঙালীর দুটি জন্মভূমি বঙ্গদেশ আর কল্‌কাতা ; কল্‌কাতা হৃৎপিণ্ড, বঙ্গদেশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হৃৎপিণ্ড রক্তধারায় ধাক্কা মারে আর তখন সেই রক্ত শিরাওন্ত্রী দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায় সমস্ত দেহে। কলকাতার সঙ্কুচন ও প্রসারণের ফলেই সমস্ত বঙ্গদেশে প্রাণপ্রবাহ স্পন্দিত হচ্ছে, তবে কখনো তার গতি মন্দ কখনো উত্তাল। ১৯০৫ সালে একবার গতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল আবার হ'লো বছর পনেরো পরে। সেবারে কোথা দিয়ে কেমন করে কি ঘটে গেল কেউ বুঝতে পারেনি ; সন্ধ্যাবেলায় সকলে যাকে মরা নদী দেখে শুয়েছিল ভোরবেলাতে চেয়ে দেখল সেই নদী টগবগ করে ফুটছে, তরঙ্গের কেশর কাঁপিয়ে মত্ত অশ্বের মতো ছুটছে, দুই তীরের মুহুর্মুহু কম্পমান মৃত্তিকা স্তর দুই হাতে লুটছে ; ঢেউয়ের শিখরগুলো একটার মাথা ছাড়িয়ে আর একটা ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছে, আর উন্মূলিত প্রায় আম কাঁঠালের ক্রোড়াশ্রয়ী গ্রামগঞ্জগুলো হায় হায়

করে মাথা কুটছে। সে বন্যা স্থায়ী হয়নি সত্য, কোন্ বন্যা স্থায়ী, তবে ফেলে রেখে গিয়েছিল প্রাণ-পঙ্কে পরিপূর্ণ পলি-মৃত্তিকার স্তর, যার উপরে গড়ে উঠেছিল নূতন বাংলাদেশ। এ বন্যার গতি ছিল ভারতাভিমুখী, তার আঘাতে ভারতের শিরা ধমনী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এবারে বছর পনেরো পরে ভারতের অভিমুখ থেকে এলো দুরন্ত বন্যা, প্রথমে কলকাতায় পরে বাংলাদেশের সর্বত্র।

হঠাৎ সবাই দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। একি, পথে হাজারে হাজারে লোক বেরিয়ে পড়েছে, নিত্য যেমন বের হয় ঠিক তেমন নয়, এরা সবাই একব্রতী, কেউ রাজ আইনে নিষিদ্ধ পুস্তক বেচছে। কেউ বিলিতি কাপড়ের দোকানে বাধা সৃষ্টি করছে, কেউ আইন লঙ্ঘন করে উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছে, আর কেউ বা শুধু চরখা শোভিত তেরঙ্গা নিশান উড়িয়ে হাঁকছে—বন্দে মাতরম্। আর এরা সব কারা? ছাত্র শিক্ষক উকীল ব্যারিস্টার কেরানী অফিসার। আর সেই সব ঘরের-মহিলা যারা গাড়ী ছাড়া কখনো রাজপথে নামেনি, সেই সব অভিজাত ধনী প্রাতর্ভ্রমণ ছাড়া যারা কখনো রাজপথে সঞ্চরণ করেনি।

সরকার প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, ভাবতে পারেনি খবরের কাগজের পরিকল্পনা এমন সত্য হয়ে সহস্রমূর্তিতে রাজপথে দেখা দেবে। তারপরেই আরম্ভ হ'ল ধরপাকড়। জেল ভর্তি হয়ে গেল, তখনো ফুরালো না আসামীর সংখ্যা। সবাই যখন ধরা দিতে ব্যগ্র, ধরবে তখন কে? অন্ততঃ কারাগারে তো ধরে নি। সরকার জেল গড়েছিল চোর ডাকাত রাখবার মাপে। তখন কি জানতো একটা সমগ্র দেশ জেলে যাবার জন্যে ক্ষেপে উঠবে! এক দিনের মধ্যে জেলের ভয়, জুজুর ভয়, পুলিশের ভয়, আইনের ভয় উর্ণতন্তুর মতো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

জেলে যখন স্থান সঙ্কুলান হ'ল না, পুলিশের বড় বড় বাস আর লরি বোঝাই করে আসামীদের নিয়ে গিয়ে দুর্গমস্থানে কাকদ্বীপে, দীঘার সমুদ্র তটে, পুরুলিয়ার অরণ্য অঞ্চলে ছেড়ে দিতে লাগলো, নাও এখন বাছারা হেঁটে ফিরে এসো। ফল হ'ল বিপরীত, ঐসব দুর্গম অঞ্চলে যেখানে খবরের কাগজের পাতা মর্মরিত হয় না নূতন আন্দোলনের বাণী প্রচার সুরু হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধীর হুকুম—সরকারের স্কুল কলেজ আফিস আদালত সমস্ত ছেড়ে সব বের হয়ে এসো। চরখায় সুতো কাটো, তাঁতে কাপড় বোনো, হাতে কাজ করো আর সমস্তই অহিংস ভাবে, মারামারি কাটাকাটি চলবে না। চলবে না মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দেওয়া, চলবে না পুলিশের গায়ে হাত তোলা, চলবে না ডাকঘর তোষাখানা লুট করা। এ যে বড় কঠিন কথা। এমন কথা মানবে কে? মানবে

সবাই। মহাত্মা গান্ধীর হুকুম। ক্রমে সেই ঢেউ এসে পৌছলো দিনাজশাহী শহরে।

তুকতাক মন্তর-তন্তর পুলিশ গোয়েন্দা কিছুতেই ঠেকাতে পারলো না স্রোতের গতি। দেশে মহামারী যখন প্রথম দেখা দেয় প্রথমেই আক্রমণ করে দুর্ব্বল প্রাণীদের, শিশুদের বৃদ্ধদের নারীদের, এখানেও তাই ঘটলো। সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল দুটির হেডমাস্টারের উপরে আগেই কিন্তু নোটিশ হয়েছিল কোনও কারণে স্কুলে ধর্ম্মঘট হ'লে হেডমাস্টার "আইন মোতাবেক দণ্ডনীয় হইবে।" স্কুলের কাছে পুলিশ ও শাদা পোষাকের গোয়েন্দা পুলিশ মোতায়েন হ'ল কিন্তু স্কুলের ছেলেরা কাছেই ভিড়লো না, দূর থেকেই সরে পড়লো। কেবল সরকারী কর্মচারীদের পুত্রেরা সহপাঠীদের বিদ্রূপ সহ্য করেও এলো, না আসলে বাবার চাকরি যাবে। মাস্টারেরা অবশ্যই এলো, তবে পড়াবার জন্যে নয়, যে সব ছাত্র অনিচ্ছায় আসতে বাধ্য হয়েছিল ইশারায় তাদের ভাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য বিফল হল না। মাস্টারের দল শূন্য ক্লাসে তাস খেলতে খেলতে এ ওকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, এই গান্ধী লোকটা কে, আর ননভায়োলেণ্ট নন কো-অপারেশন ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে ঘুরতে ঘুরতে হেডমাস্টার এসে উপস্থিত হতেই মাস্টারেরা তাস লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, হেড স্যার বাধা দিয়ে বললো, আসুন না এক হাত খেলা যাক, ক্লাস তো বন্ধ, তারপরে কি কথা হচ্ছিল, গান্ধী লোকটা কে? হটযোগী মশাই হটযোগী, বলবো এক সময়ে তার কথা। আর নন ভায়োলেণ্ট নন কো-অপারেশন? এই যা করছি।

কি রকম স্যার?

রকম এই তাস খেলা।

শুনছি শীঘ্রই কলকাতায় মস্ত জনসভা হবে।

হবেই তো। এমন হটযোগী কলিকালে দেখা যায় না।

সরকারের বিরুদ্ধে তার মামলাটা কি?

সে সব পরে বুঝিয়ে দেব, নিন এবারে আপনার দান।

সরকারী স্কুলের যদি এই অবস্থা হয় স্বদেশী স্কুল ও স্বদেশী কলেজের অবস্থা সহজেই বুঝতে পারা উচিত। মাস্টারেরা ছাত্রদের নিয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে বন্দেমাতরম ও মহাত্মাগান্ধী কি জয় ধ্বনি দিতে দিতে কাছারীর দিকে জেলখানার দিকে চলল।

শচীন বলল, ভূপতি, জেলখানাটা চিনে রাখো।

ও আমার চেনা আছে, ওর মধ্যে কোথায় ফাঁসি-কাঠ, সেটার সঙ্গে এবার

মোলাকাত হবে।

সে সম্ভাবনা নেই, এ হচ্ছে নন-ভায়োলেণ্ট।

আর বাপু নন-ভায়োলেণ্ট, ঘুঘির বহর একবার বেটারা দেখবে।

শচীন আর ভূপতির মধ্যে যখন এই কথা হচ্ছিল তখন ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় হরিপদ দত্ত ও ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে প্রায় অনুরূপ কথাবার্তা চলছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম কুট্টাম পিলাই, দক্ষিণ ভারতীয় খ্রীষ্টান।

সে শুধালো, আচ্ছা মি. ডাট, ঐ যে ধ্বনি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী কি জাই আর আমি কাছারী যাই—এ দুই কি এক!

না স্যার, ও দুটো আলাদা শব্দ, উচ্চারণও আলাদা, একটা বিশেষ্য একটা ক্রিয়াপদ। মহাত্মাগান্ধীকি জয় মানে victory to MaLatma gandhi, আর আমি কাছারী যাই মানে I go to the কাছারী!

ফানি ল্যাঙ্গুয়েজ! যাক, এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করে কাজ নেই, শাদা আই.সি.এস-গণ কালা আই.সি.এস-দের সন্দেহের চোখে দেখে। দেখুন আপনার কাছে যখন শহরের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট চাইবো, আপনি এমন ভাবে লিখবেন যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে অর্থাৎ আপনার কাজও বজায় থাকে আবার আসামীও ধরা না পড়ে। পুলিশ সাহেব বেটা ইউরেশিয়ান, বেটা এক নম্বর খচ্চর, আর ওর মেম সাহেবটা এক নম্বর হারামী, আমার মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লে কথা বলে না, কাট্ করে চলে যায়। এই খচ্চরগুলো খাঁটি শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে আমাদের বেশি ঘৃণা করে।

স্যার, আমি তো সেই ভাবেই কাজ করছি।

হরিপদর অভিজ্ঞতায় পিলাই এর মতো ম্যাজিস্ট্রেট নূতন। ভোভার ভদ্র শ্বেতাঙ্গ ক্লোজেট অভদ্র শ্বেতাঙ্গ, পিলাই উচ্চ কর্মচারী পর্যায়ের মধ্যে ঘর-ভেদী বিভীষণ।

আমি তবে এখন আসি, স্যার।

আসুন। দেখুন, আমার মেম সাহেব বলছিলেন আপনি গ্রাম থেকে সেই যে কাণ্টি সুইটস এনেছিলেন খুব চমৎকার ছিল।

স্যার, মেম সাহেবের ভালো লেগেছে শুনে শুধু আমি নই আমার গ্রাম-খানাও কৃতার্থ হ'ল। আমি শীগগীরী আবার এনে মেম সাহেবের পাদপদ্মে উপহার দেব।

শুনলে মেম সাহেব খুব খুশি হবেন, আচ্ছা এখন আসুন।

হরিপদ বুঝলো, নির্বিষ ম্যাজিস্ট্রেট বড় নাই, কারো বিষ দাঁতে, কারো কলমে, কারো বা মেম সাহেবের রসনায়। তিনদিন পরে খোকনা পালের দোকান থেকে ভালো দেখে আড়াইসের কাঁচা গোল্লা কিনে দিয়ে এলো ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয়। চাপরাশীর হাতে দিয়ে বল্‌ল, দেখো খুড়ো এর থেকে এক থাবা সরিয়ে নিয়ো না।

সে উপায় নেই বাবু, মেম সাহেব বড় হিসেবী, দাঁড়ি পাল্লায় মেপে নেয়, বাজার থেকে একটা পয়সা সরাতে পারি না।

সন্দেশের ফরমাস দেবার সময়ে খোকনা পালকে বলেছিল, দেখো ভালো যেন হয়।

ভুল হবে না বাবু, ম্যাজিস্ট্রেটের সাহেবের জিনিস কি খারাপ দিতে পারি।

কি করে বুঝলে ম্যাজিস্ট্রেটের মেম সাহেবের জন্যে?

নইলে আপনি কি খামোকা আড়াই সের খাংখোরাকি গোল্লা ফরমাস করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কথা সবাই জানে।

বড় লজ্জার কথা, এবারে ছেড়ে দেব।

অমন কাজটি করবেন না বাবু, কথাটা লোকে জানে বলেই দোকানীরা আপনাকে সেধে বাকিতে জিনিষ দেয়, নইলে এ বাজারে—।

শহরের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রইলো কেবল খানকতক মাড়োয়ারীর দোকান সামনের দরজা বন্ধ রেখে খিড়কি দরজা দিয়ে ডবল দামে জিনিষ বেচলো। ডাকঘরে খাম পোস্ট কার্ড চাইতে গিয়ে লোকে শুনলো এই মাত্র সব ফুরিয়ে গেল, কালকে এসো, পাবে। সরকারী ডাক্তারখানার যে দু' একজন রুগী গেলো, তাদের উপরে হাড়ে চটে গিয়ে ডাক্তারবাবু দুই আউন্স করে ক্যাষ্টর অয়েল গিলিয়ে দিল। আদালতে বাদী প্রতিবাদীর ভিড় কম হওয়াতে পেশকার, নাজির প্রভৃতির আয় কম হল। তাদের সব রাগ গিয়ে পড়লো গান্ধীর উপরে। তারা স্পষ্টই সবাইকে বল্‌ল, বেটার হাঁড়ির খবর অজানা নেই। ফাক্রিদের মুল্লুকে গিয়েও ব্যবসা জমলো না। এখন তিলক ফোঁটা কেটে মহাত্মা সেজে লোকের সহুপায়ের পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আর বেশিদিন দেরী নেই।

বিকালে পাঁচ আনির মাঠে মস্ত জনসভা হল। সভাপতি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি যজ্ঞেশ রায়, প্রধান বক্তা জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম সচিব ন-চ, খ-চ আর প্রধান কর্মসূচী জেলার প্রথম কারাবরণকারী প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী অক্ষয় ফৌজদার কাব্যতীর্থ মহাশয়কে জেলার জনগণের পক্ষ থেকে মাল্যচন্দন দান।

ফৌজদার মহাশয় ত্রিপদীছন্দে অল বেঙ্গল পেনসন অফিসে প্রবেশ ক'রে হাতের ছড়িখানা সযত্নে এক কোণে রক্ষা করে বিস্তারিত ফরাসের উপরে একটি তাকিয়া আশ্রয় করে হাঁক দিলেন—শীতল, জল। বেয়ারার নাম শীতল, আগে বলতেন—বাবা শীতল ঠাণ্ডা জল দাও, এখন শারীরিক শক্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাক্যটিকে সংক্ষেপ করে নিয়ে বলেন শীতল, জল। সম্বোধনপদ ও কর্মপদ এক হয়ে গিয়েছে। জলটা নিঃশেষে পান করে, তৃপ্তিসূচক একটি আঃ শব্দ করলেন।

আরে এই যে গোবিন্দ ভায়া, কখন্ এলে ?

অনেকক্ষণ এসেছি দাদা, ভাবলাম জলপান হয়ে যাক তখন কথা বলবো। দাদা, আপনি জেলার মুখ রক্ষা করে প্রথম কারাবরণ করলেন।

তবেই আর কি, সবাই আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

সে কি কথা, আপনি নিয়েছেন কিনে সব্বাইকার মাথা!

বটে! সভাস্থলে একঘণ্টা ঠায় সোজা বসিয়ে রেখে কত কি আদিখ্যেতা হল, আন মালা, দে চন্দন, কর মানপত্র পাঠ, এদিকে আমি মরি কোমরের বাতের যন্ত্রণায়, দে না বাপু একশিশি বাতের তেল।

আপনার কোমরে বাত আছে নাকি!

আমার কোমরে বাত নয়, বাতের কোমরে আমি আছি। জানো না, ন্যাকা নাকি। এই শহরের কে না জানে।

গোবিন্দ আচার্য বললেন, কেমন করে জানবো দাদা, থাকি মফঃস্বলের এক গ্রামে, পড়াই উচ্চপ্রাইমারী স্কুলে।

তবে এখানে মরতে এসেছ কেন ?

এবারে রিটায়ার করলাম, পেন্সন হ'ল বারো টাকা তেরো আনা।

তোমার তো তবু যা হোক কিছু আছে, আমার না আছে পেন্সন, না আছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, না আছে স্ত্রী পুত্র কন্যা, থাকবার মধ্যে আছে পৈতৃক—ঐ ঐ, আঃ আবার টাটিয়ে উঠেছে।

তবে কারাবরণ করতে গেলেন কেন ?

এ যদি বুঝবে তবে আর সারা জীবন পাঠশালায় পণ্ডিতি করবে কেন ?

কথা যথার্থ, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আর কতটুকু।

নিজের দীনতা স্বীকারে ফৌজদার কথঞ্চিৎ খুশি হয়ে বললেন, তবে শোন

যা বলি। বাতের চিকিৎসা করাই এমন সাধ্য নেই, বদ্যির কড়ি গুণতে গেলে না খেয়ে থাকতে হয়, আর মুদির কড়ি গুণতে গেলে সেই সুযোগে বাতটা চাগিয়ে ওঠে—ঐ রে আবার টাটিয়ে উঠেছে, দাঁড়া বাবা কথাটা সেরে নিই।

তারপরে ?

শুনেছিলাম ইংরাজের জেলে আসামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আর মা কালীর কৃপায় জুটে গেল এই অসহযোগ আন্দোলনের মওকা। দিলাম ঝেড়ে এক বক্তৃতা।

বলিহারি সাহস আপনার দাদা, তা বক্তৃতায় কি বললেন।

জব্বর বললাম, সময় বুঝে বাতটাও চাগিয়ে উঠল, জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেব সব গুষ্টির বাপান্ত করে ছাড়লাম। বাস, নিয়ে গেল ধরে।

তা চিকিৎসায় সারলো না!

সারবে কি করে ভায়া, চিকিৎসা আরম্ভ হ'তে না হ'তেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেল।

কত দিনের মেয়াদ হয়েছিল।

মাত্র পনেরো দিনের ভায়া মাত্র পনেরো দিনের। হাকিম বল্‌ল কিনা, আপনার প্রথম অপরাধ কিনা তাই নাম মাত্র সাজা দিলাম। তারপরে বল্‌ল, ভবিষ্যতে এরকম অপরাধ করলে ছ'মাসের মেয়াদ হবে, বুঝে সুঝে চলবেন।

গোবিন্দ আচার্য বল্‌ল, হাকিমের উপদেশ মনে রাখবেন দাদা, শরীর বুঝে দেশের কাজ করতে হয়।

হঠাৎ জ্যামুক্ত ধনুকের মতো খাড়া হয়ে উঠে ফৌজদার বললেন, নিকুচি করেছি দেশের। ওহে ভায়া এতক্ষণ তবে কি শুনলে! আমি বুঝি দেশের জন্য জেলে গিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম বাতের চিকিৎসার জন্যে।

তা হোক দাদা, তবু তো দেশের কাজ।

ফৌজদার বল্‌ল, এক হিসাবে অবশ্য সত্য, শরীরের জন্যেই যখন দেশ তখন দেশের কাজ বই কি।

সত্যি কথা বলতে কি দাদা, সাহস নেই। বারো টাকা তেরো আনায় সংসার চালিয়ে আর এমন রস থাকে না যে বঙ্গজননীর পায়ে দিই, নতুবা কি গানই লিখে গিয়েছেন ঋষি বঙ্কিম—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্।

ঐ গানটা শুনলেই বাতের ব্যথা চেগে ওঠে, সমস্ত বর্ণনাটাই বাতের যন্ত্রণা জাগাবার অনুকূল। আর তা ছাড়া কি জানো, মাসিক আটশ টাকা বেতন আর নানারকম ভাতা পেলে ও রকম সবাই লিখতে পারে।

ওঁর বোধহয় বাতের ব্যারাম ছিল না।

এ সমস্যা সমাধান হওয়ার আগেই প্রবেশ করলো বিশালবপু বীরেন চৌধুরী, বল্‌ল, দাদা আপনি অল বেঙ্গল লোন অফিসের মুখ রক্ষা করলেন।

করেছি ?

নিশ্চয়, শহর শুদ্ধ লোক বলছে।

তবে দাও দেখি এক শিশি বাতান্তক তেলের দাম। এই শীতল, বাবুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে হরিশ কবরেজের দোকান থেকে এক শিশি বাতান্তক তেল কিনে নিয়ে আয় তো।

ফৌজদারকে জানতো বীরেন চৌধুরী, বিনা বাক্য ব্যয়ে পয়সা বের করে দিল শীতলের হাতে।

এমন সময় জেলা কংগ্রেসের যুগ্মসচিব ন-চ, খ-চ প্রবিষ্ট হল ঘরে, বললো, ফৌজদার মশায় উঠে বসুন, প্রণাম করে নিই, সভায় ও কাজটা হয়নি।

ক্লান্ত ফৌজদার বল্‌ল, উঠবার কি আর উপায় আছে ভায়া।

পনেরো দিনের সশ্রম কারাদণ্ডেই শরীর ভেঙে পড়লো নাকি !

এ হেন অর্ব্বাচীনোচিত প্রশ্নের উত্তর দান অযথা মনে করে উল্টে প্রশ্ন করলেন ফৌজদার, ওহে, তোমরা তো অনেক কিছু জানো, কি রকম বক্তৃতা দিলে একেবারে মাস ছয়েকের মেয়াদ হয় বলতে পারো ?

এ রকম আকস্মিক দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল ন-চ খ-চের মুখ।

ন-চ বল্‌ল, তবে বলুন ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল নসিবপুরের মৌলবী সাহেব।

সে আবার কে ?

খ-চ বলল, ঐ যে পাটের আড়তদার। আমাদের উপরে কল্‌কাতা থেকে হুকুম এসেছে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ দশজন ভলান্টিয়ার চাই কারাবরণের উদ্দেশ্যে আর দুজন বক্তা, একজন হিন্দু একজন মুসলমান। হিন্দু সহজেই পাওয়া যায়—দেশপ্রেমটা তাদের—

ফৌজদার বাধা দিয়ে বল্‌লেন, দেশপ্রেম না ছাই। পুরুষানুক্রমে হিন্দুরা বাতব্যাধির রুগী। পলাশীর যুগের পরাজয়ের আসল কারণ কি জানো ?

সে তো মীরজাফরের বেইমানি।

ও সব ইতিহাস। প্রকৃত কারণ তো ইতিহাসে লেখে না। এক অক্ষয় মত্তির লিখেছিল, সরকার তার বইয়ের সেই কয়খানা পাতা ছিঁড়ে ফেলে ছাপবার

অনুমতি দিল।

ন-চ খ-চ যুগল খঞ্জনী বাজিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, একথা তো জানতাম না।

এর পরেও আর জানতে পাবে না, এখন শুনে রাখো। মীরমদন মুসলমান খাড়া দাঁড়িয়ে মরলো আর মোহনলাল হিন্দু, যেই তলোয়ার তুলতে যাবে অমনি সাত পুরুষের বাতের ব্যথাটা কোমরে টনটনিয়ে উঠল, হাতের তলোয়ার হাতেই রইলো, লড়াই ফতে করে ফেলল্ ক্লাইভ। যাক, তারপরে বলো নসিবপুরের মৌলবী সাহেব কি বল্‌লো।

ন-চ বল্‌ল, অনেক খুঁজে পেতে তো গেলাম মৌলবী সাহেবের কাছে—

বাধা দিয়ে বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, আমাদের স্বদেশীর সময়ে কিন্তু মুসলমান বক্তার জন্যে এত খুঁজতে হতো না।

সময় বদলে গিয়েছে ভায়া, সময় বদলে গিয়েছে—বলতে বলতে ঢুকলো হরিপদ দত্ত উকীল, বীরেন চৌধুরীর বাক্যটা তার কানে গিয়েছিল।

তা বটে, বলে খ-চ।

ন-চ বলে, মৌলবী সাহেবকে তো কলকাতার ফর্মান শোনালাম, বল্‌লাম মঙ্গলবারে বনপাড়ার হাটে জনসভায় বক্তৃতা দিতে হবে, আপনাকে ছাড়া তো আর যোগ্য লোক দেখি না।

আমাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে মৌলবী সাহেব বল্‌ল, তা দেবো বক্তৃতা স্বয়ং দেশবন্ধু যখন হুকুম করেছেন কিন্তু কি রকম বক্তৃতা চাও, অর্ডিনারি না জ্বালাময়ী?

এ কি একটা কথা হ'ল মৌলবী সাহেব, অর্ডিনারী হলে আর আপনার কাছে আসবো কেন? জ্বালাময়ী, জ্বালাময়ী সবাই চায় আপনার কাছে।

জ্বালাময়ী—বলে আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে বল্‌ল, তা বেশ জ্বালাময়ীই দেব। আপনাদের আর কি বোঝাবো, সরকার আজকাল আবার ধরপাকড় সুরু করেছে, যা হয় বিচার করে দেবেন।

বেশ তাই দেবো!

না, না, দেবো না, যা দেবেন এখনি দিয়ে যান, মেয়াদ হয়ে গেলে আর কংগ্রেসের লোকের দেখা পাওয়া যায় না।

দিলাম, খুশি হয়ে মৌলবী সাহেব বল্‌ল, এমন জ্বালাময়ী ঝাড়বো যে অন্ততঃ ছ'মাসের জন্য ঠেলে দেবে।

আগ্রহের সঙ্গে ফৌজদার বল্‌লেন, কি বল্‌লো আমাকে জানিয়ো তো, কারণ জেলের ডাক্তার আমাকে বলেছিল 'অন্ততঃ ছ মাস ধরা বাঁধা চিকিৎসা না হ'লে

আপনার এ পুরানো বাত সারবার নয়।

এবারে ন-চ খ-চর বক্তব্য সমে এসে একটু থামতেই হরিপদ বল্‌ল, ওহে ন-চ খ-চ, তোমরা তো সহরময় নচখচ রবে করতাল বাজিয়ে নিরীহ লোকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেশের কাজ করছ! এদিকে লোকে কি বলতে আরম্ভ করেছে জানো?

কি বলছে হে হরিপদ খুলেই বলো না? জিজ্ঞাসা করলো বীরেন চৌধুরী।

হাঁ এসব কথা খোলাখুলি বলাই ভালো, বলছে সরকার আর সকলকে ধরছে এদের ধরছে না কেন? নিশ্চয় ভিতরে একটা কিন্তু আছে।

আছে বই কি, বল্‌ল ন-চ।

নিশ্চয় আছে, বলল খ-চ।

অত ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে বলবার প্রয়োজন নেই, একজন বলো, তাহ'লেই দুজনের বলা গণ্য হবে।

বেশ তাই হোক, খ-চ তুমি চুপ করে থাকো। দেখো ভায়া, গাছের ফল যখন পাড়ে নীচের থেকে স্নুরু করে, উঁচু ডালের ফলগুলো পাড়তে দেরী হয়, সবশেষে পাড়ে সব চেয়ে উঁচু ডালের ফল।

তোমরা বলতে চাও তোমরা উঁচু ডালের ফল।

নিশ্চয়, জয়েণ্ট সেক্রেটারি তো বটি। অবশ্য আমাদের উপরেও আছেন প্রেসিডেণ্ট।

বুড়ো মানুষের কথা ছেড়ে দাও, লোকে কানাকানি করছে তোমাদের নিয়েই।

খ-চ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। হরিপদ ভায়া, যারা বলছে তারা তোমার দলের লোক।

অর্থাৎ—

বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি, স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গেও মেশেন আবার গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ চলে রাজপুরুষদের সঙ্গে।

তেমন তো তোমাদের দুটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না এ শহরে।

বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, যা নিশ্চয় জানো না সে বিষয়ে তোমার কথা বলা উচিত নয় হরিপদ।

বীরেন চৌধুরী যাই বলুক—হরিপদর নিশ্চয় জানবার উপায় ছিল। কারণ সেদিন সকালেই পুলিশ সাহেব রবিনসনের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল। হরিপদ বলেছিল, স্যার ও দুটোকে গ্রেপ্তার না করলে শহর ঠাণ্ডা হবে না

বলে দিচ্ছি। কতকগুলো বাজে লোক ধরে জেলে পুরে সরকারের রেশন খরচ করে কি লাভ?

ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো না।

বলেছিলাম।

কি বললেন?

বললেন, আমি তো ধরতেই চাই কিন্তু রবিনসন কংগ্রেসের লোকের কাছে ঘুষ খেয়েছে তাই গা করছে না।

অবশ্য কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, হরিপদর সঙ্গে এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোন পরামর্শ হয় নি, কারণ সে জানতো অসহযোগী দমনে ম্যাজিস্ট্রেটের তেমন উৎসাহ নেই।

বটে! ব্ল্যাকি হারামজাদাটা এমন বলেছে! লোকটা এক নম্বর খচ্চর। আচ্ছা বলতে পারো, ও এমন ঘোর কালো ওর ছোটছেলেটা এত ফরসা কেন! মনে রেখো এই শহরে আসবার পরে ওর জন্ম হয়েছে।

নিরীহের মতো হরিপদ বলল, কেমন করে জানবো স্যার, তবে ন-চ খ-চ বলে বেড়াচ্ছে এর মধ্যে শাদা চামড়াদের হাত আছে।

বলেছে এমন কথা! লোক দুটো এক নম্বর হারামী, আজই ওদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করছি আর কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা দরকার বলো। যজ্ঞেশ রায় তো প্রেসিডেন্ট, তাকেই বা বাদ দি কেন?

তিনি বুড়ো মানুষ, তিনি নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট, যত নষ্টের মূলে ন-চ আর খ-চ। ওরাই হাত পা, ওরা গ্রেপ্তার হ'লেই প্রেসিডেন্ট ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।

বেশ তাই হবে।

কাজেই বীরেন চৌধুরীর উক্তি সত্য নয়, হরিপদর জানবার বিশেষ হেতু ছিল।

এমন সময়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার প্রবেশ করলো, সঙ্গে একজন পুলিশ।

সকলের সন্ত্রস্ত ভাব।

আপনি নবীন চক্রবর্তী, আর আপনার নাম খগেন চংদার?

আজ্ঞে হাঁ।

আপনাদের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে।

বীরেন চৌধুরী শুধালো, কত ধারা মোতাবেক?

এখন অর্ডিনান্সের যুগ, ধারার প্রয়োজন হয় না, তবু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন বলি, ১২০ আই, পি, সি। অবশ্য আসামীদের এ প্রশ্ন করবার আর

এর উত্তর জানবার অধিকার নেই, এ শুধু আপনাদের জন্তে।

হরিপদ শুধালো, ওদের কি এখনই নিয়ে যাবেন ?

সেই রকমই তো হুকুম।

জামিন চলবে না ?

না এ জামিনযোগ্য নয়, তা ছাড়া সেটা হাকিমের হাতে। আসুন আপনারা। রহমৎ আলি।

জি হুজুর।

ন-চ খ-চ যখন দেখল যে বাঘ যখন ধরেইছে তখন একটু বীরত্বের অভিনয় করা ভালো, তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—বলো ভাই বন্দেমাতরম্।

ওদের নিয়ে যেতে উদ্যত হ'লে ফৌজদার বলে উঠলেন, ইন্সপেক্টার সাহেব, বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ ?

ইন্সপেক্টার ঘুরে দাঁড়ালেন।

এখানে একজন এক নম্বর দাগী আসামী থাকতে ধরলে কিনা দুটো নিরীহ লোককে। বাবা এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা দেশ শাসন করবে, তবেই হয়েছে।

কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

তা পারবে কেন! আমি তো ধরা দেবার জন্তে বসে আছি ; গান্ধীজির তো সেই রকম হুকুম।

আপনি তো কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেন নি!

কি করলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হয় বলো এখনি করছি। অন্ততঃ ছ'মাসের মেয়াদ যেন হয় দোহাই তোমার বাপ।

ইন্সপেক্টার দেখলো লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বল্‌ল, আপনি মাথার চিকিৎসা করান।

রহমৎ আলি বল্‌ল, বাবুর ভবিষ্যৎ বহুৎ খারাপ হো গিয়া হায়।

ফৌজদার বল্‌লেন, রহমৎ চাচা, তোমার ইন্সপেকটারের চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশি। ভবিষ্যৎ বলতে ভবিষ্যৎ, একেবারে কোমর। ওরে বাবা শীতল, একটু জোরে মালিশ করো।

বাতাস্তক তেল এনে পৌছবার পর থেকে ফৌজদারের কোমরে তেল মালিশ করে চলেছে শীতল।

ন-চ খ-চকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বীরেন চৌধুরী আর হরিপদ ওদের বাড়ীতে খবর দেবার জন্তে রওনা হয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, ন-চ খ-চকে যে এখানে পাওয়া যাবে

পুলিসের কানে সংবাদটি দিল কে হে।

যেই দিক সে ওদের বন্ধু।

কেমন ?

ওরা যে পুলিশের চর এমন কানাঘুষা বাজারে চালু হ'তে সুরু করেছিল এবারে সেটা দূর হবে। এর পরে দেখো জেল থেকে বেরিয়ে এলে ওদের কাজের সুবিধা হবে।

নাও পা চালাও হরিপদ।

ওদিকে ফরাসের উপরে কাতরায়মান ফৌজদার বলছিল, বাবা শীতল, হাত চালাও। এদিকে ছ মাসের মেয়াদ হওয়ার আগে না আবার আন্দোলনটা জুড়িয়ে যায়, যেমন ঢিমে তাল দেখছি।

১২

যজ্ঞেশবাবুর ডাকে শচীন এসে পৌছলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পাত্রপক্ষের সেই চিঠিখানা বৌমাদের দেখিয়েছিলে ? এই দেখো তাঁরা আবার তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন—বড়ই লজ্জার কথা হ'ল।

শচীনকে নিরুত্তর দেখে বুঝলেন যে কথাবার্ত্তা হয় নি, বললেন, তোমাকে আর দোষ দেব কি, সবাই এখন ব্যস্ততার মধ্যে। আমি নিজেও ভাববার সময় পাইনি।

শচীন বল্‌ল, এত তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি বাবা ?

দরকার নয়! একে তো পাত্রপক্ষ হয়ে তারা গরজ দেখাচ্ছে, আর এদিকে ক্রমে মণির বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়।

শচীন বল্‌ল, কতই বা বয়স ওর।

যতই হোক, আমাদের ঘরের মেয়েদের এর অনেক আগে বিয়ে হয়ে যায়। তোমার মা ঐ আক্ষেপ নিয়ে গিয়েছেন, আবার আমাকেও না ঐ আক্ষেপ নিয়ে যেতে হয়। এদিক ওদিক যা হয় তোমরা আমাকে জানিয়ে দাও, আমি ওদের লিখে দি। আর দেখো, ঠিক এই সময়েই নবীন আর খগেনকে ধরে নিয়ে গেল, আমার পক্ষে একা কাজ চালানো ভার হয়েছে।

কেন বাবা, আর দুজনকে আপনার সহকারী করে নিন।

বলা তো সহজ। একে তো উদ্যোগী বিশ্বাসী লোক পাওয়া কঠিন, তার উপরে আবার সরকার ক্রমে নখদন্ত বের করছে। খবরের কাগজে দেখেছ তো কল্‌কাতার কংগ্রেসী মহলের আর কেউ বাইরে নেই, দেশবন্ধু সুভাষ সেনগুপ্ত

সবাই হরিণবাড়ীর জেলে। অন্যান্য প্রদেশেও একই রকম অবস্থা, সারা দেশে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক কারাবরণ করেছে, সংখ্যা এখনো বাড়তির মুখে। গান্ধীজিকে যে কোন দিন ধরতে পারে।

এখনো কেন ধরলো না আমরা প্রায়ই আলোচনা করে থাকি।

বড়র গায়ে হাত দিতে সবাই ভয় পায়। সরকার মোটেই ভাবতে পারেনি যে দেশে তাঁর এমন প্রভাব, ডাক দিলেন আর চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক জেলে গেল, আর এমন সব ঘরের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা আগে কখনো গাড়ী ঘোড়া ছাড়া পথ চলেনি। তাই তারা কতকটা ভড়কে গিয়েছে, তবে ওঁকে ছাড়া রাখবে না। সরকারের নীতি হচ্ছে আগে ডালপালাগুলো ছেটে নিয়ে তারপরে হাত দেবে মূল গাছটায়। আমাকেই যে কতদিন বাইরে রাখবে জানি না, জেলে যাওয়ার আগে পাত্রপক্ষকে চূড়ান্ত মতামত জানিয়ে দিতে চাই।

শচীন বললো, আমি ভাবছিলাম কি আপনি যদি চান তবে আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে জন দুইকে আপনার সহকারী হিসাবে জুটিয়ে দিতে পারি।

না, ঠিক ঐ জিনিষটি আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। আমাদের ডাক সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্রদের, সে-সব তো প্রায় ভেঙে যাওয়ার মুখে। তোমাদের স্কুল কলেজ ষোল আনা না হোক বারো আনা স্বদেশী, এ দুটোর গায়ে আমরা হাত দিতে চাইনে। লেখাপড়া একদম বন্ধ হয়ে যাক এ আমাদের কাম্য নয়, এ দুটো স্কুল কলেজ পিদিম জ্বালিয়ে রাখুক। যাক, সহকারীর জন্যে তোমরা ভেবো না। বীরেন বোধ হয় রাজি আছে।

বিস্মিত শচীন শুধালো, কোন্ বীরেন, উকীল?

হাঁ।

তার যে সুখের শরীর।

দেশবন্ধুর চেয়েও কি?

দেশবন্ধু তো যৌবন থেকে স্বদেশী ভাবাপন্ন।

বীরেনও।

কই, আমরা তো জানি না।

ও-ই কি ছাই জানতো। দেখো শচীন, ঠিক সময়টি না এলে এ সব রহস্য জানতে পারা যায় না। এই যে হাজার হাজার লোক জেলে গিয়েছে তারা কি জানতো।

আশ্চর্য।

আশ্চর্য বই কি। দেশ যে তলে তলে এমন প্রস্তুত হয়ে তৈরি ছিল ক'জনে জানতো।

আজ্ঞে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও ঠিক এই রকমটি হয়েছিল, একদিনে দেশের সব বাতিগুলো দপ করে জ্বলে উঠল।

তবে। যাই হোক বৌমার মতামত আমাকে জানিয়ে দাও, অবশ্য মলিকেও জানাতে হবে, তার এখন বয়স হয়েছে।

ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার :

কি মুশকিল তবে এতক্ষণ জানাও নি কেন? কি বললেন বৌমা?

আচ্ছা, অরবিন্দকে আপনার কেমন মনে হয়?

খুব ভালো, ও রকম সৎ আদর্শনিষ্ঠ যুবক সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও কম দেখা যায়। আর ওর একটা কি গুণ জানো ওর বিশ্বাসের চরিত্র আছে, আজ এ মত কাল ও মত এমন ভাবে ইতস্তত: করা ওর স্বভাব নয়। কিন্তু হঠাৎ ওর কথা উঠল কেন?

সোজাসুজি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আর একটা প্রশ্ন করলো শচীন, আপনি ওকে কতটা জানেন?

যজ্ঞেশবাবু বুঝতে পারলেন না শচীনের প্রশ্নের মতলবটা, আগের মতোই অরবিন্দর গুণের সূত্র টেনেই বলে বললেন, ও একদিন এসে আমাকে বল্লো, কলকাতায় যাবে।

কেন?

গান্ধীজিকে দেখতে।

আমি বল্লাম, গান্ধীজিকে দেখবার সুযোগ পরেও পাবে।

কিন্তু তখন যে থাকবো জেলের মধ্যে।

বললাম, না হয় দুদিন বাদেই জেলে যেয়ো, এ দেশে জেলের দরজা আর বন্ধ হবে না, অফুরন্ত সুযোগ। তার আগে তোমার আর একটা কর্তব্য আছে।

কি বলুন।

মায়ের সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নি?

অনেক কাল।

তিনি জীবিত কি মৃত তাও বোধ করি জানো না।

গত হলে খবর পেতাম।

বললাম, দেখো বাবু, একটি অপ্রিয় সত্য বলি, কিছু মনে করো না: তোমাদের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সাধনায় গলদ আছে।

কেন স্যার?

দেশের কোলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে যাঁর কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তিনিই মূল মাতা। তাঁকে অবহেলা করলে দেশমাতাও খুশি হন না, ভাবেন যারা মূল মাতাকে অবহেলা করতে পারে আমাকে অবহেলা করতে তাদের কতক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করলো, এখন আপনার কি আদেশ?

যাও, মায়ের সঙ্গে দেখা করে তার পায়ের ধূলো নাও।

দেখা হ'লেই যে তিনি বিয়ে করতে বলবেন।

করবে।

তবে দেশের কাজ?

অরবিন্দ, অহমিকা কিছু পরিত্যাগ করো, দেশবন্ধু বা গান্ধীজির চেয়ে তুমি দেশের কাজের বড় কাজী নও। তাঁরা কি বিয়ে করেন নি? বিবাহ সৎ কর্মের অন্তরায় নয়।

শচীন বল্‌ল, এত কথা আমরা জানতাম না।

সেই জন্যেই তো বল্‌লাম, তোমাদের চেয়ে তাকে অনেক বেশি জানি। সোনার টুকরো।

তারপরে বোধ হচ্ছে বাড়ী গিয়েছিল, মাঝে কয়েকদিন তাকে দেখিনি।

ফিরে এসেছে তো?

শচীন বলল, দেখা হয়েছে ও বড় আমার কাছে ঘেঁষে-না, ওর যা কিছু কথা বার্তা আবদার সব তার বউদির সঙ্গে।

হাঁ বৌমার ছোট ভাই নেই, যেটি ছিল সেটিও গেল—বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন যজ্ঞেশ বাবু। পুরুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস অশ্রুর বাষ্পীভূত প্রকাশ।

এবারে যে প্রসঙ্গ শচীন উত্থাপন করলো তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না যজ্ঞেশবাবু।

অরবিন্দকে আপনার পাত্র হিসাবে কেমন মনে হয়?

চমকে উঠে যজ্ঞেশবাবু বললেন, পাত্র হিসাবে কাকে?

অরবিন্দকে।

কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে বললেন, এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি। মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

ভাষার সংক্ষিপ্ততম শব্দটিতে শচীন মনোভাব জ্ঞাপন করলো, বল্‌লো—হাঁ।

বিবাহিত মেয়েদের একটি প্রধান মুদ্রাদোষ বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহ দেবার চেষ্টা, আবার সে মেয়ে যদি ধারে কাছের বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হয়

তবে তো কথাই নেই। বলা বাহুল্য, রুক্মিণীতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যতদিন নিতান্ত ঘরের বধূরূপে দিনাজশাহীতে ছিল, উপরে শ্বশুর শাশুড়ী ছিল, মলিনা সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রয়োগ করতে পারেনি। তারপর যখন কল্কাতায় স্বামীর বাসায় গেল, সঙ্গে গেল মলিনা, এই গুপ্ত নিয়মের প্রতিক্রিয়া সুরু হল। আকারে ইঙ্গিতে ভাবে ভাষায় ছলাকলায় মলিনার মন বিবাহ সম্বন্ধে উৎসুক করে তুলতে আরম্ভ করলো। মলিনা হিন্দুঘরের মেয়ে, সেকালের প্রথা অনুসারে বিয়ের বয়স তার হয়েছিল, আর অনিচ্ছাও যে ছিল এমন নয়। কিন্তু বিবাহের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন একটি পাত্রের কিম্বা পাত্র সম্বন্ধে গুরুজনদের আগ্রহ, কোথায় সে-সব। কাজেই রুক্মিণীর প্রচেষ্টা শূন্যে বৃথা পাখা ঝাপটাতে লাগলো। আগুন জ্বালাতে হ'লে শুধু শিখায় চলে না ইন্ধনের আবশ্যক হয়, কোথায় ইন্ধন। এমন সময়ে শচীনের ছাত্ররূপে দেখা দিল রমণী, শচীনের ছাত্র সুশীলের বন্ধু, আর কল্কাতা বাসাবাড়ীর সঙ্কীর্ণ পরিসর কাজেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হ'তে বিলম্ব হল না। অবশ্য প্রাথমিক পরিচয়টা রুক্মিণীর সঙ্গে, সে অল্পবয়সী হলেও গুরুপত্নী রূপে গুরুজন, কাজেই কথাবার্তা আলাপপরিচয় হতে সময় লাগলো না। এই ত্রিভুজের পুরোভাগে গৃহিণী রুক্মিণী হ'লেও পশ্চাদ্‌ভাগে রইলো মলিনা, অতটুকু বাসায় সব সময়ে সংসর্গ বাঁচিয়ে চলা সম্ভব নয়। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন রুক্মিণীর মনে হল—এই তো ইন্ধন। মেয়েদের মনের কথা নাকি বিধাতাও জানতে পারেন না। রুক্মিণীর এই তো বলে ইন্ধন আবিষ্কার করবার আগেই মলিনার মন হয়তো বলে উঠেছিল তাই তো। বিধাতা করেন সৃষ্টি, মানুষে করে আবিষ্কার, এ ক্ষেত্রেও হ'ল সেই রকম। রুক্মিণীর আবিষ্কারের আগেই মলিনার মন সৃষ্টি করে বসেছিল। মেয়েদের মন দুর্জ্ঞেয়। রুক্মিণী শিখাটি এগিয়ে আনবার আগেই শমীগর্ভে অগ্নি জ্বলতে সুরু করেছে।

শচীন এসব সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সম্বন্ধে উদাসীন, আর শেষে দেখা গেল সুশীল নিতান্ত বিরূপ রমণী সম্বন্ধে। ঐ বিরূপতাই রমণীকে আরও কাছে টেনে আনলো। আগে কল্কাতায় কোন দর্শনীয় স্থানে লোকদের নিয়ে যাবার সময়ে সঙ্গে থাকতো শচীন আর সুশীল, কখনো কখনো রমণী। কিন্তু রমণীর প্রতি বিরূপ বলে সুশীল আর শেষে সঙ্গে যেতো না, কাজেই শচীনকে সর্বদা নির্ভর করতে হ'তো রমণীর উপরে। তারপরে রমণী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে অনেক সময়ে মেয়েদের বেড়াতে বা বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যাওয়ার ভার রমণীর উপরে ছেড়ে দিত শচীন। রুক্মিণী ভাবলো তার এই না যাওয়ার মূলে হয়তো

কোন ইঙ্গিত আছে, একেবারে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বয়স্থা মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার সত্যযুগ তখনো আসেনি।

পথে যেতে যেতে কথাবার্তা হ'তো রুক্মিণী আর রমণীর মধ্যে, মলিনা শ্রোতা, তবে উদাসীন শ্রোতা নয়, দু'চার দিনেই বুঝে ফেলল রুক্মিণী। মলিনার চোখ অন্যদিকে হলেও সে উৎকর্ণ রমণীর প্রতি; মুখমণ্ডল রাক্তমাভ হয়ে উঠলেও সূর্যের তাপে নয়—সূর্য হয়তো অনেকক্ষণ প্রাসাদমালার আড়ালে পড়েছে; রুক্মিণী কথাবার্তার মধ্যে তাকে টানবার চেষ্টা করলে হয়তো এড়িয়ে যেতো, নয়তো দু'একটা হুঁ হাঁ দিয়ে সারতো। এক এক সময়ে রুক্মিণীর সন্দেহ হতো তবে কি মলিনা উদাসীন রমণী সম্বন্ধে! যে সব মনস্তাত্ত্বিক বলে থাকেন মেয়েরা সব চেয়ে বেশি বোঝে মেয়েদের মনের কথা, তাঁরা যেন জন্মান্তরে বিষ্ণুর মতো মোহিনী রূপ ধারণ করে যেন নিজেদের ভুল ভাঙিয়ে দেন। এ পর্যন্ত রমণীর মনে মলিনা সম্বন্ধে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। ঘটলো অকস্মাৎ ও আচম্বিতে।

একদিন হেদোর কাছাকাছি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে পাশাপাশি তিনজন চলছিল। এমন সময়ে একখানা উচ্চাঙ্গের নিঃশব্দচারী কিটন গাড়ী মলিনার গায়ের উপরে প্রায় এসে পড়েছিল, সে ছিল রাস্তার গা ঘেঁষে, ব্যাপারটা আর দুজনের চোখে পড়বার আগেই দেখতে পেলো রমণী, মলিনার হাত ধরে টান দিয়ে তাকে সরিয়ে আনলো, কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল গাড়ীখানা।

মলিনা ক্ষেপে উঠে বলল, রাস্তার মধ্যে হঠাৎ আমার হাত ধরে টানলেন কেন? এ কি রকম ভদ্রতা!

এখনি কি হ'তো বলুন তো—ইসারায় দেখালো ধাবমান গাড়ীখানাকে।

হ'তো আমায় হ'তো, আপনার তাতে কি?

স্যার আমাকে কি বলতেন!

তিনি তো আমাকে রক্ষা করবার ভার দেননি।

সঙ্কটে কেউ ভার দেয় না, যে পারে রক্ষা করে।

ভবিষ্যতে এভাবে আমাকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করলে বাধিত হ'ব।

হঠাৎ গাড়ী এসে পড়ায় ও তার পরবর্তী ঘটনায় রুক্মিণী হকচকিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ মৃদুভাষিণী মলিনা যে এমন রূঢ়ভাষিণী হয়ে উঠতে পারে সেটাও একটা কারণ।

মলিনা, এ তোমার অন্যায়। উনি তোমাকে বাঁচিয়ে দিলেন কোথায় কৃতজ্ঞ হবে না বৃথা দোষারোপ।

না বউদি, কাল থেকে দাদা না এলে তোমাদের সঙ্গে আর বেড়াতে বের হ'ব না।

বেশ, তাহলে আমার বেড়ানোও বন্ধ হবে।

হোক গে।

আর এ বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উঠ্‌ল না, তবে তিনজনের মনের তিন চিন্তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগলো।

রুক্মিণী ভাবছিল, তবে কি আমার আগুন জ্বালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল, নতুবা মলিনার মন রমণী সম্বন্ধে এমন বিরূপ কেন? রুক্মিণী অন্তর্যামী হলে বুঝতে পারতো শরনিক্ষেপের সময়ে এ হচ্ছে কন্দর্পের ধনুকের ছিলায় উল্টোমুখী টান।

মলিনা মনের মধ্যে ডুব সাঁতার দিয়ে হাতড়ে খুঁজছিল বেদনার চুনিখণ্ড বসানো আনন্দের স্বর্ণে গঠিত সেই একটি চকিত মুহূর্তের চির নিমজ্জিত অঙ্গুরীয়টিকে। সেই কঠোর কোমল স্পর্শ, সেই উষ্ণ শীতল উত্তাপ, সেই খণ্ড লগ্মার বাঞ্ছিত ঘনিষ্ঠতা। মুখে কি বলেছিল তা কি মনে আছে! মুখ কি তখন তার আয়ত্তের মধ্যে ছিল? ঝড়ের বেগে হঠাৎ আসা স্বর্গের পাখী এক জানলা দিয়ে ঢুকে ইন্দ্রধনুর বিদ্যুৎ খেলিয়ে আর এক জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

রমণী বল্‌ল, বউদি, স্যারকে বুঝিয়ে বলবেন, আমার কিন্তু দোষ নেই।

সে কি, আপনি না থাকলে আজ ওর রক্ষা পাওয়া ভার হ'তো!

এখনো তার ডান হাতের আঙুলে আঙুলে সেই শষ্প সুকুমার কোমল মাংসল কবোষ্ণ কমনীয় মণিবন্ধের স্পর্শ। তখনো আঙুলের ডগায় ডগায় জলতরঙ্গ বাজাচ্ছিল।

মলিনা আর রমণী দু'জনেই ভাবছে, এই কি তবে স্পর্শসুখ! সুখ যদি তবে এত ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী কেন। হীরের টুকরো ক্ষুদ্রই হয়।

বাসায় ফিরে এসে রমণী ভাবলো, না, না, আর নয়, শপথ-ভঙ্গের পথে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। কাল থেকে আর ও বাড়ী যাবে না। পরদিন যথাসময়ে আবার দেখা দিল শচীনদের বাড়াতে। তার মনে ভয় ছিল, না জানি কি রকম ব্যবহার করে মলিনা, বিস্মিত হয়ে গেল যখন দেখলো তার কথাবার্তায় গত কল্যকার কোন মালিন্যের চিহ্ন নেই, বরঞ্চ চায়ের বাটি এগিয়ে দেওয়া, আর একটু খেতে অনুরোধ করা এ সব নতুন চিহ্ন, ভারি স্বস্তি অনুভব করলো রমণী। রুক্মিণী এমন ভাব দেখালো যেন কিছুই তার চোখে পড়ছে না, তবে মনে মনে হাসলো, বুঝলো ইন্ধন আর শিখা একত্র হয়েছে, এখন তার একমাত্র কর্তব্য

ফুৎকার দিয়ে শিখাকে প্রবলতর করে তোলা। ভাবলো, না এখন শচীনকে কিছু বলবার দরকার নেই, পুরুষে এ সব ব্যাপারে ভালো করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলে। রুক্মিণীর আশাতরু যখন মুঞ্জরিত হওয়ার মুখে, আচম্বিতে ঘটলো দুর্বিপাক। সুশীলের মৃত্যু, পরদিন রমণীর হত্যা-সংবাদ, সে নাকি গোয়েন্দা। একেবারেই বিশ্বাস করি না বলে চাপা তর্জ্জন করে উঠে গৃহান্তরে প্রস্থান করলো মলিনা। আর কখনো মুখে উচ্চারণ করেনি রমণীর নাম।

তারপরে পট পরিবর্ত্তন। শচীন ও তাদের কলকাতা পরিত্যাগ, দিনাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বাস। লব কুশের জন্ম, শ্বশুর শাশুড়ীর কাশীবাসের জন্ম প্রস্থান, মাতার মৃত্যু, পিতার সংসার ত্যাগ। রমণীর স্মৃতি ক্রমে ম্লান হয়ে এলো, রুক্মিণী স্থির করলো আবার নূতন করে মলিনার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে। এমন সময়ে ফেরারী আসামী অরবিন্দর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। কালক্রমে নরহত্যার দায় থেকে খালাস পেয়ে অরবিন্দ রায় পরিবারের আত্মীয়-স্থানীয় হয়ে উঠ্‌ল। সমগ্র পরিবারের আত্মীয়-স্থানীয় হয়ে ওঠা একটা বিশেষ ক্ষমতা।

একদিন রুক্মিণী বল্‌ল, মলি, বাবা আজ দুঃখ করছিলেন তোমার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না এই দুঃখ নিয়ে মা গেলেন। তারপরে বললেন, আমাকেও বোধহয় এই দুঃখ নিয়েই যেতে হয়। কোন দিন জেলে ধরে নিয়ে যাবে, সেখানেই হয়তো মরবো, তুমি রইলে মা দেখো।

মলিনা বলল, বউদি, তুমি তো সব জানো।

রুক্মিণী বুঝলো তার মনে এখনো দুঃখের কণিকা আছে, ভাবলো, খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে হবে,—ভাই, সংসার দুঃখের তালিকা অনেক, দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় নইলে বোঝার ভারেই যে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রাধা কি দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছিল ?

রাধার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না, তার উপরে একটা সামাজিক দায় বর্ত্তে ছিল, সুশীল ছিল বাগ্‌দত্ত স্বামী। তবে কি জানো ভাই, আর কিছুকাল গেলে হয়তো সে-দায়ের স্মৃতিও ম্লান হয়ে আসতো।

সেটাই কি ভালো হ'তো !

ভালো মন্দর প্রশ্ন যেমন, বাবার দুঃখের কথাটাও ভাবতে হয়।

রমণীবাবু গেলেন, এমন তো আজকাল যাচ্ছেই, আমার নিজের ভাইও তো গেল, কিন্তু গোয়েন্দার কলঙ্ক নিয়ে গেলেন এ যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

তুমিই তো বলেছিলে ওটা মিথ্যা।

যতদিন মিথ্যা প্রমাণিত না হয় সত্য বলেই তো ভাববে লোকে।

রুক্মিণী বলতে পারতো লোকে সবে ভুলে গিয়েছে রমণী ও তার হত্যাকাণ্ড, সেই সঙ্গে তার কলঙ্ক। বল্লো না, না বলে ভালই করেছিল, তাতে নূতন করে আঘাতে দেওয়া হ'তো মলিনার মনে। তাদের অতি নগণ্য প্রেম-কাহিনী সংসার অক্ষয় ভাবে চিরকাল মনে রাখবে এই গৌরবের মোহ থেকে প্রেমিকাদের বঞ্চিত করা বড় নিষ্ঠুরতা।

রুক্মিণী আশা ছাড়লো। দিনের পর দিন, কখনো প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে মলিনার মনে অব্যবহৃত তারটিতে ঝঙ্কার তুলতে চেষ্টা করতে লাগলো, জানতো একদিন সফল হবেই। ব্যস্ততার সংসারে চিরবিরহ ও চিরপ্রেম দেখা যায় না, ও কেবল উপন্যাসেই সম্ভব। অবশেষে তার মনে হ'ল, তারটা যেন স্পন্দিত হচ্ছে। এ শুধু তার কল্পনা নয়, অরবিন্দর প্রতি তার বিশেষ মনোযোগ ও ব্যবহার রুক্মিণীর আশার ভিত্তি।

দেখো মলিনা, এই অরবিন্দ ছেলেটিকে আমার বেশ লাগে।

ছেলে কোথায়! বয়স ত্রিশের কাছে।

আচ্ছা না হয় এখন থেকে যুবক বলবো। দেখো না, দেশের জন্যে সংসার ত্যাগ করেছে, ত্যাগ করেছে উপার্জনের আশা, এমন কি বুড়ী মাকে অবধি।

সেটা খুব বীরত্বের পরিচয় নয়।

নরহত্যার দায়ে তো পড়েছিল।

সেটা তো মিথ্যা প্রমাণে খালাস পেয়েছে।

উকীলের দাপটে এমন অনেকে খালাস পেয়ে থাকে।

তবে কি নরঘাতক জানলে তুমি খুশি হতে?

তুমিও হ'তে না মলিনা!

দেশের জন্যে মাঝে মাঝে এমন দরকার হয়।

এখন তো সে পালার অবসান হয়েছে। শুনেছ তো গান্ধীজির কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সন্ত্রাসক দল, মুক্ত করে দিয়েছে সকলকে সন্ত্রাসের শপথ থেকে। এখন তারা সংসারে ফিরে যেতে পারে, বিয়ে করতে পারে।

মলিনা পাদপূরণ করে বল্ল, বুড়িমাকে গিয়ে দেখা দিয়ে ধন্য করতে পারে।

শুনেছি শীঘ্রই যাবে।

আহা মায়ের প্রতি কি ভক্তি, মা ধন্য হয়ে যাবেন দেশপ্রেমিক সন্তানকে বুকে পেয়ে।

আর একদিন বিয়ের কথা তুলতেই মলিনা বল্ল, বউদি, তুমি তো সর্বদা বিয়ে করতে বলো, একটা পাত্র তো চাই, হাওয়াকে তো বিয়ে করা যায় না।

পাত্র চাই বই কি। এই ধরো না অরবিন্দ।

ঐ মুহূর্তে ঐ নামটি শুনে মলিনার মুখের উপর দিয়ে লজ্জা আনন্দ গৌরব প্রভৃতি ভাবের বলাকা লঘুপক্ষে উড়ে চলে গেল। এড়ালো না রুক্মিণীর অভ্যস্ত চোখে, মলিনাও বুঝলো ধরা পড়ে গিয়েছে। কাজের অজুহাতে স্থানান্তরে প্রস্থান করলো, ঐ যে কুশ বুঝি ডাকছে, আসছি বাবা।

কুশের কুশাঙ্কুরটি তখন বাড়ীর ধারে কাছে ছিল না, তারা মাঠে ডাংগুলি খেলছিল।

রুক্মিণী ভাবলো আর ভয় নেই, আগুন ধরেছে। একদিন নিভৃতে স্বামীকে সব কথা বলল।

মৃদুভাষী শচীন বললো, মন্দ কি।

কই শচীন, তুমি হুঁ বলেই যে থেমে থাকলে!

হাঁ, এ পাত্রটির যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তারা করেনি, তবে—তারা আর একটি পাত্রের বিষয়ে আগে থেকে চিন্তা করেছে।

বলো কি, এদিকে যে আমি শৈলেন খুড়োকে জলপাইগুড়িতে পাঠিয়ে দিলাম ঘর বর দেখে আসবার জন্যে। সে যা হয় হবে। এখন বলো কে সে?

আমাদের অরবিন্দ।

অরবিন্দ! কিন্তু তার যে কিছু বলতে কিছু নেই।

কেন বাবা এম-এ ডিগ্রি আছে, আমাদের হাতে আছে দুটো স্কুল কলেজ, একটা চাকুরি জুটবে না! আসল কথা, ছেলেটিকে আপনি কেমন মনে করেন।

খাঁটি সোনা, যেমন চরিত্রে, তেমনি সাধুতায় তেমনি নিষ্ঠায়, ও সব দলেও এমন ছেলে ক'টি আছে জানি না।

এখন তো তারা শপথ থেকে মুক্ত। ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারে।

পারে। কিন্তু তার যে মতিগতির স্থিরতা নেই। প্রথমে বললো মাকে দেখতে যাবো, তারপরে বললো কলকাতায় গান্ধীজি আসছেন আগে তাঁকে দেখে আসি। এই দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। দুদিনের জায়গায় দশদিন হয়ে গেল।

বেশি, আজ নিয়ে পনেরো দিন।

তবেই দেখো। ওদের দলের দীর্ঘকালের অভ্যাস স্থায়ী হয়ে বসবার পক্ষে অন্তরায়, আবার হয়তো গান্ধীজির ভক্তের দলে ভর্তি হবে।

এমন সময়ে ছোট একটি ব্যাগ হাতে অরবিন্দ প্রবেশ করলো।

এই যে অরবিন্দ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কখন এলে?

এই মাত্র, বলে প্রথমে যজ্ঞেশবাবুকে পরে শচীনকে প্রণাম করলো।

কি রকম কি দেখলে শুনি?

সব শুনবেন বাবা, আগে ওকে চা খাইয়ে নিয়ে আসি। এসো অরবিন্দ।

দোতলার জানালা থেকে মলিনা দেখেছে অরবিন্দকে, তার সেই দেখাটুকু আবার দেখে ফেলেছে রুক্মিণী, আবার মলিনা দেখে ফেলেছে রুক্মিণীর সেই দেখাটুকু।

গোপন প্রণয়ের স্থান যেখানেই হোক সংসারে নয়। অরণ্যে? হায় সেখানেও অনসূয়া প্রিয়ম্বদার দল আছে।

১৩

নিভৃতে বসে যজ্ঞেশবাবু ও অরবিন্দর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল—যজ্ঞেশবাবু বললেন, অরবিন্দ এবার তোমার গান্ধীদর্শনের অভিজ্ঞতা বলো।

অরবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

কি হল?

কোথা থেকে কি দিয়ে আরম্ভ করবো তাই ভাবছি, স্যার। সকাল-বেলাকার আনন্দবাজার পত্রিকার বড় বড় হরফে সংবাদ দেখলাম, আজ বেলা চারটায় মনুমেণ্টের পাদদেশে মহাত্মাগান্ধী জনসভায় অভিভাষণ দেবেন। যথা সময়ের অনেক আগে উপস্থিত হয়ে দেখি তখনই সমস্ত মাঠ জনতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কত লোক অনুমান করতে পারি এমন সাধ্য ছিল না। একসঙ্গে কখনো এতলোক তো দেখিনি। পরে কাগজে পড়েছিলাম লক্ষাধিক জন-সমাগম হয়েছিল। কোন রকমে ঠেলে ঠুলে আগের দিকে একটু জায়গা করে নিলাম। মনুমেণ্টের ঠিক নীচেই কাঠের একটা উঁচু বেদী তৈরি করা হয়েছে—চারদিকে তেরঙা কাপড়ের আবরণ, তবে খুব উঁচু নয়—মানুষ দেখা যায়। বেদীতে উঠবার জন্তে একটা কাঠের সিঁড়ি। সকলেরই আমার মতো মনের ভাব, কখন আসবেন। লক্ষ লোক একত্র হ'লে অনিচ্ছাসত্বেও একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে, ভাবলাম এর মধ্যে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যাবে কি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্বর পৌছবে কি, যাই হোক আমি তো আগের দিকেই বসেচি। ঠিক চারটের সময়ে, আমার হাতের ঘড়ি দেখে মিলিয়ে নিলাম, পিছনের সিঁড়ি বেয়ে তিনি মঞ্চের উপরে উঠে এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে আর দুইজন লোক, চিনলাম না, পরে খবরের কাগজে দেখে ছিলাম তাদের একজনের নাম সুরেশচন্দ্র

মজুমদার, আর একজন সতীশ দাশগুপ্ত। তাঁকে দেখবা মাত্র জনসভা মহাত্মা-গান্ধী কি জয় রবে চীৎকার করে উঠ্‌ল। সে ধ্বনি আর থামতে চায় না, ভাবলাম হ'ল আমার বক্তৃতা শোনা। হঠাৎ তিনি দক্ষিণ হাত তুলে জনতার উদ্দেশে বললেন—সব শান্ত্ হো যাইয়ে। ঐ একটি মাত্র বাক্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত জনতা চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট। মনে হ'ল এ যদি জাদু না হয় তবে আর জাদু কাকে বলে। তার পরে ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করলেন। সমস্তই এমন কথা যা নিতান্ত নিরক্ষরেও বুঝতে পারে আবার জ্ঞানী লোকেরও প্রয়োজনের। সে বক্তৃতার চরিত্র কি করে বোঝাই। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি; সে সব বক্তৃতায় তর্জন গর্জন আছে। কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচ আছে, আছে নানা-রকম ভাবের ওঠা পড়া যেন বর্ষাকালের ঝড়ে পদ্মার নদীর ঢেউয়ের ওঠা পড়া। এ বক্তৃতার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর একটানা তরল রব, স্রোতস্বিনীর মতোই শীতল নির্মল, আবার নিতান্ত শিশুতেও স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যেতে পারে। এতে রাজনীতির প্যাঁচ নেই, দর্শন বিজ্ঞানের আড়ম্বর নেই ইতিহাসের ঝড়ঝাপটা নেই, এ যেন আমারই মনের কথা বের হচ্ছে তাঁর মুখ দিয়ে। শুনবা মাত্র মনে প্রবেশ করছে, মনে প্রবেশ করলে আর বের হয়ে যাচ্ছে না, তাঁর কথা আমার হয়ে মনের মধ্যে বাসা বেঁধে নিচ্ছে। সুরেন বাঁড়ুজ্জের দেখেছি বাহুর আন্দোলন, যেন বক্তব্যের উপরে হাতুড়ি ঠুকে বক্তব্যকে বসিয়ে দিচ্ছে মনের মধ্যে। গান্ধীজি বলেছিলেন হিন্দি ভাষায়, শুনে-ছিলাম হিন্দি বাঙালীর পক্ষে দুর্বোধ্য। কিন্তু এ কিরকম হিন্দি। ভাষার আবরণ নেই বললেই হয়, মন থেকে যেখানে মনে কথা প্রবেশ করছে ভাষার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। বক্তব্য বিষয় যতদূর সরল হ'তে পারে। স্কুল কলেজ কলকারখানা সমস্ত শয়তানের কারসাজি, ছেড়ে দাও, স্বদেশী পড়ো, স্বদেশী করো, স্বদেশী পরো, চরখায় সুতোকেটে কাপড় বুনিয়ে নাও, গাঁয়ে গিয়ে চাষ করো, এই তো স্বরাজ। সবাই একযোগে এক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ অবশ্য হবে! আর সর্বোপরি অহিংসা, দেহে বাক্যে মনে। তিনি যেন আমাদের মনের কথা টেনে বের করে এনে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় বিস্তারিত বলে লাভ নেই, সমস্তই কাগজে পড়েছেন। তিনি যে কখন থামলেন খেয়াল ছিল না, দেখি যে দু'হাত তুলে জনতার উদ্দেশে নমস্কার করে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন।

সারারাত ধরে ভাবতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কি হলো—ঠাহর করতে

পারলাম না। পরদিন সকালবেলায় আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল—আবির্ভাব। এতক্ষণে মনের কথার হদিস মিলল, এ তো আবির্ভাবই বটে।

এই পর্যন্ত বলে অরবিন্দ থামলো।

থামলে কেন, বলো, আমি এখনো তাঁকে চোখে দেখিনি, তোমার কথায় যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। বুঝলাম আমরা এতদিন যে পথে চলছিলাম আর তিনি যে পথের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন—এ দুয়ে দুস্তর প্রভেদ, দুয়ের উদ্দেশ্য যতই এক হোক দুয়ের মিলবার কোন উপায় নেই।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার এত দেরী হ'ল কেন? এবারে সেই কথা। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি টান অনুভব করলাম তাঁর দিকে। যেখানে ছোট বড় যত সভা তিনি করেন। ছোট আর কোথায়, তিনি গেলেই ছোট সভা বড় হয়ে ওঠে, আমি সেখানে যাই। চুম্বকের টান ক্রমেই প্রখরতর হচ্ছে। কিন্তু মন যে ভরে না। তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেই হবে। এই জনসমুদ্রের মধ্যে তার উপায় কি? আমার মতো নগণ্যের তাঁর কাছে উপস্থিতির পথ কোথায়? শুনলাম তিনি আছেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে। তাতেই বা কি? সেখানেও আমি অজ্ঞাত। তবু একবার দেখা হবে আশায় বাড়ীর গেটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। যাতায়াতের পথে একবার দেখতে যাই। ঐ পর্যন্তই! হঠাৎ অদৃষ্ট সদয় হলো—একদিন চোখে প'ড়ে গেলাম স্বয়ং দেশবন্ধুর।

যাতায়াতের পথে তোমাকে আজ কদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি—কি চাও তুমি?

তাঁকে প্রণাম করে বললাম, একবার মহাত্মাজীর পায়ের ধুলো চাই।

হেসে বললেন, কলকাতার পথে আর যে বস্তুর অভাব হোক না কেন ধুলোর অভাব হবে না।

আজ্ঞে পায়ের ধুলো।

হাঁ হাঁ পায়ের ধুলোই পাবে। নইলে কি এক মুঠো পথের ধুলো তুলে তোমাকে দিয়ে বিদায় করবো। এসো আমার সঙ্গে।

নিয়ে গেলেন একটি প্রশস্ত কক্ষে, ফরাসের উপরে বসে গান্ধীজি একমনে কি লিখে যাচ্ছেন। দেশবন্ধুকে দেখে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। দেশবন্ধু বললেন, এই ছোকরাটি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইনি কে?

কে হে তুমি বলো।

আজ্ঞে আমি কেউ নই।

গান্ধীজি বললেন. স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি একটা আস্ত লোক, কেউ নও এ কি একটা কথা।

আজ্ঞে, আমি এক সময়ে সন্ত্রাসক দলের লোক ছিলাম, এখন আপনার কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করবার জন্যে শপথ-মুক্ত।

এই তো বেশ পরিচয় হল। আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করো, চিঠিখানা শেষ করে নিই, তারপরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

আমি মেঝের উপরে বললাম। গান্ধীজি ইশারায় ফরাস দেখিয়ে দিলেন। আমি ইতস্তত করছি দেখে দেশবন্ধু বললেন, তোমাকে মেঝেতেও বসতে হবে না, ফরাসেও বসতে হবে না, আমার সঙ্গে এসো।

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে একজনকে ইঙ্গিত করলেন। সে একথালা সন্দেশ ও ফল এনে আমার সম্মুখে রাখল।

নাও, ততক্ষণ খেয়ে নাও। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি ; শুধু পায়ের ধুলোয় তো পেট ভরে না। নাও আরম্ভ করো।

তাঁর মাতার' মতো মমতায় চোখ ফেটে জল আসতে লাগলো, অতিকষ্টে চোখের জল সম্বরণ করে ভাবলাম, এঁরা কি মানুষ !

ওরে কলের জল দিয়ে দিলি কেন, ডাবের জল নিয়ে আয়।

আজ্ঞে ডাবের জলের দরকার নেই।

তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে, তুমি ডাবের জলটা খেলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে।

আবার মনে হ'ল, এঁরা কি মানুষ !

নাও এবারে চলো এতক্ষণে ওঁর চিঠি শেষ হয়েছে।

এই নিন আপনার আসামী !

দেশবন্ধু, তোমার কাজ অনেক, তোমাকে আটকাতে চাই না।

হাঁ আমাকে এখনি বের হ'তে হবে।

নাও এবারে বলো তোমার কথা, এই বলে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। কি চোখ, যেমন স্নিগ্ধ তেমনি অন্তর্ভেদী। ভাবলাম তিনি আমার মনের তলা অবধি দেখতে পাচ্ছেন, তাঁকে আর নূতন করে কি বলবো।

আমাকে নীরব দেখে তিনি বললেন, আচ্ছা আমি প্রশ্ন করি তুমি জবাব দিয়ে যাও।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, বলে যাও, বেশ লাগছে, তোমার কথা শুনে গান্ধীজিকে যেন দেখতে পাচ্ছি।

অরবিন্দ আবার স্বরু করলো, ভেবেছিলাম তিনি অহিংসার ব্যাখ্যা করবেন, নিজের কর্মপদ্ধতি বোঝাতে চেষ্টা করবেন কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না। নিতান্ত বন্ধু পরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার ঘরের কথা তুললেন।

কতদিন তুমি শপথ করেছ?

এম-এ পাশ করবার পরেই, তা সাত আট বছর হ'ল, অবশ্য আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল।

বাবার অনুমতি নিয়েছিলে?

তিনি আমার শৈশবে গত হয়েছেন, তাঁর স্মৃতি মনে নেই।

তবে তোমাকে মানুষ করেছিলেন মা!

আজ্ঞে হাঁ।

আর ভাই বোন আছে?

না আমি একমাত্র সন্তান।

এই সাত আট বছরের মধ্যে মায়ের সংবাদ নাও নি?

আমাদের শপথের সেটা একটা অঙ্গ, তবে একবার লোক-মুখে সংবাদ পেয়েছিলাম।

তোমাদের নিশ্চয় জোত-জমি আছে নইলে তোমার মায়ের চলে কি ভাবে?

জোত-জমি বলতে যা বোঝায় তা নেই, একখানি ভদ্রাসন আছে, আর দুবিঘে ব্রহ্মত্র জমি।

তাতে তাঁর চলবার কথা তো নয়। তবে কোন্ ভরসায় মাকে পরিত্যাগ করবার শপথ নিলে?

ভরসা তিনি নিজেই দিয়েছিলেন।

কি রকম?

শপথ গ্রহণ স্থির করবার পরে তাঁকে বললাম, মা, মনের মধ্যে একটা খটকা আছে তোমার চলবে কি করে তাই ভাবছি। তিনি বললেন, বাবা, বিধবাদের চলবার উপায় বিধাতা খুব সহজ করে দিয়েছেন। একবেলা এক মুঠো ভাত, আর দু'খানা সাদা থান। তা যেমন করে হোক জুটে যাবে। তুমি যা কর্ত্তব্য মনে করেছ সেই পথে এগিয়ে যাও, মায়ের চিন্তার পিছু টান মনের মধ্যে রেখো না।

আমার কথা শুনে গান্ধীজি গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর বলবার একটা বিশেষ

ভঙ্গী আছে ছবিতে নিশ্চয় দেখেছেন আর যখন গভীর ভাবে চিন্তা করেন বাম করতলের উপরে চিবুক রেখে মুখ নত করে থাকেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকবার পরে বললেন, অরবিন্দ, তোমার দলের অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছে, কেউ সম্পন্ন ঘরের ছেলে নয়, আর বিদায় কালে সকলেরই মা ঐ এক ভাষায় ভরসা দিয়েছেন সন্তানদের। এমন মা যে দেশের, এমন সন্তান যে সব মায়ের সে দেশের জন্য চিন্তার কারণ নেই, এমনটি আমি অন্য কোন প্রদেশে দেখিনি। কিন্তু তোমাদের শপথ বড় কঠোর।

কাজটাও যে কঠোর।

ঐ শপথ পদ্ধতি আনন্দমঠ উপন্যাস থেকে গৃহীত, ওর গুজরাটি অনুবাদ পড়ে অবধি মনে হয়েছে বইখানা দেশাত্মবোধনের গীতা!

গীতা আর আনন্দমঠ আমাদের দীক্ষাগ্রন্থ।

এবার তো শপথ মুক্ত হয়েছ, এখন ঘরে ফিরে গিয়ে মায়ের খোঁজ নাওগে। দেখো প্রথমে মাতৃবোধ, তারপরে মাতৃভূমি-বোধ, আমার মায়ের কাছে থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম।

তিনি কি মুখে বলেছিলেন ?

মুখে কিছুই বলেন নি আচরণে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

মায়ের খোঁজ নিতে আর কত সময় যাবে, তারপরে কি করবো।

তুমিই বলো।

হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে চাই।

শপথ মুক্ত হওয়ার পরে সে অধিকার তোমার হয়েছে।

হিংসার পথে কি দেশের সমস্যা সমাধান হয় ?

আমি মনে করি হয় না। আমার বিশ্বাস হিংসার পথ ভ্রান্ত। কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোক যখন হিংসায় বিশ্বাস করছে তুমিও না হয় করলে, ক্ষতি কি।

আমি অহিংসার পথে চলতে চাই।

তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ তাই এমন বললে—অহিংসার পথ বড কঠিন, বড কঠোর, বড় দুরারোহ। দেখো, আমি বাল্যকাল থেকে অহিংসার পথে চলতে চেষ্টা করছি আজ বুড়ো হ'তে চললাম এখন পর্যন্ত কর থল-র বেশি এগোতে পারিনি। তবে শোনো, তোমাদের অনেক নেতা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারা বললেন যে আপনার কর্মপদ্ধতিতে সাফল্য লাভের আশা বেশি তাই আমরা এখন অহিংসার পথ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি বললাম ধরো সাফল্য লাভ না ঘটে। তাঁরা সরল ভাবে বললেন, তবে আবার হিংসার

পথে ফিরে যাবো। আমি বললাম, ও রকম Trial and Error অহিংসার পথ নয়।

নেতারা যাই বলুন আমি অহিংসার পথে চলতে চাই।

উত্তম। তবে ধীরভাবে সবদিকে বিচার ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আপাততঃ যাও মায়ের কাছে।

যাবো কিন্তু গেলেই তিনি বিয়ে করতে আদেশ করবেন।

করবে। দেখো আমি বিবাহিত, দেশবন্ধু বিবাহিত, মোতিলাল বিবাহিত, অহিংসার সঙ্গে বিবাহের বিরোধ নেই।

কিন্তু মনের মধ্যে থেকে একটা গ্লানি কিছুতেই যাচ্ছে না। রাজনৈতিক কারণে একটি হত্যা করেছি, তবে একটি মাত্র। প্রমাণাভাবে খালাস পেয়েছি কিন্তু গ্লানি তো যায় না।

দেখো, রাজনৈতিক কারণে হত্যা সব সময়ে নিন্দনীয় নয়, জগৎ জুড়েই তো চলছে এই পালা, বিশেষ তুমি শপথে বদ্ধ, শপথ ভঙ্গ করলেও গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেতে না।

আপনিও তাহলে রাজনৈতিক হত্যা সময় বিশেষে সমর্থন করেন।

সময়ে অসময়ে কোন সময়ই সমর্থন করি না, জগৎময় যা চলছে তাই বললাম। আমার মতো নিরেট একগুঁয়ে লোকের কথা ছেড়ে দাও।

আমি বললাম, হত্যার সঙ্গে আরও কিছু আছে—

এমন সময়ে সেনগুপ্ত ও সত্যেন মিত্র (পরে নাম জেনেছি) প্রবেশ করলেন, গান্ধীজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে আর সময় হবে না, পরে শুনবো। এখন মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছ তো ?

আজ্ঞে, আপনার আদেশ।

এমন সময়ে শৈলেন খুড়ো ব্যাগ হাতে প্রবেশ করলো।

কখন এলে শৈলেন খুড়ো ?

এই স্টেশন থেকে সোজা আসছি।

প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত হয়েছে দেখে অরবিন্দ বলল, তবে এখন আমি উঠি স্যার।

হাঁ এখন এসো।

অরবিন্দকে উঠতে দেখে যজ্ঞেশ রায় বললেন, মায়ের কাছে কবে যাচ্ছ ?

আজ বিকালেই রওনা হব ভাবছি।

বেশ যাও, তবে ফিরে এসেই দেখা করবে। অনেক জরুরী কথা আছে

তোমার সঙ্গে।

অরবিন্দ প্রণাম করে বাইরে গেল।

১৪

শৈলেন খুড়ো, তারপরে বলো ঘর বর কেমন দেখলে?

ঘর সম্বন্ধে আপত্তির কিছু নেই, আর ভাগ্যক্রমে বরটিও উপস্থিত ছিল তখন। অবস্থা বেশ ভালো, জলপাইগুড়িতে অধিকাংশ ভদ্রলোকের মতো এরাও চা বাগানের শেয়ারের মুনাফায় ধনী। ওখানে আমার পরিচিত দু'এক জন লোক ছিল। তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, বছরে প্রায় সত্তর আশী হাজার টাকা শেয়ার থেকে ডিভিডেণ্ট পান। বাড়ীটি পাকা, জলপাইগুড়িতে প্রায় সকলেরই টিনের বাড়ী, লোক বলে ইনকামট্যাক্সের দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই পাকা বাড়ী প্রায় কেউ তোলে না। এরা আর দু'চার জন মাত্র ব্যতিক্রম। আমাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আর বর?

বরটি বেশ সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। এই অনেকটা আমাদের অরবিন্দর মতোই। শুনলাম সে জামশেদপুরে টাটা কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার। কথা বলে দেখলাম মিষ্টভাষী আর বিনয়ী। বাড়ীর কর্তা পাত্রের খুড়ো।

কেন বাপ?

তিনি ক'বছর আগে একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, মা আছেন।

ইতিমধ্যে শচীন এসে বসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো, কি রকম দুর্ঘটনা?

তা তারাও বললেন না, আর আমিও জিজ্ঞাসা করলাম না।

ভালোই করেছ। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা, কত রকমই তো ঘটছে, মিছামিছি পুরোন ক্ষতে আঘাত করা হ'তো।

আমাদের কথা জানলো কি করে?

আরে যজ্ঞেশের নাম উত্তর বঙ্গে না জানে কে?

কিন্তু বলেছিলেন কি যে আমরা জেল-খাটা আসামী।

খুব সম্ভব তাঁরা জানতেন তবে তুলতে ইতস্তত করছিলেন। আমিই—পূর্বপক্ষ হয়ে সব বললাম। বললাম যে পাত্রীর পিতা আর ভাই স্বদেশীর জন্যে জেলে গিয়েছে, আবার হয়তো যেতে হবে।

পাত্রের খুড়ো অমরেশ বাবু বললেন, ওসব কথা আমাদের কাছে পুরানো হয়ে গিয়েছে, জেল খাটা লোক এখানেও অনেক আছে।

পাত্রটি বল্‌ল, দেশের এখন যে অবস্থা জেল এড়িয়ে চলা দায়।

বেশ বলেছে তো—বল্‌লেন যজ্ঞেশ বাবু।

পাত্র একমাত্র পুত্র সন্তান, তার দুটি বোন, দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। একজনের রংপুরে, একজনের কুচবিহারে।

পাত্র কোথা থেকে ঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে?

সমস্ত বলছি শচীন ভায়া। পাত্র বল্‌ল, শিবপুর থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যখন চাকুরি খুঁজছে তখন বাবা হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সরকার প্রস্তাব করে পাঠালেন তাঁরা স্কলারশিপ দিয়ে বিলাতে পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। আমরা রাজি হলাম না।

কেন?

সরকারের টাকা গিললে নানারকম দায়-দায়িত্ব বর্তায়। তাছাড়া আপনাদের আশীর্বাদে বিলাতে পাঠাবার সঙ্গতি আমাদের ছিল। সেখানে চার বছরে আরও কিছু ডিগ্রি ও ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলাম। এখন ক' বছর জামসেদপুরে চীফ মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারের কাজ করছি।

আমি বললাম, পাত্রী দেখবার ব্যবস্থা কি হবে? আগেই বলে রাখছি অমরেশবাবু, আমাদের পাত্রীর বয়স কিছু বেশি অর্থাৎ যে-বয়সে বাঙালী মেয়ের বিয়ে হয় তার চেয়ে বেশি; তবে পাত্রের সঙ্গে বেমানান হবে না।

দেখুন শৈলেশবাবু, আমরাও একটি বয়স্ক পাত্রীর সন্ধান করছিলাম। আগে কিছুদিন শ্বশুর-ঘর ক'রে পরে স্বামীর ঘরে যেতো। এখন পাত্রীকে গোড়াতেই স্বামীর ঘরে গিয়ে সংসারের ভার নিতে হবে।

তা মলিনা খুব পারবে।

পাত্রীর নাম বুঝি মলিনা?

হাঁ, তবে নামের মধ্যে কিন্তু মেয়ের রঙের পরিচয় নেই—আমি সম্পর্কে ওর দাদামশাই, ঠাট্টার সম্পর্ক, এই নিয়ে প্রায়ই পরিহাস করি।

যজ্ঞেশবাবু আপনার?

সম্পর্কে ভাইপো, যজ্ঞেশের খুড়ো কাজেই দিনাজপুরে শহরে শৈলেন খুড়ো নামে আমার পরিচয়।

অমরেশবাবু হেসে বললেন, প্রজাপতির ইচ্ছা হলে এখানেও ঐ নামে হবে আপনার পরিচয়।

তা পাত্রী দেখবার কি হবে?

কবে যেতে পারবে অম্লান?

বুঝলাম পাত্রটির নাম অম্লান; সে বল্‌ল, আমার ছুটি তো ফুরিয়ে এলো, আমার ইচ্ছা কালকে বিকালে পৌঁছই, অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা না হয় কাকাবাবু।

বিলক্ষণ! আমি তো বসেই আছি।

তবে আমি আজ রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে যাই, আপনারা আসছেন খবরটা দিতে হবে তো।

রাতের গাড়ীতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না?

কিছু না কিছু না, গাড়ীতে আমার ঘুম জমে ভালো, যেন মায়ের কোলে দোল খাচ্ছি। এই তো সব খবর।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, তার মানে ওঁরা বিকালে এসে পৌঁচচ্ছেন। শচীন, তুমি খুড়োকে নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত থেকো। সন্ধ্যার আগেই ওরা মেয়ে দেখতে চাইবেন, বউমাকে খবরটা দাও গে।

শচীন উঠে যাওয়ার আগে বলল, অরবিন্দ দুপুরবেলাতেই বাড়ীতে রওনা হয়ে যাচ্ছে—এই রক্ষা।

শৈলেন খুড়ো কিছুই জানতেন না, বল্‌ল, অরবিন্দর সঙ্গে কি সম্পর্ক!

সে অনেক কথা খুড়ো, পরে শুনো, এখন হাত মুখ ধোও গে।

পাত্রী দেখা ও আহারাদির পরে রাত্রিতে একটি প্রশস্ত কক্ষে দুটি আলাদা পালঙ্কে অমরেশবাবু ও অম্লান সুখশয্যায় শয়ান। দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

অম্লান, মেয়ে পছন্দ হ'ল?

আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি, আপনার পছন্দেই আমার পছন্দ।

এ যদি তোমার মনের কথা হয় তবে বুঝবো তোমার অপছন্দ হয়নি, কারণ আমার পছন্দ হয়েছে। এর আগে দুজনে মিলে অনেক কয়টি মেয়ে দেখেছিলাম, তাদের দুটি তিনটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, তুমিও বলেছিলে তোমার পছন্দ হওয়ার কথা।

অম্লান বাধা দিয়ে বল্‌ল, তবে সে-সব জায়গায় বিয়ে হয়নি কেন মনে রাখবেন।

তার একমাত্র কারণ আমরা কিছু অকারণ সত্য কথা বলেছিলাম।

এখানেও তো সে আশঙ্কা থাকতে পারে।

হয়তো থাকতে পারে তবে পূর্ব শিক্ষার অভিজ্ঞতায় অকারণ ও অবান্তর সত্যভাষণ না করলেই হ'ল।

সে কি উচিত হবে ?

সে সব বারেও তোমার ঔচিত্যবোধের পীড়াপীড়িতে অবান্তর সত্য কথা বলতে হয়েছিল।

অবান্তর কেন বলছেন ?

কবে কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল এতকাল পরে তা টেনে আনা অবান্তর। এখানেও তো কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কোন্ দুর্ঘটনার ফলে দাদার মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ের পরে অবশ্যই জানতে পারবে তখন—

তখন তারা একথা কখনো বলতে পারবে না যে আমরা মিথ্যা কথা বলেছি।

যে কথা আদৌ ওঠেনি তাকে মিথ্যা সত্য কিছুই বলা যায় না—

ওটাই কি মিথ্যা বলা হ'ল না ? মিথ্যা-ভাষণ ও সত্য-গোপন করা দুই কি এক হ'ল না।

দেখো অম্লান, তুমি মস্ত এঞ্জিনিয়ার হ'তে পারো কিন্তু সংসার সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। প্রত্যেক পরিবারেই কিছু না কিছু গোপন কথা থাকে, তাই নিয়ে বিচারে নামলে কোথাও বিয়ে করা সম্ভব হয় না, আর তাছাড়া দাদার তো দোষ ছিল না।

আমাদের মতে অবশ্যই দোষ ছিল না কিন্তু যাঁরা বিয়ে দিতে রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন, তাঁরা তবে পিছিয়ে গেলেন কেন ?

সেটা দেশের হাওয়ায়।

সে হাওয়া তো আরও প্রবল হয়েছে, বিশেষ এঁদের পরিবারে। যজ্ঞেশবাবু, শচীনবাবু সবাই স্বদেশীর জন্ম জেল খেটেছেন আর যখন শুনতে পাবেন যে একজন স্বদেশী ছোকরার হাতে পুলিশ ইন্সপেক্টার বলেই পিতা নিহত হলেন তখন—

দাঁড়াও, ওর মধ্যে একটু সূক্ষ্ম বিচারের আবশ্যক আছে। শচীন সুরেন বাঁড়ুজ্জের ভক্ত, তিনি বোমা পিস্তলের বিরুদ্ধে ছিলেন, আর যজ্ঞেশবাবু তো খাঁটিগান্ধী পন্থী।

কাকাবাবু, আপনার বিচার ঠিক, এঁরা কেউ বোমা পিস্তলের দলে নয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস এঁরা বোমা-পিস্তল-বিরোধী হলেও দেশের জন্ম সে-সব যারা ব্যবহার করে তাদের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আছে।

কিন্তু গান্ধীজি তো প্রকাশ্যে বোমা পিস্তলের নিন্দা করেছেন।

গান্ধীবাদী আর গান্ধী এক নয়।

সত্যকথা, অন্য দিকে মনে রেখো এই সেদিন তিনি গোপীনাথ সাহার

পিস্তল ব্যবহারের নিন্দা করেছিলেন—

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তো ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে গোপীনাথ সাহার সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল—

তুমিই বলো কেন হয়েছিল?

ঐ গান্ধীবাদী ও গান্ধী এক নয় বলে।

আর তাছাড়া দেখো দাদার আসামী কে এ পর্যন্ত লোকে জানতে পারলো না, আদালতে মামলা হ'ল না, সমস্ত ব্যাপারটাই অস্পষ্ট, এতকাল পরে এ কথা কে মনে রেখেছে।

আপনার কথা সত্য, সরকার পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হ'ল।

দেখো আমি নিজে লালবাজারে গিয়ে আসামীর পরিচয়, তার কি হ'ল জানবার চেষ্টা করেছিলাম, তারা বলেছিল এসব স্পেশাল ব্রাঞ্চের ব্যাপার, তারা কিছু জানে না। গেলাম স্পেশাল ব্রাঞ্চে, সেখানে সর্বময় কর্তা মজুমদার সাহেব, প্রথম তো দেখা করতেই চাননি, তারপরে নিহত ব্যক্তি আমার দাদা শুনতে পেয়ে দেখা করলেন বটে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে তাঁর একমাত্র জবাব—কনফিডেন্সিয়াল। বাস্, চুকে গেল।

অম্লান বল্‌লে, একখানি ইংরাজি কাগজে ছোকরার ছবি বেরিয়েছিল, নাম অবশ্য ছিল না, খুব সম্ভব নামটা জানতে পারেনি, সে ছবি আমি দেখেছিলাম।

সে ছবি কি ক'রে তোমার হাতে এলো জানি না, সরকার সমস্ত কাগজ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

আমার এক বন্ধু গোপনে দিয়েছিল, বলেছিল, দেখা হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলো।

তবেই দেখো যে কথা কেউ জানতে পারেনি, যে দু'চারজন জানতো তারাও ভুলে গিয়েছে।

সেই দু'চারজনের মধ্যে আমি নই, পিতৃহন্তার সেই ছবিখানা এখনো আমার কাছে আছে।

বলো কি। কেন রাখতে গেলে।

যতবার ভেবেছি পুড়িয়ে ফেলে দেব, কেন জানি পারিনি।

তুমি নিশ্চয় জানো কেন সরকার বৃত্তি দিয়ে বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিল?

আর এ-ও আপনি নিশ্চয় জানেন সে বৃত্তি আমি গ্রহণ করিনি—ওটা Blood money, ও টাকা অস্পৃশ্য। ফিরে এসে ভালো ভালো সরকারী

চাকরির অফার পেয়েছি, নিইনি, স্থির করেছিলাম এ সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবো না।

তাহলে তোমার তো এই পরিবারের সঙ্গে ভালো মিলবে।

সেই আশাতেই এখানে পাত্রী দেখতে এসেছিলাম।

তবে হঠাৎ আবার পুরানো কথা তুলতে গেলে কেন?

এই জন্মে যে জানিয়ে দেওয়া উচিত কোন্ দুঃখে আমি তাঁদের মতো সরকার-বিরোধী।

এই যদি তোমার মনোগত ভাব হয় তবে বিয়ের পরে জানালেই চলবে, তাঁরা মনের মতো লোক পেয়ে নিশ্চয় খুশি হবেন। আর সকলে পিছিয়ে গিয়েছিল সরকার-বিরোধী বলে, এঁরা সে দলের নন। নাও এখন ঘুমোও, কাল খুব ভোর বেলায় ট্রেন।

ভোরের আলো না ফুটতেই শচীন এসে জাগিয়ে দিয়ে গেল কাকা ভাইপোকে—বল্‌ল, হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। ব্যাগটা এখানেই থাকুক, গাড়ীতে উঠবার সময়ে তুলে দেব।

চা পানাদি ক'রে ওরা আবার শয়ন-কক্ষে ফিরে এলো—তখন বেশ আলো হয়েছে। ওরা তিনজনে ঘর থেকে বের হ'তে যাবে এমন সময়ে অম্লানদের চোখে পড়লো সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো বড় আকারের বাঁধানো একখানা ছবি, রাতের বেলায় খেয়াল হয়নি।

অম্লান বল্‌ল, মনে হচ্ছে আপনার ছবি।

শচীন বল্‌ল, অনেকে তাই মনে করে, আমার ছোট ভাইয়ের ছবি, দেখতে অনেকটা আমার মতো ছিল।

ছিল মানে?

অনেক দিন হ'ল গত হয়েছে।

অমরেশবাবু বলে উঠলেন, আহা, এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ কি হয়েছিল।

চলুন ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে যেতে পথে বল্‌ব, ট্রেনের সময় হয়েছে।

হাঁ তাই ভালো।

চলো অম্লান, তুমি যে ছবিখানার দিকে তাকিয়েই থাকলে।

হাঁ চলুন।

ঘোড়ার গাড়ীতে স্টেশনে যাওয়ার পথে শচীন বল্‌ল, ওর নাম ছিল সুশীল, কল্‌কাতায় আমার বাসায় থেকে কলেজে পড়তো। এখানে থাকতেই সন্ত্রাসক

দলে ভর্ত্তি হয়েছিল, আমরা কেউ কিছু জানতাম না, কঠোর ওদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ।

অমরেশবাবু বল্‌লেন, আপনার যদি বলতে কিছু বাধা থাকে না হয় নাই বললেন।

বাধা কিছু নেই, আর আপনাদের কাছে বাধাই বা কি। তবে কিছু দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। যাক্‌। একদিন লালদীঘিতে দুপুর বেলায় এক পুলিশ ইন্সপেক্টারকে পিস্তল দিয়ে গুলি ক'রে হত্যা করলো, তারপরে—

বাধা দিয়ে অম্লান শুধালো, পুলিশ ইন্সপেক্টারের নাম?

জানতে পারিনি, কিছু বের হয়নি।

সুশীল স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাজতে আত্মহত্যা করে মারা গেল। সেইজন্তে মামলাটা আর আদালত পর্যন্ত গড়ায় নি। সমস্ত শুনে সুরেন বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন, পুলিশ নিজের দোষ ঢাকবার উদ্দেশ্তেই আসামী আর নিহত ব্যক্তির পরিচয় বেমালুম চেপে দিল, কাগজে একটা অক্ষরও বের হ'ল না।

এই বলে সে থামলো, বেশ বোঝা যাচ্ছিল দুঃখে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। শচীন নীরব, অপর পক্ষও সমান নীরব। ট্রেন ছাড়বার মুখে শচীন জিজ্ঞাসা করলো, পাত্রী পছন্দ হ'ল কিনা জানালেন না তো?

অমরেশবাবু বললেন, পরে জানাবো।

অম্লান তখন অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে, নমস্কার অবধি করলো না।

শচীন অবাক হয়ে গেল, হঠাৎ এঁদের হ'ল কি?

১৫

ভাই বউদি, তুমি তো আমার মনের কথা জানতে তবে আমাকে এমন বিপাকে ফেল্‌লে কেন।

কি ক'রে জানবো ভাই, সবটাই কেমন তড়িঘড়ি হয়ে গেল। বাবা যে শৈলেন কাকাকে পাঠালেন আমি জানতাম না, আর আমার ভরসা ছিল তোমার দাদা যখন আভাসে অরবিন্দবাবুর কথা জানতেন তিনি হয়তো বাধা দেবেন। শৈলেন দাদার জলপাইগুড়ি রওনা হওয়ার ঠিক মুখে যখন তিনি জানলেন তখন আর বাধা দেওয়ার সময় ছিল না।

এখন আমি অরবিন্দবাবুর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো।

তুমি ভাবছো মলি যে সে কথা আমার মনে ওঠেনি!

এখন আমি কি ভাবছি জানো, অরবিন্দবাবুর মন যদি আর কোথাও পড়ে

থাকে কিম্বা মায়ের অনুরোধে আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি হন তবে সব দিক রক্ষা হয়।

এমন কেন ভাবছ ভাই ?

ভাববো না !

এমনও তো হ'তে পারে অম্লানবাবুর তোমাকে মনে ধরেনি।

এই উক্তিতে মলিনা খুশি হতে পারলো না, আঘাত লাগলো তার অহমিকায়। কোন পুরুষের পছন্দ হয়নি এ কথা মেয়েদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। দময়ন্তী দেবতাদের অগ্রাহ্য করেছিল কিন্তু কোন দেবতা যদি তাকে অগ্রাহ্য করতো !

রুক্মিণী বল্‌ল, কি, চুপ ক'রে থাকলে যে, মনের মধ্যে বোধ করি পিছুটান আছে।

মেয়েরাও মেয়েদের মনের কথা বোঝে না। মলিনা মোটেই অম্লানকে পছন্দ করেনি, তাই বলে অম্লান তাকে অপছন্দ করে যাবে এ অসহ্য। কিছু বলা উচিত নতুবা বউদি ভাবতে পারে তার অনুমান সত্য। তাই সে বল্‌ল— কি যে বলো বউদি।

কেন, সেটা কি এমনই অসম্ভব।

মলিনার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে যে ভুল করেনি, সে বল্‌ল, না।

না মানে কি ?

দেখো ওরা ঠিক চিঠি লিখবে মেয়ে পছন্দ হয়েছে, যেন কত অনুগ্রহ করলো আমাকে।

যাক বাঁচা গেল। তোমার শেষের কথাগুলো শুনে মনে হয়েছিল তুমি বুঝি সেই অনুগ্রহপ্রার্থী। দেখো আমি ঠিক বলছি ওরা কোন অজুহাত দেখিয়ে স'রে পড়বে। বাজি রাখতে রাজি আছি।

বলা বাহুল্য, একথাটাও মলিনার ভালো লাগলো না। সে চুপ করে থাকলো। কালকে সারারাত বিছানায় শুয়ে নিজের মনটাকে উল্টেপাল্টে দেখেছে। কিছুই বুঝতে পারেনি তাই আজ সকালে উঠেই বউদির কাছে এসেছিল কূল পাওয়ার আশায়, দেখলো তার মতোই বউদিও অকূলে ভাসছে। হঠাৎ তার মনে হ'ল সে দ্বিচারিণীর চেয়েও অধম, রমণীবাবু, অরবিন্দবাবু, অম্লানবাবু— সে কি তবে ত্রিচারিণী। বাঙ্গালী ঘরের বিবাহযোগ্যা মেয়ে কত অসহায়। তখনি তার মনে হ'ল রমণীবাবু ও অরবিন্দবাবুর সঙ্গে অম্লানবাবুকে একাসনে বসানো উচিত নয়। ত্রিচারিণী না হোক দ্বিচারিণী বটে তো। তবে কি

মানুষ নিজের মনটাকে বুঝতে পারে না? এমন রত্নটি বিধাতা মানুষকে কেন দিতে গেলেন!

এমন সময়ে নীচে লব কুশের গলা শুনতে পাওয়া গেল, পিসিমা আমরা বের হচ্ছি।

সে কিরে, এখনো তো ইস্কুলের বেলা হয়নি।

ওরা বল্‌ল, আজ ইস্কুল বন্ধ, তার বদলে প্রসেশন হবে।

কেন রে?

সরকার সুভাষবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে।

দাঁড়া আসছি, বলে দু'জনে নীচে নেমে এলো।

সম্মুখে শচীনকে দেখে রুক্মিণী শুধালো, কি হয়েছে গো?

সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হ'য়েছেন।

এইতো সেদিন ছেড়ে দিল!

ঐ লোকটিকে ভেতরে বাইরে কোথাও রেখে সরকারের সোয়াস্তি নেই।

অরবিন্দ কবে আসবে গো, দুদিন বলে যে গেল?

স্বদেশীওয়ালাদের কি কথার ঠিক আছে। ওরা যে কড়াপাকের স্বদেশী-ওয়ালা, এলে তবে জানতে পারবে এলো।

তুমিও কি বের হচ্ছ নাকি?

হ'ব না।

এমন সময়ে দেখা গেল লব কুশ কংগ্রেস পতাকা নিয়ে প্রস্তুত, চীৎকার, করে, বল্‌ল, বাবা এসো।

এই যাই বলে যেতে উদ্যত হ'লে রুক্মিণী শুধালো, ফিরবে কখন্, তোমাদের তো কথার ঠিক আছে, তোমরা তো কাঁচাপাকের স্বদেশীওয়ালা।

হেসে উঠে শচীন বল্‌ল, নিশ্চয় ঠিক আছে; আজকে দিনের মধ্যেই কখনো ফিরবো। তবে তোমরা লক্ষ্য রেখো, বাবা যেন বেরিয়ে না যান—বলে শচীন প্রস্থান করলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চল্‌ল, তবু শচীন ও লবকুশদের দেখা নেই। মলিনা ও রুক্মিণী তেতালার ছাদে গিয়ে উঠে দেখতে চেষ্টা করলো, দৃষ্টিতে যত দূর চলে কেউ নেই পথে। স্বাভাবিক লোক-চলাচল আছে বটে তবে সংখ্যায় কম। দূরে কতদূরে বোঝা যায় না, মনে হয় সাহেব বাজারের দিকে দারুণ গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ও সুভাষচন্দ্র কি জয় শব্দগুলো

শুনতে পাওয়া যায়। ওরা ছাদের রেলিং ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দু'জনেই অভুক্ত, অবশ্য যজ্ঞেশবাবুকে প্রায় জোর করে স্নানাহার করিয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে।

স্বদেশী স্কুল ও কলেজের মাঠে লোক জমায়েৎ হয়ে যখন প্রসেশন বের হ'তে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে পুলিশ সাহেব রবিনসনের বাংলোর খাসকামরায় পুলিশ সাহেব ও হরিপদ দত্তর মধ্যে কথা চলছিল।

মিঃ দত্ত, এই যে কাণ্ডটা হ'তে চলেছে এ বিষয়ে কিছু জানো।

হরিপদ বলল, জানি বইকি স্যার, প্রসেশনের পাণ্ডারা ভোরবেলা আমার কাছে এসেছিল পরামর্শের জন্যে (সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা)। আমি তাদের বলেছিলাম, সুভাষবাবু সরকারের আদেশ অমান্য করে কাজটা ভালো করেন নি, এ নিয়ে আপনাদের উত্তপ্ত হওয়া উচিত নয়, আপনারা শহরে গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন না। ভণ্ড কাপুরুষ, দেশের শত্রু প্রভৃতি বলে গালাগাল দিয়ে তারা চলে গেল। আমি তখনি গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পিল্লাই এর কাছে (এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা)। বললাম, স্যার শহরে আজ একটা গোলমাল হতে পারে তাই খবরটা দিতে এলাম। পিল্লাই বললে কি স্যার জানেন, বলল, এজন্য তোমার উদ্বিগ্ন না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত, এই সাহেবগুলো না গেলে দেশের উন্নতি হবে না।

বলল এই কথা!

শুধু এই নয়, পথে দেখা হ'লে রবিনসনের মেম আমার মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে না।

কেন বলবে! ওটা একটা কালামাগী। দাঁড়াও আমি কমিশনারকে ওর বি দ্ধে লিখছি।

এখনো শেষ হয় নি স্যার, বলল হরিপদ। আমি বললাম, শহরে গোলমাল হ'তে পারে তাই আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। বলল, হোক গোলমাল, দেখি রাস্কেল রবিনসনটা কি করে? আমি হুকুম না দিলে ওর কিছু করবার উপায় নেই।

বলল এই কথা! ব'লে কটা চামড়ার উপরে যতটা রক্তিম হওয়া সম্ভব হয়ে বলল, দেখা যাক কিছু করতে পারি কিনা। কিন্তু মুস্কিল কি জানো দত্ত, প্রসেশন যদি শান্ত হয়ে থাকে তবে তো কিছু করা যায় না।

শান্ত হয়ে থাকতে দেবেন কেন স্যার। কিছু এজেন্ট প্রোভোকেটার পাঠিয়ে দিন, প্রসেশন যখন সাহেব বাজার ঢুকে দোকান পাট বন্ধ করতে

বলবে, তারা যেন ঢিল ছোঁড়ে, দু'একটা দোকানের উপর হামলা করে, তখন শান্তিরক্ষার অজুহাতে পুলিশ লাঠি চালাবে, গ্রেপ্তার করবে, তখন আর ম্যাজিস্ট্রেটের বলবার কিছু থাকবে না। তা ছাড়া আপনার মতো খাস ইংরেজ ও বেটা কালা সাহেবের কথা মানবেন কেন।

রবিনসন হরিপদর পিঠ চাপড়ে বলে উঠ্‌ল—You are a brick—তুমি একটি রত্ন বিশেষ। মনে মনে বল্‌ল, এদেরই পূর্বপুরুষ পলাশীর যুদ্ধে আমাদের সহায় হয়েছিল।

হরিপদর বঁড়শি গিলল রবিনসন। প্রেসেসন সাহেব বাজারের মধ্যে উপস্থিত হতেই ঢিল ছোঁড়াছুড়ি আরম্ভ হয়ে গেল, একটা মাড়োয়াড়ীর দোকানে আগুন লাগলো। তখন পুলিশ বেধড়ক রেগুলেশন লাঠি চালাতে সুরু করে দিল। শচীন ভূপতি নৃপতি বীরেন চৌধুরী প্রভৃতি যারা শান্তি রক্ষার চেষ্টা করছিল, পুলিশ প্রথমেই তাদের গ্রেপ্তার করলো, ফলে দেখতে দেখতে দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। এই গোলমালটাই মলিনা আর রুক্মিণী ছাদের উপর থেকে শুনতে পেয়েছিল।

এমন সময়ে ধোপাবউ তেতালায় এসে উপস্থিত, সে এখন ষোল আনা স্বদেশী, দেশী কাপড় ছাড়া কাচে না।

কি খবর ধোপা বউ?

কি আর বলবো বউদিদি। দাদাবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে, ভূপতিবাবু নৃপতিবাবু সকলকেই, তাদের সঙ্গে দুপের ছেলে লব কুশকেও, লবের মাথায় ঢিল লেগেছিল আর কুশের বাঁ হাতে লাঠির চোট লেগেছে।

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো, এ তোর শোনা কথা না চোখে দেখা?

শোনা কথা হ'তে যাবে কেন, আমি বাজারে গিয়েছিলাম সোডা কিনতে, নিজের চোখে দেখলাম। তারপরে পড়ি কি মরি করে ছুটে আসছি।

খবর শুনে ওরা দু'জনে মুহূর্তের জন্যে কাঠ হয়ে গিয়েছিল তবে শুধু মুহূর্তের জন্যে। রুক্মিণীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো আর মলিনার চোখ উঠ্‌ল জ্বলে, তার মনে পড়ে গেল সুশীলের কথা, রমণীর কথা, অরবিন্দর কথা। পর মুহূর্তেই সে তর তর তরে নেমে এসে ছুটলো। রুক্মিণীও পিছনে পিছনে নেমে এসেছে, থামো থামো, কোথায় চললে ঠাকুরঝি?

মলিনা তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে, বারেক মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, বউদি, বাবাকে দেখো।

তুমি কোথায় চললে?

সাহেব বাজারে।

তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

সেই আশাতেই যাচ্ছি—মলিনা পথের বাঁকে অদৃশ্য।

রুক্মিণীরও ইচ্ছা করছিল ছুটে যায়—যদি গ্রেপ্তার করে। স্বামী পুত্র গ্রেপ্তার, কচি ছেলে দুটি আহত। এমন অবস্থায় গ্রেপ্তার না হওয়ার ইচ্ছাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু সে সুখ তার ভাগ্যে নেই, বুড়ো শ্বশুর, সমস্ত সংসার তার জিম্মায়। সদর দরজার কাছে অনাবৃত মস্তকে কাঠের মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো, চোখের জল তার কখন উবে গিয়েছে। সে পাষাণে গঠিত দেবী, রুক্মিণী অবিনাশবাবুর কন্যা।

শোবার ঘরে এতক্ষণের ধৈর্য ভেঙে পড়লো রুক্মিণীর। এ পর্যন্ত পাষাণ-কন্যা হিমবাহরূপে স্তব্ধ ছিল, এবারে গল্‌গল্ অশ্রুধারায়। শ্বশুর বলেছিলেন, মা তোমাকে শক্ত হ'তে হবে, দুর্বল হলে চলবে না, যে কোনদিন আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, তখন সংসারের হাল তোমাকেই যে ধরতে হবে। মনে পড়লো আরও বলেছিলেন, এদেশে জেলে যাওয়ার পরওয়ানা নিয়েই মানুষে জন্মেছে, জেলের ভিতর দিয়ে আসবে আমাদের মুক্তি, সে কারাগারে যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত কথাই মনে আছে রুক্মিণীর কিন্তু চোখের জল যে অবাধ্য, না মানে যুক্তি না মানে বারণ।

তার চোখে পড়লো স্বামীর শয্যা শূন্য, পাশের ঘরে লব কুশের শয্যা শূন্য, মলিনার শয্যা। এই সর্বব্যাপী শূন্যতার মধ্যে কোথায় আশ্রয়, শূন্যতার উপরে কি নির্ভর করা চলে। বাতি হাতে নিয়ে অনেকবার এ ঘর ও ঘর করলো সে, মনের মধ্যে কি ভরসা ছিল হঠাৎ এই দুঃস্বপ্ন ভেঙে যাবে, দেখতে পাবে নিত্যকার মতো লব কুশ পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে, মলিনা বুকের নীচে বালিশ নিয়ে চিঠি লিখছে, আর স্বামী একখানা মোটা বইয়ের পাতার মধ্যে নিমগ্ন? নিত্যকার এই সামান্য দৃশ্য অসামান্য বেগে আঘাত করলো বুকের উপরে, ছিটেগুলি ক্ষুদ্র হ'লেও তার আঘাত করবার শক্তি কম নয়। না এ দুঃস্বপ্ন নয়, কঠোর বাস্তব।

তার কোন ধারণা ছিল না, জেলের ভিতরে শোবার ব্যবস্থাটা কিরকম, তবে যে এমন পুরু গদির উপরে শুতে দেয় না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। যার স্বামী পুত্র ননদ কম্বলের উপরে শয়ান সে কি এমন আরামের শয্যায় শুতে পারে! না তা হ'তে পারে না। একটা পাতলা দেখে বালিশ টেনে নিয়ে

মেঝের উপরে শুয়ে পড়লো সে।

তার মনে পড়লো শ্বশুর বলেছিলেন, মা, তোমার স্বামী পুত্র ননদ গ্রেপ্তার হল। আর আমার যে পুত্র কন্যা নাতি গ্রেপ্তার হল। কার দুঃখ বেশ হওয়া উচিত? দুঃখ কি ঔচিত্যবোধ মানে, না আছে তার আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সমীক্ষা। পাঁচ রকম চিন্তার তাড়নায় চোখের জলে ভাসতে ভাসতে কখন সে সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করলো।

দশটা বাজবার আগেই শ্বশুর তৈরি হ'লেন আদালতে যাওয়ার জন্যে, রুক্মিণী বল্‌ল, বাবা, রান্না হয়েছে খেয়ে গেলে হতো না?

না মা, ফিরে এসে খাবো।

শ্বশুরকে সে চেনে, ওটা খাবো না বলবার তাঁর নিজস্ব রীতি।

পিল্লাই হাড়ে চটে গিয়েছিল রবিনসনের উপরে, বেশ বুঝেছিল, কালকার শান্তিভঙ্গ-জনিত গোলমালটা পুলিশের যোগসাজসে ঘটিয়েছে ঐ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জাতটা যার মেম পথে দেখা হলে কথা বলে না তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। তার পক্ষে অসাধ্য কি।

পিল্লাই জানতো, এ মামলা দেশী হাকিমের এজলাসে গেলে কঠোর সাজা হবে। তাই সমস্ত মামলা নিয়ে এলো নিজের এজলাশে।

ঠিক দশটায় মামলা সুরু হ'ল, দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল, আসামী জন পঞ্চাশেক, তা ছাড়া উকীল মোক্তার আর কৌতূহলী জনতা। পিল্লাই দেখল, আসামীদের বয়স দশ বারো থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, একজন স্ত্রীলোকও আছে।

পিল্লাই মাঠো মাঠো রকমের বাংলা জানতো, শুধালো, আপনাদের পক্ষে কোন উকীল মোক্তার আছে?

শচীন সকলের মুখপাত্র হয়ে বল্‌ল, আমরা ডিফেণ্ড করবো না।

জামিনের দরখাস্ত করবেন?

না, সেটা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ।

তবে মামলা সুরু হোক—বলে পিল্লাই লব কুশ ও মলিনার প্রতি কোর্ট কয়েদের হুকুম দিল, আদালত চলা পর্য্যন্ত তারা কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যে সকলের সম্বন্ধে হুকুম হ'ল দশ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, আর সকলেই প্রথম শ্রেণীর আসামী বলে গণ্য হবে।

হুকুম দিয়েই ম্যাজিস্ট্রেট বের হয়ে গেল। কোর্ট ভেঙে গেল, কাজেই লব কুশ ও মলিনা খালাস।

জনতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে উঠ্‌ল, আসামীরা জিজ্ঞাসা করলো, কেগো, আমাদের জেলে নিয়ে যাবে কে ?

ভূপতি কোর্ট দারোগাকে বল্‌ল, দারোগা সাহেব, খানকতক গাড়ী নিয়ে এসো, আমরা প্রথম শ্রেণীর আসামী, হেঁটে যাচ্ছি না চাচা।

কাছেই একজন ভোজপুরী পুলিশ ছিল। মামলা চলবার সময়ে বিধি অনুসারে খৈনি মর্দন করছিল। এবারে সেটুকু মুখের মধ্যে যথাস্থানে ন্যস্ত করে বলে উঠ্‌ল, শালা এহি বড়া তাজ্জব কি বাৎ, মালুম নেহি হো যাতা কৌন আসামী ঔর কৌন মাজিস্টর।

পশ্চিম দ্বারভাঙ্গাবাসী পুলিশটি যে কিঞ্চিৎ খৈনির ভাগ পেয়েছিল বল্‌ল, আরে ভাইয়া জমানা বদল গিয়া, আভি তো গান্ধীরাজ কায়েম হো গৈ।

পূর্বোক্ত পুলিশটি শুধালো, তলব কুছ কুছ বাঢ়ে গা।

আরে মুলুককা মালিক হো গৈ সবহি তলব সবহি তনখা।

এই অস্পষ্ট উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বার দুই খৈনি সঞ্জাত থুথু ফেল্‌ল।

যজ্ঞেশবাবু শচীনের সঙ্গে দেখা করে বল্‌লেন, তা হ'লে আমি এদের বাড়ীতে নিয়ে যাই, বাড়ীতে সকলেই ভালো আছে, চিন্তা নেই।

তারপরে ভূপতিদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, ফাঁড়াটা অল্পর উপর দিয়েই গেল।

ভূপতি বল্‌ল, পিল্লাইটা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, ওকে আর এ জেলায় বেশিদিন রাখবে না।

নৃপতি বল্‌ল, যে জেলাতে যাবে সেখানেই এই রকম কাণ্ড করবে, চারদিকে আগুন, শেষে না ওকে সেক্রেটারিয়েটে নিয়ে যায়।

ভূপতি বল্‌ল, এ কাণ্ডর মূলে রবিনসন ক্রুশো আর তার ম্যান ফ্রাইডে।

সেটি আবার কে ?

সকাল বেলাতেই সে নামটা আর মুখ দিয়ে বের করতে বলবেন না।

শচীন বল্‌ল, যান বাবা, এদের নিয়ে বাড়ীতে যান, এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি।

আর তোমাদের ?

প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক আসামী মানেই রাজার বেয়াই, আমাদের জন্ত

ভাববেন না।

সকলে প্রণাম করলে, যজ্ঞেশবাবু মেয়ে ও নাতিদের নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

মামলার রায় শুনে পুলিশ সাহেব রবিনসন নিজ কামরায় বসে গর্জে উঠ্‌ল—কালা শয়তান। কিন্তু শয়তান যখন উচ্চতর পদস্থ, অপমান সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। কি করবে ভেবে না পেয়ে চাপরাশিকে হুকুম করলো, আভি যাও, দত্ত সাহেব কো সেলাম দো।

হরিপদ তখন উকীল ঘরে বসে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল, হারামজাদা রবিনসনের ইচ্ছা ছিল এদের ডেটারেণ্ট সাজা হয়, আমি পিল্লাইকে ধরে মামলা তার আদালতে বদলি করে দিলাম নইলে—

এমন সময়ে চাপরাশি এসে বল্‌ল, পুলিশ সাহেব সেলাম দিয়া থা।

হরিপদ মনে মনে ভাবলো, এইবার বুঝি পুলিশ সাহেবের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ বের হয়ে পড়ে, চটে উঠে বল্‌ল, তোর পুলিশ সাহেবকে বল্ গিয়ে আমি তার গোলাম নই, আমরা সব স্বদেশী।

ভাবলো এখন তো উপস্থিত রক্ষা হোক, তারপরে ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

ওদিকে দশখানা ঘোড়ার গাড়ী ভর্তি হয়ে আসামীরা জেলের গেটে এসে নামলো, তারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে ভিতরে ঢুকে পড়লে, দারোগা গাড়োয়ান-দের একজনকে শুধালো, তোমাদের ভাড়া কত দেব হে?

মুরুব্বি গোছের একজন বল্‌ল, আমরা গাড়ীতে করে নিত্যি চোর বাট-পাড় আনি, আজ স্বদেশী বাবুরা সেই গাড়ী চড়ায় পবিত্র হয়্যা গেল। আবার তুমি ভাড়া দিবার চাও কর্তা, তুমি তো বহুৎ বেইমান। চল্ অছিমুদ্দি, চল্ নবীন, কেদার ভুবন ভাই সব চল্।

গাড়োয়ানের দল বন্দেমাতরম্ হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল। কোর্ট দারোগা বল্‌ল, দেখেছ স্বদেশীর জড় কত দূর নেমেছে?

ছোট দারোগা বল্‌ল, সে আর বলতে, আমার খুকিকে বন্দেমাতরম বলে ভুলিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়।

আমার গিন্নি বলেছিল আমি নাকি মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে বন্দেমাতরম বলে ফুকরে উঠি, আমি বলেছিলাম তখন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিও, ও লক্ষণ ভালো নয়, ও ধ্বনিটার আরম্ভ স্বপ্ন থেকেই হয়।

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাক, টাকা সম্বন্ধে তারা

একমত। গাড়ী পিছু দু টাকা খরচ লিখিয়ে একুনে কুড়ি টাকা দু'জনে ভাগ করে নিল। কোর্ট দারোগার ভাগে পড়লো বারোটাকা যেহেতু স্বপ্নের মধ্যে সে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হেঁকে থাকে।

বেলা বারোটার মধ্যে যজ্ঞেশবাবু মেয়ে ও নাতিদের নিয়ে বাড়ীর গেটে এসে গাড়ী থেকে নামলেন, দোতলার জানলায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল রুক্মিণী। এতটা সে আশা করেনি. ছুটে নেমে এসে ছেলেদের জড়িয়ে ধরলো। মলিনা প্রণাম করলো, বল্‌ল, মাকে প্রণাম কর্।

ওরা এক সঙ্গে বলে উঠল, প্রণাম কেন, জেল তো হয় নি।

মলিনা বল্‌ল, দাদা আসছে। যজ্ঞেশবাবু বাক্যটি পূরণ করে দিলেন, দশদিন পরে। চলো মা, এদের নিয়ে ভিতরে চলো সব বলছি!

১৬

এই দেখো তোমাদের গান্ধী মহারাজের কীর্তি—এই বলে একখানা ইংরাজি কাগজ হাতে ভূপতি প্রবেশ করলো। -

নৃপতি ভূপেশ প্রভৃতি বলে উঠ্‌ল. কি হল আবার?

আবার কি হবে, নূতন কিছু না, যা হবে তা আগেই জানতাম।

তবু শুনি না।

তার আগে বলো চৌরিচোরা নামে গাঁয়ের কথা কি জানচ?

নামটা শুনিনি তবে কি এমন সেখানে হল?

একদল লোক কতকগুলো পুলিশকে থানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। সেই উত্তাপের আগুনে বিগলিত-চিত্ত হয়ে তোমাদের মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন মুলতুবি রেখেছেন। এ না হ'লে আর মহাত্মা!

খবরটা আগে সত্যি কিনা দেখো, এখানা তো ইংরাজের পরিচালিত কাগজ।

বটে! এখন খবর সত্যি কিনা দেখো! ঐ কাগজের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করেই তো তোমরা বলো যে ভারতের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক জেলে গিয়েছে। এখন এ খবরটায় আর বিশ্বাস হচ্ছে না!

বীরেন চৌধুরী (সেই অল বেঙ্গল লোন আফিসের অন্যতম আড্ডাধারী) বল্‌ল, তিনি যা করেছেন বিচার করেই করেছেন।

ওহে বীরেন, দেহটার মতোই গান্ধীর উপরে তোমার বিশ্বাস অটল। আচ্ছা, তাঁর বিচারটাই শোনো। কি "শ্রীম কথিত" বলবো না সংক্ষেপে বলবো।

সংক্ষেপেই হোক।

তবে হে গান্ধী-ভক্তগণ, অবধান করো, তিনি বলছেন এই ঘটনা থেকে বুঝলাম অহিংসার শিক্ষা এখনো আমাদের হয়নি, এ হেন ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলন দাবানলে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় অসহযোগ আন্দোলন মুলতুবি রাখতে বাধ্য হলাম—এখন অহিংসার শিক্ষা অভ্যাস করতে হবে, তার পরে আবার আরম্ভ হবে আন্দোলন।

এ তো অন্যায় কিছু বলেননি, যে-আন্দোলনের ভিত্তি অহিংসা তাকে হিংস্র জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

বাহবা, যেমন গুরু তেমনি চেলা। শোনো বীরেন ভায়া, আমি গোড়া থেকে লক্ষ্য করছি এই লোকটার ভাগ্য ভালো, যত ভুল করছে লোকের ভক্তি তত বাড়ছে তার উপরে। এদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক জেলে পচবে আর তোমার মতো চেলারা হাত-তালি দিয়ে বলবে, অহো মহাত্মার কি সৎসাহস।

তুমিও তো তাঁর চেলা, নইলে জেলে এলে কেন ?

জেলে এসেছি বলে তো মুচলেকা দিইনি যে আমি অহিংসব্রতী। আমার নীতি হচ্ছে—মারি অরি পারি যে কৌশলে।

সেই নীতি যে মানতে রাজি নয়।

তার রাজনীতিতে আসা উচিত নয়।

এমন সময়ে চার-পাঁচজন বেয়ারা প্রাতরাশ নিয়ে প্রবেশ করলো, ট্রের উপরে সাজানো চা, মাখন, পাঁউরুটি, ডিম।

আর সকলকে ডাক।

বাবুরা আসছেন।

দেখতে দেখতে ঘরখানা ভরে গেল, মেঝেতে বিছানো শতরঞ্জের উপরে চায়ের ট্রে ঘিরে জন চল্লিশেক লোক বসলো। তাদের মধ্যে এলো শচীন, সে এ ঘরে ছিল না, প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অনেক সুবিধা, একেবারে রাজবাড়ীর আদর। বাড়ী থেকে অনেকের খাদ্য আসে, চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য পেয়—চতুর্বর্গ আনন্দ।

কিহে শচীন, খবর দেখেছ ?

শচীন সংক্ষেপে বল্ল, হাঁ।

একেবারে চুপসে গেলে যেন, ভক্তিতে ফাটল ধরলো নাকি ?

এ নীতির কথা, ভক্তির কথা নয়।

নীতিটা কি শুনি। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার নিরীহ নর-নারীকে জেলে পুরে দিয়ে মই টেনে নেওয়া—এই তো। এবারে সরকারের হাড়ে বাতাস লাগলো, দেখো এখন তারাও মহাত্মা বলতে শুরু করবে।

শচীনকে নিরুত্তর দেখে বীরেন বলতে শুরু করলো—দেখো পরাধীনতার মূল কি—না ভয়। এই ভয় তাড়ানোটাই মহাত্মার মিশন—

বাধা দিয়ে ভূপতি বল্‌ল, আহা কি আমার মিশনারি এলেন।

বাধা দিয়ো না, শোনো, আগে জেলের নাম শুনলে লোকের মুখ শুকিয়ে যেতো, এখন দেখো ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দা, ধনী দরিদ্র অকাতরে জেলে ঢুকলো—এই শিক্ষাটাই আমাদের বাকি ছিল।

শচীন বল্‌ল, মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারা কাজটা নিশ্চয় ভালো নয়।

ওরা যে জালিয়ানওয়ালাবাগে শ চারেক লোককে গুলি করে মারলো।

সে কাজটাও ভালো নয়।

বাস্‌, আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

ভূপতি, তুমি হাড়ে হাড়ে হিংসাবাদী তোমার এ পথে আসাই উচিত হয়নি।

আমি তো গোড়া থেকে বলছি আমি অহিংসা কহিংসা বুঝি না, যে পথে সুবিধা হবে ইংরাজকে ঘায়েল করবো, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

আর যদি কেউ বলে, শঠে অশাঠ্যং সমাচরেৎ, তবে?

তবে তার রাজনীতি ছেড়ে তিলক ফোঁটা কেটে পুজো আচ্চা করা উচিত।

তবে তোমার মতে রাজনীতিক কে?

শ্রীঅরবিন্দ।

তিনি তো রাজনীতি ত্যাগ করেছেন।

তবে Surrender not।

তিনি তো Sir উপাধি গ্রহণ করেছেন।

তারপরে ধরো ফেরোশাস মেটা, নাম শুনলেই হৃৎকম্প হয়।

তিনি তো পোষ মেনেছেন।

লোকমান্য তিলক।

তিনি তো দেহরক্ষা করেছেন।

তবে ধরো দেশবন্ধু।

হাঁ এতক্ষণে একটা নাম করলে বটে, তবে তিনিও তো গান্ধীকে মেনে নিয়েছেন।

দেখো, এর পরে আর মানবেন না। একটা কথা ভেবে দেখো—সরকার

ছোট বড় কত জনকেই তো ধরলো গান্ধীকে ধরছে না কেন ?

ভয় করে বলে।

হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল ভূপতি।

হাসলে যে!

না হেসে কাঁদা উচিত ছিল। তলে তলে ও সরকারের লোক। যখনি কোন আন্দোলন জাঁকিয়ে ওঠে লোকটা এসে ধামা চাপা দেয়। এবারে পেয়েছে এই লোক পোড়ানোর উপলক্ষ।

এরপরে হয়তো বলবে এই উপলক্ষটাও গান্ধীর সৃষ্ট।

শুনলে আশ্চর্য হ'ব না।

বাস্! এরপরে আর তর্ক চলে না।

হাঁ, তর্ক চালানো আর তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তবে আমার একটা কথা জেনে রাখো, এই লোকটার কপালে কষ্ট আছে। কোন দিন গুলি খেয়ে নয় লাঠি খেয়ে মরবে, মানুষকে এত কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনো সুখের হ'তে পারে না।

এই রকম তর্ক হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো। এমন সময়ে অরবিন্দ এসে শচীনকে প্রণাম করে বসলো। প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের অবারিত দ্বার।

অরবিন্দকে নিয়ে নিভৃত স্থানে এসে বসলো শচীন, বলো খবর কি? বাড়ীতে গিয়েছিলে না সোজা এখানে।

আজ্ঞে, বাড়ীতে গিয়ে খবর পেলাম যে আপনারা এখানে।

কেন, গাঁয়ে খবর পাওনি ?

আমাদের গাঁয়ে খবরের কাগজ যায় না।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শচীন বল্‌ল, বেশ সুখে আছ ভাই, সব অশান্তির সূত্রপাত খবরের কাগজ থেকে। যাক, আগে তোমার মায়ের খবর শুনি, কেমন আছেন ?

ভালই আছেন. আমি যে আসবো অন্ততঃ এতশীঘ্র আসবো তিনি আশা করেন নি, ভাবলেন অন্যবার যেমন এসেই জানাই যে মা পরশু যাবো, কিম্বা কালকে যাবো সেই ধরনের আশা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু যখন জানলেন যে দলের কাজে আর যাবো না তখন তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লেন বাবা তাহ'লে এবারে একটি বিয়ে করো।

বললাম, মা আগে তোমাকে কি খাওয়াবো স্থির করে নিই।

তিনি বললেন, কেন বাবা আমি কি না খেয়ে আছি।

নইমুদ্দি ঠিক মতো ধান পৌঁছে দিত ?

কি আর বলবো বাবা, নইমুদ্দি আমার আগের জন্মে ছেলে ছিল। এমন যত্ন এমন খোঁজখবর নেওয়া পাড়ার লোকেও করতো না।

বললাম, তুমি ভাগ্যবতী মা, তোমার এ জন্মের ছেলে তোমাকে ফেলে চলে গেল, আর গত জন্মের ছেলে এসে ভার নিল। ক্ষেতের ধান মাথায় বয়ে দিয়ে যায়।

শুধু বয়ে দিয়ে যায়! ধান ভানিয়ে চাল নিয়ে আসে, এক ছটাক এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। ধান বেচে থান কাপড় আনে, তেল নুন লঙ্কা ঘি ডাল যা দরকার নিয়ে আসে। আমি বলি, বাবা এ সমস্ত কি ধান বেচে হ'ল না নিজের ঘর থেকে দিচ্ছিস। হেসে বলে, মা, তোমার ধান আলাদা মরাইয়ে থাকে, এখনো যা আছে আরও এক বছর চলবে। বলে, কি জানি বাবা আমি তো কিছু বুঝি না, নিজের ছেলে তো দেখে না—বাধা দিয়ে বলে, ও কথা বলো না মা, দাদাভাই গিয়েছে আরেক মায়ের সেবা করতে—

বাধা দিয়ে মাকে বলি, ঐ মুখ্যু মানুষটা কি এত বোঝে!

বাবা, মাকে বুঝতে পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না, শিশুতেও বোঝে, বুড়োতেও বোঝে, ঐ মুখ্খু নইমুদ্দিও বোঝে, নইলে এত করবে কেন।

এবারে শচীনের উদ্দেশে বলে, দাদা শহরে এসে হিন্দু মুসলমানের একরূপ দেখি, গাঁয়ে দেখি আর একরূপ, কোনটা সত্য ?

অরবিন্দ, কোনটা সত্য জানি না, তবে গাঁয়ের রূপটাই কাম্য।

এমন সময়ে নইমুদ্দি এসে উপস্থিত, আমাকে দেখে এক গাল হেসে বল্‌ল, দাদাভাই আবার কবে যাবে ?

মা বল্‌ল, ওকি কথা রে।

মা ঠাকরুন, রাগ করো কেন, ভাবলাম আগে ভাগে শুনে নিয়ে মনটা তৈরি করে রাখি।

আমি বল্‌লাম, নারে নইমুদ্দি, আমি আর যাচ্ছি না।

সেকি, তোমাদের দল ভেঙে গেল নাকি!

দল ভাঙেনি তবে আমাদের ছুটি দিয়েছে ?

একি ইস্কুল না চাকরি যে ছুটি।

তা নয় রে, দলের মুরুব্বি বলেছে যে তোমরা গান্ধীজির সঙ্গে গিয়ে কাজ করো।

তা গান্ধীবাবুর নাম তো শুনতে পাচ্ছি। তাঁর কাজ আবার কি রকম?

সে আর এক সময়ে বোঝাবো। মা যে তোর খুব প্রশংসা করছিলেন, বলছিলেন, আর জন্মে তুই তাঁর ছেলে ছিলি।

হেসে বল্ল, এ জন্মের ছেলে এসেছে, আর কি আর জন্মের ছেলেকে মনে ধরবে। আরে দাদাবাবু, মা ঠাগরেনের কথা শোনো কেন। যার ধান তাকে এনে দিয়েছি এর মধ্যে প্রশংসার কি আছে।

সবাই কি দিত?

না, চুরি করতো।

তবে?

তবে শোনো দাদাবাবু, এই বলে সে উবু হয়ে বসলো, চুরি করাটা দোষের তাই বলে কি চুরি না করলেই প্রশংসা করতে হবে!

শচীন বলল, বিয়ের কথা কতদূর এগোলো?

বেশি দূর নয়। মা বল্লেন, গান্ধীবাজ তো বিয়ের হুকুম দেবেন?

বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই।

তবে আর কি। বলিস তো মেয়ে দেখি।

তোমার মা ঐটি করো না। মেয়ে দেখার ভার না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দাও।

তুই শহরে মানুষ, শহরের মেয়ে এসে কি এই পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে?

না পারে তোমাকে শহরে নিয়ে যাবো।

সে যা হয় করিস, চল এখন খাব চল।

শচীন বল্ল, তোমার খাওয়ার বর্ণনা না হয় পরে শুনবো, এখন আমাদের বাড়ীর খবর বলো—কখন পৌছেছ?

সকাল বেলায়।

তবে এত বেলায় এখানে এলে?

লব-কুশ পাকড়াও করেছিল, তাদের বীরত্ব কাহিনী শোনাবার জন্যে।

কঠিন হাতে পড়েছিলে।

কঠিন বলে কঠিন, এখন বুঝতে পারছি কেন স্বয়ং রামচন্দ্র লব-কুশের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

কি বলে ওরা?

দু'জনেই নিজ নিজ বীরত্বের কাহিনী বলে, একজন আরেকজনকে থামিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে।

আমরা ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করলাম।

লডাইএর চিহ্ন তো দেখছি না রে।

এই যে আমার মাথা ফেটে গিয়েছে—

এই যে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে—

মাথায় কাটার চিহ্ণ কোথায়, আর তোর হাত তো বেশ আস্ত দেখছি। মারলো কে?

কেউ নয়।

তবে কাটলো, ভাঙলো কি ক'রে?

তা জানো না বুঝি, একজন ভলান্টিয়ার এসে মাথায় খানিকটা লাল রঙ ঘষে দিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল, পুলিশে এর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

আর আমার হাতটা ন্যাকড়া দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে বল্‌ল, ঐ দেখো ওর হাতটা ভেঙে দিয়েছে।

আমরা বললাম, এসব তো মিছামিছি, ওরা ধমক দিয়ে বল্‌ল, চুপ কর্‌, স্বদেশী লড়াই-এ এমন হয়ে থাকে।

বল্‌লাম, যা এখন তো সেরে গিয়েছে।

শচীন শুধালো, বাবাকে কেমন দেখলে?

দাদা, রায়মশায়ের শরীরটা যেন ভাঙতে সুরু করেছে।

সেটা আমি লক্ষ্য করেছি, প্রায় প্রত্যেকদিন দেখা হয়, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি অনেক দিন পরে দেখলে কিনা।

হাঁ, এই ক'দিনের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আর কাকে কেমন দেখলে?

নটুদি শক্ত মেয়ে, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই।

আর মলিনা?

তাঁর পরিবর্তনটাই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করলাম, কেমন যেন চুপ মেরে গিয়েছেন। আগে দেখা হ'লেই টেনে নিয়ে গল্প করতেন, কত হাসি-তামাশার কথা হ'তো, এবারে দেখলাম সে মানুষ নেই, আমাকে কেমন যেন এড়িয়ে চলেন, হুঁ হাঁ বলে উত্তর দেন। বললাম, আমি তো কোন অপরাধ করিনি। তিনি বললেন, না, না, আপনি অপরাধ করবেন কেন? বললাম, আপনার ভাব দেখে সেই রকম মনে হচ্ছে। না ও কিছু না, বলে চলে গেলেন।

শচীন সমস্তই বুঝলো। বল্‌ল, ও ঐ রকম, কিছু মনে করো না।

এমন সময়ে জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সহকারীকে নিয়ে এসে হাজির হল, এটা

তাদের আসবার সময় নয়।

জেল সুপার বলল, শচীনবাবু, আজ বিশেষ প্রয়োজনে অসময়ে এলাম।

কেন স্যার ?

আপনাদের খালাস পাবার দিন আগামী কালকে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম আজ দুটোর সময়ে আপনারা খালাস পাবেন।

বিস্মিত শচীন বলল, হঠাৎ।

কেমন করে বলব, বড় কর্তার মর্জি। আপনারা তৈরি হয়ে নিন।

তৈরি আর কি হব। কিন্তু এই সময় পরিবর্তনের কারণটা বুঝতে পারছি না।

এবারে জেল সুপার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে (যেন সেটা বেসরকারী উক্তি) বলল, আসল কথা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে আপনাদের ছুটি দিলে জেল গেটে সকলে মিলে হই-হাঙ্গামা করবে আর রবিনসন তো লাঠি তুলেই আছে—তাই এই ব্যবস্থা।

অশেষ ধন্যবাদ স্যার।

সকলে জেল থেকে বের হয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। একখানা ঠিকে গাড়ী করে রওনা হ'ল শচীন ও অরবিন্দ।

অরবিন্দ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, তোমার বিয়ে করা তো ঠিক ?

হাঁ একরকম, মায়ের আদেশে আবার গান্ধীজিকে বিয়ে করা উচিত কিনা প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, অহিংসার সঙ্গে বিয়ের বিবাদ নেই !

তবে আর দেরী করছ কেন ?

মনের মধ্যে একটা খটকা বেধেছিল, তারই মীমাংসা চেয়ে গান্ধীজিকে চিঠি দিয়েছি, তাঁর উত্তরের উপরে সব নির্ভর করছে।

তিনি কি তোমার চিঠির উত্তর দেবেন ?

দেবেন বলেই জানিয়েছিলেন। তা আসুক তাঁর চিঠি।

শচীন ধরে নিয়েছিল জলপাইগুড়ির পাত্রটি মলিনাকে বিয়ে করতে সম্মতি জানিয়ে পত্র দেবে। আবার অরবিন্দর মন যে মলিনার উপর পড়েছিল একথাও শুনেছিল স্ত্রীর মুখে। অরবিন্দকে আশাভঙ্গের দুঃখ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই বিয়ের কথা তুলেছিল, বিয়েটা হয়ে গেলে অন্ততঃ কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে মলিনাকে না পাওয়ার দুঃখ এতটা বাজবে না। কিন্তু ঐ গান্ধীর পত্রটা আবার কি। ভাবলো নিশ্চয় বিয়ে সম্বন্ধে নয়, ভারত জুড়ে যিনি আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিবিশেষের বিয়ের পরামর্শ দেবেন তিনি। এমন অসম্ভব চিন্তা এক

মুহূর্তের জন্যেও মনে এসেছিল ভেবে শচীন মনে মনে হাসলো।

বেলা আড়াইটে নাগাদ গাড়ীখানা বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই—কে এলো, বলে সবাই ছুটে এল, সর্বাগ্রে লব কুশ আর মলিনা, বারান্দায় যজ্ঞেশবাবু ও শৈলেন খুড়ো, জানালার কাছে রুক্মিণী।

১৭

কি ভাবে কথাটা জানাজানি হ'ল অর্থাৎ অরবিন্দর কানে গিয়ে পৌঁছলো নিশ্চয় ক'রে কেউ জানে না, হয়তো লব কুশ বলে থাকবে যে দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন পিসিমাকে দেখতে. কিম্বা বুড়ো মানুষ শৈলেন খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে কথাটা পেড়ে থাকবে অরবিন্দর কাছে, শেষেরটারই সম্ভাবনা বেশি। বাড়ীর সকলে নিজেদের মধ্যে স্থির করেছিল ব্যাপারটা জানানো হবে না তাকে। যদি ওখানেই বিয়ে স্থির হয়ে যায় বেচারা মনে দুঃখ পাবে, আর যদি ওখানে স্থির না হয় অগতির গতি হিসাবে অরবিন্দর কাছে প্রস্তাব করলে, কি রকম তার মনোভাব হবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানা হয়নি শৈলেন খুড়োকে. বুড়ো মানুষটাকে সব কথা বলতে সংকোচ হয়েছিল। আর লবকুশকে এসব কথা বলবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি।

অরবিন্দ যে টের পেয়েছে জানতে পারা গেল যখন শচীন ও অরবিন্দ খেতে বসেছে, যজ্ঞেশবাবু ও শৈলেনখুড়ো আগে খেয়ে নেন। পরিবেশন করছিল রুক্মিণী আর মলিনা। মলিনা অরবিন্দর পাতে তিতোর সুক্তুনি দিতেই অরবিন্দ বলে উঠল, বউদি আজ যাঁর সন্দেশ পরিবেশনের কথা তাঁকে দিতে দিয়েছেন তিতোর সুক্তুনি—এ আপনার অন্যায়।

মলিনা তাড়াতাড়ি পরিবেশন সেরে রান্নাঘরে এসে গুম হয়ে বসে রইলো।

রুক্মিণী রান্নাঘরে ঢুকে বলল, মলি. তুমি ডাল নিয়ে যাও। আমি মাছ নিয়ে আসছি।

মলিনা অপ্রসন্ন মুখে বলল, আজ আমি আর পরিবেশন করতে পারবো না।

কেন, কি হ'ল?

অরবিন্দবাবু লোক ভালো নন।

কবে থেকে বুঝলে, এতদিন তো তার প্রশংসা ছাড়া শুনিনি, হঠাৎ কি হ'ল?

তাঁর মুখের বাঁধন নেই, যা তা বলেন।

তা অন্যায়টা কি বলেছেন।

ন্যায়-অন্যায়ের কথা হচ্ছে না। এলেন অতিথি হয়ে এখন দেখছি, কায়েমী

হয়ে উঠলেন। ওঁর কি বাড়ী ঘর নেই?

অবশ্যই আছে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো তো উনি গেলে কি তুমি খুশি হও?

আমার হাত সকড়ি, বুকে হাত দিতে পারবো না।

আচ্ছা আমি না হয় অন্য সব পরিবেশন করছি, তবে জলপাইয়ের চাটনিটা তোমাকে দিতে হবে ভাই।

ঐ হতভাগা ফলের চাটনি করতে কে বলেছিল তোমাকে?

ওটা হতভাগা হ'ল কবে থেকে, এতদিন তো যেচে নিয়ে খেতে।

যাও তোমার সঙ্গে পারি না, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুক্মিণী একাই পরিবেশন করলো, বল্‌ল, মলিনার হঠাৎ মাথা ধরেছে।

ঠিক জানেন মাথা ধরেছে, আমার কেমন যেন বিশ্বাস, সন্দেশগুলো বসে বসে শেষ করছেন।

অতঃপর আর কারো সন্দেহ রইলো না যে কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে, মলিনার মনোভাব তো বুঝতে পারা গেল, না জানি অরবিন্দর কি মনোভাব।

নিভৃতে স্বামীকে পেয়ে রুক্মিণী বল্‌ল, দেখো আমার বড় ভয় করছে, মলি যে একগুঁয়ে মেয়ে যদি বেঁকে বসে।

কোন দিকে বাঁকে।

ধরো যদি জলপাইগুড়ির দিকেই বাঁকে।

বিয়ে হয়ে যাবে। অরবিন্দকে তো স্পষ্ট করে আমরা কিছু বলিনি।

আর যদি ধরো অরবিন্দর দিকেই বাঁকে।

কোন একটা ছুতো দেখিয়ে জলপাইগুড়ির প্রস্তাব অস্বীকার করলেই হবে।

কি ছুতো দেখাবে?

বলবো কুষ্টিতে মিল্‌ল না।

ওরা যদি বলে আমরা কুষ্টি মানিনে।

আমরা মানি।

শেষ পর্যন্ত আবার অরবিন্দ না বেঁকে বসে।

সে ভার তোমার উপরে।

আমি কি করবো।

বাঁকাকে সোজা করবে, যেমন ভাবে আমাকে সোজা করেছ।

আহা কথার কি ছিরি।

আচ্ছা, জলপাইগুড়ির কি পছন্দ হবে?

পছন্দ না হোক এই তো তোমার কামনা।

পছন্দ হোক অপছন্দ হোক জানাবে তো, অনেক দিন যে হয়ে গেল।

বাজার যাচাই করে দেখছে, হয়তো হাতে আরও মেয়ে আছে।

বাজার যাচাই করতে বড় সুখ—না?

কেমন করে বুঝবো, সে সুযোগ তো পেলাম না।

সত্যি কথা বলবো?

এখন আর সত্য কথায় কি লাভ?

সত্যটাই লাভ।

শুষ্ক মুখে রুক্মিণী বল্ল—বলো, শুনে নিই।

দেশের সমস্ত বাজার খুঁজে এলেও এমন রত্নটি পেতাম না।

পরিহাসছলে কথিত হ'লেও সত্যের অনুরোধেই স্বীকার করতে হয় রুক্মিণী অসামান্য সুন্দরী। নারীর প্রকৃত দর্পণ পুরুষের চোখ।

মলিনা এরকম দ্বন্দ্বে কখনো পড়েনি। এক সময়ে তার জীবনে কেউ ছিল না, তখন কৈশোর পার হ'লেও কৈশোর তার পরওয়ানা জারি করেনি, তখন বেশ ছিল। তারপরে ছায়ার মতো এগিয়ে এলো রমণী, ছায়া ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল, তবে ক্রমে চিন্তার কারণ ঘটতে সুরু করলো। ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করছে। তারপরে একদিন অকস্মাৎ কায়ার বিলুপ্তি ঘটে গেল। যে দুঃখ প্রকাশের যোগ্য নয় তা সহন করা দুঃসাধ্য, যে দুঃখের শবে কাঁধ দিতে আর কাউকে ডাকা যায় না তা বহন করা দুষ্কর—তবু সহন করতে হ'ল, তবু বহন করতে হ'ল। বেশ চলছিল। এমন সময়ে আবার একটি উপচ্ছায়া ক্রমে ছায়ায় পরিণত হ'তে চলল, ছায়া হয়ে উঠ্ল কায়া, সেই কায়াবান অরবিন্দ।

অরবিন্দকে সে আমল দিয়েছিল এই ভেবে যে রমণী ও অরবিন্দ দুজনেই বিপ্লবী দলের লোক, রমণীর গোয়েন্দা অপবাদ মুহূর্তের জন্যও সে বিশ্বাস করেনি, অরবিন্দকে সে গ্রহণ করেছিল রমণীর প্রতিভু ভেবে। কিন্তু সংসার বড় নিষ্ঠুর বিচারক। শূন্য সিংহাসনের পাশে দীর্ঘকাল কাউকে বসিয়ে রাখলে একদিন কখন তাকে সিংহাসনে চাপিয়ে দেয়—যে বসতে সম্মতি দিয়েছিল জানতেও পারে না, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে প্রতিভূ হয়ে উঠেছে ভূস্বামী। কতকটা এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত সে অরবিন্দকে গ্রহণ করেছিল। এই সব

ভাঙা-চোরা, অদল-বদলের ইতিহাস কতকটা জানতো তার বউদি।

কিন্তু হঠাৎ একি বিপর্যয়, পত্রাপত্রিতে এলো জলপাইগুড়ির অম্লান সান্যাল। পছন্দ তারা নিশ্চয় করবে এটাই ছিল তার মনে ভয়। অথচ এদিকে দাদা বউদি জেনেছেন অরবিন্দর কথা, হয়তো বা তাদের সূত্রে বাবাও জেনে থাকবেন। তবে আবার ওঁকে ডাকা কেন? তখন মনে পড়লো ঠিক ডাকাও যে হয়েছে এমন নয়, কথাবার্তা চলতে চলতে তারা জোর করে এসে দেখে গেলেন। ঘটনাক্রম মনে থাকলে এমন ভাবতে পারতো না মলিনা, কারণ আগবাড়িয়ে শৈলেন খুড়ো গিয়েছিলেন পাত্রপক্ষের বাড়ীতে। এখন একমাত্র ভরসা কোন কারণে তারা যদি পিছিয়ে যায়। কিন্তু তার আগে অরবিন্দর কাছে সে বের হবে কি করে, কথা বলতে যাবে কোন্ মুখে। আর ভদ্রলোকের মুখের আড় নেই, আজ পরিবেশনের সময়ে ভদ্রলোক যে কাণ্ডটি করলেন। মলিনা ভাবে, মানুষ এত অসহায় কেন।

পরদিন সেই বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-আতঙ্কিত পত্রখানি এসে পৌঁছলো। তখন বাইরের ঘরে কেউ ছিল না, যজ্ঞেশবাবু ও শচীন দুজনেই বাইরে। রুক্মিণী ও মলিনা ডাকের সময়ে একবার করে দেখে যায় চিঠিপত্র এলো কিনা। আজ নিত্যকার সময়ে বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলো টেবিলের উপরে যজ্ঞেশবাবুর নামে একখানি খামের চিঠি—হস্তাক্ষর অপরিচিত। চিঠিখানি দেখবামাত্র দুজনে পরস্পরের দিকে তাকালো, সে তাকানোর একটিং অর্থ—এই সেই চিঠি। রুক্মিণী চিঠিখানা নিয়ে ডাকঘরের মোহর পড়তে চেষ্টা করলো, ডাকঘরের ছাপে সব অক্ষর না ওঠাই রীতি, তবু যে কয়টি অক্ষরের পাঠোদ্ধার করা গেল জলপাইগুড়ি বোঝবার পক্ষে তা যথেষ্টরও বেশি।

মলিনা বলল, বউদি, তুমি না থাকলে আমি চিঠিখানা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতাম।

সরাসরি তা পারতে না।

তার মানে?

সযত্নে খুলে পড়তে তারপরে আবার সযত্নে জুড়ে রেখে দিতে।

পড়লামই যদি তবে না পোড়াবো কেন?

ঠিক বলবো?

হাঁ, ঠিক বলো।

রাগ করবে না তো?

তোমার হয়েছে ভাই "হেড আই উইন, টেল ইউ লুজ" অবস্থা।

আবার জিজ্ঞাসা করছি তার মানে ?

আবার জিজ্ঞাসা করছি রাগ করবে না তো ?

তোমার কথায় কবে রাগ করেছি ?

এবারে করবে।

দেখা যাক বলো।

ওরা যদি হাঁ বলে তবে অম্লান যদি না বলে অরবিন্দ, কোন দিকেই ঠকবে না।

এবারে রাগ করলাম বউদি।

দেখি, বলে মলিনার মুখখানি আলোর দিকে সরিয়ে নিরীক্ষণ করে বল্‌ল, মনে হচ্ছে সত্যি রাগ করেছ, চোখের কোণে দুটো মুক্তোর আভাস।

মুক্তো দুটি এবারে গড়িয়ে গাল বরাবর এসে চিবুকের খুব কাছে মিলিত হয়ে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে ঝরে পড়ে গেল। ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ির মতো মলিনার মুখখানি নিটোল সুডোল, রঙেও তারি আভা।

বউদি, আমি কি পাশাখেলার পণ ?

ভাই, দ্রৌপদীও তো একবার পাশার পণে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তুমি কি তার চেয়ে বড ?

মলিনা রাগের মাথায় যা বল্‌ল, তার অত্যন্ত কদর্থ হ'লে হ'তে পারতো—হাঁ আর দুজন জুটলেই দ্রৌপদীর উপমাটা সার্থক হয়।

ছিঃ ভাই।

শোনো বউদি, হয় আমি অরবিন্দবাবুকে বিয়ে করবো নয় আদৌ বিয়ে করবো না—এই আমার শেষ কথা তুমি জেনে রাখলে—বলে বিদ্যুৎভরা মেঘের মতো সবেগে প্রস্থান করলো।

বাইরে চেনা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রুক্মিণী অন্তঃপুরের দিকে গেল।

যজ্ঞেশবাবু ও শচীন ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি কোচে বসে বল্‌লেন, দেখো তো শচীন টেবিলের উপরে চিঠিখানা কার ?

আপনার নামে চিঠি।

আমাকে আবার কে লিখলো, দেখো তো জলপাইগুড়ির নয়তো।

জলপাইগুড়ির বলেই মনে হচ্ছে।

খুলে পড়ো।

শচীন খাম খুলে চিঠি পড়তে সুরু করলো।

শচীন অনেকক্ষণ কথা বলে না দেখে শুধালেন, এত কি লিখেছে, লম্বা চিঠি?

হাঁ, অনেক কথা লিখেছে; আপনাকে সংক্ষেপে বলছি। লিখেছে মেয়ে অপছন্দ নয়, তবে আমাদের পরিবারে বিবাহে তাদের আপত্তি আছে।

কেন আমরা জেল খাটা বলে?

না তার চেয়েও বেশি। আমাদের জেলখাটার উল্লেখ করে লিখেছে যে "ভাববেন না আপনারা জেলখাটা স্বদেশী বলে আমাদের আপত্তি। এখন এদেশে বল্লাল সেন রাজা হ'লে এই দেশ খাটিয়েদেরই কুলীন পদবী দিত।

বেশ মুন্সীয়ানা করে লিখেছে দেখছি।

হাঁ অনেক মুন্সীয়ানা করে চিঠিখানা লিখতে হয়েছে পাছে আমরা মনে কষ্ট পাই।

এখানে বিয়ে করবে না তার আর এমন কি কষ্ট, আমার মেয়ের কি আর বিয়ে হবে না।

না বাবা ব্যাপারটা খুব জটিল আর তাদের পক্ষে মর্মান্তিক।

খুব তাড়াতাড়ি বলো বাপু, তুমি আর রহস্য বাড়িও না।

"পাত্রের পিতার নাম অনিমেষ সান্যাল, তিনি ছিলেন, কলকাতার নর্থ ডি. সি. তিনি ১৯১২ সালে ১২ই জুলাই দুপুর বেলায় লালদীঘিতে এক সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হন।" এ অংশ তাঁদের লেখা, এবারে কিছু বুঝতে পারছ বাবা?

সুশীলের সেই ব্যাপারটা মনে হচ্ছে। তা এত কাল পরে এ কথা তারা জানলেন কি ক'রে?

না, জানবার কথা নয়। কারণ জেল হাজতে সুশীলের আত্মহত্যার ঘটনাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ আদ্যন্ত সমস্ত চেপে গিয়েছিল, তারা জানতো সুশীলের মুরুব্বি সুরেন বাঁড়ুজ্জে। নিহতের নাম আসামীর নাম সমস্ত বেমালুম চাপা পড়ে গেল—স্পেশাল ব্রাঞ্চের অসাধ্য কিছু নেই।

শচীন, এমন ক্ষেত্রে তাদের বা আমাদের কারো অগ্রসর হওয়া উচিত নয় বুঝতে পারছি কিন্তু বুঝতে পারছি না এতদিন পরে তাঁরা কি ভাবে আসামী সনাক্ত করলেন?

অম্লানবাবুদের যে ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল সুশীলের বড় ছবিটা সেই ঘরে আছে। রাতের বেলায় কারো চোখে পড়েনি, ভোরবেলায় বের হওয়ার সময়ে ছবিখানা দেখে অম্লানবাবু চমকে উঠলেন, আমার ছোট ভাইয়ের ছবি জেনে সে কোথায় কি করছে অত্যন্ত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি মনে

করেছিলাম শুধু কৌতূহল মাত্র।

কিন্তু সুশীলকে তো তিনি দেখেন নি, তার ছবিও বের হয় নি কোন কাগজে।

দেখেননি সত্য, তবে সুশীলের ছবি কোন কাগজে বের হয় নি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। একখানা ইংরাজি কাগজে বের হয়েছিল, জানবামাত্র স্পেশাল ব্রাঞ্চের হুকুমে সব বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, তারই এক কপি অম্লানবাবুদের চোখে পড়ে থাকবে। তাছাড়া তো অন্য কোন সূত্র দেখি না।

শচীন, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম সরকার কেন অম্লানকে বিলাতে পড়তে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিল, আর কেনই বা প্রত্যাখ্যান করেছিল সে আর কেনই বা ফিরে এসে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেনি।

ঠিক করেনি, বাবা?

হাঁ ঠিক করেছিল বই কি। যে সরকার তার চাকুরেদের রক্ষা করতে পারে না। তাদের হত্যাকারীদের দণ্ড দিতে পারে না তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না ওরা। আদর্শ পুত্র, তবে দুঃখ এই যে এমন ছেলে আমার ঘরে আনতে পারলাম না।

বাবা, তোমার পুত্র সুশীলও কম আদর্শ নয়।

আদর্শ বইকি। সংসারের দাঁড়ি পাল্লায় যখন দুইদিকে সমান ভারি হয় তখনই দেখা দেয় সমস্যা। নইলে সমস্যা আর কি।

শচীন বলল, আরও আদর্শ এদের ভদ্রতা-জ্ঞান, নিতান্ত যেটুকু না বললে নয় সেইটুকু মাত্র বলেছেন, এমন কি সুশীলের নামটি অবধি উচ্চারণ করেন নি। তুমি ওদের ধন্যবাদ দিয়ে একখানা চিঠি দাও, সুশীলের নামটা যে ওঁরা জেনেছেন তা যেন প্রকাশ না পায়। আর দেখো, জলপাইগুড়ি যে না বলেছে এ কথাটা বউমাকে জানিও, কি ভাবে বলবে, কতটুকু বলবে তুমি জানো। আমি ভাবছি মলিনার মনের উপরে না জানি কি প্রতিক্রিয়া হবে।

শচীন মনে মনে ভাবলো, বুড়োরা যৌবনের কিছুই জানে না। শচীন ভুলে গিয়েছিল যে যৌবনটা অতিক্রম করে তবেই বুড়োরা বার্ধক্যে পৌঁছয়।

শচীন অন্তঃপুরের দিকে চলল।

অন্দরে গিয়ে রুক্মিণীকে সব কথা বলল, জলপাইগুড়ি রাজি হয়নি। শুনে সে খুশি হয়েছিল। বলল, মলিনা তো তাই চায়, ওখানে বিয়েতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তারপরে যখন অসম্মতির কারণ শুনলো, বলল, অদৃষ্টের কি লীলা,

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

শচীন বল্‌ল, তারা জেনে শুনে কেমন ক'রে পিতৃহন্তার পরিবারে বিয়ে করে।

তা বটে।

তুমি মলিনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলো!

বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে মনে হয় না। তার মন যে অন্যত্র পড়ে আছে সে কথা তোমার অজানা নয়। তবে অসম্মতির কারণটা শুনলে নিশ্চয় দুঃখ পাবে।

দুঃখ পাওয়ার কারণ তো নেই—এ তার দোষ নয়, আবার তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তবে দেখো জলপাইগুড়ির অসম্মতির কারণটা অরবিন্দর কানে না ওঠে।

সুশীলের ব্যাপার অরবিন্দ জেনেছে।

তা জানুক, কিন্তু জলপাইগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগটা না জানলেই হ'ল।

সে কথা মনে রাখবো।

মলিনাকে সব কথা খুলে বলল রুক্মিণী, কিছুই হাতে রাখলো না।

তুমি তো চাইছিলে ওরা রাজি না হয়।

মলিনা বল্‌ল, নিশ্চয় চাইছিলাম, কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা যে এই কারণে ঘটবে কে জানতো।

এ ছাড়া আর কি করতে পারতো তারা!

মলিনা নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো, এখন অরবিন্দর সঙ্গে তার বিবাহে আর কোন বাধা থাকলো না, কিন্তু যতটা আনন্দ হবে ভেবেছিল তা হ'ল কোথায়! তবে কি নিজের অগোচরে অম্লানের প্রতি উন্মুখ হয়েছিল, না অরবিন্দকে যতটা ভালোবাসে মনে করেছিল তার মধ্যে কোথাও গলদ আছে। কিছুই ঠিক করতে না পেরে একবার এদিক ওদিক চিন্তা করে। মায়েরা যেমন নিজের সদ্যোজাত শিশুকে নানাভাবে ঘুরিয়ে উপলব্ধি করতে চায় সেই রকম বুঝি তার মনের অবস্থা।

এই ঘটনার টানে আজ বিশেষ করে তার মনে পড়ে গেল সুশীলের কথা। মনে হ'ল সে বেঁচে থাকলে তার বয়স ত্রিশের উপরে হতো, তার চেয়ে অনেক কম বছরের বড় ছিল ছোটদা। এতদিনে সে বিয়ে করতো, ঘরে বউদি হয়ে আসতো রাধা, রাধা তার প্রায় সমবয়সী, সে বেশ হতো ভেবে দীর্ঘ নিশ্বাস

পড়লো। ছোটদা এতদিনে হয় দাদার মতো অধ্যাপক হ'তো, নয় উকীল হ'তো বাবার মতো, মাও হয়তো অকালে মারা যেতো না। অরবিন্দ তার মনের উপরে ছায়া ফেলতে আসতো না, তাদের সংসারের আদলটাই অন্য রকম হ'তো। কিন্তু রমণী···মনে হ'ল তার মতো সামান্য একটি প্রাণীকে নিয়ে অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুর ফাঁস এঁটে দিয়েছে। এখানেই তার নিষ্ঠুরতার শেষ না আরও কিছু আছে। একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়লো। বউদি ভেবে উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখ্‌ল সম্মুখে রাধার মা।

মাসিমা আসুন, হঠাৎ এই ভর সন্ধ্যাবেলায়—

একটু গা-আঁধারি না হ'লে পথে বের হ'তে পারি না, হতভাগীরা দেখে হাসে।

তা আমাদের খবর দিলেই যেতাম।

তোমরাই তো মা যাচ্ছ, আর কেউ তো ও-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় না। তা বউমা কই ?

আপনি বসুন, আমি ডেকে আনি।

থাক, তোমার সঙ্গেই কথা বলি, পরে তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো। দেখো, এখন তো শুনছি গান্ধী রাজা হ'ল দেশের, তার হুকুমে আগের খুনখারাপি সব বন্ধ। এখন আর সুশীলকে লুকিয়ে রাখবার দরকার কি ?

মাসিমা, সুশীল তো অনেক দিন হ'ল—

বাধা দিয়ে বল্‌ল, তাইতো বলছি, অনেক দিন তো হয়ে গেল আর এখন লুকিয়ে থাকবে কেন ?

ছোটদা তো মারা গিয়েছেন।

হাঁ মা, ঐ কথাই তো লোককে বলতে হয় নইলে বিশ্বাস করবে কেন ? তাই বলে আমার সঙ্গে ভাঁড়াভাঁড়ি ক'রে কি লাভ !

মলিনা বুঝলো উৎকট উন্মাদের সঙ্গে কথা বলছে, বল্‌ল, আপনি বসুন আমি বউদিকে ডেকে আনি।

রুক্মিণীকে সব কথা বলে ওকে নিয়ে এলো।

রুক্মিণী আসতে বলল, বউমা এসেছ, ভালোই হয়েছে, সুশীলকে এবারে বের করে নিয়ে এসো, তা হ'লেই রাধা ঘরে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবে। এই দেখো চিঠি লিখে জানিয়েছে।

আগ্রহের সঙ্গে ওরা বল্‌ল, রাধা চিঠি লিখেছে, দেখি দেখি—

এই দেখো—বলে আঁচলের খুঁট খুলে বের করলো একখানা মলিন কাগজ।

ওরা মাসির কাছে গিয়ে দেখল, রাধার বাল্যহাতের আঁকজোক আঁকা পুরাতন একখানা কাগজের খণ্ড।

পড়লে!

ওরা বুঝলো উন্মাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, বলল, তাই তো দেখছি।

তবে! বৃদ্ধার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুশীল এলেই রাধা আসবে, তখন আবার আমার বাড়িতে সবাই আসবে, তখন আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে, ভাঁড়ে ভাঁড়ে দই, টিনভরা রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, কিছুই বাদ পড়বে না। আমার কি টাকার অভাব! সব টাকা আমি রাধার নামে জমিয়ে রেখেছি—একটা পয়সাও খরচ করিনি। বউমা সুশীলকে চিঠি লিখে দাও, শীগ্গীর যেন চলে আসে আর লুকিয়ে থাকবার দরকার নেই। দাও রাধার চিঠিখানা দাও,—বলে সেই কাগজের টুকরোখানা চেয়ে নিয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধে বলল, চললাম—

দাঁড়ান একটা আলো দি সঙ্গে।

না, না, আলো নয় আলো নয়, আমাকে দেখতে পেলে হতভাগীরা হাসে। আমার ঘর অন্ধকার, বাইরে অন্ধকার, রাতের অন্ধকার, রাত তো ভগবান আমার মতো অভাগীদের জন্যেই করেছেন, না, না, আলো নয়, আলো নয়—বলতে বলতে সেই উন্মাদিনী নারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী বলল, চলি ভাই লবকুশ ফিরলো কিনা দেখিগে, বাবার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হলো, দেখি সব ঠিক আছে কিনা।

সে প্রস্থান করতে উদ্যত হ'লে মলিনা এক নিশ্বাসে বলে ফেলল—বউদি, অরবিন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বাবাকে বলো।

মলিনার কথা শুনে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রুক্মিণী তার গালে চুমো খেলো—অনুভব করলো তার গালে চোখের জল। রুক্মিণীর চোখ দিয়েও জল পড়তে শুরু করলো। চোখের জল সাথী খোঁজে।

১৮

অরবিন্দ যে আশাতে এই রায়বাড়ীটি আঁকড়ে পড়ে আছে তা সফল হওয়ার তো কোন লক্ষণ দেখতে পায় না সে। সে বুঝেছিল মলিনার মন তার প্রতি বিরূপ নয়। কেমন করে বুঝেছিল জানে না, আকারে ইঙ্গিতেও মলিনা তার প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করেনি, তবু বুঝেছিল যে তার ভুল হয়নি, প্রেমের

ইশারা যে পথে চলে সে পথ রহস্যময়। আর তার নিজের মনের কথা, সেখানে তো এতটুকু ফাঁকি নেই। কিন্তু এভাবে আর কতদিন এখানে বসে থাকা যায়। দেশবন্ধুর আগমনের সময় যজ্ঞেশবাবুর অনুরোধে ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছিল— সে তো আজ অনেক কাল হ'ল—কতকাল শুনতে লজ্জা পায়। সে স্থির করলো আজ সকালেই শচীনের কাছে কথাটা পাড়বে। ইতিমধ্যে হ'ল জলপাইগুড়ির আবির্ভাব, সে ভাবলো ভালই হ'ল—একেবারে চূড়ান্তভাবে চুকে থাক এ বাড়ীর আশা। কিন্তু তারপরে শুনতে পেলো সেখানে বিয়ে হবে না। তখন আর একবার আলোর শিখা জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু ইন্ধনের অভাবে সে শিখাও নির্বাপিতপ্রায়। আজ নিশ্চয় সে বিদায় প্রার্থনা করবে শচীনের কাছে। এমন সময়ে শচীন তাকে ডেকে পাঠালো।

শচীন কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রে বল্‌ল, অরবিন্দ চাকরি করবে ?

অরবিন্দ ভাবল এ বিদায় দানের পূর্বলক্ষণ. ভাবলো ভালই হ'ল, বিদায়টা তাদের দিক থেকেই এলো।

অরবিন্দ বল্‌ল, দাদা, অনেক জায়গায় চাকুরি খুঁজেছি, নামকাটা সেপাই জেনে কেউ রাজি হয় না।

এমন জায়গাও তো থাকতে পারে যেটা নামকাটা সেপাইদের আস্তানা।

অসম্ভব নয় তবে সে রকম স্থান তো জানিনে।

তবে খুলে বলি, আমাদের স্বদেশী কলেজটাতে একজন ইংরাজি অধ্যাপকের পদ অনেক দিন থেকে খালি, নামকাটাদের আস্তানা বলে সুবোধ ব্যক্তিরা আসতে চায় না, তোমার বোধ করি আপত্তি নেই।

দাদা, এ আমার প্রয়োজনে না আপনাদের প্রয়োজনে।

ধরো—দু-ই।

তা যদি হয় তবে এক্ষুনি রাজি।

কবে জয়েন করছ ?

আজ যদি বলেন আজই।

বেশ, আজই জয়েন করে একটা বাসা ঠিক ক'রে সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে গাঁয়ে যাও, আর মাকে নিয়ে এসো।

সেটি হওয়ার জো নেই দাদা।

কেন ?

সেদিন যখন গিয়েছিলাম, মা বললেন, বাবা এবারে বিয়ে করো।

বললাম, তাহলে মা তোমাকে যে শহরে যেতে হবে। চাকুরি তো আমার

গাঁয়ে মিলবে না।

বেশ তো তোরা শহরেই থাকিস, একবার বউমাকে নিয়ে আসিস, আশীর্বাদ করে মুখ দেখবো।

আর তুমি গাঁয়েই থেকে যাবে ?

বাবা, তোদের কাছেই তো থাকতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি কই ?

বাধা কি মা তোমার।

শ্বশুরের ভিটেতে সন্ধ্যাবেলা পিদিম জ্বলবে না আর আমি শহরে ইলেকটিরি আলোয় বসে থাকবো, না বাবা তা পারবো না।

তবে তো আমার বিয়ে করা হ'ল না।

কেন বাবা ?

তুমি থাকবে এক জায়গায়, বউ থাকবে আর এক জায়গায়, এ কেমন সংসার।

বাবা, সংসার তো বউকে নিয়ে।

তাই যদি হবে মা তুমি শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছ কেন ?

আরে খোকা ছেলে, একদিন যে এই বাড়ীতেই বউ হয়ে এসেছিলাম সে কথা কি ভুলতে পারি।

তারপরে শচীনের উদ্দেশে বল্‌ল, এবারে বুঝলেন তো দাদা বাসা করলেও মা আসবেন না।

সে না হয় পরে বোঝা যাবে, আগে বিয়ে তো হোক।

হাসবার চেষ্টা করে অরবিন্দ বল্‌ল, দাদা আমার মতো বাউণ্ডুলেকে মেয়ে দেবে কে ?

কথাটা সত্য নয়। ইতিমধ্যে বীরেন চৌধুরীর (অল বেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডাধারী) কাছ থেকে তার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব এসেছিল। অরবিন্দ বলেছিল আমার মতো দাগী আসামীর ঘরে মেয়ে দেবেন তিনি। তারপরে বীরেন চৌধুরী জেল থেকে বের হয়ে এসে, আবার লোক পাঠালো। এখন তো বীরেনবাবুও দাগী। আর আপনার আপত্তি করা উচিত হবে না। নিজের অস্ত্রে আহত হয়ে অরবিন্দ বল্‌ল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

গতরাত্রে শচীন ও রুক্মিণীর মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়, আলোচনার কারণ মলিনার ঐ উক্তি "বাবাকে এবার অরবিন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলো।"

শচীন বলেছিল, বিয়ে তো করবে, চাকরি কোথায় ?

কেন চাকরি তো তোমাদের হাতেই আছে। চাকরি পেলে একটা বাসা

করতে বলো। তারপর মাকে নিয়ে আসুক, ক্রমে বিয়ের কথা উঠবে।

শচীন বলল, বিধাতা পুরুষকে বুদ্ধি দেননি, সেইজন্য বুদ্ধিমতী স্ত্রী দিয়াছেন।

আচ্ছা মশাই হয়েছে।

দশটার সময় স্কুল কলেজে যাইয়েদের পরিবেশনের ভার বরাবর মলিনার উপরে।

রুক্মিণী বলল, ঠাকুরঝি, যাও আজ একখানা নূতন মুখ দেখতে পাবে।

অরবিন্দর চাকুরির কথা কিছুই জানতো না, বলল, তা যা বলেছ আমাদের বাড়ীটা হোটেলখানা, কে আসছে কে যাচ্ছে ঠিক নেই। তা লোকটা কে?

একেবারে অপরিচিত নয়, যাও না।

দুহাতে দু'খানা ভাতের থালা নিয়ে বের হ'য়ে দাদার সঙ্গে অরবিন্দকে উপবিষ্ট দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, আগে হ'লে বলতো, কি অরবিন্দবাবু, আবার ইস্কুলে ভর্তি হলেন নাকি। কিন্তু গত রাত্রের স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পরে আজ আর পরিহাস করা সম্ভব হ'ল না। তবে প্রশ্নের উত্তর একযোগে পাওয়া গেল সব কুশের মুখ থেকে—জানো না পিসিমা, অরবিন্দদাদা কলেজের প্রফেসার হয়েছেন।

পিসিমা বুঝলো কালকে রাতে যে কল্পতরু রোপণ করেছিল এই চাকরি হচ্ছে তার প্রথম ফল। তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

তার মুখের রক্তিমা লক্ষ্য করে অরবিন্দ বেশ সরলভাবেই বলল, উনুনের তাপে যে মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

উত্তরটা বক্রভাবে ফিরিয়ে দিল মলিনা, বলল, উনুনের কাছেও যাবেন, আবার তাপও লাগবে না এমন তো হয় না।

আমি অত ভেবে বলি নি।

এখন থেকে ভেবে বলবেন—বলে রান্নাঘরে ঢুকলো মলিনা।

বউদি হাসছ যে?

হাসি কি কারো একচেটিয়া! তুমি যে সকাল থেকে হাসছ?

তার কারণ ছিল।

এটা না হয় অকারণেই হ'ল।

তুমি পরিবেশন করো গিয়ে, আমি পারবো না বলে অন্দরের দিকে চলে গেল।

রুক্মিণী মাছ পরিবেশন করে এসে দেখলো মলিনা ফিরে এসেছে। একাকিনী

খুব মৃদু স্বরে গুন গুন করে বল্‌ল—"অলি বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে, তবে তো ফুল বিকাশে।"

ওটা কি হ'ল ?

রবিঠাকুরের একটা গান, ফুলের নামটা খুলে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

বউদি তোমার ঠাট্টা রাখো।

সত্যি বলছি ঠাকুরঝি এ ঠাট্টা নয়।

অগত্যা রুক্মিণীকেই পরিবেশন করতে হ'ল···মলিনা ঠায় বসে রইলো, এতটুকু সহায়তা করলো না।

অন্য সমস্ত পরিবেশনের অন্তে চাটনি দেবার জন্যে এসে দেখল পাথরের বাটিটা শূন্য।

একি চাটনি গেল কোথায়।

মলিনা বল্‌ল, নর্দমার মধ্যে—যার যেখানে স্থান।

চাটনিটা জলপাইয়ের ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় রুক্মিণী স্বামীকে বল্‌ল, এবারে বাবাকে প্রস্তাব করতে বলো—মাছে বঁড়শী গিলেছে।

শচীন শুধালো, কোন্ পক্ষ মাছ ?

এখানে দুই পক্ষই।

তবে বঁড়শী ফেল্‌ল কে ?

রুক্মিণী বল্‌ল, স্বয়ং অদৃষ্ট।

বেশ, তবে আজ রাতেই বাবাকে সমস্ত কথা বলে করে তৈরি করে রাখছি।

আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে যজ্ঞেশ বাবু বললেন, এ তো উত্তম কথা, অরবিন্দর মতো পাত্র আর কোথায় পাবো, কালকে সুপ্রভাতে অরবিন্দর কাছে প্রস্তাব করবো।

পরদিন সুপ্রভাতে যখন যজ্ঞেশবাবু অরবিন্দকে ডেকে পাঠালেন, অরবিন্দর হঠাৎ আহ্বানের কারণ বুঝতে বিলম্ব হল না। সে একটু ছিমছাম হয়ে যজ্ঞেশ-বাবুর কাছে এসে উপস্থিত হল। ঠিক সেই মুহূর্তে সংবাদপত্র এসে পৌছলো। দুজনেই দেখ্‌ল প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা অক্ষরের ঘোষণা—"গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আজ দেশব্যাপী হরতাল।" দুজনে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই কাগজখানার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন এই সংবাদের তাৎপর্য ও গুরুতর পরিণাম বুঝতে তারা অক্ষম।

গান্ধীজির গ্রেপ্তার সংবাদে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে গেল। যদিচ তাঁর গ্রেপ্তার আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়—তবু সেই প্রত্যাশিত সঙ্কট যখন এসে পড়লো তখন অপ্রত্যাশিতের মতোই আঘাত করলো। অল্প আঘাতে মানুষ চঞ্চল হয়, অধিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায়। গান্ধীপন্থী ও গান্ধীর অনুরক্তদের তো কথাই নেই, কিন্তু যাঁরা গান্ধীপন্থী নন, গান্ধীর অনুরক্ত নন তাঁরাও কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করলেন। একটি লোক অপসারিত হওয়া মাত্র সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়লো অতল স্পর্শ গহ্বর, না আছে সম্মুখে পথ, না আছে পিছনে ফিরবার উপায়। একটা লোক যে এতখানি আগে কে বুঝতে পেরেছিল। সমস্ত দেশ হতবুদ্ধি, এমন কি কেউ হরতাল পর্যান্ত ডাকলো না, তবু যা হওয়ার আপনি হয়ে গেল। ভোরবেলা দোকানপাট খুললো না, ইস্কুল কলেজ বসলো না, পথে যানবাহন চললো না, আপিস আদালতে গেল কেবল সরকারী কর্মচারীর দল, তাদেরও হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সমস্ত শহর কেমন নিস্তব্ধ, কেমন গা ছমছম ভাব। ইতিমধ্যে সদ্যোজাত আনন্দবাজার পত্রিকা একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো, ঘোষণা করে বসলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে বন্দী করবার প্রতিবাদে আনন্দবাজার পত্রিকা বন্ধ থাকবে।

পুলিশ সাহেব রবিনসনের মতো ক্ষুদ্রাত্মারা একেবারে ডবল পেগ চড়িয়ে ভাবলো, Ho Ho, Gandhi is finished, no agitation, আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পিল্লাই-এর এতো বুদ্ধিমান জীবগণ বুঝলো এ ঝটিকাপূর্ব শান্তভাব।

যজ্ঞেশবাবুর আর বিয়ের প্রস্তাব করা হ'ল না, তিনি সোজা কংগ্রেস অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন, দেখলেন তার আগেই যুগ্মসচিব ন-চ আর খ-চ এসে উপস্থিত হয়েছে। হরিপদবাবুর ষড়যন্ত্রে তারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই খালাস হয়ে বাইরে এসেছে। যথাযোগ্য কারণ অবশ্যই ছিল। পিল্লাই মাঝে মাঝে জেল ভিজিট করতে যেতো, দু'চার দিন তাদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলো, দুটোই নিরেট আহাম্মক, এরাই আবার কংগ্রেসের সেক্রেটারি, ভাবলো তবেই কংগ্রেস দেশ স্বাধীন করেছে। দেখলো এদের যতদিন আটকে রাখা যাবে কংগ্রেসের লাভ বই ক্ষতি নেই, আর যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারের নিমক খেয়ে থাকে সে, কংগ্রেসের যাতে ক্ষতি হয় দেখা তার কর্তব্য। কাজেই মেয়াদের অনেক আগে খালাস দিয়ে সরকারী খরচ বাঁচাতে সাহায্য করলো।

বাড়ীতে ফিরবার পথে তাদের দেখা হ'ল হরিপদ উকীলের সঙ্গে। তার মোটামুটি জানা ছিল এদের খালাসের সময়, হঠাৎ বাইরে আসতে দেখে বুঝলো কোথাও একটা হিসাবে গোলমাল হয়েছে। তবে কিনা যে দিক থেকেই বাতাস আসুক পাল তুলে দিতে কসুর বোধ করে না এই লোকটি বল্ল, ছাড়া পেয়েছ তো ভাই, অনেক বলে কয়ে পিলাইকে রাজি করাতে হয়েছে, শালা এক নম্বর হারামী।

ন-চ খ-চ একযোগে বল্ল, আপনাকে আমরা করে দেব কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, বুড়ো টঁাসলেই হয়, আপাতত ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

হরিপদ বল্ল, আরে, আমি তো কংগ্রেসেই আছি তবে একটু আড়ালে থেকে কাজ করতে হয়, নইলে কি তোমাদের এত সহজে খালাস করে আনতে পারতাম।

ন-চ খ-চ বিগলিত হ'য়ে তাকে প্রণাম করতে উদ্যত হ'লে হরিপদ সরে গিয়ে বল্ল, একে একি আপনারা ব্রাহ্মণ, আর আমি কায়স্থ, প্রণাম করতে নেই।

ওরা বল্ল, কংগ্রেস জাত পাত মানে না, কংগ্রেস সেকুলার।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, ওহে তোমরা আজ বিকালে পাঁচ আনির মাঠে জনসভার আয়োজন করো।

আমরা এখনি সহরে ঢোল পিটিয়ে দিচ্ছি।

না, না, ঢেলে সহরতের দরকার নেই, অমনি কথাটা মুখে মুখে চারিয়ে দাও, তাহ'লেই হবে।

সভাস্থল জনাকীর্ণ। বক্তা একজন মাত্র—যজ্ঞেশ রায়। ন-চ খ-চ প্রস্তাব করেছিল তারা জেলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তৃতা করবে, তিনি রাজি হননি। বক্তৃতার বিষয় গান্ধীজির বাণী ও চরখা। যজ্ঞেশবাবু বললেন, গান্ধীজি এখন কারাগারে, তিনি দেশের লোকের সম্মুখে একটি কর্মপন্থা রেখে গিয়েছেন, চরখায় সুতো কাটা। আসুন, আমরা সকলে এই কর্মপন্থা অনুসরণ করি দীর্ঘ। বক্তৃতা দেবার ও শুনবার মতো লোকের মনের অবস্থা ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সভা ভঙ্গ হল, লোকে নীরবে প্রস্থান করলো।

আর দশজনের মতোই হরিপদও এসেছিল, সে লক্ষ্য করলো এক কোণে গুঁড়িসুড়ি মেরে অন্ধকারে বসে আছে তারাচরণ চক্রবর্তীর ভূতপূর্ব মুহুরী কৈলাস, জানতো কৈলাস ফেরারী আসামী, তার নামে হুলিয়া বের হ'য়েছে। সভা থেকে বের হয়েই সোজা সে রওনা হ'ল রবিনসনের কুঠির দিকে।

গান্ধীজি নির্ধারিত কর্মপন্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ফল অবিলম্বে ফল্‌ল। পর দিন দেখা গেল যাদের বাড়িতে পুরানো চরখা অনাদরে পড়ে ছিল সেগুলো আবার চলতে লাগলো; নূতন চরখার ফরমাস কুলিয়ে উঠতে পারে না ছুতোরে, তুলো ও পাঁজ আমদানি হ'ল বাজারে, আর পথে ঘাটে চলতি পথিককেও দেখা গেল তকলিতে সুতো কাটছে। সকলেরই মনে অল্প বিস্তর সাড়া জাগালো। এমন কি সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধনের গৃহিনী যখন চরখা নিয়ে বসলো, বর্ধন বলে উঠ্‌ল, এবারে দেখছি আমার চাকরিটা খাবে।

কেন, চরখাকাটা কি বেআইনি।

কি মুস্কিল ওতে যে গান্ধীর ছোঁয়াচ আছে, সরকারী চাকরেদের ওটা এড়িয়ে চলা দরকার?

গৃহিণী উত্তর দিল, তুমি সরকারী চাকরে বলে কি আমিও? আমাকে কি মাইনে দেয় তোমার সরকার।

আহা এটা বোঝো না, তোমাকে আমাকে জড়িয়েই মাইনেটা ঠিক হয়েছে।

বেশ, তাহলে মাসে মাসে আমার ভাগটা আমাকে দিয়ো।

গৃহিণীর দাবীকে উচ্চাঙ্গের রসিকতা মনে করে উড়িয়ে দিয়ে সিনিয়র ডেপুটি প্রস্থান করলো।

সবজজ গিন্নি একটু স্থুলাঙ্গী। তিনি একপাশে পানের বাটা, অন্যপাশে পিকদানি রেখে চরখা কাটতে সুরু করেছেন সকালবেলাতেই।

সবজজবাবু বললেন, গিন্নি তোমার চরখায় বড্ড বেশি শব্দ হচ্ছে, কে আবার কোথা থেকে শুনতে পাবে, একটু তেল দাও গো।

স্বামীর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি উত্তর করলেন, তোমার চরখায় তুমি তেল দাওগে—বলে গোটা দুই পান ও যথোচিত মাত্রায় দোক্তা মুখের মধ্যে দিয়ে সুতো কাটতে লাগলেন।

অগত্যা সবজজের ক্রোধ পড়লো পানগুলার উপরে—ঐ পান খেয়েই আমাকে ফতুর করবে।

চরখায় নিবিষ্টচিত্ত গৃহিণী বল্‌ল, তবু তো পান করিনে, দেখে এসো তোমার উপরওলা জজের গিন্নিকে।

বস্তুতঃ তিনি জজের গিন্নিকে পান করতে দেখেন নি।

আরে, ওরা যে সাহেব মেম, ওদের কথা আলাদা।

নূতন হাকিম মাইতির গায়ে এখনো কলেজের গন্ধ, তার উপরে আবার সে

মেদিনীপুর জেলার লোক ; তার স্ত্রী স্বামীর চেয়েও উগ্রতর স্বদেশী, তারা গোড়া থেকেই চরখা কাটতো, তবে একটুখানি নলচে আড়াল দিয়ে—অর্থাৎ স্বামী রাতের বেলায় (সরকারী চাকুরে), আর স্ত্রী দিনের বেলায় (সরকারী চাকুরের স্ত্রী মাত্র)।

সরকারী মহলের যখন এই অবস্থা বেসরকারী মহলের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে প্রীতিভাষণের বদলে হয় প্রতিভাষণ, আজ কতটা সুতো কাটলেন ? কেউ ওজনে উত্তর দেয়, তিন তোলা ; কেউ দৈর্ঘ্যে উত্তর দেয়, আড়াইশ গজ। স্বদেশী স্কুল ও কলেজে দু'ঘণ্টা করে চরখা কাটা, পাঁজ তোলা আবশ্যিক, সরকারী স্কুলে ছেলেরা টিফিনের সময়ে চরখা কাটে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে, হেডমাস্টার ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগণ উত্তর দেয়, টিফিন আওয়ারে ছেলেরা চরখা কাটে কি পরস্পরের নাক কাটে আমরা কি ক'রে জানবো ; হাঁ মশায়, আছি নিজের ধান্দায়। দিনাজশাহী শহরের এই সামগ্রিক পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত শুধু অলবেঙ্গল লোন আফিসের আড্ডাধারীগণ।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট পিল্লাইএর খাস কামরায় পুলিশ সুপার রবিনসন প্রবেশ করে সম্ভাষণ করলো, গুডমর্নিং স্যার।

পিল্লাই খবরের কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে বলল—ওয়েল !

স্যার, গুরুতর সংবাদ।

কি এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটলো ?

শুনতে পাচ্ছি জুনিয়ার সরকারী চাকুরেগণ খদ্দর পরতে সুরু করেছে।

সার্ভিস বলে তো খদ্দর পরা নিষিদ্ধ নয়।

অনেক কথা প্রকাশ্যে লেখা থাকে না, but if you read between the lines—

পিল্লাই বল্ল, দুই লাইনের মাঝখানে তো পঠনীয় কিছু থাকে না, বেবাক ফাঁকা জায়গা।

আপনি বুঝতে পারছেন না, এরা সেরেস্তাদার, নাজির প্রভৃতি নয়, জুডিশিয়াল, একজিকিউটিভ সার্ভিসের লোক।

পিল্লাই বল্ল, সকলের পক্ষেই এক নিয়ম। আমিও খদ্দর ধরবো ভাবছি, তুমিও ধরো না রবিনসন, বেশ আরাম, তাছাড়া সস্তা, আর অবসর সময়ে যদি হাতে সুতো কেটে নাও তবে নাম মাত্র মূল্যে।

রবিনসন মনে মনে স্থির করলো, আজ কুঠিতে ফিরেই কমিশনারের পার্সনাল

এসিসটেন্সকে জানাবে যে পিল্লাইএর স্ত্রী খদ্দর ধরেছে। ভাবলো আগে স্ত্রীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

রবিনসন যখন দেখলো যে খদ্দর দিয়ে সুবিধে হ'ল না, তখন একটু কাছিয়ে এসে বল্‌ল, স্যার, শহরে একজন ফেরারী আসামীকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, তার উপরে পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া আছে।

নিশ্চয় তাকে এখন ধরা হয়েছে?

না, এখনো ধরা যায় নি।

কেন?

কালকে জনসভায় একবার ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়লো, তারপরে কোথায় গা ঢাকা দিল।

আপনার পুলিশেরা কি গাঁজা খায়?

গাঁজা খায়, ভাঙ খায়, সিদ্ধি খায়—

বাধা দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বল্‌ল—বুঝলাম হয় তারা ভুল লোককে দেখেছে নয় একেবারে অকর্ম্মণ্য।

পুলিশের এতে দোষ নেই, যার চোখে পড়েছিল সে আমাদের একজন ভদ্রলোক Informer।

শুধু Informer বল্‌লেই চলতো, আবার ভদ্রলোক বলা কেন? আপনি এখনি যান, লোকটা যাতে অবিলম্বে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা করুন।

রবিনসন রাগে গর গর করতে করতে বের হ'য়ে গেল।

সেদিন রাত বারোটা নাগাদ ভূপতির বাসা-বাড়ীর পিছনের জানলায় আঘাত পড়লো। ভূপতি অবিবাহিত, একলা একটা বাসা নিয়ে থাকে। আরও কয়েকবার ঘা পড়তেই ভূপতি উঠে জানলা খুলে বল্‌ল, কে?

শীগ্‌গীর দরজা খুলুন।

গলাটা চেনা মনে হ'ল, লোকটা তখনো অচেনা তবু দরজা খুলে দিল। লোকটা ভিতরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিল, ততক্ষণে তার মুখের উপরে বিদ্যুতের বাতির ছটা ফেলেছে ভূপতি।

কি এখনো চিনতে পারলেন না? এবারে দেখুন তো, বলে গোঁফ দাঁড়ি খুলে ফেলে হাসলো।

ওঃ তুমি, এসো ভাই এসো, বলে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

কি ক'রে চিনলেন?

তোমার হাসি দেখে।

এবারে আগন্তুক ভূপতিকে প্রণাম করলো।

আহা আহা থাক থাক, বলে ভূপতি আবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

২০

তারপরে কবে এলে শুনি?

কালকে সন্ধ্যার আগে এসে দেখি বিরাট জনসভা হচ্ছে, তার মধ্যে ভিড়ে পড়লাম, ভাবলাম ভালই হ'ল, পুলিশের চোখ এড়ানো যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম টিকটিকির চোখে পড়ে গিয়েছি। না পড়বোই বা কেন? মাথার উপরে পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া আছে, কোন রকমে চোখ এড়িয়ে সিদ্ধেশ্বরীর ভাঙা মন্দিরটায় গিয়ে আড্ডা নিয়ে কালকে সারারাত, আজ এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলাম।

খেয়েছ কিছু?

খাওয়ার মধ্যে পেট ভরে মশার কামড়।

দুজনে হেসে উঠ্‌ল।

ভূপতি শুধালো, তারপরে?

লোকটি বল্‌ল, না দাদা তার আগে।

তার আগে কি?

খিদেয় প্রাণ যাচ্ছে, কিছু খেতে দিন।

তা বটে, মশার কামড়ে তো পেট ভরে না, অবশ্য ম্যালিরিয়ায় ধরলে কুইনিনে পেট ভরবে। দাঁড়াও দেখি কিছু আছে কিনা।

চাকর-বাকর নেই তো?

একটা লোক ছিল বটে, তবে হঠাৎ বাপ না মা কার অসুখ সংবাদ পেয়ে দেশে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে। তা আপনার আহারের কি হয়?

দু'বেলা শচীনদের বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসি।

তবে আমাকে আবার কি খাওয়াবেন!

এসো না, দেখাই যাক, ভাঁড়ারে কিছু আছে কিনা।

দু'জনে ভাঁড়ার গবেষণা করে আবিষ্কার করলো চাল আর আলু আছে। নুন তেলেরও অভাব নেই।

এই দেখো, স্টোভ ধরিয়ে আলুসিদ্ধ ভাত চড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তোমার কথা শুনি। কোথা থেকে এলে, কেন এলে বলো দেখি কৈলাস।

ঐ নামটা আপাতত ভুলে যান, আমি এখন কৃষ্ণলাল। নাম বদলালেই পরিচয় চাপা পড়ে।

শুধু নাম বদলে নয়, তার উপরে চাপদাড়ি আর গোঁফ লাগিয়ে। তা কৃষ্ণলাল, কোথায় ছিলে শুনি।

দাদা, ঐটি আপনার মতো সুহৃদকেও বলতে নিষেধ, আমাদের শপথের অঙ্গ।

কিন্তু শুনেছিলাম যে তোমরা পিস্তল বোমার পথ আপাতত পরিত্যাগ করেছ।

ভুল শোনেন নি। গান্ধীজির কর্মপদ্ধতিতে আমাদের মনে হয়েছিল এই লোকটাকে দিয়েই আমাদের মতলব হাসিল হবে। পিস্তল বোমার সমস্ত দলই তাদের পথ পরিত্যাগ করেছিল।

হাঁ, তাদের তো এখন ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে শুনেছি।

সবটা শোনেননি দাদা। পিস্তল বোমার দল অনেকগুলো, তাদের কর্মস্থান ও কর্মপদ্ধতিও এক নয়, তবে উদ্দেশ্য এক। ইচ্ছা করেই কেউ কারো খোঁজ রাখিনে, পাছে একটা দল ধরা পড়লেই খোঁজখবরের সূত্রে সব দল ধরা পড়ে যায়। তবে ইশারায় এক রকম জানা-শোনা চলে। সেই ইশারাতেই স্থির হয়েছিল, আপাতত জাল গুটাও, বড় পেলোয়াড় এসেছে তাকে দিয়েই কার্য উদ্ধার হবে কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী হ'ল না।

ভূপতি শুধালো, তা স্বপ্নটা ভাঙলো কি ক'রে?

ঐ চৌরিচৌরার ঘটনায়।

ঐ ঘটনায় গান্ধীজিরও তো স্বপ্নভঙ্গ হ'ল।

না দাদা, ঠিক উল্টো। আমাদের হ'ল স্বপ্নভঙ্গ আর তিনি হ'লেন স্বপ্নগ্রস্ত।

তাঁর স্বপ্নের কথা থাক, এখন তোমাদের ইতিহাসটা শুনি।

সবটা শুনতে পাবেন না, তবে কতকটা বলবো।

যথা লাভ—তাই বলো।

চৌরিচৌরার ঘটনায় এক ছটাক রক্ত দেখে যার মাথা ঘুরে যায় তাকে দিয়ে দেশ উদ্ধার সম্ভব নয়। এতবড় একটা দেশ—তুলনায় ক'ফোঁটা রক্তপাত হ'ল।

দেখো, তিনি ঐ রক্তপাতকে বিষ মনে করেন, এক ফোঁটা বিষে একটা হাতী

মারা পড়ে।

হাতী মারা পড়তে পারে কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় না।

তা গোটা কতক পিস্তল বোমায় সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে কি ?

দাদা, আমাদের পরিকল্পনা যদি আপনাকে বলতে পারতাম তবে দেখতেন আমরাও বিস্তারিত জাল ছড়িয়েছি।

তার মানে তোমরা আবার একটা পাল্টা সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলতে চাও।

ভূপতির যুক্তি শুনে কৈলাস ওরফে কৃষ্ণলাল স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দাদা, শেষে আপনিও কি তিলক ফোঁটার দলে ভর্তি হলেন না কি !

ভূপতি হেসে বল্‌ল, নির্ভয় হও ভাই, আমি তিলক ফোঁটা কাটিনে, তবে পিস্তল বোমার উপরেও আর তেমন ভরসা নেই।

তবে দেশ উদ্ধার হবে কি করে ?

সে অনেক কথা। তবে এইটুকু জেনে রাখো, আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধা ছাড়া ভারতের স্বাধীন হওয়ার উপায় নেই।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমিও যে সম্পূর্ণ বুঝেছি তা মনে করো না। তবে একটা দাবানল জ্বলে উঠ্‌লে সেই আগুনে মুক্তির অনেক পথ খুলে যায়।

অর্থাৎ দৈবের উপরে নির্ভর করে বসে থাকা।

না, আগুনের উপরে—ঐ দেখো ভাতটি সিদ্ধ করে দিয়েছে, কেমন সুগন্ধ বের হচ্ছে।

তবে আপাততঃ ভারত উদ্ধার স্থগিত থাকতে পারে।

আমি তো সেই রকম বুঝি।

ঘি দিয়ে আলু সিদ্ধ ভাত খেতে খেতে কৈলাস বল্‌ল, দাদা, অমৃত কি এর চেয়েও মিষ্ট ?

খাইনি তো ভাই, তবে শুনেছি একবার খেলে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।

তবে বিষের সঙ্গে তফাৎটা কোথায় ?

কোথাও নয়, মূলত ও দুই এক, একই সঙ্গে সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল। নাও, এখন শোবার ব্যবস্থা করেছি। এই ছোট ঘরটায় শুয়ে পড়ো, এদিকে কেউ বড় আসে না। একটা বিছানাও আছে দেখছি।

মশাও নিশ্চয় আছে।

নিশ্চয়, তবে মশারিও আছে। কাল থেকে তোমার পরিচয় তুমি আমার

নূতন চাকর, নাম কৃষ্ণলাল, গোঁফ দাড়িটা পরতে ভুলো না, মনে রেখো এখানে পাঁচ-সাত বছর ছিলে।

পাঁচ-সাত নয় দাদা, পাঁচ আর সাতে বারো—বারো বছর, এক যুগ।

স্কুলে দেখা হ'লে শচীন জিজ্ঞাসা করলো, কিহে ভূপতি, আজ খাবে না বলে খবর পাঠিয়েছিলে কেন?

একটি লোক পেয়েছি।

তোমার ভাগ্য ভালো যে লোক গেলে আবার লোক পাও।

আর তোমার বাড়ীর যে লোক কখনো যায় না।

সে কথা যাক্, লোকটি কেমন, রাঁধতে জানে না শুধুই খেতে জানে।

এক রকম কাজ চালিয়ে নিতে পারে। ন'টা বাজে দেখে বল্লাম, ওহে এখনো রান্না চড়াও নি। সে বল্ল, আজ্ঞে বাবু, সে জন্য ভাববেন না, আপনি স্নান করে নিন, আমি চাপাইছি কি নামাইছি।

চাপিয়েই নামালো, তা সিদ্ধ হ'ল তো?

হাঁ, এক রকম দাঁড়ালো।

তা লোকটি যথা সময়ে প্রস্থান করলে আমাদের বাড়ীতে খবর পাঠাতে ভুলো না।

ভূপতি বল্ল, একাদশী করবার ইচ্ছা না থাকলে অবশ্যই খবর পাঠাবো।

স্কুল থেকে ফিরে এসে ভূপতি শুধালো, কৈলাস কেন এসেছ বল্লে না তো?

কৈলাস যা বল্ল, তার মর্ম এইরূপ।

গান্ধীর কর্মপদ্ধতি দেখে যখন সাময়িক ভাবে নিজেদের কর্মপদ্ধতি থেকে তারা বিরত হ'ল, রাধা তাকে ধরে পড়লো কৈলাস দাদা মায়ের খবর নিয়ে এসো, আমাকে না দেখে এতদিন তিনি হয় মারা গিয়েছেন নয় পাগল হয়ে গিয়েছেন। বল্ল, একখানা চিঠি লিখেছিলাম বটে রুক্মিণী বউদিকে, তাতে মাঝে মাঝে তত্ত্ব নিতে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁর উত্তর তো আমার পাওয়ার উপায় নেই, ঠিকানাই দিতে পারিনি।

কৈলাস বলেছিল, তা তুমি যাও না কেন? তারপরে নিজেই ভেবে বল্ল, না তা সম্ভব নয়। কৈলাস বুঝেছিল রাধার বয়সের মেয়ে বাড়ী থেকে না বলে চলে এলে ফিরবার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাধার কান্নাকাটি দেখে তার মায়ের সংবাদ নিতে এসেছে, ধরা পড়বার ঝুঁকি নিয়েও এসেছে।

এবারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাধার মায়ের খবর কি পেলে?

পেয়েছি বই কি।

কার কাছে থেকে?

আপনার কাছে থেকেই।

কই আমি তো কিছুই বলিনি।

সে বল্‌ল, ঐ না বলাই যে যথেষ্ট বলা। আপনি জানেন, একমাত্র আপনিই জানেন যে রাধা আমার সঙ্গে গিয়েছিল। এখন রাধার মা মারা গেলে অবশ্যই এতক্ষণে আমাকে বলতেন।

কিন্তু মারা যাওয়া দাড়াও তো অন্য দুরবস্থা হতে পারে।

জানি, এক অর্থাভাবে পড়া, আর পাগল হয়ে যাওয়া। প্রথমটার কোন কারণ নেই, কেন না রাধা যাওয়ার আগে ব্যাঙ্কে তার নামে যে টাকা ছিল মায়ের নামে ট্রান্সফার করে দিয়ে গিয়েছিল। আর পাগল বা পাগলের মতো হয়ে যাওয়া যে অনিবার্য তা রাধাও জানে আমরাও জানি।

শোন কৈলাস, তোমার শেষের কথাটা নিদারুণ ভাবে সত্য, ফলাও ক'রে বলে লাভ নেই, তবে প্রথম কথাটা সত্য নয়, রাধার এক পয়সাও তিনি খরচ করেন না।

তবে চলে কি ক'রে?

ক্ষেত থেকে ধান আসে, বাড়ীতে গাছে কাঁচকলা রক্ষা হয়। লোকে না বুঝে বিধবাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করবার জন্যে শাস্ত্রকারদের দোষ দেয়। আমি তো তাঁদের প্রশংসা করি। তাঁরা অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন, অনাথা বিধবাদের দুর্দশা চোখে দেখে তাঁরা নিম্নতম দাবীতে নামিয়ে এনেছেন তাদের খাওয়া-পরাটাকে। যারা এর বেশি পারে তাদের ক্ষীর সর খাওয়ার বাধা নেই। তা ছাড়া যজ্ঞেশবাবুর মেয়ে ও বউমা মাঝে মাঝে অভাব মিটিয়ে আসে। যাক্, এসব দুঃখের কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার দরকার নেই রাধাকে, সংক্ষেপে জানিয়ো তার মা সুখে আছেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাধার কি ফিরবার কোন সম্ভাবনাই নেই?

মোটেই না দাদা। পুলিশের খাতায় তার নাম উঠে গিয়েছে, হয়তো বা ছবিও। আর তাছাড়া সামাজিক বাধা তো আছেই। চুপ করে রইলেন কেন দাদা, শুধু রাধা বলে নয়, রাধার মতো আরও পাঁচ-সাতটি মেয়ে আছে, সকলেই সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, আর পুরুষেরা নানা অবস্থার। দলের প্রত্যেককেই ছোট এক শিশি পটাশিয়াম সাইনাইড উপহার দেওয়া হয়—যাতে জীবিত অবস্থায়

পুলিশের হাতে কেউ ধরা না পড়ে। ওকি দাদা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কেন? এখনো সব শোনেননি, থাকি পাহাড় জঙ্গলের দেশে, সাপখোপ বাঘ ভালুক তো উপরি।

ভূপতি বল্ল, তোমরা কোন অঞ্চলে থাকো একেবারে কিছু না জানি তা নয়।

যদি জেনে থাকেন তো জেনেছেন, কিন্তু মনে রাখবেন আমার মুখ থেকে জানেন নি, দাদা, দলে ভর্তি হয়ে দেখলাম মরবার পথ অসংখ্য বাঁচবার পথ একটাই।

কি সেটা? শুধালো ভূপতি।

মানুষের মতো বাঁচা।

স্কুলের পরে বিকাল বেলায় ভূপতি ও কৈলাসের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। এমন সময়ে দরজার কড়া উত্তেজিত ভাবে নড়ে উঠ্ল, আর অধিকতর উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করলো নৃপতি, তার আগেই কৃষ্ণলাল মাথায় গামছা জড়িয়ে চায়ের বাসন ধুতে ধুতে গুনগুন সুরে গান গাইতে লাগলো—"গুণতে গেলে গুণের নাহি শেষ।

দাদা, পুলিশে তারাচরণবাবুর বাড়ীতে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলল।

সেখানে তো আছেন তাঁর একমাত্র বিধবা পত্নী, তা তাঁর দোষ।

শহরে নাকি তারাচরণবাবুর পুরাতন মুহুরী কৈলাসকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সে ফেরারী আসামী, তারই খোঁজে এসেছে।

যদিই বা সে এসে থাকে, তবে কি লোকটা সেই একমাত্র জায়গায় যাবে যেখানে প্রথমেই তার খোঁজ পড়বে। এ না হলে আর পুলিশী বুদ্ধি।

যা বলেছেন দাদা, রহড়কী ডাল আর রুটির কল্যাণে ওদের দেহ আর বুদ্ধি সমান মোটা আই বি ইন্সপেক্টার গোবিন্দ সরকারের মতো।

তাকেও কি ওখানে দেখলে নাকি!

সে-ই তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খানাতল্লাস করাচ্ছে, অর্থাৎ সামনে যা পড়ছে ভাঙছে, দু-এক খানা তৈজস যা দেখছে পুলিশেরা নিয়ে নিচ্ছে—আর কি অকথ্য গালাগালি, শীগ্‌গীর বুড়ী বল কোথায় তোর পেটভাতা জামাইকে রেখেছিস, শীগ্‌গীর বল্, নইলে এখুনি তোকে পুলিপোলাও চালান দেব।

সাব ইন্সপেক্টারের বদ জবানে খুশি না হয়ে গোবিন্দ সরকার, বল্ল, জামাই আবার কি, ওর মেয়ের আশনাইয়ের মানুষ! এদিকে কে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রাধার মা কাঁদছে।

যাও, যজ্ঞেশবাবুকে একবার খবরটা দাও।

আর খবর দাও। গোবিন্দ সরকার তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে অনেকক্ষণ প্রস্থান করেছে।

দাদাবাবু, আপনাদের গোয়েন্দা সাহেবের নামটি তো ভালো, গোবিন্দ সরকার কিনা গোয়েন্দা সরকার, ওঁর বাপ মা দেখছি জ্যোতিষ জানতেন—বল্‌ল কৃষ্ণলাল।

দাদা, আপনার লোকটি দেখছি গুনী।

শুনলে ও গান করছিল 'গুণতে নাহি গুণের নাহি শেষ।' চললাম দাদা, একটু সাবধানে থাকবেন।

হাঁ হাঁ, কোন ভয় নেই।

নৃপতি প্রস্থান করলে কৈলাস বল্‌ল, সেই পুরোনো গোবিন্দ সরকার এখনো আছে দেখছি।

কেন থাকবে না বলো, গভমেণ্ট ওকে দিয়ে কাজ পাচ্ছে তাই রেখে দিয়েছে।

চা খেয়ে ভূপতি একখানা বই নিয়ে বসলে কৈলাস কখন বের হয়ে গেল। তারপর যখন ভূপতিকে খাওয়ার জন্যে ডাক দিল তখন রাত দশটা, দশটার আগে সে খায় না।

ভূপতি শুধালো, কোথায় গিয়েছিলে, দু'একবার ডাকলাম সাড়া পেলাম না, ভাবলাম দিনকাল খারাপ, কৈলাস গেল কোথায় ?

একটু বেড়াতে বের হয়েছিলাম।

উঁহু, ঠিক ক'রে বলো তো গিয়েছিলে কোথায় ?

গোবিন্দ সরকারের দেনাটা শোধ করে দিয়ে এলাম।

তার মানে ?

তার মানে তো বুঝতেই পারছেন, পিস্তলের দুটো গুলির বেশি লাগেনি।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পিস্তলই বা পেলে কোথায়, আর দেনাই বা কি ?

আগে পিস্তলের কথাটা বলে নিই। পরশু রাতে ছিলাম সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে সে কথা তো আগেই বলেছি। কাল রাতে এখানে রওনা হওয়ার সময়ে পিস্তলটাকে একটু কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে বল্‌লাম, মা ওটা তোমার জিম্মায় রইলো, দেখো যেন বেহাত না হয়। আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়ী থেকে রওনা হয়ে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে দেখি যেখানকার জিনিস সেখানে আছে, মা কি

সন্তানের মিনতি ফেলতে পারেন। তখন পিস্তলটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম গোবিন্দ সরকারের বাড়ী—ভাগ্যক্রমে সেই পুরোনো বাড়ীতেই এখনো আছে। শহরের গলি ঘুঁজি অন্ধি সন্ধি সব আমার জানা। দেখি যে সদর দরজায় জোড়া পুলিশ পাহারা। পিছন দিকে গিয়ে দেখি গোয়েন্দা সাহেব জানলার কাছে বসে টেবিলের উপরে কি লিখছে। দুটো গুলির বেশি দরকার হ'ল না। লোক জন হাঁ হাঁ করে উঠবার আগেই যেমন গিয়েছিলাম তেমনি চলে এলাম। আগেই স্থির করে রেখেছিলাম কোন্ পথ দিয়ে পালাবো। দাদা পালাবার পথ স্থির করে রেখে কাজ করবার নাম বীরত্ব।

তারপরে ?

তারপরে আর কি। আবার গেলাম মায়ের মন্দিরে, বললাম মা, আবার এটা রইলো তোমার জিম্মায়, তোমার আশীর্বাদে সফল হয়েছি।

এতক্ষণ ভূপতি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। সদ্য লোক খুন করে এলে এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে বড় শোনা যায় না, বলল, তুমি তো বড় ভয়ানক লোক দেখছি।

ঐতেই ভয় পেয়ে গেলেন। এই নিয়ে আমার তেরোটা হ'ল। দাদা এবারে দেনাটার ব্যাখ্যা—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আর দেনার ব্যাখ্যা করতে হবে না বুঝেছি। কিন্তু বিপদ এই যে পুলিশে নিশ্চয় শেষ রাতে আমার বাড়ীতে খানাতল্লাসি করতে আসবে। শচীন নৃপতি গোপেন এদের পুলিশে জানে নিতান্ত নিরামিশাষী বলে, তাদের চোখে কেবল আমিই আমিষভোজী। তাই আসতে আমার এখানেই আসবে, তখন তোমাকে সামলাবো কেমন করে তাই ভাবছি।

কিছু ভাববেন না দাদা, আমার ভাবনা আমি ভাববো। ঐ যে বললাম না, পালাবার পথ স্থির করে রেখে কাজ করবার নাম বীরত্ব। আসুন এখন খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

ভূপতির অনুমান নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হল, ভোর রাতে দরজায় ধাক্কা পড়লো। ভূপতি জানলা খুলে দেখতে পেলো লাল পাগড়িতে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। দরজা খুলবার আগে কৈলাসকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো—ওঠো ওঠো।

সে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে বলল, কি ঘিরেছে নাকি। যেন প্রত্যাশিত। তারপরে একখানা ময়লা গামছা টেনে নিয়ে বিড়ে পাকিয়ে মাথার উপরে রাখলো, আর কাপড়খানা গুটি-য়ে পড়ে নিয়ে বলল, দাদা, আমি পায়খানায়

চললাম।

ও চালাকি চলবে না, ওখানেও তল্লাসি করবে।

করুক না, চললাম দাদা, দিন দরজা খুলে দিন। প্রণাম—এই বলে সে পায়খানার দিকে চলে গেল।

দরজা খুলে দিতেই পুলিশে বাড়ী ভ'রে গেল।

আমরা তল্লাশ করবো।

করুন, নিশ্চয় করবেন। পুলিশ এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে লাগলো, ভূপতি সেই খোলা জানলাটার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো খাটা পায়খানার ময়লার টিন মাথায় ক'রে একটা মলিন বেশী লোক পুলিশের সারির মধ্যে দিয়ে ধীরপদে চলে গেল। ভূপতির বুকের ভিতরটায় হু হু করে উঠলো, হায় ভগবান, এদেরই নাম সন্ত্রাসবাদী।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে না পেয়ে পুলিশ চলে গেল।

ওদিকে কৈলাস পদ্মার ধারে এসে টিনটা মাথা থেকে নামিয়ে রেখে স্নান করতে নেমে স্রোতে গা ভাসান দিয়ে মাইল দুই দূরে গিয়ে উঠল। এখানেই পদ্মার ধারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরে প্রবেশের সময়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে, মা এ যাত্রা তো রক্ষা করলে, এখন শেষ রক্ষা করে দিয়ো, আজ দিনমানটা তোমার কাছেই থাকবো। এই বলে মন্দিরে ঢুকে পড়লো।

বলা বাহুল্য এই শহরের আর দশজন স্বদেশীর মতো কৈলাসও এই মন্দিরে দীক্ষাপ্রাপ্ত।

২১

কৈলাসের পিস্তলের গুলি সাময়িকভাবে নিস্তরঙ্গ দিনাজশাহী শহরের শান্ত সরোবরে যে ঢেউ তুলে দিল নিরপরাধের পক্ষে তার ফল বিষময় হল। পুলিশের বিচারে রাজনৈতিক হত্যার ঢালাও আসামী স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ। এমন সহজ লক্ষ্য আর কোথায় পাওয়া যাবে। শহরের স্বদেশী কলেজ ও যাবতীয় স্কুলের ছাত্রসমাজকে পুলিশ নানাভাবে পর্যুদস্ত করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যারা নিরীহ, পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়ীতে চলে গেল। সেখানে গিয়েও অব্যাহতি নেই, দারোগা এসে খোঁজ নিয়ে যায় হঠাৎ তারা বাড়ী এলো কেন, এখন তো ছুটির সময় নয়। শহরের যখন এই রকম অবস্থা একদল বিশিষ্ট নাগরিক যজ্ঞেশবাবুকে অগ্রণী করে পিল্লাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে গেল, তাদের আবেদন এই যে পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করুক, দোষী প্রমাণিত হ'লে তার যথোচিত দণ্ড হোক সে বিষয়ে কারো আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু এ কি অনাচার, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

সবাই জানতো পিল্লাই লোকটা উগ্র চাকুরে নয়, অর্থাৎ স্বদেশীওয়ালাদের সম্বন্ধে তার যাই মনোভাব হোক সে খড়্গহস্ত নয়। এই নিয়ে পুলিশ সুপারিনটেন-ডেণ্ট রবিনসনের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হ'তে হতে মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ডেপুটেশনকে বিদায় দিয়ে রবিনসনকে চিঠি লিখে জানালো সে যেন অনুগ্রহ করে পরদিন প্রাতে তার কুঠিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। এরকম পত্রের ফল যা হওয়ার হ'ল, রবিনসন লিখে পাঠালো—প্রয়োজন হ'লে আদালতে তোমার খাস কামরায় গিয়ে দেখা করতে পারি কিন্তু তোমার কুঠিতে কদাচ নয়। পিল্লাই লিখে পাঠালো, তথাস্তু।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় অগ্নি ও ইন্ধন একত্র হ'তেই দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল।

মিঃ রবিনসন, এ কি হচ্ছে, একজন আসামী ধরতে গিয়ে আস্ত শহরটা নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছ!

আসামী একজন কি অনেক কি করে জানলেন?

তুমিই না হয় বলো কতজন।

আগেই কি করে বলবো, আগে খানাতল্লাসি শেষ হোক।

কবে শেষ হবে শুনতে পারি কি?

এখনো বলতে পারি না।

এদিকে শহরে যে কাণ্ডটি করছ তাতে শান্তিভঙ্গ হওয়ার উপক্রম।

শান্তি কি করে রক্ষা করতে হয় বেশ জানি।

মোটেই জানো না, তার প্রমাণ অনেকবার হয়ে গিয়েছে।

মিঃ পিল্লাই, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তুমি মিঃ গ্যান্ধির চাকর বনে গিয়েছ।

এ পর্যন্ত বনে যাইনি, তবে তোমার মতো লোকের আচরণে বনতে ইচ্ছা করছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরার পাশেই নাজিরের ঘর, এ ঘরে জোরে কথা বললে ও ঘরে শুনতে পাওয়া যায়, এমন জোরেই কথা হচ্ছিল।

নাজির মুস্তাক আলি প্রবীণ ব্যক্তি, পদোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করে বসে আছে, কিন্তু ছোকরা কেরানিদের উল্লাসের অন্ত নেই।

একজন বল্‌ল, রবিনসন সাহেবকে, রবিনসন বালি বানিয়ে দিল ম্যাজিস্ট্রেট।

অপর একজন বল্‌ল, নামে পিল্লাই, কাজেও পিলে চমকে দেয়।

তৃতীয় একজন জুৎসই বলবার কিছু না পেয়ে উঠে নাচতে সুরু করলো।

এবারে আফিসের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে নাজির সাহেবকে মুখ খুলতে হল, যদিচ এতক্ষণ ছোকরাদের কথায় বেশ আনন্দ পাচ্ছিল।

ও মশয়, যা কইরগাছেন বইয়া বইয়া করেন, থামকা আমার কাল ছ্যান ক্যান। আর মশয়, আগে চাকরিটা রাইখ্যা তবে তো ছ্যাশের কাজ।

ছোকরার দল শান্ত হ'ল, কিন্তু পাশের ঘর ঘোরতর অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল। বাগ্‌যুদ্ধের বদলে বোধ করি বাহুযুদ্ধ। এই উচ্চপদস্থ দ্বন্দ্বে কার অপদস্থ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা এই নিয়ে যখন ছোকরার দলে আলোচনা চলছে, অর্থাৎ কার মরবার সম্ভাবনা বেশি, কে মরলে আফিস ছুটি হয়ে যাবে ইত্যাদি তখন প্রবীণ নাজির সাহেবের দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্রাকার একটি মাত্র বাক্যে চোলাই হয়ে শ্রুতিগোচর হ'ল—ছাড়ান দেন মশয় ছাড়ান দেন যেটা যায় হেটাই লাভ, ঐ বস্তুটার আবার এপিঠ আর ওপিঠ।

ওরা দেখল রবিনসন দ্রুত পায়ে বের হয়ে গেল।

পরদিন গোবিন্দ সরকার খুনের মামলায় দেড়শ আসামীকে পুলিস হাজির করলো ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। মিঃ পিল্লাই একবার তাকিয়ে দেখলো, তার মধ্যে আশী বছরের বুড়ো থেকে বারো বছরের বালক সব আছে। প্রত্যেককে একটাকা ক'রে জামিনে খালাস দিল। কিন্তু বললো, not this man। সে লোকটির পনেরো দিনের জন্য পুলিশ হাজতে থাকবার হুকুম হ'ল। This man অর্থাৎ এই লোকটি হচ্ছে উকীল হরিপদ দত্ত।

হরিপদ উকীল আসামী শ্রেণী ভুক্ত হ'ল কি প্রকারে? গোবিন্দ সরকার খুনের মামলা শহর যখন তোলপাড় হচ্ছে, হরিপদ এসে রবিনসনকে বল্‌ল স্যার আমার তো শহরে টেকা দায় হয়ে উঠ্‌ল, অনেকেই আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছে, এর পরে আর আমাকে দিয়ে পুলিশের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে না।

রবিনসন বল্‌ল, কি করা যায় দত্ত?

হরিপদ বল্‌ল, আমাকেও এই দলের সঙ্গে চালান দিন তবেই সেই লোকের সন্দেহ দূর হবে।

এই পরামর্শের ফলে অভিযুক্ত হয়ে হরিপদ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির

হ'ল, কিন্তু একমাত্র তারই জামিন মিলল না।

রবিনসন চল্‌ল, So sorry Mr. Dutt—

হরিপদ বল্‌ল, দুঃখের কি কারণ আছে? দশ পনেরো দিন হাজত বাস করলে লোকের ধারণা হবে আমি এক নম্বর স্বদেশী, তখন আরও সহজ হবে আপনাকে সাহায্য করা।

এক নম্বর স্বদেশী বনবার জন্যে আনন্দিত মনে হরিপদ দত্ত পুলিশ হাজতে গেল।

লব কুশকে নিয়ে যজ্ঞেশবাবু ও শচীন বাড়ী ফিরে এলেন, বলা বাহুল্য তারাও আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়ে চালান হয়েছিল। যজ্ঞেশবাবু বল্‌লেন, শচীন, এবার এদের হুগলিতে নিয়ে গিয়ে গৌরহরিবাবুর গান্ধী আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে এসো।

শচীন বল্‌ল, আগে মামলা মিটুক।

মামলার কিছু নেই, মিটে যাবেই। হাঁ, তারপরেই নিয়ে যাবে। গৌরহরিবাবু তো নিয়ে যেতে বলেছেন।

হাঁ, লিখেছেন যখন খুশি নিয়ে আসতে, তবে বয়স বারোর মধ্যে হলেই ভালো হয়।

ওদের তো বারো হ'ল, আর দেরী করা উচিত হবে না।

মলিনা ও রুক্মিণীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না লবকুশ পড়াশুনা ছেড়ে গান্ধী আশ্রমে ভর্তি হ'য়ে ভবঘুরে শ্রেণীভুক্ত হয়। তাই মলিনা বলল, বাবা আপনার নাতিদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিলে লোকে ভুল বুঝবে।

কি বুঝবে?

বুঝবে এই যে রায় মশায় চান, অন্যের ছেলে স্বদেশী করে জেলে যাক আর নিজের নাতি দুটোকে এই পরিণাম থেকে বাঁচাবার জন্যে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিলেন।

মা, প্রথমত গান্ধী আশ্রম মোটেই নিরাপদ স্থান নয়—পুলিশের প্রধান লক্ষ্য দেশের আশ্রমগুলো। দ্বিতীয়ত, পুলিশের গায়ে একটা ঢিল ছুঁড়ে বা একটা সাহেবকে ছুঁয়ো দিয়ে যে সম্প্রদায়ের স্বদেশী করা হয় তার কি মূল্য! ওদের পাকা রকমের স্বদেশী করবার আশাতেই অন্যত্র পাঠাচ্ছি।

কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎটা কি ভেবে দেখেছেন, বাবা।

ভেবেছি বই কি মা। ওরা আমার মতো উকীল বা শচীনের মতো

অধ্যাপক হ'তে পারবে না, তবে আমরা যা হ'তে পারিনি তাই হবে, ওরা মানুষ হবে।

তারপরে ?

তারপরে তো আর কিছু নেই মা, মানুষের মতো মানুষ হ'লেই সব হওয়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল।

শচীন এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি, তবে তার মনের মধ্যে খুব সমর্থন ছিল না। কিন্তু বাপের মতের বিরুদ্ধে বিশেষ দেশবন্ধুর অনুরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে চুপ করে থাকলো।

যথা সময়ে মামলা মিটে গেল। আর তারপরে শুভলগ্নে মা ও পিসিমাকে কাঁদিয়ে সকলকে প্রণাম করে বাবার সঙ্গে লব কুশ হুগলি রওনা হয়ে গেল।

পিসিমা বল্‌ল, দুধ খেতে ভুলিস না।

মা বল্‌ল, নিয়মিত চিঠি লিখিস।

প্রথম বাড়ী ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে, ওদের মনটা একটু খারাপ হ'ল বটে, তবে কৌতূহল ও আনন্দের পাল্লাটাই বোধ হয় বেশি ভারি!

বালকের মন দুঃখের কি জানে!

২২

গৌরহরিবাবুর গান্ধী আশ্রম খুঁজে বার করতে কষ্ট হ'ল না শচীনদের। কুলির মাথায় বাক্স ও বিছানা নিয়ে তারা দাঁড়ালো গিয়ে একটা পুরোনো দোতালা বাড়ীর কাছে। একজন বল্‌ল, উপরে উঠে যান। তারা দোতালায় গিয়ে দেখলো টানা ঘরের মধ্যে কম্বল বিছিয়ে একজন গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি উপবিষ্ট, পরনে খদ্দরের ধুতি, গলায় তুলসীর মালা।

আপনি শচীনবাবু? জিজ্ঞাসা করলেন গৌরহরিবাবু।

আজ্ঞে হাঁ, আমরা আসছি দিনাজশাহী শহর থেকে।

ওরে, মাল নামিয়ে রাখ, কুলিদের দিকে তাকিয়ে বললেন গৌরহরিবাবু।

এই দুটি আপনার ছেলে বুঝি? বাঃ বেশ স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝলেন শচীনবাবু, স্বাস্থ্য আর বুদ্ধি যদি থাকলো তবে আর ভাবনা কি। কি নাম তোমাদের বাবা।

ছেলেরা বল্‌ল—লব, কুশ।

শচীন বল্‌ল, যমজ কি না তাই ঐ নাম রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ওরা তিনজন কম্বলে বসেছে, কুলি বিদায় নিয়েছে।

ভালো নাম কি?

শচীন বল্‌ল, ভালো নাম আর রাখা হয় নি।

বাল্মীকির চেয়ে ভালো নাম আর কোথায় পাবেন। বেশ বেশ, লব আর কুশ। তা আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন।

আমরা স্টেশনে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ সারা ক'রে নিয়েছি।

আপনারা আমাদের আশ্রমের আদর্শ ও নিয়মাবলী সব জানেন কি?

বিশেষ কিছু জানি না, শুধু দেশবন্ধুর কাছে আপনাদের আশ্রমের কথা শুনেছিলাম, তিনি বলেছিল ওখানে গেলে ডাক্তার, উকীল, শিক্ষক হবে না, তবে মানুষ হবে। তখন ওরা ছোট ছিল বলে নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

মানুষ হবে এ দেশবন্ধুর যোগ্য কথাই বটে। আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের দ্বারা কতদূর সম্ভব হবে জানি না তবে মানুষ গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি এই মাত্র বলতে পারি।

এবারে শচীন জিজ্ঞাসা করলো, এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি কি রকম?

কেতাবী শিক্ষা আমরা কিছু দিয়ে থাকি, যেমন ধরুন বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি গণিত, ইতিহাস আর ভূগোল, তবে সে সব পাঠ্য অন্য স্কুলের সঙ্গে মিলবে না। তবে আমাদের প্রধান ঝোঁকটা ছাত্ররা যাতে স্বাবলম্বী হ'তে পারে। হাতের কাজের দিকে আমরা বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকি, যেমন তুলো থেকে পাঁজ তৈরি করা, পাঁজ থেকে সুতো তৈরি করা, সুতো থেকে কাপড় তৈরি করা। শহরের মধ্যে আমরা খানিকটা জমি পেয়েছি, জমিটা একজন দান করেছেন, এ বাড়ীটাও একজন ব্যবহার করতে দিয়েছেন বিনা ভাড়ায়। সেই জমিটায় ছেলেরা শবজি তৈরি করে থাকে, ফলে তরকারি আমাদের কিনতে হয় না, চাল ডাল নুন তেল অবশ্য কিনতে হয়। আহারের ব্যবস্থা নিরামিষ। কি বাবারা, ভয় পেলে নাকি!

সত্য কথা বলতে গেলে লব কুশ মোটেই ভয় পায় নি, বরঞ্চ তাদের ভালোই লাগছিল। বাড়ীতে একটা কুমড়োর গাছ লাগিয়েছিল, পিসিমার কি বকুনি। তারা মনে মনে স্থির করছিল কি গাছ লাগাবে, কুমড়ো, লাউ, বেগুন লঙ্কা কত কি গাছ। অধিকতর সত্য কথা বলতে কি, শচীনের মন এই অভিনব ব্যবস্থায় মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল যদিচ মুখের ভাবে তা প্রকাশ পায়নি। এবার শুধালো, দুধটা অবশ্য কিনতে হয়।

হাঁ দুটো গোরু আমরা দানে পেয়েছি, ঐ শবজি বাগানে একটা চালায় থাকে, ছেলেরা গোপরিচর্যা দেখে, যেমন দুধদোহানো, গোবর থেকে সার

তৈরি করা, গোরুকে খেতে দেওয়া স্নান করানো।

দুধটা সকলে খায় বুঝি!

না দুধ আমরা খাই না, না ছেলেরা না শিক্ষকরা।

খাদ্যের ব্যবস্থা কি রকম? কিছু মনে করবেন না, কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করছি!

করবেন বইকি। ছেলে রেখে যাবেন আর জানবেন না সে কি হয়। এই সেদিন নলডাঙা থেকে দুটি জমিদারের ছেলেকে নিয়ে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি এখানকার ব্যবস্থা শুনেই পরের গাড়ীতেই ফিরে গেলেন—বলে গৌরহরিবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

শচীন লক্ষ্য করলো হাসিতে তাঁকে আরও সুন্দর দেখালো, এমনিতেই তিনি সুপুরুষ। হাসিতে যাকে সুন্দর মনে না হয় তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

আপনাদের গোয়ালের দুধটা কি হয়?

বেচে দি, তাতেই নুন তেল জ্বালানির খরচটা উঠে আসে।

আর চাল ডাল?

দানে পাই। এই শহরে যাঁরা আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের বাড়ীতে হাঁড়ি দিয়েছি। তাঁরা কিছু কিছু চাল ডাল জমান, সপ্তাহান্তে ছেলেরা গিয়ে নিয়ে আসে। হাঁ, খাদ্যের কথা হচ্ছিল শুনুন। সকাল বেলায় আমরা সকালে ছোলা ভিজানো, আখের গুড় আর আদার টুকরা খেয়ে থাকি। দুপুরে ডাল ভাত আর একটা যে কোন তরকারি। মালের মধ্যে নুন আর হলুদ। বিকালে জলযোগ মুড়ি চিঁড়ে ছাতু এই রকম কিছু। আর রাতের আহারও দুপুরের মতন।

এখানে বেতন ও খোরাকি মিলিয়ে ছাত্রদের কত দিতে হয়?

এক পয়সাও নয়।

আর শিক্ষকদের বেতন কি রকম?

পেটভাতা বলতে পারেন। ছাত্ররা বেতন দেবে না আর শিক্ষকরা বেতন পাবে এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। দেখুন শচীনবাবু সংসারে, যত অনর্থের সূত্রপাত ঐ বেতন দেওয়া নেওয়া থেকে। যদি ছোট মুখে বড় কথা মাপ করেন তবে বলি আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমের আদর্শ মহাত্মাজীর সাবরমতী আশ্রম।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ধরুন এখন যে সব দান পেয়ে থাকেন তা যদি কখনো বন্ধ হয়ে যায়—

তবে এই আশ্রম তুলে দিতে হবে, বুঝবো যে আমাদের আদর্শের উপরে লোকের আর আস্থা নেই। তবে সে রকম আশঙ্কা আছে মনে হয় না। এই দেখুন না কেন, আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে হুগলি আর বর্ধমান জেলায় আরও চারটি আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, একটি আরামবাগে। একটি নবগ্রামে, একটি গুসকরায় আর একটি ভেদুয়াশোলে।

ছেলেরা সব এখন কোথায় ?

ছাত্র শিক্ষক সবাই গিয়েছে খামারে কাজ করতে। শচীনবাবু, আমাদের দীন আয়োজন দেখে ভাববেন না এখানে গরীবের ছেলেরা আসে। মোটেই না। আমাদের পনেরোজন ছাত্রের মধ্যে বারোজন জমিদারের পুত্র, তিনজন বড় উকীলের পুত্র, আর এ দুটিকে নিয়ে হ'ল সতেরোজন।

আর শিক্ষকরা ?

তাঁরাও ঐ একই পথের পথিক, আমাকে নিয়ে পাঁচজন। তিনজন সরকারী চাকুরি ছেড়ে এসেছেন, অধ্যাপক ছিলেন, দু'জন পি, আর, এস, একজন পি-এচ-ডি, আর দুজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। আমাকে ঐ শেষের দু'জনের মধ্যে ধরতে পারেন। আমারও এখন খামারে থাকবার কথা, আপনাদের আশায় এখানে ছিলাম। সকাল বেলায় কেতাবী পড়াশোনা, বিকালে হাতের কাজ আর খামারের কাজ। কই, পায়খানার ব্যবস্থা কি রকম জিজ্ঞাসা করলেন না তো ?

ও আর কি জিজ্ঞাসা করবো।

জিজ্ঞাসা করবেন বইকি। আমরা একটা লম্বা ট্রেঞ্চের মতো খুঁড়ে ঝাপ দিয়ে ঘিরে নিয়েছি, কাজ শেষ হয়ে গেলে কিছু কিছু মাটি ছিটিয়ে ঢেকে দিলেই হ'ল। মেথরকে চিরকাল জাত-ব্যবসায়ে আবদ্ধ রাখা সামাজিক পাপ।

শচীন বলল, আমি ওদের নিয়ে গঙ্গার ধারটায় একটু ঘুরে আসি।

আসুন, তবে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ফিরবেন, তখন রাতের আহারের সময়। অবশ্য খাওয়ার আগে সবাই মিলে গান করে—রবিবাবুর গান, আর গুজরাটী সাধক কবি নরসিং মেহতার ভজন। খাওয়া হয়ে গেলে বাসন কোসন মাজবার পরে ছেলেদের আমরা গল্প বলি, ইতিহাসের গল্প, ভারতের অধঃপাতের কারণ, উন্নতির উপায়, দেশবিদেশে ভ্রমণের কথা এইসব। আচ্ছা আসুন।

নদীর ধারে এসে ওরা সকলে দেখতে পেলো মস্ত নদী।

লব বলল, বাবা, গঙ্গা নদী না ?

শচীন বল্‌ল, গঙ্গা, আবার ভাগীরথীও বলে।

কুশ বল্‌ল, বাবা মানচিত্রে হুগলি নদী বলে লেখা দেখেছি যে।

তার কারণ কি জানিস, ইংরেজরা ব্যবসায়ের জন্যে কল্‌কাতায় কুঠি গড়বার, আগে এই হুগলি শহরটায় কুঠি গড়েছিল, তাই তাদের আঁকা মানচিত্রে নদীটার নাম দিয়েছিল হুগলি।

আচ্ছা বাবা, কুশ এখনি বল্‌ল নদীটা আমাদের দিনাজশাহীর পদ্মার চেয়ে বড়। তোমার কি তাই মনে হয়।

না, পদ্মা অনেক বড়, তবে কি জানিস, পদ্মা গঙ্গারই একটা শাখা, পূর্ববঙ্গের নরম মাটিতে ঢুকে অনেক চওড়া হয়ে গিয়েছে।

শুনলে কুশ আমার কথা সত্যি কিনা।

শচীন বল্‌ল, এবারে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানকার থাকা খাওয়া কাজকর্মের ব্যবস্থা সব নিজেদের কানে শুনলে, দুধ দই ঘি নেই মাছ মাংস নেই, সন্দেশ রসগোল্লা নেই, দেখ ভালো ক'রে ভেবে দেখ, পারবি থাকতে ?

দু'জনে একত্রে বিতানিত স্বরে বল্‌ল, খুব, খুব পারবো।

কুশ বল্‌ল, তাই বলে তুমি আবার বাড়ী ফিরেই পিসিমাকে যেন বলো না যে আমরা দুধ খাইনে, তাহলে তখনি লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।

শচীন হাসলো. বল্‌ল, আচ্ছা সে যা হয় দেখা যাবে। এখন আশ্রমে ফিরে চল্‌।

সকলে ফিরে এসে দেখল দোতালার ঘরে সমবেত হয়েছে, জন বারো ছাত্র, জন চারেক শিক্ষক। গৌরহরিবাবু সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এরা আমাদের ছাত্র।

ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো। লব কুশও উঠে দাঁড়ালো।

আর এঁরা আশ্রমের শিক্ষক, আমাকে আশ্রমধারী বলতে পারেন। ধরণী-বাবু বর্ধমানে গিয়েছেন কাল আসবেন, তিনিও একজন শিক্ষক। চলুন এবারে নীচে আহারের স্থানে যাওয়া যাক। সিঁড়িতে নামতে নামতে গৌরহরিবাবু বললেন, রান্নার কাজটা আমরা শিক্ষকরা নিজেদের হাতে রেখেছি, ছেলেরা আগুনের কাছে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তবে পরিবেশনটা ছেলেরা করে, এখনি দেখতে পারেন।

শচীন নীচে নেমে দেখল—সারিবদ্ধ ভাবে চটের আসন পাতা, সম্মুখে থালা বাটি গেলাস। সকলে বসলে ছেলেরা পরিবেশন আরম্ভ করলো। শচীন বুঝলো

গৌরহরিবাবু অত্যুক্তি করেন নি, খাদ্যবস্তু যৎসামান্য, ভাত, ডাল তরকারি, তবে রান্নাটি ভালো আর সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছেলেরাই ঘর ধুয়ে ফেলল, আর বাসন মাজলো। তারপরে উপরে এসে দেখল, দোতালার দুটো ঘরে পাশাপাশি অনেকগুলি কম্বল পাতা, আর মাথার কাছে ছোট একটুকরো পিঁড়ির মতো কাঠ।

এই আমাদের শয্যা।

শচীন মিনিটখানেক পরে বল্‌ল, আপনাদের কোথায়?

ও শুণে ফেলেছেন দেখছি, আমাদের মাটিতে, আমরা মাটিতে না শুলে ওদের কম্বলে শুতে বলি কি করে!

এ যে দেখছি, Spartan simplicity,

যা বলেছেন, সামরিক সরলতা। সাবরমতীতেও এই নিয়ম। গান্ধীজি বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কাজেই জিনিসপত্রের ভার হাল্কা করে ফেলতে হবে। তিনি বলেন, সম্মুখে আসছে বিরাট আন্দোলন যার তুলনায় অসহযোগ আন্দোলন তুচ্ছ।

শচীন চুপ ক'রে শুনলো, কিন্তু তার মন তৈরি হয়ে উঠেছে সুরেন বাঁড়ুজ্জের প্রভাবে, সংবিধানের সোজা রেলের উপর দিয়ে তা চলতে অভ্যস্ত, এই যুদ্ধ বিগ্রহের কথা তার তেমন পছন্দ নয়। তার কাছে আন্দোলনের চরম স্বদেশী আন্দোলন।

আজকে আপনারা বিছানাতে শোন, কালকে যথোচিত ব্যবস্থা হবে।

লব কুশ বেঁকে বসলো, বল্‌ল, আমরা মাটিতে শোব।

বাবা, ছাত্রদের তো মাটিতে শোবার নিয়ম নেই, আর আজ অতিরিক্ত কম্বল নেই, কালকে সব ব্যবস্থা করে দেব। কি বাবারা, পারবে তো এখানে থাকতে না বাবার সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাবে, দেখো ভালো করে ভেবে।

নিশ্চয় পারবো, যমজ উত্তর যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের।

এমন সময়ে শচীন দেখলো একটি ছেলে এক বাটি তেল নিয়ে সকলের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, সকলে খানিকটা করে নিয়ে হাতে পায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে।

শচীনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে গৌরহরিবাবু বললেন, এই আমাদের মশার কামড়ের প্রতিকার। মশারির রূপান্তর বলতে পারেন।

শচীন বল্‌লো, বলেন কি, এতে মশা নিবারণ হয়!

দেখতেই পাবেন রাতের বেলায়। এখানে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সমস্ত সাবরমতীতে পরীক্ষিত। ওখানে সবাই তেল মেখে শোয় যদিচ স্নানের সময়ে

তেল মাখবার নিয়ম নেই। আর বাপুজি যখন জেলে থাকেন রাতের বেলায় কেরোসিন তেল মাখেন, ওখানে সরষের তেল পাবেন কোথায়। নিজে পরীক্ষা করে না দেখে কাউকে কিছু করতে বলেন না।

বালিশের বদলে ঐ কাঠের টুকরোও!

হাঁ ওটাও। আর ওঁর তো এখন ওঠাও লাগে না, উনি মাটিতে মাথা দিয়ে শোন।

শচীন স্বভাবগম্ভীর লোক নতুবা এইসব উক্তিতে হেসে ফেলতো। সে স্থির করলে, রুক্মিনীর কাছে লুকোতে হবে শয্যার এই সামরিক সরলতা। কারণ ছেলেদের বিছানার পারিপাট্য সম্বন্ধে তার মমতার অন্ত নাই, আর মলিনার কাছে দুধ না খাওয়ার কথা। সে প্রত্যহ দুবেলা নিজের হাতে দু'জনকে দু'গেলাস দুধ গিলিয়ে দেয়—ও মার্শাল ল থেকে কারো সাধ্য নেই তাদের বাঁচায়।

ভোরবেলায় জলযোগ শেষ হ'লে শচীন বল্‌ল, গৌরহরিবাবু, আজ আমি রওনা হব।

তবে আসুন, ওদের বাক্স দুটোয় দেখা যাক কি আছে?

শচীন বাক্স খুললে গৌরহরিবাবু বললেন, খদ্দরের ধুতি দেখছি, বেশ বেশ আপনারা খদ্দর পরেন দেখছি।

সব সময় না, তবে এখানে আসবার সময়ে বাবা খদ্দরের ধুতি কিনে নিতে বলেছিলেন।

বেশ করেছেন। তবে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে দেখছি বাক্সতে, এসব নিয়ে যান—বলে দুজনের চারখানা করে আটখানা ধুতি, চারটে খদ্দরের শার্ট, দু'খানা গামছা রেখে আর সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল্‌লেন, জুতো নিয়ে যান, দেখছেন তো আমরা জুতো প'র না এখানে। আর শচীনবাবু, একটা কাজ করুন। বাজারের মধ্যে বিশুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার বলে একটা দোকান আছে, সেখানে গিয়ে চারখানা কম্বল কিনে আনুন।

কতদামের কিনবো?

সে আপনাকে ভাবতে হবে না, এখানকার ছাত্রদের জন্যে বললেই তারা বুঝবে, চারখানায় টাকা ষোল লাগবে। দুপুরে খাওয়ার পরে যে গাড়ী তাতেই যাবেন এখন।

আচ্ছা, ছুটিতে ওরা বাড়ীতে যেতে পারবে তো?

ছুটি বলে তো আমাদের কিছু নেই, তবে প্রয়োজন মতো দু'দশ দিনের জন্যে যাবে বইকি।

এমন সময়ে পূর্বকথিত ধরণীবাবু প্রবেশ করলেন এক হাতে মস্ত একটা লাউ, অন্য হাতে লাউডগা—দেখুন কি এনেছি।

সকলে এসে জুটে আনন্দে কৌতূহলে কলরব করে উঠলো, শিক্ষকরা মনে মনে, ছাত্ররা মুখে মুখে।

গৌরহরিবাবু শুধালেন, কোথায় পেলেন ?

আর একজন শিক্ষক শুধালেন, কিনলেন ?

পয়সা দিয়ে এসব বিলাসখাদ্য কেনা এদের নিয়ম বহির্ভূত কাজেই দাম কত কেউ জিজ্ঞাসা করলো না।

আরে, স্টেশন থেকে নেমে আশ্রমে আসছিলাম এমন সময় গাঁয়ের এক গেরস্ত এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো।

কি চাই হে ?

এই পাশে আমার বাড়ী, একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।

আমাকে চিনলে কি করে হে ?

আজ্ঞে চিনি বই কি, আপনি গান্ধী আশ্রমের বাবু।

আমাকে বসিয়ে একটা গেলাসে করে কি নিয়ে এলো। কি আনলে হে ?

আজ্ঞে আমার খেজুর গাছের রস, একটু পান করতে আজ্ঞা হয়।

দিব্বি জিনিস। উঠতে যাবো এমন সময়ে এই দুটি জিনিস এনে দিল, দয়া করে নিয়ে যান, আশ্রমের বাবুদের সেবায় লাগবে। নেওয়া উচিত কি না ভেবে ইতস্ততঃ করছি দেখে বললো, আমার বড় ছেলেটি এখনো কারাবরণ করে আছে আপনারা সেবা করলে তারি খাওয়া হবে।

কারাবরণ কেন হে ?

পুলিশে মারপিট করছিল তাতে বাধা দিয়েছিল।

তা কতদিনের মেয়াদ ?

সামনে মাসের দশই ছাড়া পাবে।

তাকে নিয়ে একবার যেয়ো আমাদের আশ্রমে।

যাবো বই কি বাবু। এবারে শুনলে তো লাউ আর লাউডগার ইতিহাস।

প্রফুল্লবাবু আজ রাঁধবেন, রসায়নের অধ্যাপক, রান্না জমবে ভালো।

আহারান্তে যথা সময়ে শচীন বাড়ী রওনা হল, খেয়া নৌকায় হুগলি থেকে নৈহাটিতে নেমে ট্রেন ধরবে। আসবার আগে নব কুণ্ডের ট্রাঙ্ক ও বাড়তি

জিনিস গৌরহরিবাবুর জিম্মায় রেখে গেল, বল্‌ল, এসব এখানে ব্যবহার চলবে না শুনলে ওদের মা আর পিসিমা হকচকিয়ে যাবে। ক্রমে সব সইয়ে নিয়ে প্রকাশ করলেই হবে। তবে বাবা ও আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

লব কুশ তীরে দাঁড়িয়ে থাকলো, যতক্ষণ চোখ চল্‌ল উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে দেখল অবশেষে এক সময়ে লব কুশ দুটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে মিলিয়ে গেল আর শচীন খেয়ার অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেল—তখন ফিরে এলো আশ্রমে।

গাড়ীতে চলতে চলতে শচীনের মনে চিন্তা তরঙ্গ উঠতে লাগলো—এই গান্ধী আশ্রমগুলির স্বরূপ স্বাধীন ভারতের রূপ। এসবের মধ্যে তেজ থাকতে পারে কিন্তু রস কোথায়, আনন্দ কোথায়, একটা লাড্ডু উপহার পেলে যেখানে এমন উল্লাস পড়ে যায় সেখানে রসনার সংযম কোথায়, সেখানে ভ্রান্ত সংযমের নামে জীবনের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয় নি কি? তার মনে হল এই যদি স্বাধীন ভারতের রূপের ছবি হয় তবে তার জন্যে কোন আকর্ষণ অনুভব করলো না সে, কিন্তু একবারও তার মনে হ'ল না যে এগুলি হয়তো অহিংসবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প। শিবিরে কেমন করে পাওয়া যাবে গৃহের পরিবেশ।

বাড়ীতে ঢুকতেই শচীন প্রথমেই পড়লো মলিনার সম্মুখে।

এই যে দাদা কখন এলে? এখনি মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাদা, ওদের দুবেলা দুধ খেতে দেবে তো।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

খাওয়ার নিশ্চয় কষ্ট হবে না।

কষ্ট কেন হবে—আরও কত ছেলে আছে।

আচ্ছা দুবেলা মাছ দেয় তো, ওদের আবার মাছ ছাড়া ভাত ওঠে না মুখে।

মলিনা, ওখানে নিরামিষ আহার।

তবে, বলে সে গালে হাত দিল।

তবে, আর কি দুধ দই ঘি মাখন আছে।

হাঁ, দইটা ওদের খুব পছন্দ। ক্রমে সব সয়ে যাবে দাদা, কি বলো আরও ছেলে আছে তো।

আছে বই কি, সব বড়লোকের ছেলে।

ভ্রাতা ভগ্নীতে যখন এই কথোপকথন হচ্ছিল, পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল রুক্মিণী।

আচ্ছা, ওদের বিছানা করে দেওয়ার লোক আছে নিশ্চয়।

হাঁ, তা একজন আছে বই কি।

তারাই বুঝি রোজ বিছানা রোদে দেয়।

দেয় বই কি।

চাদর ওয়াড় এসব বদলায়।

বাঃ, না বদলালে চলবে কেন। নাও এখন আমাকে চা খেতে দাও পরে বাকি কথা শুনো।

স্বাধীন ভারতের অহিংস যোদ্ধাদের খাতিরে এতগুলি নির্জলা মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হ'ল শচীন। যজ্ঞেশবাবুকে অবশ্য সব কথা ও অবস্থা আনুপূর্বিক বলল, তারপরে সাবধান করে দিল মেয়েদের কাছে যেন প্রকৃত অবস্থা না বলেন, তাহলে এখানে তারা কান্নাকাটি জুড়বে, না হয় লোক পাঠিয়ে দেবে নিয়ে আসবার জন্যে—এই ভয়েই আমি ওদের বিছানা ট্রাঙ্ক হরিমোহনবাবুর জিম্মায় রেখে এসেছি।

যজ্ঞেশবাবু হেসে বললেন—একটু শক্ত হোক, শক্ত হোক। দুধ ঘি খাওয়া অনেক বড়লোকের ছেলেও তো আছে।

আছে বইকি বাবা।

সেটাই ভরসার কথা। আমাদের দেশের বড় লোকেরা অনেকেই অবশ্য অপদার্থ কিন্তু এখনো অনেকে জীবন নিয়ে পরীক্ষা করবার সাহস হারায়নি।

আর দরিদ্ররা?

যারা মনে দরিদ্র তারা অবশ্য আলোচনার বাইরে। আর যারা ধনে দরিদ্র তাদের মধ্যেও দুঃসাহসিক লোক আছে। যাক এসব আলোচনা পরে হ'তে পারবে, এখন কাপড় ছাড়ো গিয়ে।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এলো, শচীনদা ফিরেছেন নাকি?

অরবিন্দ যে—দাঁড়াও আসছি।

২৩

স্বদেশী কলেজে চাকুরি পেয়ে অরবিন্দ শহরে বাসা ভাড়া করেছে আর মাকে এনেছে। মা সহজে আসতে চায়নি, তার আপন শ্বশুরের ভিটের বাতি জ্বলবে না।

কেন জ্বলবে না বলে অরবিন্দ, এই তো মহিম আছে। কিরে মহিম পারবি নে?

মহিম ওদের ঠিক চাকর না, তবে বাড়ীর পাশে বাড়ী, নিজে চাষী কৈবর্ত,

অরবিন্দদের হাক ডাকের লোক। তারা তিন পুরুষ অরবিন্দদের অনুগত।

তা মাঠাকরুন, তুমি যাও না কেন, দিন কতক ঘুরে এসো, দেখে এসো দাদাবাবুর কি রকম বাসা বাড়ী হ'ল।

মহিম, তুই কি বলিস, বাড়ীতে বউ নেই কি দেখতে যাবো।

বাড়ী হ'ল এবারে বউ আসবে, দাদাবাবু তো এখন স্বদেশী দল ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী হয়ে বসেছে। তাই না দাদাবাবু।

অরবিন্দর মনে পড়ে মলিনার মুখ, কল্পনায় দেখতে পায় সে মাথায় আঁচলের প্রান্ত দিয়ে এঘর ওঘর করছে।

অরবিন্দ বলে, হাঁ হাঁ হবে, এখন মাকে রাজি করা।

এর মধ্যে আবার রাজি গররাজি কি। ছেলের বাড়ীতে মা যাবে তার আবার হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির কি আছে। তুমি গাড়ী নিয়ে এসো দাদাবাবু, দেখি মা ঠাকরুন কেমন না যায়।

অরবিন্দর বাসা বাড়ীতে পৌঁছে মা বল্‌ল, বাঃ, বেশ বাড়ী।

তুমি কিছু না দেখেই বলে দিলে বেশ বাড়ী, আগে একটু ঘুরে ফিরে দেখো।

ওরে আমার যা দেখবার দেখা হয়ে গিয়েছে।

বুঝেছি, তোমার দেখবার বলতে তো রান্নাঘর আর ঠাকুরঘর—তা দেখো, দুটোই পাশাপাশি, এঘর থেকে ওঘরে যেতে তোমার কষ্ট হবে না।

এটি বুঝি ঝি? কি নাম তোমার মা? মোক্ষদা। বেশ নাম। আমার সইয়ের ঐ নাম ছিল। অনেক কাল হল শ্রীবৃন্দাবনে লীন হয়েছে।

এখন তোমার সইয়ের ঠিকুজি রাখো মা, এবারে রান্নাঘরের দিকে একটু মন দাও, রাঁধুনী বামনি এলো বলে।

আমার রাঁধুনীতে কি দরকার, আমি কি রাঁধতে জানি না!

সে তো জানি না, তবে এখন একটু আরাম করো।

কি রকম লোক জানি না, নোংরা হবে কি হবে না, যার তার হাতে খেতে গা কেমন কেমন করে।

দেখই না কেমন লোক, আমি তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখেই রেখেছি।

রাঁধে কেমন?

খেয়ে বুঝো।

হাঁ রে, এখানে স্নান করিস কোথায়?

কেন, এই তো দেখছ কুয়োয়।

বাড়ীতেও কুয়ো, এখানেও কুয়ো, আমাকে পদ্মায় স্নান করিয়ে আনবি নে।

কেন আনবো না, তৈরি হয়ে নাও।

মা ঘুরে ফিরে দেখে বল্‌ল, বেশ বাসা, ছুটো শোবার ঘর দেখছি, বসবার ঘর একটা, ভিতরে বাইরে বারান্দা, রান্নাঘর ঠাকুর ঘর—সমস্ত বেশ ছিমছাম। তা কলেজে যাস কখন?

যখন ক্লাস থাকে, আজকে ছুটি।

ওরে অরু, এবার একটি বিয়ে কর।

এই নাও আরম্ভ হ'ল মায়ের পাঁচালি। বুড়ো হলাম, আর কি বিয়ের বয়স আছে!

বুড়ো হ'তে যাবি কেন ষাট, কতই বা বয়স হ'ল।

তা মন্দ হয় নি মা, তিরিশ পেরিয়েছে।

তিরিশ কি একটা বয়স। আর তিরিশ হলই বা কি করে, সেই বড় ঝড়ের বার হল তোর জন্ম।

মা, তোমার গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা রাখো! সেই ঝড়ের বার জন্ম হল, আর সেই বড় তেঁতুল গাছটা সেবারে প'ড়ে গেল তোর পৈতে হ'ল, আর সেই সেবার বন্যা হ'ল তুই বি. এ পাশ করলি।

রাখ্‌ রাখ্‌, আমি কি তোদের মতো লেখাপড়া জানি, আমাদের ঐ রকম করেই মনে রাখতে হয়।

এই নাও মা তোমার রাঁধুনী।

রাঁধুনী প্রণাম করলো।

তোমার নামটি কি বাছা? অন্নদা, বেশ নাম। তোমার স্বামী কি করেন বাছা?

জমিদারের গোমস্তা।

আর ছেলেরা?

ছুট ছেলে মা, ছু'জনেই পাঠশালায় পড়ে।

দিন তিনেক পরে একদিন মাকে নিয়ে গিয়েছিল যজ্ঞেশবাবুদের বাড়ীতে। ফিরে এসে তার আর গুণগান থামতে চায় না, রায় মশায় সদানন্দ পুরুষ মহাদেব, শচীন রূপে গুণে কার্ত্তিক, বউমা স্বয়ং লক্ষ্মী আর মেয়েটি—আহা যেমন রূপ তেমনি গুণ—

ওখানেই থামলে কেন মা, মহাদেব হ'ল লক্ষ্মী হ'ল কার্তিক হ'ল একে না হয় সরস্বতী বলো।

তা বাছা সরস্বতী বটে, আহা এমন মেয়েটির এখনো বিয়ে হয় নি কেন?

সরস্বতীর তো বিয়ে হয় নি মা।

ওসব তোর কলেজে পড়া বিদ্যা রাখ, আহা ঐ রকম একটা বউ হয় তোর।

অরবিন্দ হেসে উঠল।

হাসলি যে বড়।

তোমার কথা শুনে। এর পরে বলবে, আহা পূর্ণিমার চাঁদটা যদি তোর পড়বার ঘরের বাতি হ'তো, আকাশের সূর্যটা যদি তোর রান্নাঘরের উনুন হ'তো।

দেখ্ অরু, তুই এমন কি ছোট যে অমন মেয়ে তোর বউ হওয়া অসম্ভব।

ওদের কত টাকা জানো।

বাপের টাকায় কি মেয়ের পরিচয়, মেয়ের পরিচয় স্বামীর টাকায়। আর স্বামীর যদি টাকা না থাকে তা হ'লেও বাপের টাকা দেখানো চলে না। আহা, কি সুন্দর মুখের ডোলটি, যেন ফুলের কুঁড়িটি।

অরবিন্দ কিছুতেই থামতে দিতে চায় না নলিনার প্রসঙ্গ। তার অন্তর্যামী জানে, সে ঘাড় মোড় ভেঙে নলিনার প্রেমে পড়েছে। প্রসঙ্গটা জাগিয়ে রাখাতেই তার আনন্দ।

কি ফুলের কুঁড়ি মা, ঘেঁটু ফুল নয় তো।

তোর কি চোখ নেই! পদ্ম ফুলের কুঁড়ি।

তা না হয় ঘটকালি করো।

না বাবু, আমি কথা তুলে অপ্রস্তুত হ'তে পারবো না।

তাই বলো তোমার ইচ্ছা নাই।

তাই বটে! যা তুমি গুণের ছেলে, শেষ বেলায় বেঁকে বসবে, আমি বিয়ে করবো না।

আর ছেলে দুটিকে কেমন দেখলে?

চমৎকার। নামেও লব কুশ কাজেও তাই, দেখিস ওরা বাপ-ঠাকুর্দাকে ছাড়িয়ে যাবে।

রায়বাড়ীতেও অরবিন্দর মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। শচীন শুধালো, বাবা, অরবিন্দর মাকে কেমন দেখলে।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, চমৎকার, গ্রামের সরলতা আর শহরের সহবৎ মিলে চমৎকার ব্যবহার।

আমি ভাবছি বাবা চিরকাল যিনি পল্লীগ্রামে কাটালেন প্রথম সাক্ষাতে কেমন শোভন আচরণ করলেন, লজ্জার আড়ম্বর নেই আবার গ্রাম্য জড়তাও নেই এ কেমন করে সম্ভব হ'ল!

বাবা শচীন, তোমাদের জীবনটা হচ্ছে এ'টেল অব্ টু সিটিজ। দিনাজশাহী আর কলকাতা, কলকাতা আর দিনাজশাহী। বাংলাদেশকে তোমরা জানো না, বাংলাদেশ গোটাকতক শহরে নয়—দেশের মধ্যে ছড়ানো হাজার হাজার গাঁয়ে। সেখানে সভ্যতার জোলুস নেই তবে সভ্যতার আসল বস্তুটি আছে। বৃষ্টির জল যতই ঘোলা হোক হাজার ফুট নীচে গিয়ে যখন পৌছয় তখন নির্মল আর শীতল। সভ্যতার আসল বস্তুটি হচ্ছে সেই নির্মল শীতল পানীয়। তার সঙ্গে কেতাবী শিক্ষার সংস্রব নেই। এক কথায় এত দূর বলতে পারি যে এঁদের ঘরে মলিনা গেলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো।

শচীন বল্‌ল, সে তো এক রকম স্থির হয়েই আছে, কেবল গান্ধীজিকে অরবিন্দ কি চিঠি লিখেছে তার উত্তর পেলেই হয়।

সে তো অনেক দিনের কথা হ'ল, চিঠি জমিয়ে রাখবার অভ্যাস তো তাঁর নয়। তবে এখন জেলের মধ্যে আছেন, সে এক আলাদা জগৎ, নিশ্চয় চিঠি লিখবার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। তা তুমি একবার তাগিদ দাও অরবিন্দকে।

শচীন সংক্ষেপে বল্‌ল, তা দেব।

রুক্মিণী বলল, অরবিন্দর মাকে কেমন দেখলে মলি?

বেশ মানুষটি বউদি, একদিকে সরল আবার সম্ভ্রমবোধটিও আছে, দেখলে বসতে আসন দিতেই হবে, আর সব প্রশ্নের কেমন খোলা উত্তর দেন, মনের মধ্যে প্যাঁচ নেই।

যা বলেছ মলি, এ বিষয়ে মায়ে আর ছেলের বিস্তর তফাৎ।

মলি বাধা দিয়ে বলল বউদি যে প্রসঙ্গই উঠুক শেষ পর্যন্ত ঐ ছেলেটিতে এনে ফেলবে, তোমার সঙ্গে আর পারিনে।

খুব পারো ভাই খুব পারো। ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলবে আশায় সব সময় কাছে ঘুর ঘুর করে ঘুরছ।

উঠলাম তবে আমি—বলে-উঠবার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ করলো না।

কই উঠলে না যে।

যে জন্যে তোমার কাছে বসেছি তা আগে শেষ হোক, চুলটা বেঁধে দাও।

সত্যি কথা বলো তো, চুল বাঁধবার জন্যেই কি বসেছিলে?

নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারিনে, কি বলবার আছে বলো।

বলছিলাম মায়ের কাছে প্রশ্ন করলে সরল উত্তর পাওয়া যায়—কিন্তু ছেলেটিকে আমরা যে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, তার সরল হোক বাঙ্কম হোক কোন উত্তর এ পর্যন্ত পেলাম না—তাই বলছি।

বউদি, আবার বিয়ের কথা। একবার তুলে কি রকম অপ্রস্তুত হ'লে দেখলে তো। এখানে আবার কি ফ্যাকড়া উঠবে কে জানে। ওঁর ঐ নীরবতাকে আমার বড় ভয়।

যাক, নিশ্চিন্ত হ'লাম।

মলিনা তার নৈশ্চিন্ত্যের কারণ বুঝতে না পেরে শুধালো, কেন?

অরবিন্দবাবু যখন উনি হয়েছেন তখন আর চিন্তার কি আছে।

ওটা সঙ্গদোষে ঘটেছে।

আরে, আমিও তো সেই কথাই বলছি। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে সঙ্গটা কার।

এবারে ছেড়ে দাও, আমার চুল বাঁধা হয়েছে।

হয়নি, হয়নি, একটু দাঁড়াও ভাই বলে মলিনার খোঁপার উপরে হু'তিনবার থাবড়া দিল রুক্মিণী।

রাত্রিবেলায় রুক্মিণী স্বামীকে বল্‌ল, দেখো, তোমরা মলিনার বিয়ের দিকে মন দিচ্ছ না খুব ভুল করছ।

হাঁ বাবাও তাই বলছিলেন, আমি লব কুশকে হুগলিতে রেখে এসে কথাটা আবার তুলবো শচীনের কাছে।

আচ্ছা, আমি বুঝে পাইনে নিজের বিয়ের বিষয়ে গান্ধীজিকে কি লিখবার থাকতে পারে, লজ্জাও তো আছে।

রুক্মিণী, ওসব বিপ্লবীদলের কথাই আলাদা।

আমি বলি কি জানো, ওদের একবার কাছাকাছি আসবার সুযোগ দাও, তারপরে দেখবো কেমন বাছাধন গান্ধীজির উত্তরের অপেক্ষা করে থাকে। মনে রেখো ওদের দু'জনেরই এখন বয়স হয়েছে, এ খুকি নয় যে একটা উটকো লোক হঠাৎ এসে ঝুঁটি ধরে বল্‌বে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে এসেছি।

শচীন হেসে বল্‌ল, এই সহজ কথাটা বুঝতে সেদিনকার খুকি প্রায় বুড়ো হয়ে গেল।

মশায়, বুড়োটা শুধু এক পক্ষে হয়নি।

তাই রক্ষে। কিন্তু দুজনকে কাছাকাছি আসবার সুযোগটা কি করে দেওয়া যায় ভেবে রেখো।

ভেবে রেখেছি, এখন শীতকাল, চলো সবাই মিলে চর চিলমারিতে পিকনিক করতে যাওয়া যাক। বাস্, তারপরে আর ভাবতে হবে না, একটু নিরিবিলি পেলে বাছারা নিজেই সুযোগ করে নেবে।

শচীন বলে উঠ্‌ল, 'দি আইডিয়া।' আগামী রবিবারে গেলেই হবে, ইতিমধ্যে আমি ওদের হুগলিতে রেখে আসি।

হাঁ ওরা থাকলে নিরিবিলি পাওয়া মুস্কিল।

বুঝতেই পারছ।

অরবিন্দর ডাক শুনতে পেয়ে শচীন বের হয়ে এসে বল্‌ল, অরবিন্দ ভালই হয়েছে এসেছ, নইলে আমাকেই তোমার কাছে যেতে হতো।

কি এমন জরুরি কথা দাদা!

এমন কিছু নয়, যাওয়ার আগেই স্থির করে রেখেছিলাম যে ফিরে এসে একদিন বাইরে গিয়ে পিকনিক করে আসা যাক, শীতের দিন রোদে কষ্ট হবে না।

কোথায় যাবেন স্থির করেছেন।

চর চিলমারি কেমন?

চমৎকার জায়গা, দু'একবার বেড়াতে গিয়েছি।

তবে তাই চলো। ভোরবেলা জিনিসপত্র নিয়ে ঠাকুর চাকর চলে যাবে।

তারপরে?

আমরা যাবো, স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যারা যেতে চায়।

ভিড় বাড়ানো কি ভালো হবে?

সেই জন্যই তো ভাবছি মেয়েদের নেব না।

অরবিন্দর মুখে মেঘের ছায়া পড়লো, লক্ষ্য করলো শচীন।

ভাবছি কি জানো অরবিন্দ, পুরুষের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে নেওয়া যাক, নইলে রাঁধবে কে!

মেঘ কেটে গিয়েছে।

সেই ভালো দাদা, পিকনিকে গিয়ে নিজেরা না রাঁধলে আনন্দ নেই।

তবে সেই কথাই রইলো, মনে থাকে যেন রবিবার, আজকে হল

বৃহস্পতিবার।

শচীন ভাবলো একটা সুযোগ দেওয়া যাবে, অরবিন্দ ভাবলো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে; অদৃষ্ট ভাবলো শেষ রক্ষা হোক না হোক, দুটি অবোধ প্রাণীকে নিয়ে একটু খেলাতে দোষ কি?

সুযোগ সংসার-অরণ্যের মায়ামৃগ।

২৪

দিনাজশাহী শহরের কাছে পদ্মানদী প্রায় আট মাইল চওড়া, মাঝখানে মস্ত একটা স্থায়ী চর পড়ে গিয়ে নদীটাকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। চরটা আর বর্ষা কালেও সমস্তটা ডোবে না, মুসলমান চাষীদের স্থায়ী বাস সেখানে, তারা শীতকালে রবিশস্য লাগায়, মটর, কলাই, ছোলা, মুশুর, শষে প্রভৃতি, অন্য সময়ে ধান। পটলের চাষও আছে। এই সব দিনাজশহরে গিয়ে বেচে—এই তাদের জীবিকার উপায়। চরটা পুব পশ্চিমে প্রায় ৬।৭ মাইল লম্বা। চরটার দক্ষিণ দিকের পদ্মার শাখাটাই প্রবল—পরপারে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর দিকের শাখা শীতে এক মাইলের বেশি নয়, বর্ষার সময়ে দুই মাইলের মতো। এই চরের নাম চর চিলমারী।

সকাল বেলায় রায়বাড়ীর ঠাকুর চাকর নৌকা করে রান্নার উপকরণ ও বাসন কোসন নিয়ে চলে গিয়ে গাছপালার আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় উনুন খুঁড়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলো, আর বাবুরা দশটার আগেই গিয়ে পৌছলো। বাবু অর্থে এখানে শচীন মলিনা রুক্মিণী, আর অরবিন্দ, ভূপতি, নৃপতি ও আরও কয়েকজন স্বদেশী স্কুল কলেজের শিক্ষক। ভূপতি একটা গাছের ছায়া বেছে নিয়ে শতরঞ্চি পেতে তাস বের করলো, বল্ল, শচীন এবার তোমার অনুচর-পরিচরদের চা জোগান দিতে বল্ল।

পাশে অন্য একখানা শতরঞ্চিতে রুক্মিণী ও মলিনা বসেছিল, তারা বল্ল, আজ ঠাকুরদের ছুটি, আমরা চা নিয়ে আসছি।

ছুটি তবে সঙ্গে এনেছেন কেন?

চাল ডাল বাসন কোসন আগলাবার জন্যে।

উত্তম, তবে আপনারাই আসুন, আপনাদের জন্যেও আনবেন।

ওরা দুইজন চা তৈরি করতে চলে গেল।

ভূপতি বয়সে সকলের বড়, বয়সটা পঞ্চাশের রেখা ছুঁয়েছে, শচীন নৃপতি কয়েক বছরের ছোট, আর সকলে ত্রিশের এদিকে ওদিকে, অরবিন্দ ত্রিশ

পেরোয়নি। বয়সের গৌরবে সকলকে হুকুম হাকাম করবার অধিকার ছিল ভূপতির, মেয়েরাও এই সকলের মধ্যে পড়ে। মেয়েরা তাকে একটু বিশেষ খাতির করতো, শুধু বয়সের জন্যে নয়। ভূপতি অবিবাহিত। অবিবাহিত প্রবীণের প্রতি মেয়েদের একটু বিশেষ মমতা থাকে, আহা বেচারা গৃহসুখে বঞ্চিত।

পিকনিকের নামে অরবিন্দর একটু বেশি আগ্রহ হয়েছিল, ভেবেছিল শহর থেকে দূরে গেলে মলিনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কার্যতঃ দেখলো সুযোগ পাওয়ার আশা কম, সবাই আড্ডা জমিয়ে বসেছে, কেউ নড়তে চায় না, তাকেও যে নড়বার সুযোগ দেবে মনে হয় না। আশাভঙ্গ হওয়ার উপক্রম তার।

কই আপনাদের কোথায় ?

আমরা পরে খাবো।

পরে নয় এখনি, যান নিয়ে আসুন।

মলিনা বল্ল, বউদি তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি।

আপনি কেন যাবেন, আমি নিয়ে আসি বলে উঠতে গেল অরবিন্দ। দ্রুত পলায়মান সুযোগের কেশর আঁকড়ে ধরতে সে বদ্ধপরিকর।

অনধিকার চর্চা নাই করলেন, প্রত্যেক দিন কি আপনি আমাদের চা জোগান !

হায়, পলায়মান সুযোগটা পালিয়েই গেল। মাঝে থেকে অরবিন্দ অপ্রস্তুতের একশেষ।

ভূপতি বল্ল, অরবিন্দ, তোমার মধ্যে যদি এক বিন্দু শিভালরি থাকে। মলি বল্ল আর তুমি মেনে নিলে, যাও ছুটে যাও, বল্‌তো আমাকে !

সকলে হেসে উঠলো।

মলিনা অরবিন্দর রহস্য শচীন ও রুক্মিণী ছাড়া কেউ জানতো না—তাই ভূপতির ধিক্কার একটা সাধারণ রসিকতা বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী বল্ল, নিন, আপনারা তাস খেলুন, আমরা রান্নার দিকে যাই। অরবিন্দ, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো।

অরবিন্দ মনে মনে কৃতার্থ হ'য়ে বল্ল, সেই ভালো বউদি, আমি আবার তাস খেলতে জানি না।

আবার ওঁকে কষ্ট দেওয়া কেন !

পিকনিকে এলে একটু কষ্ট করতে হয়, আরামে খেতে হলে তো বাড়ীতেই

খেতে পারতো।

বউদি, আমি বরাবর লক্ষ্য করছি আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারেন।

তার মানে তুমি বলতে চাও, মলিনা বুঝতে পারে না।

অরবিন্দকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে মলিনা বল্‌ল, বুঝবার মতো কথা থাকলে অবশ্যই পারতাম।

শুনছেন বউদি।

আমি অনেককাল থেকে শুনছি, এবারে তুমি শোনো।

একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না তো।

কথাটা না শুনলে বলতে পারি না।

রুক্মিণী স্থির করেছিল ওদের মাঝখানে প'ড়ে ওদের মনের চলাচলের পথটা সুগম করে দিতে হবে—এছাড়া উপায় নেই।

কি, কথা থেমে গেলে কেন অরবিন্দ ?

বলছিলাম যে এতদিন আপনার ননদকে নিতান্ত অবোধ ভাবতাম—

কোন মেয়েই অবোধ নয়, তবে অবোধ পুরুষগুলোকে ঘায়েল করবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে অবোধের ভূমিকা গ্রহণ করে।

মলিনা বলে উঠ্‌ল, এসব কি বলছ বউদি, আমি চললাম, বলে হন হন করে সোজা মাঠের দিকে চলতে আরম্ভ করল।

শোনো ভাই শোনো, আমি তোমাকে বলিনি, মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলেছি মাত্র।

মলিনা থামলো না, চলতেই থাকলো। একি তার অবোধের ভূমিকা গ্রহণ নাকি!

অরবিন্দ, তুমি ওর পিছু পিছু যাও, অজানা জায়গায় কোথায় গেল দেখো।

হাঁ বউদি, বিপদ-আপদ হ'তে পারে।

অসম্ভব নয়—বলে মনে মনে হেসে ভাবলো বিপদকে তো সঙ্গেই পাঠালাম।

পলায়মান সুযোগের কেশর চেপে ধরেছে অরবিন্দ।

এ কি, আপনি আবার পিছু নিলেন কেন ?

বউদির হুকুম।

বউদির হুকুম এতই শিরোধার্য কেন শুনতে পাই।

আর কেউ হুকুম করবার নেই বলে।

থাকলে শুনতেন, না!

সময় হ'লে দেখা যাবে।

ততক্ষণে তারা সঙ্কীর্ণ আলের উপর দিয়ে হাত খানেকের ব্যবধানে চলতে সুরু করেছে। তু'দিকে ফুলন্ত শরষে ক্ষেতের মদির গন্ধ ওদের মগজের শিরায় গিয়ে পৌঁছতে সুরু করেছে, আর শরষে ফুলের সোনা আর শীতের রোদের সোনা পলে পলে স্বর্ণমৃগ ছুটিয়ে দিচ্ছে ওদের চোখে, আর কোথাও একটা ঘুঘু, কখনো মনে হয় খুব দূরে যেন অন্য জগতে, কখনো মনে হয় এত কাছে যেন বুকের মধ্যে, একটানা বিলাপধ্বনির সুধাবিন্দু নিক্ষেপ করে চলেছে, তুটি অবোধ নর-নারীকে কাছে টানবার ষড়যন্ত্রের এত আয়োজন ব্যর্থ হ'তে পারে না প্রকৃতির। ক্রমে তাদের কথোপকথনের শব্দ ও সুর ভিন্নমূর্তি ধারণ করতে লাগলো। তবু কথা যোগায় না কারো মুখে, নীরবে চলতে থাকে তু'জনে।

মলিনা ভাবে, কিছু বলে না কেন ?

অরবিন্দ ভাবে, কিছু বলবো কি ?

মলিনা ভাবে এত চিন্তা করবার কি আছে—বলবার কথা তো সংসারে গোটা তুই।

অরবিন্দ ভাবে অসংখ্য কথার কোন্‌টা দিয়ে আরম্ভ করি।

হঠাৎ মরীয়া হ'য়ে উঠে অরবিন্দ বল্‌ল, অনেকদিন থেকে ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলবো—

চলুন কিছু শরষে ফুল তুলে নিয়ে যাই, চমৎকার ভাজা হবে।

কার ক্ষেতের ফুল তুলবো ?

মলিনা বল্‌ল, এ সংসারে কার ক্ষেতের ফুল কে তুলছে তার কিছু ঠিক আছে কি !

ক্ষেতের মধ্যে নেমে তু'জনে ফুল তুলতে সুরু করলো।

আপনার ও রুমালে কুলোবে না, দিন আমার আঁচলে।

ইতিমধ্যে শরষে ফুল উগ্রতর সুরা ঢেলে দিয়েছে ওদের স্নায়ুতন্ত্রীতে, তারই প্ররোচনায় অরবিন্দ বলে উঠ্‌ল, এবারে সেই কথাটা সেরে নিই—

ঐ দেখুন লঙ্কা ক্ষেতে সবুজে লালে লঙ্কাগুলোর কি বাহার, কিছু তুলে নেওয়া যাক্।

কার ক্ষেত, কার ফসল নেবো ?

অরবিন্দবাবু, সংসারে সবাই অন্যের ক্ষেতের ফসল নিচ্ছে।

তাই বলে আমরাও নেবো।

না নিলে ঠকবেন।

লঙ্কা ক্ষেতের কাছে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলো—ও দিদিঠাকরুন, কি নেবেন? লঙ্কা! নেন যত খুশী নেন।

দাম?

লোকটি জিভ কেটে বল্‌ল, আপনারা আমার বাড়ী বয়ে দুটো লঙ্কা নিতে এসেছেন তার আবার দাম দিতে চান। কি শরম। আর এক কাজ করেন কচি মটর শাক নিয়ে যান। ও হায়তুল্লা এক ডালা মটর শাক তুলে দে দিদি ঠাকরুণকে। চিনতে পারলিরে—বুড়ো রায়বাবুর মেয়ে।

তুমি চেনো নাকি আমাকে।

চিনি না! কতদিন আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে পটল বেচে আসছি। তা রায়বাবু ভালো আছেন তো? ভাল্লো থাকবেন বই কি! আল্লার দোয়ায় আপনারা সবাই ভালো থাকেন। তা এ বাবুটি কে দিদি ঠাকরুন?

মিঞা তোমার লঙ্কা কি খুব ঝাল?

খুব ঝাল নয়, মিঠে রকম ঝাল।

মিঠে ঝাল আবার আছে নাকি।

নাই! দুনিয়ায় এক স্বাদের জিনিস আছে নাকি। সব নানা স্বাদের মিলন। তিতোর সঙ্গে মিষ্টি, ভালোর সঙ্গে মন্দ, লালের সঙ্গে সবুজ, কালোর সঙ্গে শাদা, এক স্বাদের তো কিছু দেখলাম না।

মলিনা যখন বুড়োর কথা শুনছিল অরবিন্দ দেখছিল বুড়োর চেহারা। লোকটার চুল পেকে গিয়েছে, চিবুকে এক গোছা দাড়ি সাদা, চোখের ভুরু, চোখের পাতার লোম সব সাদা, এমন কি চোখের তারা দুটোও সাদা, গায়ে সস্তা দামের একখানা চাদর সেটাও সাদা, গায়ের রঙটাও সাদা।

এমন সময় ছেলেটি একডালা মটর শাক এনে দিল তার মধ্যে সবুজে লালে মেশানো এক মুঠো লঙ্কা। ছেলেটি বল্‌ল, বাপ জান, এরাই বুঝি ওখানে চড়িভাতি করতে এসেছে।

আসবে বই কি! আগে আরও কত আসতো, এই স্বদেশী হাওয়া দিয়ে অবধি এখন কিছু কম। তা গান্ধীবাবু কেমন আছে, সরকার কি তাকে ছেড়ে দিয়েছে না এখনো জেলে রেখেছে। আহা, অমন লোককেও জেলে ধরে রাখে। গান্ধীবাবু তো খারাপ কিছু বলেনি, বলেছে চরখা কাটো, নিজের কাপড় নিজে তৈরি করো, এর মধ্যে খারাপ কথাটা কি!

অরবিন্দ শুধালো, তোমাদের গাঁয়ে কি চরখা চলে?

চলে না, খুব চলে, আমাদের বউ ঝি অনেকেই চরখা কাটে।

সুতো দিয়ে কি করো ?

আমাদের গাঁয়ে এক ঘর তাঁতি আছে, কাপড় বুনে দেয়—এই কাপড়খানা দেখো, একটু খাটো, তা হোক নিজেদের হাতে বোনা তো।

উৎসাহিত হয়ে অরবিন্দ বল্ল—এই তো চাই মিঞাসাহেব, সবাই মিলে চরখা কাটলে স্বরাজ হ'তে আর দেরি কি।

স্বরাজ কারে বলে দাদাবাবু ?

বুঝলে না মিঞা সাহেব, এই যেমন সবাই মিলে সুতো কাটা, কাপড বোনা এই রকম।

তাই বলো। তাহলে আমাদের তাঁতি-পাড়ায় স্বরাজ হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাঁতি-পাড়ায় হলে তো চলবে না, সারা দেশটায় হওয়া চাই।

বলো কি দাদাবাবু, সারা দেশ সুতো কাটলে তাঁত বুনলে অন্য কাজ করবে কে, আর এত কাপডই বা পরবার লোক কোথায় !

অরবিন্দর মনে পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ প্রায় এই রকম উক্তি একাধিক বার করেছেন, এখন এই রকম নিরক্ষর চাষীর মুখে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো যদিচ গুণগত ভাবে দু'য়ে অনেক তফাৎ।

মলিনা বুঝলো তর্ক বাঁকা পথ ধরেছে, নিরক্ষরের কাছে স্বাক্ষরের পরাজয়ের আশঙ্কা প্রবল। তাই সে চাইল তর্কের অবসান ঘটাতে বলল, মিঞা কেন শোনো দাদাবাবুর কথা। দাদাবাবু নিজে চরখা কাটে না।

কেন দিদিঠাকরুণ।

চরখা নেই বলে।

তবে কি করে ?

পরের চরখায় তেল দিয়ে বেড়ায়।

বুড়ো রসিকতা বুঝলো, হো হো করে হেসে উঠে উদ্‌ঘাটিত করে দিল দাঁতের আত্যন্তিক অভাব।

এখন আমরা আসি মিঞা, অনেক জিনিস দিয়েছ, এ বেলা তো হবেই, ওবেলাও হবে।

ওদিকে কমনে চললে ?

বড় গাঙটা দেখে আসি।

যাও যাও, দেখবার লায়েক গাঙ বটে, এদিকেরটা তো মরে হেজে যাওয়ার মধ্যে—ঐ যা বর্ষার সময়ে একটু জোর ধরে।

আবার আলপথে দুইজনে।

আর একটু হলেই বুড়োর কাছে বিপদে পড়েছিলেন দেখছি।

মুর্খের সঙ্গে তর্ক করার বিপদ আছে বই কি।

দেশের চোদ্দ আনা লোক যদি মূর্খ হ'ল আপনার মতো দু'চার জন পণ্ডিত হয়ে কি লাভ।

লাভ এই যে ওদের বোঝাতে পারছি।

পারলেন ওকে বোঝাতে। আমি না বাঁচালে তো নাজেহাল হয়ে যেতেন।

এমন সময়ে একটা গলাভারি কোকিল মাথার উপর দিয়ে ডেকে উড়ে চলে গেল। বাংলা দেশের কোকিল পঞ্জিকা মানে না।

ঐ বুড়ো মুসলমানটি গান্ধীর উল্লেখ করেছিল, সেই থেকে অরবিন্দর স্মৃতি জুড়ে বসেছেন গান্ধী। তাঁকে একখানা চিঠি লিখে একটি সমস্যার সমাধান জানতে চেয়েছিল অরবিন্দ, তার ধারণা হয়েছিল উত্তর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এ ধারণার মূল কি সে-ও ভালো করে জানে না; যিনি এতবড় একটা দেশের ভাগ্য নিয়ে খেলছেন তিনি যে একজন নগণ্য স্বল্পপরিচিত এক যুবকের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য সময় ব্যয় করবেন তা কেমন করে হবে। যেমন করেই হোক হবে। অমেয়জ্যোতি সূর্যের প্রতিবিম্ব কি ছোট্ট একটি অঙ্গুরীয়ে ধরা পড়ে না! অরবিন্দ চিঠি লিখবার পরেই গান্ধীজি জেলে যান। সে অবশ্য জানতো চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছবে। তবে জেলের মধ্যে চিঠিপত্র লিখবার নিয়মের কড়াকড়ি, তাই উত্তর পেতে দেরী হবে। দেরী হয়েছিল বটে, তবে উত্তর এল। সে উত্তর যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সরল, তেমনি সতেজ, আর সেই জন্যেই অরবিন্দর পক্ষে অস্বস্তিকর। চিঠিখানার মূল বক্তব্য হচ্ছে—বিবাহ করে যাকে জীবনের সঙ্গিনী করতে যাচ্ছ, কোন কথা, তা যতই আপাতদর্শনে অপ্রীতিকর হোক, গোপন করা উচিত নয়। মূল বক্তব্যর সঙ্গে অরবিন্দর মত মেলে—কিন্তু যা মতে মেলে কাজে করা কি অত সহজ। অনেকবার ভেবেছে কথাটা মলিনাকে বলবে সুযোগ পায়নি, শচীনকে বলবে সাহসে কুলোয় নি, বাধ্য হয়ে সেটিকে গোপনে মনের মধ্যে লালন করে এসেছে, তবে এটাও স্থির করেছে, বিবাহ করবার আগে কথাটি নিঃশেষে পৌঁছে দেবে মলিনার কানে, তারপরে যা থাকে কপালে। আজ সুযোগ এসেছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না—যদি মলিনা পিছিয়ে যায়, সে যে মলিনাকে ভালোবেসে ফেলেছে। সন্ত্রাসক দলের নীতি অনুযায়ী নরহত্যা সে করেছে, একটি মাত্র, কিন্তু সে রকম নরহত্যা মলিনার ভাই সুশীলও করেছে। কিন্তু অরবিন্দর ক্ষেত্রে যে সেই সঙ্গে

আরও কিছু আছে।

অরবিন্দ যখন এই সব কথা ভাবতে ভাবতে চলছিল আলের উপর দিয়ে, মলিনা তখন কয়েকটি শরষে ফুল নিয়ে ঘাসের ডোর দিয়ে বাঁধছিল একটি তোড়া, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সেই ক্ষুদ্র তোড়াটি অরবিন্দর হাতে দিয়ে বল্‌ল নিন।

অরবিন্দ অবাক হ'য়ে গিয়ে বল্‌ল, এ কি ?

আপনাকে দিলাম।

কেন ?

চোখে যাতে শরষে ফুল দেখতে এদিক-ওদিক হাতড়াতে না হয়।

কিন্তু কেন ?

মাঝে মাঝে চোখে শরষে ফুল দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

মাথা-মুণ্ডু কি বলছে ভালো করে না ভেবে সে বলে উঠ্‌ল, জানেন আমি নরহত্যা করেছি।

জানি বইকি। মনে হচ্ছে এবার নারী হত্যা করবেন।

আবার কি বলছে না ভেবে বলে উঠ্‌ল, নাঃ ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

মলিনা কৃত্রিম স্বস্তির সঙ্গে বল্‌ল—যাক জগতের নরনারী বেঁচে গেল।

না ঠাট্টা নয়।

বাপরে, হত্যা নিয়ে কি ঠাট্টা সম্ভব। আসুন এখানে বসা যাক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

তারা বড় গাছের কাছে এসে পড়েছে।

মলিনা শুধালো, অরবিন্দবাবু আপনি গান জানেন ?

অরবিন্দ হয়তো স্থানমাহাত্ম্যে অন্যমনস্ক ছিল প্রশ্নটার মর্ম না বুঝে বলে উঠ্‌ল, গান নয় পিস্তল।

উত্তর শুনে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল মলিনা, আপনি কি আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেন না।

যে পুজোর যে মন্ত্র বুঝলেন না, গান দিয়ে গুপ্তহত্যা হবে কি করে ?

আমি বাংলা গানের কথা বলছি।

তার চেয়ে বলুন দেশী গান। তাতে হয় তো টোটা আদৌ বের হবে না।

কি মুস্কিলেই পড়া গেল। গান বলে একটা বাংলাশব্দ আছে জানেন, যার প্রতিশব্দ সঙ্গীত।

অরবিন্দ এতক্ষণে অকূলে কূল পেলো, বলে উঠ্‌ল, তাই বলুন।

তবু যে ভালো বুঝেছেন, বলছি একটা গান করুন। অনুরোধ করছি বললে যদি খুশি হন তবে অনুরোধ করছি। শুনেছি আপনি ভালো গান করতে পারেন।

ভালো মন্দ জানি না, এক সময়ে করতাম, বন্দীজীবনে অনেক সময় কাটিয়েছি, তবে আপনার মতো শ্রোতা কখনো পাইনি।

এখন তো পেলেন, করুন।

কি গান করবো ?

ঠিক এ সময়ে যে গানটি আপনার গাইতে ইচ্ছা করছে।

অরবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে একটু গুন গুন করে আরম্ভ করলো—

'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত
ছল করে
ওগো, ঘরে ফিরে চলো, কনক কলসে
জল ভরে।'

অরবিন্দর কণ্ঠ মধুর, শব্দ অনবদ্য, সুর রহস্যময়। তিনে মিলে মলিনার কর্ণমূল রক্তিম করে তুলল। কিন্তু অভিযোগ করবার কিছু নেই, নিজের জালে নিজে জড়িয়েছে—'অপনা মাংসে হরিণী বৈরী'।

অরবিন্দ তন্ময় হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে গেয়ে চলেছে—

হেরো যমুনাবেলায় আলসে হেথায়
গেল বেলা
যত হাসি ভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত ছলভরে।'

এবারে মলিনার আপেলের মতো সুডোল কপোল তপ্ত হয়ে উঠেছে। সে দেখছিল শীতের পদ্মায় নিস্তরঙ্গ বারিবিস্তারে পান্নার অচঞ্চল চাদর; সে দেখছিল নির্মল নির্মেঘ নিষ্কলঙ্ক নীলানির্মিত নীলাভ্রের খিলান নত হয়ে পড়েছে। সে দেখছিল না শুনছিল বুঝতে পারছিল না।

হেরো নদীপরপারে গগন কিনারে
মেঘমেলা
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখপরে
কত ছল ভরে

শুনছিল—

কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত ছল ভরে।

মলিনা দেখতে পায় আকাশের নীলায় আর পদ্মার পান্নায় তৈরি একটি দিব্য দাঁড়, ঝুলছে শীতের রোদের সোনার শিকল; ভাবে কিন্তু পাখীটা কোথায়? বসেনি না বাঁধন কেটে পালিয়ে গিয়েছে।

গান থেমে গেল। গান থেমে গিয়েও তো থামে না, ডুব সাতারে তার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে মনের মধ্যে। কিছু রুক্ষভাবে মলিনা বলে উঠ্‌ল, আপনার কি আর গান জানা ছিল না?

বিস্তর।

তবে?

আপনি বললেন ঠিক এ সময়ে যে গানটি আমার গাইতে ইচ্ছা করছে সেটি গাইতে।

আপনার ইচ্ছার বলিহারি যাই। গান থাক, অন্য প্রসঙ্গ করুন।

সেই ভালো, অনেকদিন থেকে ইচ্ছা আছে আপনাকে একটি কথা বলবো।

আর আমার ইচ্ছা আছে যে তা শুনবো না।

গান্ধীজিকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম তিনি উত্তর দেবেন।

যত বেকারে তাঁকে চিঠি লেখে আর যত নির্বোধে ভাবে উত্তর দেবেন।

কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছেন।

তবে আর কি, জনে জনে বলে বেড়ান।

জনে জনে বলে বেড়াবার মতো নয়। শুধু আপনার কানের জন্যই সে উত্তর।

বেশ কান খুলে আছি।

অরবিন্দ মুখ খুলবার উপক্রম করছে এমন সময়ে টানাস্বরে হুইসিল বেজে উঠলো।

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল, একি!

স্থির হয়েছিল যে পর পর তিনবার হুইসিল বাজলে বুঝতে হবে রান্না হয়েছে খেতে এসো। আর একটানা হুইসিল বেজে চললে বুঝতে হবে, গুরুতর কিছু ঘটেছে, যে যেখানে আছ শীঘ্র এসো।

সঙ্কেতের গুরুত্ব বুঝে ওরা পড়ি কি মরি করে ছুটে চলল। কাছাকাছি

এসে দেখতে পেলো সকলেই হাত নেড়ে অপরকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে, আরও কাছে এসে দেখতে পেলো সকলেরই যেন উৎফুল্ল ভাব, আর একেবারে শ্রুতি-গোচরতার মধ্যে এসে পড়লে শচীন উচ্চস্বরে বল্‌ল, অরবিন্দ, গুড নিউজ, বাবা লোক যোগে খবর পাঠিয়েছেন গান্ধীজি মুক্তি পেয়েছেন।

সকলে মুহূর্ত্তকাল স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

বন্দেমাতরম,
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

গান চলবার সময় সেই বুড়ো চাষীটি এসে একান্ত নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। গান থেমে গেলে সে জিজ্ঞাসা করলো, কি খবর বাবু?

গান্ধীজি মুক্তি পেয়েছেন।

তার মানে ছাড়া পেয়েছেন, কি বলেন।

হাঁ, ছাড়া পেয়েছেন।

বুড়োটি বল্‌ল, আল্লার দোয়ায় ভালো থাকুন—বড় ভালো লোক, গরীবের কথা ভাবেন গান্ধীবাবু।

২৫

অল বেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডায় পাত্র-পাত্রীতে কিছু বদল হয়েছে। পাত্রী নেই, কোন কালেই ছিল না, ওটা কেবল রীতি রক্ষামাত্র। তারাচরণ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পরে এখন আড্ডাধারী অক্ষয় ফৌজদার, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রবৎ সমস্ত আগলে রয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রই বটে। বয়সে প্রবীণ ও প্রায়ান্ধ। একটা চোখে ছানি পড়লে সকলে পরামর্শ দিল, যান কল্‌কাতা গিয়ে কাটিয়ে আসুন। পয়সা কোথায় বলে নিষ্কাম অর্থযোগী এই শহরে সুলভে ছানি কাটাতে গেলে চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় চোখের ছানিটা চোখের তারাকে প্রায় পূর্ণগ্রাস করে ফেলেছে, সামান্য একটু আবছা রকমের দেখতে পান। সকলে পরামর্শ দেয় এবারে আর অবহেলা করবেন না, যান কল্‌কাতায়। তিনি বলেন যতদিন চলে চলুক, কাজেই বর্তমানে তিনি চৌদ্দ আনা অন্ধ। ধৃতরাষ্ট্র খঞ্জ ছিল কিনা জানা যায় না, শারীরিক বিকলতার মাত্রায় তিনি তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন—এক পায়ে খঞ্জ। কোন রকমে নীচ তলায় এসে দাঁড়ালে আড্ডার বেয়ারাদ্বয় পীতাম্বর ও শীতল তাঁকে ধরে উপরে নিয়ে আসে, এসেই তিনি তাকিয়ে অবলম্বন করে চিৎ হয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেন—কই, কে কে আছ হে?

বীরেন চৌধুরী বলে—এই যে আমি বীরেন।

বেশ বেশ, তোমার ছেলেটি তো ডেপুটি হয়েছে, লক্ষ্য রেখো যেন মানুষ-খেকোদের দলে না ভিড়ে যায়।

মানুষ-খেকো কারা ?

ঐ যে গান্ধী বাবার চেলারা। পরের ছেলের চাকুরি খেতে ওদের জুড়ি নেই অথচ এদিকে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের টাকাটা, না বাবু কে আবার কোথা থেকে শুনতে পাবে, আর এই হরিপদ তো এখন নাম কাটা সেপাই—

এই উক্তির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। কিছুদিন আগে পুলিশ সাহেব রবিনসন শ দেড়েক ছেলে বুড়োকে চালান দিয়েছিল, হরিপদর অনুরোধক্রমে পুলিশ সাহেব তার নামটা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল একটু স্বদেশী করাও হল, আবার ছাড়া পাওয়াও যাবে। কিন্তু অবস্থাক্রমে হল বিপরীত। পিল্লাই সকলকে খালাস করে দিয়ে হরিপদকে এক মাসের মেয়াদ দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট অনেক দিন থেকে হরিপদর দুমুখো নীতি দেখে তার স্বরূপ বুঝেছিল, এবারে প্রথমে সুযোগেই শোধ তুলল। বন্ধুরা বলল, আপীল করো। হরিপদ দেখলো, স্বদেশী বলে এই দাগটুকুকে কৌশলে প্রয়োগ করতে পারলে লাভ হতে পারে। সে বলল, ছিঃ এই শয়তানী সরকারের কাছে আপীল করবো, ধিক, তারা বুঝলো হরিপদর পরিবর্তন হয়েছে।

সত্যই পরিবর্তন হয়েছে, এখন সে জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি।

ফৌজদার শুধালো, হরিপদ, অনেক দিন ন-চ খ-চকে দেখি না, ব্যাপার কি ?

তাদের কথা আর বলবেন না স্যার, তারা কংগ্রেসের তবিল তছরুপ করে সরে পড়েছে।

এ আর এমন কি কথা। কংগ্রেসের তবিল তো তছরুপ হওয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছে।

বীরেন চৌধুরী বলল, নালিশ করো।

ভায়া, ন-চ খ-চ সেদিকে বড় হুঁশিয়ার। কংগ্রেসের রিজোলিউশান আছে তিন বছরের মধ্যে আদালতে যাওয়া চলবে না। ন-চ খ-চ জানে তিন বছর পরে টাকাটা তামাদি হয়ে যাবে।

তা হ'লে টাকাটা চাপা পড়ে গেল।

চাপা পড়বে কেন, রায় মশায় প্রেসিডেণ্ট তিনি পুরিয়ে দিয়েছেন।

ঐ এক গর্ভস্রাব। ছিলি রায় বাহাদুর, মহারানীর শ্রাদ্ধ করলি, আমরা ভাবলাম এবার সি, আই, ই হয় কি জায়গীর পায়, সে সব চুলোয় দিয়ে ফোতো

গান্ধীর দলে ঢুকে ফোতো হতে চলেছে। আবার শুনছি নাতি দুটোকে কোন্ গান্ধী আশ্রমে দিয়েছে। তোমরা দেখে নিয়ো, সব শুদ্ধ পথে বসবে।

হরিপদ বল্‌ল, ওসব কথা এখন থাক দাদা।

ফৌজদার উষ্মা পরবশ হয়ে বলে উঠ্‌ল, থাকবে কেন ভায়া। ন-চ থ-চর জায়গায় ঢুকলো হরিপদ, চোরের জায়গায় ডাকাত। ওরা ফাণ্ড মেরেছে, এ কংগ্রেসের বাড়ীটা সুদ্ধ বেচে স'রে পড়বে।

বীরেন বল্‌ল, কি বলছেন দাদা, একটা লোকের মুখের উপরে—

হরিপদ বল্‌ল, তাছাড়া এমন অপরাধের ভবিষ্য পুরাণ বর্ণনা—

বীরেন বল্‌ল, ঠিক বলেছ হরিপদ ভায়া, কি হয়েছে তাই জানা যায় না আর কবে কি হ'তে পারে তারই ব্যাখ্যা।

বীরেন, আমি অন্ধ আর ত্রিভঙ্গ হয়ে শুয়ে আছি বলে ভেবো না কোন দরকারী খবর আমার অজানা থাকে। আচ্ছা, তোমার বন্ধু হরিপদকে জিজ্ঞাসা করো তো কিছুকাল হ'ল তারা চক্রবর্তীর বিধবার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করেছে কেন?

হরিপদ বল্‌ল, বীরেন কেমন করে জানবে, আপনি বলুন না।

বলবো বই কি, আমার চক্ষুলজ্জা নেই। তুমি তারা চক্রবর্তীর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করছ যে রাধার নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকা কিছু নয়, রাধা যদি স্বদেশী দলে মিশে থাকে তবে সরকার টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

হরিপদ বাধা দিল, আপনি এত জানেন আর জানেন না যে টাকার উপরে অধিকার মাকে দিয়ে গিয়েছে রাধা।

হরিপদ, তুমি জ্ঞানপাপী। তুমি বেশ জানো, দিয়ে গিয়েছে টাকা তোলবার অধিকার টাকার অধিকার নয়। তারপরে শোনো বীরেন, রাধার মাকে জপাচ্ছে যে টাকাটা আমার নামে ট্রান্সফার করে দিন। কেমন হরিপদ ঠিক বলছি কিনা।

সংবাদ-সংগ্রহের নিখুঁৎ বিবরণে হরিপদ সত্যই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তবে তার বিস্ময়ের হেতু নেই। অপ বেঙ্গল লোন আফিস থেকে ফৌজদার অবসর নিলে সে স্থান অধিকার করলো বিনোদ চক্রবর্তী, ফৌজদারের অধীনে দীর্ঘকাল সহকারীর কাজ করেছে, বরাবর শহরে থাকে ফৌজদারের বাসায়। ব্যাঙ্কের নাড়ি নক্ষত্র জানায় ফৌজদারকে।

হরিপদ বল্‌ল, বীরেন ভায়া চলো যাওয়া যাক আজ বিকালে সূত্রযজ্ঞ আছে।

ও সবাই মিলে চরখা ঘুরোবে বুঝি! যাও যাও, চরখা ঘুরিয়ে যে হাতে

বাত ধরবে। কংগ্রেস ব্যাধি বাধাতেই পারে, নিরাময়ের উপায় জানে না।

চরখাই তো নিরাময়ের উপায়।

আরে বাপু, ও সব কথা চ্যাংড়াদের বুঝিয়ো আর পাড়াগাঁয়ের মুখ্যুদের। চরখা কাটলেই যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে দেশ পরাধীন হ'তে গেল কেন? নবাবী আমলে তো সারা দেশ চরখা কাটতো। ওতেই যদি অশ্বত্থামার দুগ্ধ পানের মতো খুশি হয়ে থাকো তবে হও, কিন্তু এ-ও বলছি কংগ্রেস আর বেশি দিন নয়।

দুজনে বিস্ময়ে বলে ওঠে, সে কি দাদা!

সে কি দাদা, ন্যাকা সাজা হচ্ছে। এবারে যে বাঘের উপরে টাঘ পড়েছে।

সে আবার কি দাদা।

ঐ যে স্বরাজ পার্টি। এর মূলে আছে বাঙাল বাচ্চা যে দশলাখ টাকার ব্যবসা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে দেশের জন্যে ফকির সেজেছে। এ তোমার নেংটে গান্ধী নয়। আর আছে মোতিলাল নেহরু, যার নামে সারা উত্তর ভারত কাঁপে, সে-ও দশ লাখ টাকার ব্যবসা ছেড়ে চাকরি নিয়েছে। দেখে নিয়ো তোমার কংগ্রেসের দশা।

বীরেন বললুম, দাদা, এ আপনার ভুল, স্বরাজ পার্টি কংগ্রেসের একটা শাখা বই নয়।

ভায়া হে, শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজের শাখা বই ছিল না, মামা ভাগ্নের সম্বন্ধকে ও ছাড়া আর কি বলবো। ঐ শাখার হাতেই তো পতন হল মূল বৃক্ষের।

দাদা, আপনি বড় সিনিক হয়ে পড়েছেন।

সিনিক কি সাধে হয়েছি, অনেক দেখলাম, যে অনেক দেখে সিনিক ছাড়া আর কি হবে সে।

বেঁচে থাকলে সবাইকে অনেক কিছু দেখতে হয়।

তবে তারাও সিনিক হয়। কত দেখলাম। দেখলাম সুরেন বাঁড়ুজ্জের ঘর কাঁপানো বক্তৃতা, শেষ পর্যন্ত স্যার হ'ল, মন্ত্রী হ'ল, আবার হেরেও গেল। দেখলাম বারীন ঘোষের বোমার দাপট, এখন শুনছি বোষ্টম হয়ে নামগান সুরু করেছে। আবার দেখছি তোমার গান্ধী বাবার নেংটে পন্থা। আমি বলছি দেখে নিয়ো লোকটা দেশটাকে ডোবাবে, শেষ পর্যন্ত হয় সরকারী খেতাব নিয়ে তোমাদের অকূলে ভাসিয়ে দেবে, নয় কারো হাতে লাঠিতে বা গুলিতে মরবে। ভায়া হে, ও সব লোকের পরিণাম কখনো ভালো হয় না।

এমন সময়ে সুবোধ চৌধুরী প্রবেশ করলো, আড্ডার সে একজন তরুণ সদস্য।

হরিপদ শুধালো, কি হে সুবোধ, আজ দেরী কেন ?

আর বলবেন না দাদা, স্বদেশী কলেজের কর্মসমিতির মীটিং ছিল।

এমন কি বিষয় ছিল যে এত দেরী !

বিষয় একটাই, অরবিন্দ কাজে ইস্তফা দিয়ে দরখাস্ত করেছে।

হঠাৎ !

সত্যই হঠাৎ, কোন কারণ দর্শায়নি, কেবল অনুরোধ জানিয়েছে অবিলম্বে তাকে যেন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তোমরা কি করলে ?

ডাকিয়ে এনে অনেক অনুরোধ উপরোধ করা গেল, না, কিছুতেই রাজি নয়। এমন যোগ্য লোক সহজে পাওয়া যায় না। তার কথায় মনে হ'ল শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে।

ফৌজদার আলোচনার একটা বিষয় পেলো, বলল, বাঙালীর ছেলে হয়ে যে চাকুরি ছাড়ে তার কপালে দুঃখ আছে। লোকটা কি গান্ধী বাবার দলে ঢুকলো না আবার গুড়ুম গুড়ুম করবে, সেই দলেই তো ছিল বলে শুনেছি। কিছুদিন তারা চুপচাপ ছিল আবার তো এদিকে ওদিকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

তা জানি না দাদা, সভায় যা হয়েছিল বললাম।

ওরে পীতাম্বর, ওরে শীতল, রাত অনেক হয়েছে, ধরাধরি করে আমাকে নামিয়ে দে বাবা, নীচে আমার রিক্সা আছে।

সুবোধ বলল, আজ আসতেই সভাভঙ্গ।

কাজেই, তুমি আসবে একেবারে শেষবেলায়, বলল ফৌজদার, তখন তার নড়বড়ে দেহ কাঠামোটাকে কোন রকমে ধরে করে নীচে নামাচ্ছে বেয়ারা দু'জন।

হরিপদ বলল, বীরেন ভায়া, সুবোধ, কালকে সূত্রযজ্ঞ, যেতে ভুলো না।

২৬

মেয়েরা বোঝে। পুরুষে যখন মেয়েদের চোখের দিকে তাকায় দেখতে পায় নিজেদের প্রতিবিম্ব আর মেয়েরা পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় তাদের অন্তস্তল অবধি। মেয়েরা বোঝে। মলিনা বুঝেছিল যে এই হতভাগ্য জীবটি তার মায়াজালে আপাদমস্তক আবদ্ধ, বেচারা ঝটপট করে পাখা আছড়াচ্ছে মুক্তি পাবার আশায় নয়, মনের কথাটি প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। তাতেই তার মুক্তি।

সেদিন ঠিক যে মুহূর্তে সেই গোপন কথাটি বলবার জন্যে উদ্যত ঠিক সেই সময়ে বেজে উঠ্‌ল গুরুতর আহ্বানের হুইসিল, বেচারার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। এমনি ধারাই হয়ে থাকে সংসারে। নলের হংসদূত দময়ন্তীর কাছে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে গেল। অরবিন্দ ভাবলো হায় সুযোগ পেরিয়ে গেল, মলিনার মন ততোধিক হায় হায় করে উঠ্‌ল। অরবিন্দ যদি মনের কথা বলতো তাতেই যে মীমাংসা হতো এমন মনে করবার কারণ নেই—মলিনা কখনোই সোজাসুজি উত্তর দিতে পারতো না, হয়তো চুপ করে থাকতো, বিব্রত বোধ করতো অরবিন্দ; কিম্বা মলিনা হয়তো এমন অসংলগ্ন কিছু বলে ফেলতো মুহ্যমান হয়ে পড়তো অরবিন্দর মন। অঙ্গহীন দেবতার এ কি লীলাময় আক্রোশ হতভাগ্য অঙ্গধারী মানুষের প্রতি।

সে রাত্রে ঘুম এলো না মলিনার, সে রাত্রে ঘুম এলো না অরবিন্দর। দুজনে দুজনের অজান্তে বিছানায় ছটফট করে মরলো। একজন ভাবলো—হায় বলা হ'ল না, একজন ভাবলো—হায় শোনা হ'ল না। সংসারে ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। মানুষে শুনতে চায় 'ভালোবাসি' এই অতি পরিচিত শব্দটি। কান তার দাবী ছাড়বে কেন। রাজদর্শনার্থীর প্রথম ভেট যোগাতে হয় দ্বারপালকে।

অরবিন্দ স্থির করলো, না এমন ভাবে বিরল সুযোগের উপরে বরাত দিয়ে আর বসে থাকা নয়, সে স্পষ্ট করে বলবে। কিন্তু বলবে কি আর বলবে কাকে? মলিনাকে আর সহজে একাকী পাওয়া যাবে না—কাজেই বলবে শচীনকে। কিন্তু কি বলবে। সে যে মলিনার প্রতি আসক্ত তাদের পরিবারের সবাই বুঝেছিল, সেই সূত্রেই জুটে গিয়েছিল অযাচিত চাকুরিটি। মলিনাকে বিয়ে করতে চায় এ কথাটা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রায় অবান্তরের পর্যায়ে পড়েছিল—তবু অবান্তর কথাও কখনো কখনো বলা অত্যাবশ্যক। ওটা উভয় পক্ষে এক-রকম অকথিত ভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরও কিছু বলা আবশ্যক। সে কথাটা গোপন থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ বিপ্লবী জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গেই জন্মান্তরের মতো অলীক হয়ে পড়েছিল সেটা। কিন্তু গোল বাধালো গান্ধীজির চিঠি।

তার প্রথমে রাগ হ'ল নিজের উপরে কেন সে আগ বাড়িয়ে গান্ধীজিকে লিখতে গিয়েছিল। তিনি তো গোড়াতেই বলে দিয়েছিলেন যে জীবন থেকে সে বিদায় নিয়েছে সে জীবনের দায়িত্ব এখন স্বপ্নের চেয়ে সত্য নয়। ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারপরেও আবার কেন গান্ধীজিকে সব খুলে লিখে পরামর্শ চাইতে গেল যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছে তার কাছে সব

খুলে বলা উচিত কিনা। গান্ধীজি তার চিঠি পেয়ে বুঝেছিলেন তার মনের মধ্যে একটা গাঁঠ আছে, সেই গ্রন্থির দুর্বহ ব্যথা বহনের চেয়ে সব খোলসা করে বলে ফেলে বেশ হাল্কা হয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করাই শ্রেয়। কিন্তু সে কি সামান্ত কথা! কোন একটা আদর্শের খাতিরে নরহত্যা করা যতই কঠিন হোক তার চেয়েও সহস্রগুণে কঠিন সেই নিহত নিরীহ নিরুত্তর ব্যক্তির নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ ; স্বপক্ষ সমর্থনের শেষ উপায়টুকু যার নিঃশেষে গত। তার রাগ গিয়ে পড়ে গান্ধীর উপরে, কেন, বললেই তো পারতেন হত্যার সঙ্গে ঐ কথাটাও ভুলে যাও না কেন। গান্ধীজির সত্যের পরীক্ষা বইখানা সে পড়েছিল, অনেক গোপন কথা সাধারণতঃ মানুষে যা বলে না অনায়াসে বলেছেন তিনি। অরবিন্দ ভাবে তিনি সাধুপুরুষ, তাঁর পক্ষে যা বলা সম্ভব অপরে তা পারবে কেন। কিন্তু একবারও তার মনে হয় না তিনি যদি সাধুপুরুষ হন তবে অপরকে অসাধু পরামর্শ দেবেন কেন?

একবার ভাবলো, প'ড়ে মরুকগে গান্ধী, কথাটা চেপে গিয়ে মলিনাকে বিয়ে করায় কি এমন ক্ষতি। গান্ধীজি তো আর তাকে জেরা করতে আসছেন না। তাঁর কাছে আর না ঘেঁষলেই হ'ল। কিন্তু তখনি মনে পড়ে যায় ক্ষীণ শান্ত স্বগতভাষণ-প্রায় সেই কণ্ঠস্বর। সেই অতল অমেয় করুণায় পূর্ণ দৃষ্টি, আর সেই হাসি যাতে জগতের আদিম শৈশবের সারল্য জড়িত। তার মনে হয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই দৃষ্টি, সেই হাসি নিয়ে সমস্ত মানুষটা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। তার মনে পড়ে গেল তার বিপ্লবী বন্ধুদের মন্তব্য, লোকটা জাদু জানে, লোকটা হঠযোগী, আর যাই করো তার কাছে ঘেঁষো না, লোকটা এক রকম ছেলে-ধরা, ওর হাতের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়লে ঝুলিতে না ভরে ছাড়বে না। দূরে থেকে যে যতই বাহাদুরি করুক কাছে গিয়ে পড়লে নতশির হয়, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। মিথ্যা কথা বলবে সঙ্কল্প করে গেলেও কি ভাবে যেন সত্য কথাটা বের হয়ে যায়। নাঃ, লোকটা জাদুগির না হয়ে যায় না। লোকে রাজার আয়ের ওকালতি ছাড়ছে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গোটাচ্ছে, অন্নভক্ষ্যগণ চাকুরি ছাড়ছে, বিধবার একমাত্র ভরসা পুত্র চাকুরি ছাড়ছে—আর হাজারে হাজারে জেলখানা ভরে তুলছে। এ যে রাজনৈতিক বিশে ডাকাত, আগে ভাগে নোটিশ দিয়ে আইন ভঙ্গ করে। তার সঙ্গে পাল্লা কষবার শক্তি কোথায় হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীব অরবিন্দর। দূরে থেকে যে নিরন্তর সম্মুখস্থ তাকে ফাঁকি দেয় সাধ্য কি। নাঃ, বলতেই হবে সব কথা খুলে মলিনাকে, না তাকে আড়ালে পাওয়া সম্ভব নয়,

বলবে শচীনকে। তারপরে যা থাকে ভাগ্যে।

মলিনা কি ক্ষমা করবে না। তার মনে পড়ে পশ্চাদ্ধাবমান পুলিশের হাতে থেকে আশ্রয় দিয়ে তাকে রক্ষা করেছিল। তারপরে যখন বেকসুর খালাস হয়ে ফিরে এসে তাকে ধন্যবাদ দিতে গেল, মলিনা হেসে বলেছিল, যান খুব বেঁচে গেলেন, এদিকে বীরপুরুষ বলেও নাম রটলো আবার খালাস পেয়েও গেলেন। এবারে বিয়ে করে সংসারী হোন। মলিনার সেদিনের সেই হাসিটুকু এখনো তার চাদরের খুঁটে বাঁধা আছে।

হাসির জবাবে হেসে অরবিন্দ বলেছিল, আমাকে আবার বিয়ে করবে কে!

বাপ রে, এমন বীরের পাত্রীর অভাব। আগেকার যুগ হলে স্বয়ম্বর সভাতে আপনার গলাতেই মালা পরতো।

তারপরে অনেক বছর গিয়েছে, এখন সে রায় পরিবারের আত্মীয় মধ্যে প্রায় গণ্য। আবার এদিকে গলাও উদ্‌গ্রীব, মালাও উদ্যত, মাঝখানে গোলযোগ ঘটিয়ে বসলো সেই ভারতজোড়া জাদুগির। তার পরামর্শ অমান্য করলেই হয়। সাধ্য কি! নাঃ, আজই সমস্ত ব্যাপার খুলে বলবে শচীনকে। তারপরে হয় জয়মাল্য নয় ভগ্নদূতের মতো প্রস্থান।

সে তো অনেক কাল চুকে বুকে গিয়েছে ভাই, শপথ থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার আগের সুকৃতি দুষ্কৃতি বৈতরণীর জলে ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

সেই ভাবেই ভেবেছিলাম দাদা, কিন্তু গান্ধীজির চিঠিতে—

শচীন বাধা দিয়ে শুধালো, এর মধ্যে গান্ধীজি এলেন কোথা থেকে?

আসবার কথা নয় কিন্তু অদৃষ্ট কলম ধরতে বাধ্য করলো। লিখলাম তাঁকে সব কথা—

আবার বাধা দিয়ে শচীন বলল, তিনি কি লিখবেন সেটা তো আগেই বোঝা উচিত ছিল।

না তা ঠিক নয় দাদা। প্রথমে যখন তাঁকে মুখে সব কথা নিবেদন করেছিলাম তিনি আপনার মতোই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আগেকার কথা জন্মান্তরের কথা বলে মনে করো। মনে করো এখন থেকে তোমার নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল, বলেছিলেন, আমাদের শাস্ত্রে যাকে বৈতরণীর জল বলে আসলে তা হচ্ছে অনুশোচনার চোখের জল।

দেখো অরবিন্দ, এই গান্ধী লোকটিকে আমি এখনো মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি, হয়তো বুঝতে পারিনি বলেই; কখনো মনে হয় সাধু বৈরাগী পুরুষ,

কখনো মনে হয় ঝানু রাজনীতিক, কখনো ভাবি ভারতের সৌভাগ্য কর্তৃক প্রেরিত দৈব পুরুষ, আবার কখনো মনে হয় চরম বেনিয়া।

অতশত জানিনে দাদা, আপনার মতো অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ শক্তি আমার নেই, প্রথম দর্শনেই আমি অভিভূত হয়ে পড়ি আর সে অভিভূতি এখনো কাটেনি, কখনো কাটবে মনে হয় না। সে যাক, তিনি তো আমাকে পূর্ব জীবনের দুষ্কৃতি থেকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু মুক্ত হ'তে পারলাম কই। তাঁকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করে পাঠালাম, যাকে বিবাহ করবো তার কাছেও কি এ পাপের স্মৃতি বলতে পারবো না?

কি লিখলেন তিনি, তখন তিনি তো খুব সম্ভব জেলের মধ্যে—

হাঁ, জেলের মধ্যে থেকেই লিখলেন, জানালেন তোমার মনে যখন পাপবোধ আছে তখন জীবনসঙ্গিনীর কাছে না লুকানোই ভালো। জানালাম যদি তিনি এ কথা শুনে বিবাহ করতে রাজি না হন। লিখলেন যে ঝুঁকি নিতেই হবে আর জীবনযাপন মানেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলা।

দেখো অরবিন্দ, এসব বিষয়ে আমি কখনো খুঁটিয়ে প্রশ্ন করি না বিপ্লবী দলের লোককে, অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যদিও। কিন্তু যেহেতু তুমি প্রসঙ্গ তুললে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি তো মেরেছিলে তোমরা যাদের দেশের শত্রু মনে করো তাদের—

অরবিন্দ বাধা দিয়ে বলল, না দাদা, তাহ'লে বোধ করি এত পরিতাপ হ'তো না।

তবে আর কাকে মারলে?

নিজের দলের লোককে।

সে কি! চমকে ওঠে শচীন, এমন তো শুনিনি।

শোনেন নি তার কারণ ঘটনার উপরে অন্য রঙ দিতে আমরা অভ্যস্ত। কি রকম একটা ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে বলি, অনেক কাল আগেকার কথা এখন আর বলতে বাধা নেই। একবার একটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র হিন্দু হোস্টেলে এলো, আর পড়লো তো পড়লো সেই ঘরেই যেখানে থাকতো দু'জন সন্ত্রাসক। ওরা ছেলেটাকে আভাসে ইঙ্গিতে ভজিয়ে নিল, সে বেচারা পুরোপুরি সমস্ত না বুঝেও বুঝলো এরা দেশের কাজ করে। দেশের কাজ করতে কার আপত্তি। একদিন তাকে নিয়ে দু'জন রওনা হয়ে গিয়ে নাটোর স্টেশনে নামলো, তখন গভীর রাত্রি, তখন তারা কাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলো ছেলেটির কাছে, নিকটের এক গ্রামের মহাজনের গদিতে ডাকাতি করতে হবে,

ছেলেটিকে আগেই গোপনে ধাপার মাঠে নিয়ে গিয়ে পিস্তল চালনা শিক্ষা দিয়েছিল তারা। ছেলেটি সরাসরি অস্বীকার করলো। বল্‌ল, দেশের কাজ মানে দেশের লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করা নয়।

তোমার এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার নেই।

ডাকাতিতে যোগ না দেওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে।

তা আছে তবে আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। এসো আমাদের সঙ্গে।

ছেলেটি তখনো বোঝে নি কি সে অধিকার কী আছে তার ভাগ্যে। খানিকটা পথ চলে তার ডিস্‌ট্যান্স সিগন্যালের কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন রাত যেমন গভীর, তেমনি নির্জন আর তেমনি অন্ধকার। হঠাৎ একজন একটি পিস্তল বের করলো।

একি আমাকে মারবেন নাকি!

উত্তর দিল পিস্তলের নল।

তারপরে তারা তার দেহটা রেল লাইনের উপরে শায়িত ক'রে পালিয়ে এলো সারারাতের মধ্যে কত গাড়ী যাতায়াত করলো, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দেহটা। পরদিন সকলে সিদ্ধান্ত করলো রেলে কাটা পড়েছে।

চমকে উঠে শচীন শুধায়, তুমি কি সেই দলে ছিলে না কি।

না দাদা, এ ঘটনা আমরা দলে ঢুকবার আগে ঘটেছিল।

তবে পড়ে মরুকগে, তুমি কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত যদি বলতে ইচ্ছা করো বলো।

এ ঘটনাটা খামোকা বলিনি।

শচীন নিরুত্তরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দেশের কাজের জন্য টাকার অভাব হ'লে মাঝে মাঝে আমরা ডাকাতি করতাম। একবার দলের একটি ছেলের উপরে আদেশ হ'ল ডাকাতির দলে যোগ দেবার। সেই অবোধ ছেলেটির মতো এই ছেলেটিও অস্বীকার করলো। দলের নেতারা দেখলেন ডবল অপরাধ, আদেশ অমান্য আর ডাকাতির কথা জেনে ফেলা, সিদ্ধান্ত হ'ল ওকে সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের দলের পরিভাষায় সরিয়ে দেবার অর্থ শেষ করে দেওয়া। শুধু তাই নয় একটা ঘোরতর কলঙ্কের রঙ চাপিয়ে দিতে হবে যাতে দলের অন্য লোক সাবধান হয়, আদেশ অমান্য করতে সাহসা না করে। আমার উপরে ভার পড়লো।

শচীনকে নিরুত্তর দেখে থামলো অরবিন্দ।

শচীন বল্‌ল, বলে যাও, শুনছি।

কাজটা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমরা দুজনে এক মেসেই থাকতাম। একদিন ভোর রাতে হাওয়া খাওয়ার অছিলা করে তাকে নিয়ে গেলাম গোল-দীঘিতে, সমস্ত নির্জ্জন অন্ধকার। একখানা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে গোপনে পিস্তল বের করে তাকে সরিয়ে দিলাম।

সেকি ? চমকে ওঠে শচীন।

এখানেই শেষ নয়, তার জামার উপরে পিন দিয়ে 'গোয়েন্দার যোগ্য দণ্ড' লেখা একখানা কাগজ সেঁটে দিলাম। ঐ বয়ান লেখা কাগজ ও পিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এবারে অরবিন্দর চমকে উঠবার পালা। শচীন শুধালো, তার নাম কি রমণী চৌধুরী, থাকতো কি ১৮ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ?

হাঁ দাদা, আপনি কি তাকে জানতেন !

সে আমার রিপন কলেজের ছাত্র ছিল।

হাঁ, রিপন কলেজে পড়তো বটে, আমি পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু এতদিন আগেকার পুরানো কথা মনে আছে আপনার !

পাপ পুরানো হয় না। তা ছাড়া মনে থাকবার বিশেষ একটা কারণ আছে, ঠিক তার আগের দিনে আমার ভাই সুশীল পুলিস হেফাজতে মারা গিয়েছিল।

তারপরে একটু ভেবে বল্ল, অরবিন্দ, একথা না জানালেই ভালো করতে।

আমার মনে যে—

তোমার মনের কথা ভাবছি না, রমণীর যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়ীতে। মেয়েরা তাকে জানতো চিনতো।

তবেই দেখুন দাদা, বলে ভালোই করেছি।

শচীন ও অরবিন্দ দুজনেই জানতো মলিনার সঙ্গে অরবিন্দর বিবাহ স্থির, কেবল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের অপেক্ষামাত্র।

কাজেই এত বিস্তারিত ভাবে বলবার কারণ তাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয় নি।

সমস্ত ঘটনা ও তার প্রকৃতি শুনে শচীনের মন বিষিয়ে গিয়েছিল, তবে এই বলে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করলো যে বিপ্লবী দলকে বাদ দিয়ে সংসার করা সম্ভব নয়, বিশেষ তারা কেউ যখন স্বার্থের খাতিরে হত্যা করেনি। কিন্তু নিহতের নামে বৃথা কলঙ্ক, যে কলঙ্ক অপনোদনের কোন সুযোগ আর থাকলো না—সেটা মনের মধ্যে খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো।

ওসব কথা ভুলে যাও অরবিন্দ।

ভুলতেই তো চেষ্টা করছি তবে ওঁরা যদি ভুলে যান, আপনি বললেন ওঁরা চিনতেন।

· ওঁরা শব্দ বহুবচনের প্রয়োগ নিতান্তই সামাজিক।

আপনি বউদিকে বরঞ্চ বলুন।

অরবিন্দ জানে, রুক্মিণী শুনলেই মলিনার কানে উঠবে। সংসারে যাবতীয় নারী এককর্ণ।

শচীন জানতো না মলিনার সঙ্গে রমণীর পরিচয়ের শিকড় কত দূর ছড়িয়েছে কত গভীরে নেমেছে—সে রহস্য একমাত্র জানতো রুক্মিণী। তাই সে বল্‌ল, আচ্ছা তুমি যখন নিতান্তই ছাড়বে না, আজ রাতেই বলবো।

শচীনের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে রুক্মিণী বল্‌ল, তুমি অন্য পাত্রের সন্ধান দেখো, এখানে হবে না।

সে কি, এতদিন পরে এমন কথা।

দেখো মিছে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, মলিনা মরে গেলেও এখানে বিয়ে করবে না।

কেন শুনি।

তবে শোনো। বলে রমণীর প্রতি মলিনার প্রকৃত মনোভাব খুঁটিয়ে প্রকাশ করলো, বললো, সেই দুঃখেই এতকাল বিয়ে করতে রাজি হয়নি। এখন মা কাশী পেয়েছেন, বাবারও প্রাচীন বয়স, আর স্বদেশী হিসাবে অরবিন্দর প্রতি একটা টান ছিল, অনেক বলা কওয়ায় রাজি হয়েছিল। তার ভিতরকার কথা তো এই।

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শচীন বল্‌ল, আমার বোনটির অদৃষ্ট ভালো, একটি পাত্র এলো পিতৃহন্তার পুত্র, আর একটি এলো যে স্বয়ং মিত্রহন্তা।

তুমি যখন বলছ মলিনাকে আমি সব কথাই বলবো, রেখে ঢেকে কিছু বলবো না, তবে তুমি অন্য পাত্রের সন্ধান দেখো—অবশ্য এর পরে যদি সে আদৌ বিয়ে করতে রাজি হয়।

মলিনা বল্‌ল, বউদি, তোমার পায়ে পড়ি আর বিয়ের কথা বলো না।

কেন ভাই তোমার তো কোন দোষ নেই।

বউদি, আমার অদৃষ্টও যে আমারই অঙ্গ।

এত বিচলিত হচ্ছ কেন ভাই, কত জনের কত বিয়ে ভেঙে যায় তার কি

আর বিয়ে হয় না। আমার কথাই ভেবে দেখো না কেন। নাটোরের বিয়ে ভেঙে গেলে তোমার দাদাকে বিয়ে করতে যদি রাজি না হতাম তা হ'লে আজ তোমার দাদার কি গতি হতো।

শুধু দাদার নয় বউদি আমাদের সকলের, তুমি তো লক্ষ্মীর আসনে এসে বসেছ। তা ছাড়া তুমি তখন ছেলেমানুষ ছিলে, বিচার করবার বয়স তোমার হয়নি।

মলিনা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমারও বিচারের বয়স হয় নি।

বলো কি, সাতাশ বছর বয়সেও যদি বিচার করবার শক্তি না হয় তবে আবার কবে হবে।

আজকালকার দিনে সাতাশ বুঝি একটা বয়স!

অন্ততঃ তেরোর দু'গুণ।

দেখো, তোমার দাদা বলছিল যে তার হাতে একটি সৎপাত্র আছে।

আবার! এরা দুজনেও তো সৎপাত্র ছিল।

সে কথা সত্যি—কিন্তু দৈব।

দৈব কি আমার বেলাতেই বাম। জলপাইগুড়ির রাজি না হওয়ার কারণ বুঝতে পারি। পিতৃহন্তার ভগ্নীকে জেনে শুনে কে বিয়ে করতে চায়। তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

এরই বা দোষ কি। তারা যে শপথ গ্রহণ করেছিল—

বাধা দিয়ে মলিনা বল্‌ল, তার দায় বহন করতে হবে এখন আমাকে।

দেখো, অরবিন্দবাবু সরল ও সত্যবাদী বলেই কথাটা প্রকাশ করলো, মনে করো সে যদি কিছু প্রকাশ না করতো।

না জেনে সাপের বিষ খেলে হজম হয়ে যায়।

পরে যদি কোন দিন তোমার আছে খুলে বলতো তখন—

তখন আর কি, বাকি জীবনটা কণ্টকশয্যায় শুয়ে কাটাতে হ'তো।

কিন্তু তুমি এখন অস্বীকার করলে অরবিন্দ বাবু কত দুঃখ পাবেন অনুমান করতে পারো কি।

পারি কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারি দুঃখ সত্যভাষণের অপরিহার্য অঙ্গ।

একটা সত্য কথা বলবে?

তোমার কাছে কবে মিথ্যা কথা বলেছি।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, অরবিন্দবাবু তোমাকে ভালোবাসেন।

মলিনা মুখ নত করে বলল, শুধু আমি নই, তোমরাও পেয়েছ।

তবে তাঁকে দুঃখ দেবে কেন ?

কিন্তু অন্য দুঃখটাও যে ভুলতে পারছি না।

রমণীকে হত্যা, এই তো।

শুধু হত্যা হলেও না হয় শপথের অঙ্গ বলে ক্ষমা করলেও করতে পারতাম, কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতিবাদের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ!

সেটাও তো শপথের অঙ্গ।

এমন শপথকে ধিক, ধিক, লক্ষবার ধিক। এই বলে সে উঠে যাচ্ছিল, রুক্মিণী আঁচল ধরে টেনে বসালো।

আর একটা সত্য কথা বলো, তুমি কি অরবিন্দর চেয়ে রমণীকে বেশি ভালোবাসতে ?

সত্যি কথা শুনতে চেয়েছ তবে শোনো, অরবিন্দবাবুর চেয়েও কাউকে বেশি ভালোবসি না, আর ভবিষ্যতেও বাসতে পারবো না।

তবে সে বেচারীকে এ দণ্ড দিচ্ছ কেন ?

দণ্ড কি শুধু সে-ই পাচ্ছে!

নিজেই বা দণ্ডিত হতে যাচ্ছ কেন ?

সীতা তো বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

তোমারই বা অপরাধ কি।

সেই নিহত নিরীহ অকারণে কলঙ্কিত রমণীবাবুকে ভুলতে পারছি না। না ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারলাম না, অরবিন্দবাবু আসবার পরে তাকে ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ তার স্বীকারোক্তিতে নির্ব্বাপিত অগ্নিকুণ্ডে শিখার ঝলক দেখা দিল।

সে নিশ্চয় ভালোবাসা নয়।

না ভালোবাসা নয়, করুণা। বউদি যে হাত সেই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে তুমি কি সত্যই আমাকে সেই পাণি গ্রহণ করতে আদেশ করছ ?

না ভাই করছি না। কিন্তু ভাবছি কি বলবো তোমার ভাইকে আর বাবাকে।

দাদাকে সব খুলে বলতে পারো, তিনি বুঝবেন।

আর বাবাকে ?

বলো তাঁর মেয়ে অবাধ্য, তাঁর মেয়ে একগুঁয়ে, না হয় বুঝিয়ো তাঁর মেয়ের

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

তোমার দাদা আর আমি এক রকম করে তাঁকে না হয় বোঝাবো কিন্তু ভাবছি এই দীর্ঘজীবন নিঃসঙ্গ কাটাবে কি করে?

নিঃসঙ্গ কেন, তোমরা কি নেই!

ভাই এ থাকা থেকেও না থাকা।

বউদি, আর নিঃসঙ্গ থাকা কি এতই কঠিন। ও পাড়ার কুমুদিনী দিদি তো সারাজীবন নিঃসঙ্গ কাটালেন বিয়ে না করে।

সেটা ইচ্ছা করে নয় অবস্থা-বৈগুণ্যে, কুলীনের মেয়ের বর জুটলো না! আমরা তো কুলীন নই, কুমুদিনী দিদির দৃষ্টান্ত তুললে চলবে কেন?

আর সৌরভী দিদি, তেরো বছরে বিয়ে হয়েছিল বলে শুনেছি, চোদ্দয় বিধবা হলেন, এখন বয়স পঞ্চাশের উপরে, বাপের ভিটেয় কি তার নিঃসঙ্গ কাটছে না।

ছি ভাই মলিনা, তাঁর দৃষ্টান্ত তুলো না।

নাই তুললাম তাঁর দৃষ্টান্ত, কিন্তু আমার কি লব কুশ নেই, তাদের মানুষ করবো।

তারা যে আশ্রমে পড়েছে না জানি কোন্ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বের হবে।

লক্ষ্মীর ছেলে কি লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে।

রুক্মিণীর তর্কের স্রোত বন্ধ হয়ে গেল লব কুশের উল্লেখে, এখানে তার ব্যথার স্থান। সকল মায়ের মতো তারও বাসনা ছিল তার ছেলে দুটি স্কুল কলেজে পড়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠে, হয় শ্বশুরের মতো উকীল, নয় বাপের মতো অধ্যাপক, নয় আরও উঁচু জজ কি ম্যাজিস্ট্রেট। সে আশায় তাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, মাঝে মাঝে তাদের চিঠিপত্রে সেখানকার পড়া-শোনার আর জীবনযাত্রার আভাস পায়। সে-সব প'ড়ে রুক্মিণীর বিশ্বাস হয়েছে ছেলে দুটো বুনো হয়ে বেরিয়ে আসবে। তারা সকাল বেলা চরখা কাটে, দুধ দোয়, সবজির ক্ষেত করে, তবে পড়া-শোনা করে কখন্! আর এসব কি ভদ্রলোকের শিক্ষণীয় বিষয়, এ সব কোন্ কাজে লাগবে, উপার্জনের উপায় কি, কিছুই বুঝতে পারে না। স্বামীকে অনেকবার খুঁচিয়ে সজাগ করে দিতে চেষ্টা করেছে, উত্তর পেয়েছে, বাবা যা ভালো মনে করেছেন তার উপরে তার হাত নেই। রুক্মিণীর এমন সাহস নেই যে শ্বশুরকে এ বিষয়ে কিছু বলে। তারপরে সেই যে ছ'সাত মাস আগে তারা গিয়েছিল একবারও আসেনি, স্বামীর কাছে শুনেছে ছুটি বলে তাদের কিছু নেই, তবে কালেভদ্রে কখনো আসতে পারে। শুনেছে এ তো স্কুল-কলেজ নয়, এ হচ্ছে গান্ধীআশ্রম। শুনেছে দেশ স্বাধীন হ'লে

নাকি এদের মূল্য বুঝতে পারা যাবে। ভাবে স্বাধীন দেশের কাজ কি এইসব চরখা কাটা সবজি বোনা ছেলের দল চালাবে! তখনো ডাক পড়বে কলেজে পাশ করা ভালো ছেলেদের আর গান্ধী আশ্রমের চেলারা বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ তাদের চেয়ারে বসে কাজ করতে সুযোগ দেবে না।

কি বউদি, চুপ করে রইলে যে!

তোমার দাদাকে কি বোঝাবো তাই ভাবছি।

দাদা বুদ্ধিমান লোক, অল্প বললেই বুঝবেন।

তা জানি, আর বাবাকে?

দাদা যেমন ভালো বোঝেন বলবেন।

কয়েক দিন পরে জিজ্ঞাসিত হয়ে শচীন বাবাকে বলেছিল যে মলিনার বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই। এর বেশি বলা সম্ভব হয়নি, বুড়ো মানুষ প্রেমতত্ত্বের জটিলতা বুঝতে পারবেন না, আর ছেলে হয়ে বুড়ো বাপকে সে সব কথা বলেই বা কি ভাবে।

সমস্ত শুনে যজ্ঞেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, মলিনার বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও রাখে, যেমন ভালো বুঝেছে তাই করুক। তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, শচীন, মানুষের সব ইচ্ছা সফল হয় না, সহজে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তবে যাতে তার অন্নবস্ত্রের অভাব না হয় সে ব্যবস্থা করে যাবো। আমি অবস্থা গতিকে বুড়ো বয়সে কংগ্রেসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি নইলে আবার কাশীবাসে চলে যেতাম।

এ সমস্ত কয়েক দিন পরের কথা। রুক্মিণী চলে গেলে মলিনা শুয়ে পড়লো, ঘুম এলো না, এলো চোখের জল। রাতটা কাঁদবার জন্যে, দুঃখীর এক ফোঁটা চোখের জলও অপব্যয় হয় না, সমস্তই সঞ্চিত হয়ে থাকে আকাশের তারাগুলোয়।

শেষ রাতে তন্দ্রার ঘোরে মলিনা স্বপ্ন দেখলো, লব কুশ এসেছে, ডাকছে পিসিমা ওঠো, ওঠো, ভোর হয়ে গিয়েছে তবু ঘুমোচ্ছো। তারা যেন বলছে, এখন যে আমাদের কপির ক্ষেতে জল দেবার সময়। পিসিমা, পিসিমা, ওঠো ওঠো।

সে সজাগ হয়ে ওঠে, না, এ তো স্বপ্ন নয়, এখনো যে ডাক শোনা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ঐ তো উঠোনের মধ্যে লব কুশ দাঁড়িয়ে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে এল, আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে রুক্মিণী ও শচীন।

ওমা এ কি ছিরি হয়েছে, চুল গেল কোথায়, কাকে ঠুকরে নিয়েছে নাকি ?

না পিসিমা, আমরা নিজে কাটি কিনা তাই এমন হয়েছে।

লব যদি থামলো কুশ ব্যাখ্যা শুরু করলো, একে বলে গান্ধী ছাঁট, চুল লম্বা হলে ময়লা জমে কিনা।

তা ওখানে কি নাপিত নেই ?

থাকবে না কেন, তবে আমরা সব কাজ নিজে করি কিনা।

ধোপার কাজও করিস তা হ'লে ?

করি কি বই কি। ধোপা নাপিত ঝাড়ুদার মেথর সব কাজ নিজেদের করতে হয়।

মেথরের কাজও! কি ঘেন্না, ঘেন্না। বউদি ছাড়িয়ে আনো, এখনি ছাড়িয়ে আনো ওখান থেকে।

যতক্ষণ মলিনার সঙ্গে লব কুশের কথা হচ্ছিল রুক্মিণী এক দৃষ্টিতে দেখছিল পুত্রদের চেহারা, এত যত্নে আদরে যারা মানুষ, চেহারায় যাদের লাবণ্য ছিল এই কয় মাসের মধ্যে সে চেহারা কেমন চোয়াড়ের মতো হয়ে গিয়েছে, চোখে তার জল ভরে উঠছিল পাছে সকলের সম্মুখে পড়ে তাই নীরব হয়ে ছিল। মলিনা ক্রুদ্ধ, রুক্মিণী ক্ষুব্ধ।

পরণে তোদের এ কি ?

সপ্রতিভভাবে তারা উত্তর দেয়, কেন খদ্দর।

খদ্দর তো আমরাও পরি, এমন চটের মতো নয় তো।

ওরা ততোধিক সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দেয় এ যে আমাদের নিজ হাতে বোনা।

কাপড় বুনতে হয়, তার মানে সুতোও কাটতে হয়!

হয় বইকি।

তবে লেখাপড়া করিস কখন! সকাল থেকে কি কি করিস ঠিক ঠিক বল তো।

ঘর ঝাঁট দি, সবজি ক্ষেতে জল দি, গোয়াল পরিষ্কার করি—

গোরুর দুধ দুইতে হয়।

তাহলে অন্ততঃ দুধটা খেতে পাস।

দুধ যে বিষ পিসিমা।

দুধ বিষ। তা সে বিষ নিয়ে করিস কি।

পাড়ায় বেচে দি।

ও, বিষ নিজেরা না খেয়ে প্রতিবেশীদের খাওয়াস। কোন্ মাস্টার তোদের এ শিক্ষা দিয়েছে রে, একবার তার দেখা পেলে হ'তো।

ওরা সহজ অর্থে মলিনার কথাগুলো নিয়ে বল্ল, যাবে পিসিমা সেখানে, বড্ড ভালো লোক, যেমন শান্ত তেমনি মিষ্টি কথা বলেন, গৌরহরিবাবু তাঁর নাম, তিনি হচ্ছেন আশ্রমধারী।

বটে, আশ্রমধারীকে একবার পেলে হ'তো।

এবারে প্রথম কথা বল্ল রুক্মিণী, জিজ্ঞাসা করলো, এত সকালে এলি কি ভাবে, তোদের তো কেউ আনতে যায়নি।

আমাদের সুশীলদা দার্জিলিঙ গেলেন কিনা পথে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুশীলদাটি কে ?

আমাদের আশ্রমের মাস্টার। কিন্তু পিসিমা, কাউকে মাস্টার বলবার উপায় নেই, বলতে হবে দাদা।

ঐ রে বউদি, তোমার ছেলেদের দাদাতে ধরেছে, বাঘে ধরলেও রক্ষা আছে, রক্ষা নেই দাদাতে ধরলে। মনে নেই ছোটদাকে দাদাতে ধরেছিল, রাধাকে দাদাতে ধরেছিল, সব স্বদেশীওয়ালাদের দাদাতে ধরে।

পিসিমা আমাদের সে স্বদেশী নয়, এখানে বোমা পিস্তলের কারবার নেই, সব অহিংস।

ভাইপোদের উল্লাসময় বর্ণনা শুনে মলিনা রাগে গরগর করছিল, বল্ল, সহিংস দাদা দেখলাম, এবারে অহিংস দাদা দেখবার পালা। কিন্তু আমার কথার উত্তর তো দিসনি—সকালে বিকালে দুধ খাস কিনা—ঠিক ক'রে বল্।

বাঃ রে, কি করে খাবো, সব দুধ যে বিক্রি করে দি।

দুধের কত দর ?

তা কেমন করে জানবো!

তবে পাস কি ?

টাকা পয়সা পাইনে, ওসব নেওয়া হয় না—

তবে ?

দুধের বদলে আমরা নি চাল ডাল তেল নুন—

বল্ বল্ থামলি কেন, মসলাপাতি, ঘি—

ওসব আমাদের ওখানে চলে না।

রাঁধে কারা ?

মাস্টার মশাইরা, যাঁদের দাদা বলি।

কেন ও কাজটাই বা বাদ থাকে কেন, করলেই পারিস।

আমরা তো করতেই চাই পিসিমা, কিন্তু হাত পা পুড়ে যাবে ভয়ে দেন না।

ও, আবার মনে দয়া-মায়াও আছে দেখছি। তোরা তো দেখছি খালি হাত পায়ে এসেছিস, তোদের জুতো কোথায়, বাক্স বিছানা সব কোথায়।

এখানে বলে রাখা ভালো, ঐ সব অস্পৃশ্যবস্তু আশ্রমধারীর জিম্মায় রেখে এসেছিল শচীন, এখন দেখা গেল নিতান্ত ভুল করেনি, তারপরে এক ফাঁকে গিয়ে নিয়ে এসে ভূপতির বাড়ীতে রেখে দিয়েছিল।

পিসিমা, জুতো ওখানে পরবার নিয়ম নেই, আর বিছানায় কি হবে, সকলে শুই একখানা করে চটের উপরে।

আর বালিস?

বালিস আমাদের এক টুকরো কাঠ। অতো রাগ করছ কেন পিসিমা, একদিন শুয়ে দেখো—অসুবিধা হয় না।

দেখো বউদি, তোমার ছেলে দুটোকে যদি চোয়াড় চাষা ভিক্ষুক বানাতে চাও বানাও, আমি এর মধ্যে নেই—এই বলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল রুক্মিণী কখন চলে গিয়েছে। ছেলেদের চেহারা দেখে, তাদের জীবনযাপন প্রণালীর বর্ণনা শুনে রুক্মিণী নীরবে প্রস্থান করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

যাচ্ছি আমি দাদার কাছে—কিন্তু যেতে হ'ল না, প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করে শচীন প্রবেশ করলো বাড়ীতে।

দাদা দেখো, দুটো সঙ এসেছে।

সঙ হতে যাবে কেন, এইতো দিব্বি শক্ত সমর্থ হয়ে উঠেছে।

ঠিক সেই সময়েই উপর থেকে নামলেন যজ্ঞেশ বাবু—নাতিদের দেখে উল্লাসে বলে উঠলেন, এই যে তোরা এসেছিস, দেখেছ শচীন, কেমন পুরুষ মানুষের মতো চেহারা হয়েছে। এই তো চাই। দুধ ঘি মিষ্টিতে মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। গান্ধী আশ্রমগুলোই এখন দেশের ভরসা।

প্রথমে হাইকোর্ট পরে সুপ্রীমকোর্টের রায় বিরুদ্ধে যাওয়ার হতমান মলিনা নীরবে প্রস্থান করলো, রুক্মিণী আগেই গিয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে লব কুশের সহপাঠী ও সমবয়সীর দল এসে দেখা দিতে লাগলো, মফঃস্বল শহরে এ রকম খবর চালু হতে বিলম্ব হয় না। নেড়া, নিমু, পাঁচকড়ি নাড়ু শিবুরা এসে উপস্থিত হ'ল আর আশ্চর্য্য এই যে তাদের প্রতিক্রিয়া ঠিক বিপরীত হ'ল রুক্মিণী ও মলিনার। কি চমৎকার, এমন ইস্কুল যে ভূ-ভারতে

আছে কে জানতো। যেখানে কপির ক্ষেতে জল দিলে, ক্ষেত থেকে আলু মূলো তুলে জড়ো করলে আর দুধ দিয়ে বিক্রি করে তার বদলে চাল ডাল সংগ্রহ করে আনলে পড়বার জন্যে কেউ তাগিদ দেয় না, বস্তুতঃ ঐ কাজগুলোই ওই ইস্কুলের পড়াশোনা এমন তো স্বপ্নে তারা ভাবেনি।

লব কুশ বলে, ওখানে আমরা রাঁধি পরিবেশন করি!

বন্ধুরা বলে ওঠে, এই তো চাই নইলে ভাই দেশ স্বাধীন হবে কি করে!

তবে কম্বলের উপরে কাঠের টুকরো মাথায় দিয়ে শোয়া এটা যেন কেমন কেমন লাগে তাদের।

উৎসাহ দিয়ে লব কুশ জানায়, আরে ওতেই তো ক্রমে মাথা শক্ত হয়ে ওঠে।

লব জানায়, আমাদের সুশীল দা বলে মাথা এমন শক্ত করে তুলতে হবে যাতে পুলিশের লাঠি মাথায় পড়লে মাথার বদলে লাঠি ভেঙে যাবে।

আর কুশ বলে, শুধু তাই নয়, একদিন গৌরহরিবাবু বলছিলেন মাথা শক্ত হলে তবেই তো সাম্রাজ্যবাদীদের আদেশ ভিতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাবে।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করলো, ভাই সাম্রাজ্যবাদী কাদের বলে?

এ আর জানিস না, ঐ যারা বিলিতি কাপড় বেচে।

ও তাই বলো।

কিন্তু ভাই তোমাদের ঐ আশ্রম নামটা যেন কেমন কেমন; মনে হয় বোষ্টমের আখড়া। দেখোনা আমাদের ইস্কুলের নাম কেমন গাল ভরা—নবীন স্বদেশী বিদ্যালয়।

লব বাধা দিয়ে বলে, আমাদের শুধু তো আশ্রম নয় গান্ধী আশ্রম।

তাতেও এমন গাল ভরে না।

কিন্তু নামের এই অকিঞ্চিৎকরতা গুণের তুলনায় ক্ষমার যোগ্য এই হ'ল তাদের ধারণা।

বন্ধুদের অনেকেই স্থির করলো বাড়ী ফিরে গিয়ে বাবা-কাকাদের বলবে অবিলম্বে তাদের গান্ধী আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে।

রান্না শেখানোই যদি ওখানকার উদ্দেশ্য হয় তবে আমি তাদের চেয়ে ভালো রান্না শেখাতে পারবো, বলল একজনের স্নেহময়ী জননী। অপর জনের স্নেহময় খুল্লতাত কানে ধরে কাছে টেনে ভ্রাতুষ্পুত্রের দুই গালে আচ্ছা করে চড় কষিয়ে দিয়ে বলল—ফের যদি রায়বাড়ীতে যাবি তবে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনবো। খুল্লতাতটি অন্তর্যামী হ'লে বুঝতে পারতো, ভ্রাতুষ্পুত্রটি তো ঠিক এটাই চায়। শিবুর অবস্থা সব চেয়ে সঙ্কটজনক হল। পরমারাধ্য পিতৃদেব তখন কাছারীতে

যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে উঠছিলেন, সংক্ষেপে বললেন, ফিরে এসে হবে। সারা দুপুর শিবুর আহার-নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটলো, অন্যদের তো বিচার সমাধা হয়ে গিয়েছে, শিবুর এখনো মুলতুবি। দোদুল্যমান শাসনবাক্য পতনোন্মুখ বজ্রের চেয়েও ভীতির কারণ।

ওদিকে রায়-বাড়ীতে সঙ্কট ক্রমেই অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগলো। দুপুরে আহারের সময়ে লব কুশ যখন ডাল ভাত ও একটা নিরামিষ তরকারি ছাড়া অন্য সমস্ত পদ খেতে অস্বীকার করলো, আর দুধের বাটিটা দেখবামাত্র শিশু শকুন্তলাকে বিশ্বামিত্র কর্তৃক অস্বীকার করবার ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়ে 'যাও' বলল—তখন রুক্মিণী চোখের জল আঁচলে চেপে উঠে গেল আর ক্রুদ্ধা মলিনা গর্জন করে বলে উঠল, পোড়ারমুখো!

কে পিসিমা?

তোমাদের ঐ গান্ধী বাবা থেকে সব ক'টা, সকলে—

এমন অনার্যোচিত বাক্য কখনো লব কুশের কানে প্রবেশ করেনি, এখন এহেন বাক্য শ্রবণে কি কর্তব্য ভেবে পেলো না, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সেই এঁটো পাতে এঁটো হাতে আর বলা বাহুল্য এঁটো মুখে এ হেন পাপের শুদ্ধীকরণ সঙ্গীত স্বরূপে তারা যুগপৎ মিলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌ল—"বৈষ্ণব জনো তে কহিয়ে—"।

দুপুরের নিদ্রাভঙ্গে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে যজ্ঞেশবাবু বললেন, মলি মা, ও সব অল্প বয়সের বাড়াবাড়ি, বয়স হলেই সেরে যাবে।

কি যে বলো বাবা, বয়স হ'লে গাঁথুনি আরো পাকা হবে, তখন দুঃখ পাবে।

আরে পাগলি দুঃখকে এড়াতে চেষ্টা করলেই কি এড়ানো যায়। ও সাপের লেখার মতন ভাগ্যে থাকলে এসে কামড়াবেই।

তবে কি ওরা এমনি চোয়াড়ে হয়ে থাকবে, এর পরে যে ডাকাতি করবে।

আর স্বদেশী ছোকরার দলও তো ডাকাতি করতো, এখনো হয়তো করে, কই তাদের তো কেউ নিন্দে করে না।

তারা দেশের জন্যে করে।

এরাও দেশের জন্যে করছে, দেশবন্ধু গিয়েছেন কিন্তু তাঁর অনেক কথার মধ্যে একটা কথা মনে গেঁথে রয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন এই গান্ধী আশ্রমগুলো দেশের ভাবী অহিংস যুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্প, ওগুলো সম্বন্ধে শ্রদ্ধার দৃষ্টি রাখবেন। তাইতো পাঠিয়েছি ওদের ওখানে।

বেশ করেছ। বলে রেগে উঠে চলে গেল মলিনা।

ফলে দাঁড়ালো এইযে যে-কয়দিন লব কুশ বাড়ীতে ছিল তাদের খাদ্যের তালিকা সকলের আহার্য পদ হয়ে উঠ্‌ল। এমন কি অনেক চেষ্টাতেও বৃদ্ধ যজ্ঞেশবাবুকেও নিরস্ত করা গেল না। তাঁর এক যুক্তি, দেশের বারো আনা লোকে এটুকুও পায় না। চিরকাল এমন চালাতে পারবো না, এই যা দুঃখ।

রাতের বেলায় রুক্মিণী স্বামীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো, বল্‌ল, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো, আমি আর চোখে দেখতে পারি না। যেমন হ'য়েছে ওদের চেহারা, তেমনি খাদ্য, তার উপরে আবার মাটিতে কম্বল বিছিয়ে পিঁড়ে মাথায় দিয়ে শোয়া। আর সবার উপরে সকালে বিকালে বিড় বিড় করে কি গান করে এক অক্ষর যদি বোঝা যেতো।

কেন, মাঝে মাঝে রবিবাবুর গানও তো গায়।

ও তোমার রবিঠাকুর গান্ধী তলে তলে সবাই এক। কেন সেদিন আনন্দ-বাজার পত্রিকায় ছবি দেখোনি, পাশাপাশি দু'জনে কেমন হাসিমুখে বসে আছে। এটা জেনে রেখো বড় লোকের কোন দল নেই, ওরা সব একদল। প'ড়ে মরুকগে বড়লোক, এখন আমার ছেলে দুটোকে বাঁচাবার উপায় দেখো।

কেন, তুমি তো তোমার বাবাকে সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলে; উত্তর পাওনি?

তিনি নিজে তো গিয়ে পড়েছেন গান্ধীর খপ্পরে একেবারে সেই সাবরমতী আশ্রমে। আজকাল চিঠিপত্র বড় লেখেন না, যদি লেখেন তবে ন'মাসে ছ'মাসে।

ছ'মাস তো হল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখো না কেন, কি লেখেন।

সেই আদিমতম কাল থেকে অন্তিমতম কাল পর্যন্ত স্বামী সম্বন্ধে যে বাক্যটি পত্নীদের শেষ আশ্রয় ও সান্ত্বনা সেই ভরত বাক্য উচ্চারণ করে রুক্মিণী নীরবতা অবলম্বন করলো—কি কঠিন পাষাণের হাতেই না পড়েছি।

দিন তিনেক পরে অবিনাশবাবুর পত্র এলো মেয়ের পত্রের উত্তরে; সে পত্রের কঠিনতা স্বামী-সম্বন্ধীয় কাল্পনিক কঠিনতা থেকে অনেক বেশি কঠিন—অন্ততঃ তাই মনে হ'ল রুক্মিণীর।

অবিনাশবাবু লিখেছেন—

রুক্মিণী মা, তোমার পত্রের উত্তর দিতে অনেক দেরী হয়ে গেল, তার কারণ

সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই, সংক্ষেপে বলছি। এই সাবরমতী আশ্রমে যেখানে গান্ধীজির অনুগ্রহে স্থান পেয়েছি এখানে একমাত্র অভাব সময়ের। ভোর রাতে সাড়ে চারটায় উঠে প্রার্থনায় যোগ দিতে হয় তারপরে সুরু হয়ে যায় নিয়মিত কাজের পালা। এখানে সকলেই কর্মী, নির্দিষ্ট কর্মে সকলে আত্মনিয়োগ করে, সবচেয়ে বেশি কাজ স্বয়ং গান্ধীজির। আমরা প্রাতরাশ সেরে বের হওয়ার আগেই তাঁর আধমন সবজি কোটা শেষ হয়ে যায়, তারপরে তাঁর আরম্ভ হয় চিঠি পড়বার, চিঠি লিখবার পালা, তিনজন সেক্রেটারি পেরে ওঠে না তাঁর সঙ্গে তাল রক্ষা করতে। তারপরে আসে লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় কে কখন সময় পাবে, সম্মুখে থাকে একটা ঘড়ি, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই তিনি একটি নমস্কার করেন, বুঝতে হবে তার পালা শেষ হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আমরা সাফাই ধোলাই শেষ করে ফেলি, চরখা নিয়ে বসি। নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো না কাটা অবধি ছুটি নেই। এইভাবে বাঁধা কাজেব বাঁধা পথ দিয়ে সারা দিনের কাজ গড়াতে গড়াতে সন্ধ্যা হয়ে যায়—তখন আবার প্রার্থনা। তারপরে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। আমার উপরে ভার পড়েছে ছেলেমেয়েদের ইতিহাস পড়াবার, পড়ানো বলতে যা বোঝায় তা নয়, গল্পাকারে সমস্ত বলতে হয়। ওরই মধ্যে আধঘণ্টা সময় দিতে হয় গান্ধীজিকে বাংলা শেখাবার জন্যে। এই লোকটিকে দূরে থেকে মানুষে যা ভাবে মোটেই তিনি তেমন নন। মা বাবা ভাই বন্ধু সব মিলিয়ে একটি চরিত্র, আর কি রসিক পুরুষ। হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঝরণা, আর তুষাররাশির উপরে রোদের কিরণে হাসির ঝলমলানি মিলিয়ে নিলে কতকটা বুঝতে পারবে, সবটা পারবে না কারণ সমুদ্রে ভাসমান তুষার-পুঞ্জের অল্পভাগ মাত্র দৃশ্যমান অধিকাংশ অন্তর্মগ্ন। দেশের অনেক সুকৃতির ফলে এমন একটি লোক আবির্ভূত হয়েছেন।

এবারে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিই। লব কুশকে গান্ধী আশ্রমে পাঠানোয় দুঃখিত হয়েছ। কেন বলো তো। এটা নিশ্চয় জেনো ওরা ডিগ্রি-ধারী কেতাবী পণ্ডিত হবে না, তবে মানুষ হয়ে উঠবে নিশ্চয়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটা অধিকতর কাম্য, দেশে যেখানে যত গান্ধী আশ্রম আছে সমস্তই সাবরমতী আশ্রমের ধাঁচে তৈরি, আর উদ্দেশ্যও এক। সাবরমতী আশ্রমের নাম সত্যাগ্রহ আশ্রম, সবগুলোই নামে না হোক কাজে তাই। সম্মুখে আসছে বিরাট সংগ্রাম যার তুলনায় অসহযোগ আন্দোলন সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। আমি জানি সংগ্রামের নাম শুনে তুমি ভয় পাবে, মনে পড়বে

সুশীলের পরিণাম। কিন্তু ভয় পেয়ো না, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বোমা পিস্তল মারামারি কাটাকাটির স্থান নেই। বলতে পারো সত্যাগ্রহীরা না মারলেও সরকার মারতে পারে। কিন্তু গা এক তরফা মার কি বেশি দিন চলে! সত্যের জন্য দুঃখ সহ্য করে সমবেদনা জাগিয়ে দিতে হবে মারনেওয়ালার বুকে—সে তো মানুষ বই নয়। সত্যাগ্রহের সব রহস্য যে বুঝেছি এমন মনে করি না। আর সে সংগ্রাম কবে আরম্ভ হবে কি ভাবে আরম্ভ হবে এখনো কেউ জানে না, খুব সম্ভব তিনিও জানেন না। বিকাল বেলায় লাঠি হাতে লম্বা লম্বা ধাপ ফেলে যখন তিনি চলেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মাটির দিকে—খুব সম্ভব দেশের মাটির মধ্যে দেশের মুক্তির বীজ সন্ধান করে ফেরেন তিনি। হয়তো দেখতে পেয়েছেন হয়তো এখনো দেখতে পাননি, তবে দেখতে যে পাবেন সন্দেহ নেই। দেখতে পেলে আরম্ভ হবে ভারতব্যাপী নিরস্ত্র অহিংস সংগ্রাম। দেশের শত শত গান্ধী আশ্রমের ট্রেনিং ক্যাম্পে যারা এখন তৈরি হচ্ছে তারাই হবে এই মুক্তি-সংগ্রামের Vanguard, আগরওয়ালা সৈনিক। তোমার লব কুশ সেই দলের, এ শুধু তাদের সৌভাগ্য নয়, তোমার আমার আমাদের সকলের সৌভাগ্য। মন থেকে ভয়ের অন্ধকার, সংশয়ের কুয়াশা দূর করে দাও। দেখবে সমস্ত উজ্জ্বল সমস্ত সুস্পষ্ট। আমার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করো, আর তোমাদের বাড়ীতে সাপ্তাহিক Young India নিশ্চয় যায় নিয়মিত পড়ো।

রায় মশায়কে আলাদা চিঠি দিলাম। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো, আর লব কুশ দাদুকে আমার আশীর্বাদ ও অভয় জানাবে। বাবা।

বাবার পত্র পড়ে রুক্মিণীর মনে যেটুকু আশা ভরসা ছিল অন্তর্হিত হ'ল। সুশীলের পরিণাম ভাবতে নিষেধ করেছিলেন বাবা, কাজেই সেই পরিণামটাই অধিকতর ভয়াবহ রূপে তার মনে দেখা দিল। চিঠিখানা স্বামীকে দেখাবার আগেই দেখালো মলিনাকে। মলিনা সমস্ত পড়ে ফিরিয়ে দিল বউদিকে।

কিছু বল্‌লে না যে!

বলবো আবার কি?

কেন!

যেমন তোমার বাবা তেমনি গান্ধী বাবা। তোমার বাবা তোমার কানে মন্ত্র দেন আর গান্ধীবাবা দেশ শুদ্ধ লোকের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়ান।

অরবিন্দর প্রশ্নের যে উত্তর গান্ধীজি দিয়েছিলেন, বিষাক্ত তীরের ফলার মতো তা বিঁধেছিল মলিনার মনে। কেন ঐটুকু না লিখলে এমন কি ক্ষতি ছিল। কিন্তু একবারও নিজের মনকে প্রশ্ন করলো না গান্ধীজির উত্তর লঙ্ঘন করে

অরবিন্দকে বিয়ে করলে ক্ষতি ছিল কি। সে চেপে ধরলে অরবিন্দর সাধ্য ছিল কি অস্বীকার করে। তবে কেন পিছিয়ে এল! এই তবের উত্তর যতই পায়নি ততই রাগ বেড়ে উঠেছে গান্ধীর উপরে। লব কুশ এসেই জিজ্ঞাসা করেছিল, অরবিন্দদা কোথায়, তাকে দেখছি না কেন?

মলিনা বলেছিল, কল্‌কাতায় ভালো কাজ পেয়েছে তাই চলে গিয়েছে।

মলিনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে অরবিন্দর আর এখানে থাকা সম্ভব হ'ল না। বঙ্গবাসী কলেজের কৃতী ছাত্র সে, লিখবামাত্র তারা লিখলো অবিলম্বে চলে এসো। মাকে নিয়ে গিয়ে কল্‌কাতায় বাসা বেঁধেছে।

লব কুশ উত্তর শুনে বল্‌ল, দাঁড়াও না পিসিমা, আমরা কল্‌কাতায় গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আনছি, এখানকার কাজ এমন কি খারাপ ছিল!

মলিনা মনে মনে হাসলো।

এমন সময়ে থালার উপরে ছোলা ভিজা আর আখের গুড়, সঙ্গে দুটি সন্দেশ নিয়ে রুক্মিণী এসে উপস্থিত হল, মনে ক্ষীণ আশা, ভুলে যদি সন্দেশ দুটি খায়।

নে খেয়ে নে।

ও দুটো কি মা?

সন্দেশ!

সন্দেশ। বিষ, বিষ, শীগ্‌গীর সরিয়ে নাও।

কেন এতদিন তো খেতিস!

এখন যে আমরা সত্যাগ্রহী সৈনিক!

রুক্মিণী আঁচলে চোখের জল মুছে সন্দেশ সরিয়ে নিল।

এমন সময়ে যজ্ঞেশ বাবু একখানা টেলিগ্রাম হাতে করে উপস্থিত—কই শচীন কই?

এই যে বাবা—বলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, শুধালো, টেলিগ্রাম কিসের?

গৌরহরিবাবু জানিয়েছেন—কয়েক দিনের মধ্যেই গান্ধীজি আশ্রমে আসবেন, লব কুশকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া যেন হয়। কাল তো রবিবার আছে, তুমি নিয়ে ওদের রেখে এসো না কেন।

বেশ, তাই হবে।

লব কুশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আর রুক্মিণী ও মলিনা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মূর্তিমতী অসহযোগের মতো নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

ইংরাজ সরকার হিংসায় বিশ্বাসী যে-রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসবাদী বলতো গান্ধীর অভিনব কর্মপদ্ধতি দেখে তাদের বিশ্বাস হয়েছিল এতেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, কারণ এমন প্রকাশ্য ও ব্যাপক কর্মযজ্ঞ তাদের ধারণার অতীত ছিল, আর যে লোকের এক ডাকে লক্ষ লোক সমবেত হয় তার উপরে সহজেই বিশ্বাস স্থাপিত হয়। সন্ত্রাসবাদীরা বিচার ক'রে দেখলো, প্রায় কুড়ি বছরের চেষ্টাতেও তাদের শিকড় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীচে নামতে পারে নি, সেখানেও তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ, ধনীদের মধ্যে অনুকূলতার বদলে প্রতিকূলতা। তাদের উপরে বিশ্বাস যদি থাকতো তবে লোকে স্বেচ্ছায় টাকা দিত, দেশের হিতের জন্যে দেশের লোকের উপরে ডাকাতি করতে হতো না। এ বিষয়ে গান্ধী জাদুকর। তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের নামে দেশের কাছে হাত পাতলো আর অমনি এসে গেল এক কোটি টাকা। তারা স্থির করলো একে দিয়েই কার্য সিদ্ধ করতে হবে। কেবল একটা বড় ত্রুটি তাদের চোখে কেমন কেমন লাগলো। লোকটা ঘন ঘন অহিংসার কথা বলে। আরে, অহিংসায় কি ডাল গলে। অনেকের ধারণা হ'ল ঐ অহিংসাটা চালমাত্র, হিংসার উপরে মালাতিলকের পর্দা ঝোলানো। তবু তাকে একটা সুযোগ দিতে বাধা কি, তবে যদি প্রমাণ হয় যে তিনি অহিংসাকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকলেন, বিশেষ কোন ফলোদয় হ'ল না, তবে আবার মত বদলাতে কতক্ষণ।

এদিকে সন্ত্রাসবাদীরা ছোট বড় নানাদলে বিভক্ত। মূল অনুশীলন দলের পরে দেখা দিল যুগান্তর দল; তারপরে কোনস্থানে বা নেতা বিশেষকে, কোন স্থানে বা জেলা বিশেষকে অবলম্বন করে আরও অনেক দল দেখা দিল। তবু সকলেই মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অনুশীলন দলের নেতৃত্ব স্বীকার করতো। তাই অনুশীলন দলের প্রধানগণ (তখন নাম করবার উপায় ছিল না) যখন গান্ধীনীতি স্বীকার করে নিল, জানালো এখন তাদের হিংসার পথ বন্ধ রইলো কেউ বিশেষ আপত্তি করলো না। অনুশীলন দলের নেতৃত্ব দলের শপথ-গ্রহণকারী লোকদের শপথ থেকে মুক্তি দিল, জানিয়ে দিল এখন তারা আর দলের অনুশাসন মানতে বাধ্য নয়—তারা ইচ্ছা করলে গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে, এমন কি ইচ্ছা করলে রাজনীতি একেবারে পরিত্যাগ করে সংসারী হ'য়ে বিবাহাদি করতে পারে। তবে আবার যদি কখনো প্রয়োজন হয় ডাক দেবে, যাদের ইচ্ছা পুনরায় এসে যোগদান করতে পারে। অনেকেই সন্ন্যাসক্তি

গান্ধীর কাছে গিয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার কথা জানালো।

গান্ধী নিজেকে বেনিয়া বলেন, কাজেই টাকা ঝুঁন দিয়ে নেওয়া তাঁর অভ্যাস। তিনি শুধালেন, তোমরা তো বলছ যে অহিংসা স্বীকার করছ, তবে সেটা creed হিসাবে না policy হিসাবে।

তারা বল্ল, policy হিসাবে।

গান্ধী খুশী হ'য়ে বললেন, এই রকম সরল সত্যভাষণ আশা করেছিলাম তোমাদের কাছে থেকে।

কেউ কেউ বল্ল, আপনি কি আমাদের স্বীকার করলেন ?

না করবার কোন কারণ নেই। দেখো, যে দল আমার প্রধান সহায় সেই কংগ্রেসের শতকরা নব্বই জন policy হিসাবেই অহিংসাকে মানে, তার বেশি তারা এগোতে রাজি নয়। সেই জন্যে কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ঘোষণার মধ্যে "অহিংস" শব্দটা নেই, আছে peaceful and legitimate শব্দ দুটি।

দুটোয় জড়ালে কি অহিংসা হয় না ?

দেখো, জোড়াতাড়া দিয়ে অহিংসা হয় না, তবে আমি কংগ্রেসের মুখে peaceful ও legitimate শব্দ দুটোতেই খুশী। সম্ভব নিয়ে রাজনীতি। আরও দেখো, a general never blames his tools.

এখন আমাদের প্রতি আদেশ কি ?

আদেশ দেওয়া আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়, ওটা আসবে কংগ্রেস থেকে। তবে যতদিন কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানবে হিংসার পথে চলা বন্ধ রেখো।

আমরা সে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তবে আর কি, থেকে যাও।

বিপ্লবীদের অধিকাংশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে রাজনীতিতে নামলো। কিছু লোক সাময়িক ভাবে হিংসা থেকে বিরত হ'ল, তবে হিংসায় বিশ্বাস ছাড়লো না ; আর স্বল্পতর কিছু লোক শপথ-মুক্তির সুযোগ নিয়ে একেবারেই রাজনীতি ছেড়ে দিল, সংসার ধর্মে তাদের আপত্তি রইলো না। এমন একজন লোক অরবিন্দ।

গান্ধী নেতৃত্বে বিপ্লবীদের বিশ্বাসে প্রথম আঘাত লাগলো চৌরিচৌরার ব্যাপারে, যখন গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ওরা ভাবলো লোকটা দেখছি মনে প্রাণে মালাতিলকধারী. আমাদের ধারণা হয়েছিল এটা একটা পর্দা মাত্র। আরে রাম, এত বড় একটা দেশে এক ছটাক রক্তপাত হয়েছে তাতেই এই! তারা বিহ্বল হল। যারা মনে মনে হিংসায়

বিশ্বাস ছাড়েনি অথচ হিংসাত্মক কার্য থেকে বিরত ছিল, বল্‌ল—কেমন, হল তো, আমরা আগেই জানতাম লোকটা বিপ্লবী নয়, নিতান্তই সেকেলে বাবাজি। তবু অধিকাংশ লোক গান্ধী নেতৃত্ব বর্জন করলো না। ভাবলো, দেখা যাক কি হয়। এমন সময়ে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন, তখন তো আর দলত্যাগের কথা ওঠে না।

কিন্তু তারপরে যখন গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশের সম্মুখে নূতন কর্ম্মপদ্ধতি দিলেন চরখা, সুতো, স্বরাজ; স্বরাজ মানেই সুতো কাটা, স্বরাজের সূত্রপাত চরখার সূত্রপাতে, তখন পূর্বতন সন্ত্রাসবাদীরা একযোগে গান্ধী নেতৃত্ব পরিহার করলো, বললো আর নয়, জোলা আর তাঁতির রাজ্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণপণ করে ঘর সংসার ছেড়ে রাস্তায় বের হই নি। হিংসায় বিশ্বাসী যে ক্ষুদ্র দলটি নিজেদের বিশ্বাস আঁকড়ে এতকাল নিষ্ক্রিয় ছিল তারা বল্‌ল, এখন শিক্ষা হ'ল তো, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।

তখন আবার বোমা বন্দুক পিস্তল চল্‌ল। কল্‌কাতার শাঁকারিটোলার ডাকঘরে, গ্রামের রেল অফিসে, মির্জাপুর স্ট্রীটে বোমা-পিস্তল, দক্ষিণেশ্বরে ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার, কাকোরী রেল স্টেশনে ডাকাতি, প্রেসিডেন্সি জেলে পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত, পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপরে গুলি—এমন আরও কত।

গান্ধীর উভয় সঙ্কট। সহিংস বিপ্লববাদীরা ভাবে ওঁকে দিয়ে কিছু হবে না। আবার সর্বজ্ঞ সরকার ভাবে এই সব হত্যাকাণ্ডের মূলে তলে তলে গান্ধী আছে, নইলে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই আবার হিংসাত্মক কাজ আরম্ভ হবে কেন! অহিংসা ওর নিরীহ নামাবলী। আর যার সম্বন্ধে এত জল্পনা তখন তিনি বিহারে আসামে উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে সভায় সভায় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন সুতো কেটে স্বরাজ আনো, চরখা খদ্দর স্বরাজ, অন্য সমস্ত কাজ এখন বন্ধ থাকুক।

অবশ্য রাজনীতি বন্ধ রইলো না, গান্ধীর অনুরোধ সত্ত্বেও বন্ধ রইলো না। রাজনীতি করা মানে বাঘের পিঠে চাপা, চাপা সহজ নামা প্রায় অসম্ভব। প্রায় এই জন্যে বাহনের বদল হ'তে পারে কিন্তু বাহনার বদল সম্ভব নয়। কংগ্রেস প্রথমে আইন সভা বর্জন করলেও কংগ্রেসের অনেক প্রধান ব্যক্তি স্বরাজ দল এবং ন্যাশানালিস্ট দল গঠন করে রূপান্তরে রাজনীতি করতে লাগলেন।—এই নিয়েই দুটি শব্দ চালু হয়ে গেল—নো-চেঞ্জার (No-changer) আর প্রো চেঞ্জার (Pro-changer)।

একদিন বিকালবেলা অরবিন্দ মির্জাপুর স্ট্রীটে ফেভারিট কেবিন নামে চা পানের দোকানে ঢুকতে যাবে, দেখতে পেলো দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে রবিন—তার পুরানো বন্ধু, অনেক দিন পরে দেখা।

দুজনে হাত ধরে মুখোমুখী হয়ে কিছুক্ষন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবার পরে রবিন প্রথমে কথা বল্ল, কি চা খেতে ঢুকছিলে তো, চলো বামা কেবিনে যাওয়া যাক, এখানে বেজায় ভিড়।

বামা কেবিন শ খানেক গজ পূবে, মির্জাপুর স্ট্রীটেই।

বামা কেবিনে এসে দেখল প্রায় নির্জন, একজন মাত্র খদ্দের, তারও আবার চা পান সমাপ্ত হওয়ার মুখে।

কি খাবে রবিন ?

ও প্রশ্ন তো আমার জিজ্ঞাসা করবার! আমি চা খেয়ে বের হচ্ছিলাম আর তুমি ঢুকছিলে চা খেতে।

একথা লজিকাল বটে।

চায়ের সঙ্গে মাখন মাখানো পাউরুটির টুকরো এলো।

রবিন আর অরবিন্দ দুজনেই সন্ত্রাসক দলের। এদের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল, সে নিয়ম মূল শপথের অঙ্গ, কেউ কাউকে সন্ত্রাসক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে না, কেউ যদি স্বেচ্ছায় বলে তবে সে আলাদা কথা। তবে অন্য প্রশ্নে আপত্তি নেই।

অরবিন্দ, তুমি নাকি কলেজে চাকুরি নিয়েছ ?

হাঁ, বঙ্গবাসী কলেজে।

আছ কোথায়, মেসে না বাসায় ?

কিছুদিন মেসে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম, দেখলাম অনেক বাধা, প্রধান কারণ লোকের অকারণ ঔৎসুক্য, তাই ছোট একটা বাসা করলাম

কোথায় ?

মুসলমানপাড়া লেন, কলেজের কাছে হয়।

বিয়ে যে করোনি বুঝতেই পারছি।

কি করে বুঝলে ?

বিয়ে করলে কেউ কলেজ থেকে বের হয়ে দোকানে চা খেতে আসে না।

আমিও সাধারণত আসি না, তবে এদিকে খান কতক বই কিনবার দরকার ছিল, ভাবলাম এক ঢিলে দুই পাখী মেরে যাই।

একটি পাখীর নাম কি রবিনহুড ?

দলের মধ্যে রবিনহুড বলে তার পরিচয় ছিল, ছুরি ছোরা বন্দুক পিস্তলে তার দক্ষতার জন্যে।

অরবিন্দ ও রবিন দুজনে হো হো শব্দে হেসে উঠল।

তখন অরবিন্দ আরম্ভ করলো, দেখো রবিন, তুমি আবার শপথ গ্রহণ করেছ কিনা জানি না, যদি করে থাকো তবে তোমার পক্ষে খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব নয়, আমাতে বাধা নেই।

কেন তুমি কি দলে ভিড়বে না ?

দলে ভিড়েছি বইকি।

তবে তুমিই বা খোলাখুলি আলোচনা করবে কিভাবে ?

রবিন, আমি সেইদলে ভিড়েছি যেখানে সব খোলাখুলি, যেখানে আগে নোটিশ দিয়ে আইন ভাঙা হয়।

বুঝেছি আর বলতে হবে না, ঐ জাদুগিরের হাতে ধরা পড়েছ।

জাদুগির আর হঠযোগী যাই বলো আমি ইচ্ছা করেই ধরা দিয়েছি।

আর আমরাও তো ধরা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু লাভ কি হল ? প্রথমে চৌরিচৌরায় ছটাক খানেক রক্তপাতে বাবাজী মূর্ছিত হলেন—তারপরে এখন দেশোদ্ধারের নূতন ফরমুলা বের করেছেন—চরখা চালাও ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাবে। ইংরেজ পালাবে এখনো প্রমাণ হয়নি কিন্তু বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা দেশ জুড়ে বসবে তা ইতিমধ্যেই চোখে দেখতে পাচ্ছি।

রবিন, তোমার আমার চোখের দৃষ্টি কতদূর যায় ?

বেশিদূর যায় না স্বীকার করছি কিন্তু রবিঠাকুর তো একটা ঋষিতুল্য ব্যক্তি, তিনি বিদেশী কাপড় পোড়ানো আর চরখার ঘোরতর বিরোধী। কেন ?

কেন তিনি জানেন। তবে আমি যা জানি বলতে গেলে অতবড় মানী লোকের মানহানি হবে।

হ'লেও এই সামান্য বাসা কেবিনের মধ্যে হবে, শুনিই না।

বিলিতী কাপড় পোড়াতে গেলে তাঁর বাড়ীতে এক টুকরো কাপড়ও যে থাকে না। আর চরখার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ এদেশের গরীব দুঃখীর আর জোলা তাঁতিদের। অতবড় অভিজাত ধনীর পক্ষে সেই চরখা স্পর্শ করা, ওঃ বাব্বা।

এ তোমার অন্যায় ধারণা অরবিন্দ।

গান্ধীর সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা তার চেয়ে হীন নয় কি।

আরে কোথায় গান্ধী আর কোথায় রবিঠাকুর। এ প্রভেদ গান্ধী নিজেও জানেন, সাধে কি গুরুদেব বলেন তাঁকে।

আর তিনি যে মহাত্মা বলতে গদ্‌গদ। দেখো ভাই রবিন, রামচন্দ্র আর মহাদেবে হরিহরাত্মা—যত ঝগড়া তাঁদের সহচরদের মধ্যে।

বেশ, তবে অনুচরদের মধ্যে আপোষ হ'য়ে যাক, এসো আর এক পেয়ালা করে চা খাওয়া যাক।

দেখো শপথ যখন আর নিচ্ছ না বিয়ে করো না কেন?

ইচ্ছা যে না ছিল তা নয়।

তবে বাধলো কোথায়?

সে অনেক কথা, আর দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। সেই দুঃখেই পালিয়ে কল্‌কাতায় এসেছি।

কল্‌কাতায় তো মেয়ের অভাব নেই।

যথেষ্ট আছে, প্রয়োজনের বেশি আছে, কিন্তু এ আলোচনাটা আর বেশিদূর গড়াতে দিতে চাইনে।

তবে থাক। এ সপ্তাহে তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে, অবশ্য কলেজের কাজ ছাড়া?

একবার হুগলি যেতে হবে।

কেন?

গান্ধীজি ওখানে যাবেন, যদি দেখা হয়।

তিনি তো কল্‌কাতা হয়েই যাবেন, দেখা করো না।

কল্‌কাতার বড় হাটে কি তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব!

সেদিন আর নেই অরবিন্দ, এবারে দেখতে পাবে হাট ভেঙে গিয়েছে, গান্ধী ফুরিয়ে গিয়েছে।

দেখা যাক তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণাম।

আরও একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি মনে রেখো—এদেশে পরাধীনতার ভারি কার্পেটখানা বিছানো আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম দিক থেকে, সবশেষে এসে পৌঁছেছিল পূবদিকে। এবার সেই কার্পেট গোটানো আরম্ভ হবে পূবদিক থেকে মনে রেখো।

তার মানে বলতে চাও কল্‌কাতা থেকে?

তার মানে বলতে চাই কল্‌কাতারও পূবে আরও জায়গা আছে।

আছে বইকি—ঢাকা, বরিশাল চট্টগ্রাম জেলা থেকে?

কোন উত্তর দিল না রবিন।

চলো বের হওয়া যাক।

না আর একটু দেরী করো, 'এক বেটা টিকটিকি ঘোরাফেরা করছিল। বেরিয়ে দুজনে দুদিকে চলে যাবো যাতে বেটা ভাবে এদের মধ্যে যোগাযোগটা নিতান্তই আকস্মিক।

অরবিন্দ আগে ভাগে এসে চুঁচুড়া রেলস্টেশনের ওভারব্রিজের উপরে একটু জায়গা করে নিয়েছিল, সে শুনেছিল যে গান্ধীজির গাড়ী ডাউন প্ল্যাটফর্মে লাগানো হবে যাতে লাইন পার হ'তে গিয়ে ওভারব্রিজের উপরে ভিড় না হয়। তখনো গাড়ী পৌছতে ঘণ্টা খানেক দেরী, অরবিন্দ তাকিয়ে দেখল প্ল্যাটফর্মের উপরে চাপ-বাঁধা জনতা আর স্টেশনের বাইরে যতদূর চোখ যায় লোকে লোকারণ্য, গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি, কাঁধে কাঁধে ঘেঁষাঘেঁষি, সেই হ্যারিসন রোডের দৃশ্যের পুনরভিনয়। আসাম মেল শেয়ালদ স্টেশনে পৌছবার আগে থেকে স্টেশনের চত্বর ভরে গিয়ে জনতার প্রবাহ বউবাজারের মুখ থেকে হ্যারিসন রোডের মাথা অবধি ছড়িয়ে পড়েছে আর জনতার মূল প্রবাহটা হ্যারিসন রোড কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিম দিক বরাবর। আর শুধু তাই কেন পৃথিবীর এই প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশে জনতার ছায়াপথ রচিত হয়েছে দুদিকের বারান্দায় আব ছাদে। রবিনের উক্তি মনে পড়লো অরবিন্দর, এই কি গান্ধীজির ফুরিয়ে যাওয়া! চুঁচুড়ার দৃশ্য দেখেও রবিনের উক্তি আবার মনে পড়লো—এই কি গান্ধীজির ফুরিয়ে যাওয়া!

তন্ময় হ'য়ে যখন সে এইসব মনে মনে আলোচনা করছিল। চমকে উঠ্‌ল জনতার গর্জনে। তাকিয়ে দেখে দূরে ট্রেনের এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। অবশেষে গাড়ী এসে থামলো, এত যাত্রী নামলো মনে হল গাড়ীখানা বুঝি খালি হয়ে গেল। অরবিন্দর চোখ খুঁজছে এই জনারণ্যের মধ্যে গান্ধীজিকে। কোথায় তিনি? এমন সময় দেখতে পেলো খদ্দরের পোশাক পরা একদল ভলান্টিয়ার হাতে হাতে হাতে ধরাধরি করে বূহ রচনা করেছে, তার মধ্যে ক্ষীণকায় যষ্টিধারী সেই ব্যক্তি। অনেক দূর থেকে সে দেখলো আর অনেক বছর পরে, মনে হ'ল রোগা হয়ে গিয়েছেন। আর একি বেশ! আগে দেখেছে কাথিয়াওয়াড়ি পোষাকে,-মাথায় পাগড়ি, গায়ে পিরান, পরনে ধুতি, পায়ে জুতো, আর আজ মাথায় ছোট একটা খদ্দরের টুপি, খালি গায়ে কাঁধের

উপরে খদ্দরের চাদর আর ধুতির ঝুল হাঁটুর নীচে নামেনি, পায়ে কি আছে দেখা যাচ্ছে না।

শহরের কাছে ময়দানে যেখানে জনসভা হচ্ছিল অরবিন্দ যখন সেখানে এসে পৌঁছল বুঝলো সভা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ভিড় ঠেলে এগোতে তার বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। ময়দান ছাপিয়ে জনতা গঙ্গার ধারে নেমে পড়েছে, লক্ষ লোক হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই, পয়সাটি পড়লেও শুনতে পাওয়া যায়। কাছেই একটা তাল গাছ ছিল, তার পাতায় বাতাস লেগে সরসর শব্দ হচ্ছে সেটুকুও এড়ায় না কানে। আর বক্তব্য! সেই পুরাতন কথা। চরখায় সুতো তৈরি করো, চরখার সুতোতেই স্বরাজ, বিলিতি কাপড় বর্জন করো। বক্তৃতার শেষে কিছু নূতন কথা ছিল—সবাই জিজ্ঞাসা করে আন্দোলন হচ্ছে না কেন। কবে আরম্ভ হবে, কি হবে তার আকার, তার কর্ম্মপদ্ধতি। তিনি বলে চলেন, অনেকের ধারণা এখন সরকারের সঙ্গে আপোষ করবার মতো মনে হয়, জনগণ চায় বিরাট আন্দোলন যার মধ্যে আপোষের স্থান নেই। আমার বক্তব্য এই যে ওসব দায়িত্ব ও সব ক্রিয়াপদ্ধতি আমার উপরে ছেড়ে দাও। এখন আমি কিছুই প্রকাশ করবো না, ঠিক সময়ে ঠিক পথে ঠিক ধাপ ফেলে অগ্রসর হ'ব। তোমরা আমায় সহায়তা করো স্বরাজ সূত্র বহন করে। আন্দোলনের ভার আমার উপরে ছেড়ে দাও, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে হাম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে।

ঐ শেষের বাক্যটিতে অরবিন্দর সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হ'ল ; হয়তো সকলেরই হয়েছে। বক্তৃতা শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু লোক জয়ধ্বনি করতে ভুলে গেল, সমস্ত নিঃশব্দ নিশ্চল নিস্তব্ধ। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র কলধ্বনি করে ওঠে, সূর্যোদয়ে একেবারে নির্বাক। চন্দ্রে সূর্যে অনেক প্রভেদ।

অরবিন্দ আগেই গৌরহরি সোমকে লিখে জানিয়েছিল যে রাতটা তাঁদের আশ্রমে কাটাবে। কিন্তু সেখানে যেতে আর মন সরছিল না—ঐ যে একটি মন্ত্র কানে প্রবেশ করেছিল 'হাম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে' সেটাকে সযত্নে মনের মধ্যে দোলাতে সুরু করলো সদ্যোজাত শিশুর মতো। ঐ ক্ষুদ্র বাক্যটি সুস্পষ্ট তিনটি ধাপ ফেলে এগিয়ে চলেছে, ছন্দ ভাগ করে বারবার সে আবৃত্তি করতে লাগলো—হাম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে। তামাম হিন্দুস্থান। উথল যায়েঙ্গে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি অন্ধকার, আকাশে তারাগুলো উৎসুক, তারা সবাই যেন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে বদ্ধপরিকর কালপুরুষের যোজনব্যাপী ধাপ

ফেলে এগিয়ে যাওয়ার অবিশ্রান্ত দৃশ্যটি। অরবিন্দ তন্ময় হয়ে দেখছে। এমন সময়ে তার মুখের উপরে পড়লো বিজলি বাতি! এক ঝলক আলোর ছটা।

লব, এই যে, অরবিন্দদা এখানে।

বাঃ বাঃ, একা বসে কবিত্ব করছেন আর আমরা সারা ময়দান খুঁজে মরি।

লব বল্‌ল, শীগগীর আশ্রমে চলুন, সবাই আপনার জন্যে চিন্তা করছেন।

চলো ভাই, বলে উঠে পড়লো অরবিন্দ।

২৯

গৌরহরি বাবুর অনুরোধে অরবিন্দ রাজি হল লব কুশকে দিনাজশাহীতে পৌঁছে দিতে। তিনি বল্‌লেন, গান্ধীজি আমাদের আশ্রমে আধঘণ্টার জন্যে এসে পায়ের ধুলো দিয়ে গিয়েছেন—সমস্ত ব্যবস্থা দেখে খুশী হলেন, সব চেয়ে বেশি খুশি হলেন লব কুশকে দেখে, বললেন, ছেলে দুটি যেমন উজ্জ্বল তেমনি উৎসাহী, ওদের একবার সাবরমতীতে পাঠিয়ে দিন। ওদের দেখে ওখানকার ছেলেরাও শিক্ষা পাবে আবার ওরাও কিছু শিখবে। তারপরে যখন শুনলেন যে অবিনাশ চক্রবর্তী মশায় ওদের মাতামহ তিনি বলে উঠলেন তবে তো ওরা আমার নাতি, দিন শীঘ্র ওদের পাঠিয়ে। ওরা তো শুনে অবধি আমার সঙ্গ ছাড়ছে না, বলছে, দাদা কার সঙ্গে পাঠাবেন।

আমি বল্‌লাম, তার আগে একবার বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে এসো।

যাই তবে বাড়ীতে।

আরে দাঁড়াও, তোমাদের দাদু বলেছেন একাকী না পাঠাতে। শুনে ওরা বলে একা কোথায়! আমি যাবো কুশের সঙ্গে, আর কুশ যাবে আমার সঙ্গে। তারপরে যখন শুনলো যে আপনি আসতে পারেন তখন থেকে ঘর বার করছে, অবশেষে খুঁজতে বার হয়েছিল, বল্‌ল, অরবিন্দদা নিশ্চয় পথ ভুলে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসছে।

অরবিন্দ বল্‌ল, গঙ্গার ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময়ে বিদ্যুতের আলো নিয়ে গিয়ে ঠিক ধরলো, ভালই হল, নইলে আরও খানিকটা খুঁজতে হতো আপনাদের আশ্রম।

আমাদেরও ভালো হল, কার সঙ্গে পাঠাই ভাবছিলাম, এখন সে ভাবনা দূর হল। আজ রাতটা এখানে বিশ্রাম করুন, কালকে ওদের নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন। যজ্ঞেশ বাবুকে আমার নমস্কার দিয়ে জানাবেন যে ওদের যেন শীঘ্র

-করে ফিরে পাঠিয়ে দেন, গান্ধীজি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে গিয়েছেন।

পরদিনে লবকুশকে নিয়ে অরবিন্দ কল্‌কাতায় চলো এলো, বল্‌ল, ভাই কলেজে ছুটি নিতে হবে আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বুঝিয়ে বলে যেতে হবে। এই বেগারের কাজ ছাড়াও অরবিন্দর নিজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল একবার দিনাজশাহীতে যাবার। এতদিন সময় করে উঠতে পারে নি, তাছাড়া নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া চলছিল, সেখানেও হিসাব মিলিয়ে উঠতে পারেনি। স্থির করলো ঘটনাচক্রে আজ যখন যেতেই হবে সেই হিসাবটার শেষ অঙ্ক মিলিয়ে নিয়ে সমস্ত রোখশোধ করে আসবে।

রাতের গাড়ীতে লবকুশকে নিয়ে অরবিন্দ রওনা হল, ওরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো, অরবিন্দর আর ঘুম আসে না। সে ভাবছিল মলিনা অসম্মত হ'ল তাকে বিবাহ করতে। সন্ত্রাসক দলে থাকতে মানুষ খুন করেছিল এই যদি কারণ হয় তবে মলিনার ভাই সুশীলও তো সেই দলে ছিল, হয়তো বা দলের আদেশে খুন করেও থাকবে। তবে অরবিন্দর বেলায় এমন অবহেলা আর অসম্মতি কেন। এসব প্রশ্নের উত্তর পায়নি, কারণ প্রশ্ন করবার মতো তার মনের অবস্থাই ছিল না। পরদিনেই কতকটা রাগে কতটা অভিমানে কতকটা অপমান-বোধে কলেজে ছুটি নিয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো কলকাতায়। এক হোটেলে উঠে বাসা খুঁজে স্থির করলো, সেই সঙ্গে দেখা করলো তার পুরানো কলেজে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষের সঙ্গে। তিনি নিজে এক সময়ে স্বদেশী ছিলেন, স্বদেশী ছাত্রদের প্রতি মমতার অন্ত ছিল না, আভাসে ইঙ্গিতে জানতেন অরবিন্দ সন্ত্রাসক দলের লোক। তা ছাড়া সে কলেজের নাম করা ছাত্র ছিল, সহজেই চাকুরি জুটে গেল। সেই অবধি আর দিনাজশাহীর খবর রাখে না, কিন্তু যে খবর মৌমাছির পাখায় ভর করে আসে সে খবর ঠেকাবে কি করে। মলিনাকে সে ভালোবাসতো আর নিশ্চয় করে জানতো মলিনাও তাকে ভালোবাসে। তবে কেন? নরঘাতী বলে? সে কি চোর না ডাকাত না ঠেঙাড়ে ফাঁসুড়ে। নরহত্যা করেছিল দেশের স্বার্থে, তার উপরে কলঙ্কের আরোপ করেছে দলের আদেশে। এমন তো কতজনে করেছে, বিবাহও হয়ে গিয়েছে তাদের, তবে তার বেলাতেই অদৃষ্ট এমন বেঁকে বসলো কেন? সে সব কথা খুলে বলেছিল—এ অপরাধ না গুণ? আর যার পরামর্শে খুলে বলেছিল তার পরামর্শে যে আজ সমস্ত দেশটা চলছে। সে স্থির করেছিল আজ যখন দিনাজশাহীকে যেতেই হচ্ছে একবার খোলাখুলি সব জেনে নেবে।

অবশ্য মলিনার সঙ্গে আর তার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয় তবে শচীনদাকে জিজ্ঞাসা করতে তো বাধা নেই। সে আরও জানতো এখন আর আগের মতো যজ্ঞেশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্থির করলো ওদের স্টেশন থেকে বাড়ীতে রওনা করে দিয়ে যাবে ভূপতিদার বাড়ীতে, অবিবাহিত ব্যক্তি, বন্ধুদের জন্য অবারিত দ্বার।

দিনাজশাহী স্টেশনে পৌছে গাড়ী করে লবকুশকে রওনা করে দিল বাড়ীর দিকে, আর বল্‌ল যে সে উঠবে ভূপতিদার বাড়ীতে। লবকুশ কিছুতেই বুঝতে পারলো না অরবিন্দদা কেন ওদের বাড়ীতে না গিয়ে যাচ্ছেন অন্য জায়গায়। ওদের অনেক টানাটানিতেও যখন অরবিন্দ অটল থাকলো, ওরা রাগ করে বাড়ী রওনা হয়ে গেল।

ভূপতির বাড়ীতে পৌছে দেখল বাড়ী বন্ধ, খোঁজ নিয়ে জানলো সে কল্‌কাতায় গিয়েছে। কাছেই ছিল নৃপতির বাড়ী, সে স্বদেশী কলেজের অধ্যাপক, তার সহকর্মী, সপরিবারে বাস করে, সরাসরি সেখানে চলে গেল গিয়ে শুনলো নৃপতি কলেজে গিয়েছে, তবে অভ্যর্থনার অভাব হল না, নৃপতির মা তাকে চিনতেন, আদর করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

অরবিন্দ বল্‌ল, মাসিমা আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম তো?

তিনি বল্‌লেন, নিজে অসুবিধায় না পড়লে সহজে কি আসতে। নাও বসো, চা খাও, স্নানাহার করে ঘুমোও, নিপুর আসতে সেই বিকাল।

লব কুশ বাড়ীতে ঢুকতেই দেখা হল মলিনার সঙ্গে। সে শুধালো, হাঁ রে তোরা কখন এলি?

এই আসছি।

কার সঙ্গে এলি?

অরবিন্দদার সঙ্গে। কত করে বললাম আমাদের বাড়ীতে আসতে, কিছুতেই এলেন না।

কোথায় গেলেন?

ভূপতিদার বাড়ীতে।

অরবিন্দ এসেছে শুনে মলিনার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছিল, সুখ কি দুঃখ বুঝতে পারেনি। পরে যখন শুনলো ভূপতির বাড়ীতে উঠেছে আবার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠ্‌ল, দুঃখ কি সুখ বুঝতে পারলো না।

এমন সময়ে বের হয়ে এলো রুক্মিণী। ওরে তোরা হঠাৎ?

লব কুশ উত্তর দেবার আগেই এলো শচীন, তারপরে যজ্ঞেশবাবু।

আর বলা নেই কওয়া নেই, একি রে!

বাড়ীতে আসবো তার আবার বলা কওয়া কি?

কার সঙ্গে এলি?

অরবিন্দদার সঙ্গে, তিনি গেলেন ভূপতিদার বাড়ীতে।

সকলেই বুঝলো অরবিন্দর পক্ষে এ বাড়ীতে আর ওঠা সম্ভব নয়।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, এখন তোদের ছুটি নেই, ছেড়ে দিলে যে?

দেবে না! বাপুজি বলেছেন।

এর মধ্যে আবার বাপুজি এলেন কোথা থেকে?

লব বল্‌লো, তিনি হুগলি গিয়েছিলেন।

কুশ বল্‌ল, হুগলি শুধু নয়, আমাদের আশ্রমেও গিয়েছিলেন।

তা বটে। দেখলি তাঁকে?

দেখবো না! তিনি গৌরহরি বাবুকে বললেন আমাদের সাবরমতী আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে।

কেনরে।

আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

তা যেন করলেন, হঠাৎ সাবরমতী যাওয়ার হুকুম হ'ল কেন?

এ প্রশ্নের সদুত্তর তারা জানতো না, তাই বলে তো ঠকা যায় না, বলল, সেখানে অনেক শিক্ষার আছে।

কুশ বল্‌ল, সেখানে দাদা আছেন, বাপুজি বললেন তাঁর সঙ্গে ফিরে আসতে পারবো।

কুশ বল্‌ল, আমরা তাঁর নাতি জেনে বললেন তবে তাঁরও নাতি।

যজ্ঞেশবাবু সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাধে কি লোকে মহাপুরুষ বলে, লোকে কি সাধে মহাত্মা বলে! দেখো, সামান্য দু'জন ছেলেমানুষও এড়ালো না তাঁর চোখ।

কিন্তু কারো মুখের ভাবে নিজের মন্তব্যের সমর্থন খুঁজে পেলেন না।

শচীন গান্ধীজির উপরে খুশি নয়। তার মন সুরেন বাঁড়ুজ্জের পাতা সংবিধান-সম্মত রেল লাইনের উপর দিয়ে চলে, স্বদেশী আন্দোলন তার কাছে সব আন্দোলনের সেরা।

রুক্মিণীও খুশি নয় গান্ধীজির উপরে, ঐ গান্ধী আশ্রমে গিয়েই ছেলে দুটোর ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে গেল।

মলিনার তখন সাধ্য ছিল না মনটা বিশ্লেষণ করে দেখে। তার রাগ হ'ল অরবিন্দর উপরে। আবার কেন? যে নৌকা বানচাল হয়ে গিয়েছে তাকে বৃথা টেনে তোলবার এ প্রচেষ্টা কেন? একবারও তার মনে হ'ল না অরবিন্দ স্বেচ্ছায় না আসতেও পারে, মনে হল না যে লবকুশকে পৌঁছে দেবার জন্যেই সে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ হুগলিতে সে যেতে গেল কেন? তার চিন্তাটা প্রশ্নাকারে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো—হঠাৎ এর মধ্যে অরবিন্দবাবু এলেন কোথা থেকে?

বা, তাঁকে যে আমরা অন্ধকারে গঙ্গাতীরে খুঁজে বার করলাম।

কি প্রশ্নের কি উত্তর।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, সে হয়তো হুগলি গিয়েছিল গান্ধীজিকে দর্শন করবার আশায়।

রুক্মিণী বল্‌ল, বাবা, এখন ওদের ভিতরে নিয়ে যাই।

তাই যাও মা, ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, সারারাত না খেয়ে আছে।

মলিনা ভাবলো লোকটা ভূপতিবাবুর বাড়ীতে উঠেছে ভালই হয়েছে, সেখান কোন স্ত্রীলোক না থাকায় তার কখনো যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আবার বুঝলো না দুঃখ কি সুখ। দুঃখ সুখ যমজ ভাই, প্রথম নজরে দেখে চিনে উঠতে পারা যায় না।

বেলা তিনটা নাগাদ মলিনা নৃপতির বাড়ীতে রওনা হ'ল। নৃপতির স্ত্রী তার সমবয়সী, দুজনে সখ্যতা আছে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দু'জনে গল্প গুজব চলে। যাওয়ার আগে নিত্যকার মতো রুক্মিণীকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

নৃপতির বাড়ীর বৈঠকখানার দরজা খোলা ছিল, মলিনা ঢুকে দেখতে পেলো অরবিন্দ দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবি এক মনে দেখছে। ছবিটা মলিনার পরিচিত, অনেকের সঙ্গে তারও ছবি ছিল তার মধ্যে। অরবিন্দর মনোযোগের কারণ তার বুঝতে কষ্ট হল না। যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসবার জন্যে যখন উদ্যত তার ছায়া পড়লো পাশের বড় আয়না খানার মধ্যে।

অরবিন্দ ফিরে দাঁড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করলো। এটি নূতন। মলিনাকে আজ অনেক কয় বছর দেখছে, কখনো নমস্কার করেনি, সাধারণ ভদ্রতার সীমা-রেখা মুছে গিয়েছে বললে যথেষ্ট হয় না, কখনো সে রেখা পড়বার কারণই ঘটেনি। আজ এটা নূতন। এই নূতনত্ব মলিনার হাড়ের মধ্যে অবধি জ্বালা ধরিয়ে দিল—ভড়ং দেখো না।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।

অরবিন্দ বল্‌ল, আমিও ভাবিনি, কিন্তু যখন দৈবে দেখা হয়েই গেল একটা প্রশ্ন করলো, উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার হাত।

সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমার প্রস্তাবটাকে সংক্ষেপে 'না' করে দিলেন কেন, একটা কারণও জানালেন কেন?

মলিনার মাথায় রোখ চেপে গিয়েছিল, কেন হয় তো সে জানে, হয়তো সে-ও জানে না। বললো, আপনার কবুল করবার কি দরকার ছিল আপনি নর হত্যা করেছেন?

না জানালেই কি আপনি রাজি হতেন?

না জেনে বিষপান করলেও মানুষে মরে না।

কিন্তু কোনদিন না কোনদিন প্রকাশ পেয়ে যেতই।

তখন তো ফিরবার পথ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে।

নরহত্যা করা না করার উপরে আমার হাত ছিল না, ওটা দলীয় শপথের অঙ্গ।

কিন্তু নিহত ব্যক্তির নামে, যখন তার উত্তর দেবার উপায় আর নেই, কলঙ্ক আরোপ করাও কি তাই?

আপনার অনুমান মিথ্যা নয়—ওটাও আদেশ।

যে দল এমন নীচ আদেশ দিতে পারে, যে আদেশ হত্যার আদেশের চেয়েও নীচ, সে দলকে দিয়ে দেশের উপকার হবে একথা কি সত্যই আশা করেন?

ভুল বুঝতে পেরেই আমি দলত্যাগ করেছি, এখন আমি গান্ধীজির অহিংসাবাদী।

হায় গান্ধীজির পোড়াকপাল। আপনার মতো কত ভণ্ড সে দলে ভর্তি হয়েছে জানি না।

ভণ্ড হ'লাম কোন অপরাধে?

বলবো?

বলুন।

এখন আপনারা মনে মনে অহিংস ঘুষি চালাচ্ছেন, তার আঘাত সহিংস ছোরার চেয়ে কম মারাত্মক নয়।

আমি পুরোপুরি অহিংসায় শিক্ষা পেয়েছি এমন দাবী করি না, তবে গান্ধীজি

যে অহিংসার সন্ধোত্রী একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। শপথের দায়ে পূর্বতন হিংসাকে তিনি ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু যখন তাঁকে জানালাম যে আমার মন তো মানছে না, জানালাম যাকে বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছি তাঁকে সব কথা খুলে না বলা অবধি মনে শান্তি পাচ্ছি না। তিনি লিখলেন জানাও তবে পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে জানিও। তাই আপনাকে জানিয়েছি, আশা করি এবারে আপনার মূল প্রশ্নের উত্তর পেলেন।

তবে তো পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই জানিয়েছেন, তার উত্তরটা সংক্ষেপে পেলেন কি বিস্তারিত পেলেন তাতে কি আসে যায়।

তার মানে আমি আপনার ক্ষমার অযোগ্য ?

ঘোরতর অযোগ্য।

ক্ষমা করতে না পারাও কি হিংসা নয় ?

আমি তো অহিংসপন্থী নই।

আর একটা প্রশ্ন। অহিংসাপন্থীর সঙ্গে হিংসাপন্থীর কি মিলন সম্ভব নয় ?

খুব সম্ভব, নীচের সঙ্গে মিলন অসম্ভব।

এরকম প্রশ্নোত্তর কতক্ষণ চলতো জানি না, এমন সময়ে নৃপতির স্ত্রী জয়ন্তী চা নিয়ে প্রবেশ করলো অরবিন্দর জন্যে। মলিনাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, মলিভাই কতক্ষণ এসেছ ?

এই এলাম ভাই, চলো ভিতরে যাওয়া যাক। এই বলে বিনা উপসংহারে অরবিন্দকে এড়িয়ে ভিতরে চলে গেল।

স্কুল থেকে ফিরে শচীন শুনলো যে লবকুশকে নিয়ে অরবিন্দ এসেছে, আছে নৃপতির বাড়ীতে।

তা হ'লে দেখা করে আসি, বলে রওনা হ'ল শচীন।

দাদা চা খেয়ে যাবে না ? শুধালো মলিনা।

ওখানেই খেয়ে নেব, বলে শচীন পথে নামলো।

শচীন ফিরলো রাত দশটায়, সকলে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো, এত দেরী হল যে।

আর বলো কেন, পথে দেখা হ'ল টেলিগ্রাফ পিওনের সঙ্গে, হাতে ছিল এক টেলিগ্রাম। খুলে দেখি অরবিন্দর এক বন্ধু আমার ঠিকানায় তাকে জানিয়েছে কল্‌কাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গিয়েছে, অবিলম্বে ফিরে আসতে লিখেছে।

তারপরে মন্তব্য করলো, ওদের বাসাটা আবার মুসলমান পাড়া লেনে, বাসাতে একলা মা আছে। তাকে খাইয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছি। কালকে ভোরে গিয়ে পৌঁছবে, আশা করি সব ততক্ষণে চুকে যাবে।

মলিনা ও রুক্মিণী দুজনেই শুনলো, মলিনা প্রকাশ করেনি যে বিকাল বেলায় অরবিন্দর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

মলিনা এসে শুয়ে পড়লো, তবে ঘুম এলো না। ঘুম যদি ইচ্ছা মতো আসতো তবে সংসার অনেক সুখের হ'তো।

অরবিন্দর সঙ্গে তার বিতর্ক হয়েছিল স্মরণ করে এক সঙ্গে লজ্জা, বিস্ময় ও ধিক্কার অনুভব করলো। কখনো ভাবেনি যে এমন সমানে সমানে অমন একটা বিদ্বান লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারে ; অরবিন্দ শপথের দায়ে নরহত্যা করেছে কিন্তু নিজেরও তো চরম বিপদের ঝুঁকি ছিল, মারতে গেলে মরবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়, আর তার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ হয়েছে যে অরবিন্দকে সে ভালবাসে। কি লজ্জা, কি বিস্ময়, কি ধিক্কার। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

তারপরে মনে ভয় দেখা দিল, ঐ দাঙ্গার মধ্যে মা একাকী আছেন আর সেই বিপদের মুখে চললো একাকী নিরস্ত্র অরবিন্দ! তার মনে হ'ল এটা যদি দগ্ধ কলিকাল না হয়ে পৌরাণিক যুগ হতো তবে সুভদ্রার মতো কিম্বা চিত্রাঙ্গদার মতো সঙ্গে চলে যেতো সে। কলিকাল শুধু কান্নার যুগ, তাতেও কি সব জ্বালা জুড়োয়। মনে মনে সে প্রার্থনা করতে লাগলো—নারায়ণ, নারায়ণ, তাঁকে রক্ষা করো, নারায়ণ নারায়ণ, আবার যখন দেখা হ'বে আর অনাদর করবো না।

বালিশটা ভিজে উঠেছে, সেটাকে উল্টে নিলো, কিন্তু উল্টে নিলেই কি সমাধান হয়, সে দিকটাও দেখতে দেখতে ভিজে উঠ্‌ল। তখন বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝের উপরে এসে শুয়ে পড়লো। ঘুম যে আসে না, স্থির করলো আজ না হয় জেগেই কাটাবে, তিনিও হয়তো দুশ্চিন্তায় জেগে কাটাচ্ছেন ট্রেনের মধ্যে।

ঠাকুরঝি, কালরাতে তুমি মেঝের উপরে শুয়েছিলে দেখছি।

বউদির সাড়া পেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠ্‌ল, মলিনা, হাঁ কালকে বড় গরম পড়েছিল।

সকাল বেলায় অরবিন্দর হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ শুনে যজ্ঞেশবাবু বললেন, এই হিন্দু মুসলমানের মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাধা পালা জ্বরের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা ছাড়া এর নিষ্কৃতি হবে না।

এমন সময়ে লবকুশ এসে বল্‌ল, দাদা, কালকে চর চিলমারিতে চড়িভাতি করতে যাবো, কি বলো।

বেশ যাওয়া যাবে। তোমার মা বাবা পিসিমাকে রাজি করাও।

তোমারও যেতে হবে কিন্তু।

যাবো বইকি, কত দিনের পরে এসেছিস, এবারে সাবরমতী গেলে আবার কতদিনের পরে আসবি কে জানে।

তবে আমরা পিসিমাদের রাজি করিয়ে আসি।

বেশ যা।

৩০

দাদু,

তুমি লিখেছ যে আমরা আরও ঘন ঘন চিঠি লিখি না কেন? তোমাকে আগে জানিয়েছিলাম এখানে নিয়মের রাজত্ব, সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলে, এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে চিঠিপত্র লেখাও পড়ে। বাড়ীতে মাসে দু'খানার বেশি চিঠি লিখবার নিয়ম নেই, খাম ও পোস্টকার্ড মগন ভাইয়ের কাছে থেকে নিতে হয়। মগন ভাইয়ের পুরো নাম মগনলাল গান্ধী, তিনি বাপুজির আত্মীয়। এক কথায় তাঁকে এখানকার ম্যানেজার বলা যেতে পারে। টাকা-কড়ি থেকে আরম্ভ করে খাম পোস্টকার্ড অবধি তাঁর জিম্মা। সকলকেই এমন কি বাপুজিকে পর্যন্ত তাঁর কাছে থেকে চেয়ে নিতে হয়। অবশ্য বাপুজির পক্ষে মাসে দু'খানা চিঠি লেখার নিয়ম চলে না। প্রত্যেক দিন তাঁর নামে এক থলে ভরা চিঠি আসে, আবার রোজ এক থলে ভরা চিঠি ডাকে যায়। তাঁর সেক্রেটারির নাম মহাদেব দেশাই। তিনি প্রথমে চিঠিগুলো পড়েন, তারপরে খুব দরকারি চিঠি-গুলো বাপুকে দেন। কতকগুলো চিঠি তিনি নিজ হাতে লেখেন, আর অনেক-গুলো মুখে মুখে বলে যান, মহাদেব ভাই লিখে নেয়। বাপুজির হাতের লেখা পড়ে কার সাধ্য, তোমার হাতের লেখার চেয়েও খারাপ, আর কি তাড়াতাড়ি লিখে যান। যেদিন খুব বেশি চিঠি আসে একা মহাদেব ভাই পারেন না, পড়বার ভার পড়ে অবিনাশ দাদুর উপরে। অবিনাশ দাদুর উপরে বাপুর খুব বিশ্বাস, তাঁর কথা মতো অনেক চিঠির উত্তর তিনি দেন, পড়েও দেখেন না কি লিখলেন এত বিশ্বাস তাঁর উপরে।

আগে অনেকবার তোমাকে বাবাকে মাকে পিসিমাকে এখানকার বিবরণ পাঠিয়েছি, তোমাকে না হয় আর একবার পাঠাই, কারণ তোমার ভুলে যাওয়ার

শক্তি অসাধারণ। কিন্তু মজা এই যে বাপু কিছু ভোলেন না। আর তাঁর স্মৃতি-শক্তি খুব বেশি। অবশ্য তাঁর বয়স তোমার চেয়ে কম। এই আশ্রমে প্রায় আড়াইশ লোক থাকে, প্রত্যেকের নাম তিনি জানেন, আর শুধু নাম নয়, কার বাড়ী কোথায়, কে কতদিন আশ্রমে আছে সব তাঁর মুখস্থ। সকাল-বেলায় উঠে সকলকে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হয়। তারপরে ছেলে-মেয়েদের সকলকে ব্যায়াম করতে হয়। বয়স যাদের বেশি তাদের অবশ্য নয়। তারপরে এক পেট ঘোল খেতে হয়, সঙ্গে মুগ ভেজা আর গুড় থাকে। খেতে কি মিষ্টি। তারপরে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। কাজ ভাগ করে দেওয়া আছে, তবে একটা কাজ সকলকেই করতে হয়, তুলো পেঁজা আর চরখায় সুতো কাটা। ঐ সুতোয় কাপড় বোনা হয়। সে কাজ সবাই পারে না। শুনলে আশ্চর্য হবে, বাপুজি নিজেও সুতো কাটেন, তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না, আর তাঁর কাটা সুতো হয় সবচেয়ে মিহি।

তারপরে সকলে স্নান করতে নামি সাবরমতী নদীতে। নদীটা পদ্মার মতো চওড়া হবে। তবে আগাগোড়া বালু, কেবল আমাদের আশ্রমের দিকে জলের একটা ধারা আছে। নদীর ওপারে আমেদাবাদ শহর। সেখানে আমাদের যাওয়ার হুকুম নেই, তবে যখন নূতন আসি একদিন বাপু বলেছিলেন আমাদের শহরটা দেখিয়ে নিয়ে আসতে। চিন্তামন শাস্ত্রী বলে একজন মস্ত সংস্কৃত পণ্ডিত আছেন, আর একজন আছেন তাঁকে সবাই বিনোবাজি বলে, তিনি নাকি চোদ্দটা ভাষা জানেন। 'আচ্ছা দাদু, এতগুলো ভাষা শিখে কি লাভ, কথা তো বলি একটা ভাষায়। যাই হোক তাঁরা আমাদের নদীপার করে', নদী হেঁটেই পার হওয়া যায়, দেখিয়ে আনলেন আমেদাবাদ শহরটা। মস্ত শহর, অনেক কাপড়ের কল, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া কত কি, কিন্তু আমাদের মোটেই ভালো লাগলো না। আশ্রমে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। চারদিকে খোলামাঠ আর বাবলা গাছের বন, পাশ দিয়ে গিয়েছে একটা পাকা রাস্তা, খানিক দূর যেতেই পাওয়া যায় সাবরমতী রেল স্টেশন, ছোট লাইনের ছোট ছোট গাড়ী। তারপরেই সাবরমতী জেল, পথটা সেখানে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকালবেলায় আমরা কয়েকজনে বাপুজির সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিলাম, তিনি লম্বা লম্বা ধাপ ফেলে চলেন, দৌড়ে নাগাল পাওয়া যায় না। তিনি বললেন, পথটা এখানে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে কেন জানো? তারপরেই বললেন, না, ঠিক শেষ হয় নি। জেলের ফটকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, আমাদেরও

ঢুকতে হবে ঐ পথ ধরে ফটকের মধ্যে, এদেশে জেল হচ্ছে মানুষের শেষ আশ্রয়। বলেই হেসে উঠলেন। দাদু, বাপুর হাসি কি কখনো দেখেছ? মনে হয় সেই হাসির আভায় চারদিক হেসে ওঠে।

হাঁ, দাদু, আসল কথা বলা হয় নি। বাপুজি শীঘ্রই নাকি একটা আন্দোলন সুরু করবেন, অসহযোগের চেয়ে সে আন্দোলন আরও বড় হবে। তবে কি আন্দোলন, কবে হবে সে-সব কথা কি আমাদের মতো নাবালক ছেলেদের কাছে বলবেন! আমরা মাঝে মাঝে উড়ো খবর পাই। আর দেখতে পাই যে কিছু যেন একটা যোগাড় যন্তর চলছে, মগন ভাই মহাদেব ভাই বিনোবাজিরা এক সঙ্গে বসে কি যেন সব পরামর্শ করেন। আর মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন অনেক বড়লোক, একজনের নাম সর্দার বল্লভভাই, কি নিরেট চেহারা যেন একটা মস্ত লোহার হাতুড়ি. আর একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। চেহারায় আকারে কথাবার্তায় সর্দারজির ঠিক বিপরীত। একজন যদি হন লোহার হাতুড়ি, আর একজন ধারালো ইস্পাতের পাত, তেমনি হাল্কা তেমনি শীতল আবার শুনতে পাই তেমনি তীক্ষ্ণ। সেদিন আর একজন এসেছিলেন, নামটা মস্ত মনে নেই, শুধু মনে আছে কালো চশমা পরা চোখ।

বাপু আমাদের দুজনকে ঠাট্টা ক'রে বলেন লব কুশ তো যুগল যোদ্ধা, খুব লড়িয়ে লোক, দেখা যাবে কেমন লড়াই করতে পারো। বললেন, শীঘ্রই তোমাদের দাদুর সঙ্গে বাংলা মুলুকে পাঠিয়ে দেব। আমরা বললাম তা হ'লে জেলটায় ঢুকবো কি ভাবে! বললেন, জেল কি ঐ একটাই, বাংলা মুলুকেও জেলের অভাব নেই।

সেদিন মগন ভাইদের মধ্যে কথা হচ্ছিল, বাপু নাকি এবারে আশ্রম ভেঙে দলবল নিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন, কেবল যারা খুব বুড়ো আর খুব ছেলে-মানুষ শুধু তারাই থাকবে আশ্রমে। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, কবে যাবেন কেউ কিছু জানে না। আমাদের বিশ্বাস, জানলে ঐ লোহার হাতুড়ি আর ঐ ইস্পাতের পাত এরা দুজন জানে। কারণ ওদের দু'জনকেই সর্বদা বাপুর কাছে বসে গুজ গুজ করতে দেখি. হাঁ, আর কালো চশমা পরা লোকটাও থাকে। যাক, এর পরে যেমন হয় জান'বো, অবশ্য চিঠি লেখার নিয়ম মেনে।

বাবা মা পিসিমাদের সাহস দিয়ে বলো, ভয়ের কারণ নেই। তোমাকে সাহস দিতে আর কাকে বলবো। তুমি পুলিশের লাঠি খেয়েছ, জেলে গিয়েছ, রায়বাহাদুরি ছেড়েছে, তোমার সাহসের অন্ত নাই। অবিনাশ দাদু আমরা

দুজন বেশ সুস্থ আছি। সকলকে প্রণাম দিয়ো আর অবশিষ্ট থাকলে নিজেও নিয়ো।

ইতি তোমার স্নেহের লবকুশ

পুঃ আমার পোষা ময়নাটাকে নিয়মিত ছাতুর গুলি খাওয়াতে যেন পিসিমা ভুলে না যায়। ইতি লব।

৩১

সিমলা শৈলের উচ্চ টিলায় থ্রি পাইনস নামে ক্লাব যেখানে অত্যুচ্চ ইংরাজ রাজপুরুষদের একমাত্র প্রবেশাধিকার, অত্যুচ্চের মধ্যেও আবার বাছবিচার আছে, ব্রিটিশ রাজের শাসননীতিতে সামান্য একটু নাড়া খেলে যারা প্রদেশের গভর্ণর হয়ে দেখা দিতে পারে তাদের জন্যেই শুধু ক্লাবের দ্বার অবারিত; আর যারা যারা হিজ এক্সেলেন্সির বা তদীয় মহিমার আড়ালে বসে শাসননীতির দড়ি টানাটানি করে তাদের; কাজেই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অ্যাবেল, মুডি, করফিল্ড প্রভৃতির ন্যায় উত্তুঙ্গ সৌভাগ্যের শিখর বাসীরা সারাদিনের কার্যাবসানে এখানে পুরু গদি আঁটা চেয়ারে আসীন হয়ে কড়া হুইস্কি সহযোগে দূরবর্তী তুষার-রেখার দিকে তাকিয়ে অধিকতর দূরবর্তী শ্বেতদ্বীপের স্মৃতি রোমন্থন করে। মাঝে মাঝে কুয়াশা উড়ে এসে জানলার কাচ ঝাপসা করে দেয়; 'আহা কি দেশের আবহাওয়া' বলে তারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাবে, কবে এই দগ্ধ বিদেশ পরিত্যাগ করে পেন্সন গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি নানাবিধ প্রাচ্যের পুঁটুলি বেঁধে শীতল স্বদেশে প্রস্থান করবে; কারো কারো বা মনোভাব হঠাৎ ভাষা পায়, উই হ্যাভ ডান সো মাচ ফর ইণ্ডিয়া, হাউ উই লাভ ইণ্ডিয়া, নধর ছাগল ছানাটিকে পুষ্ট করে তুলতে কত পরিশ্রম করেছি, আহা নধর ছাগল ছানাটিকে কত না ভালবাসি। সূক্ষ্ম বিচারে বসলে দেখা যাবে এই একান্ত অভিজাত ক্লাবটির সঙ্গে ভারতের মাটির কোন যোগ নাই, এ হচ্ছে শ্বেতদ্বীপের নোঙর ছেঁড়া ক্ষুদ্র একটি খণ্ড হিমালয়ে বাধা পেয়ে ঠেকে আছে বাতাসে, আর একটু বেগ হলেই আবার ভেসে গিয়ে ভিড়বে মূল শ্বেতদ্বীপের সঙ্গে। সেই জন্যেই সদর দরজায় বড় বড় সাদা অক্ষরে লিখিত—ডগস্ এণ্ড ইণ্ডিয়ানস নট অ্যালাউড, কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু খিড়কি দরজার নীতিটা আলাদা। সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বাবুর্চি, বেয়ারা, আরদালি আরও কিছু কিছু লোক, কোন মাপকাঠিতেই যাদের অভারতীয় বলা যায় না। বৃটিশ রাজের হরগৌরী নীতির এ একটি নমুনা।

এমন সময়ে করফিল্ড প্রবেশ করলো।

মুডি আর আবেল একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যালো আজ এত দেরী ?

এইচ. ই (H. E) আটকে দিলেন।

কোন গুরুতর সংবাদ আছে মনে হচ্ছে।

গুরুত্ব দিলেই গুরুতর নইলে—আবদা, a stiff whisky, কড়া এক গেলাশ হুইস্কি।

নইলে কি বাক্যটা সম্পূর্ণ করো।

আবেল বল্‌ল, আহা ওকে একটু জিরোতে দাও, ইণ্ডিয়ার জন্যে বেচারা সত্যই বড় পরিশ্রম করে।

করফিল্ড বল্‌ল, বুড়ো নির্বোধটা সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গিয়েছে।

আর একটু ব্যাখ্যা করতে হ'ল, কারণ এদেশে বুড়োর সংখ্যাও কম নয়, আর নির্বোধের সংখ্যাও যথেষ্ট, আর তারা যে দেউলে গত দশ বছরের রাজনীতি দেখলেই বোঝা যায়—

মুডি বল্‌ল, চরখায় সুতো কেটে ম্যাঞ্চেস্টারকে যারা জব্দ করতে চায় তারা দেউলে ছাড়া আর কি!

এবারে বুড়ো বজ্জাতটা নিজেকে ডিঙিয়ে গিয়েছে নির্বুদ্ধিতায়।

সমস্তই বুঝলাম, কে সেই বুড়ো বজ্জাত ?

আবার কে, হিজ গোটশিপ।

দুজনে একত্রে বলে ওঠে, হিজ গোটশিপ, তার মানে এইচ জি, আমরা তো এইচ ই পর্যন্ত জানি!

জানো না! খুবই জানো, যে লোকটা ছাগলের দুধ খায় বলে সকলকে বলে, তলে তলে দুধ ছানা ক্ষীর সব খায়, নইলে রাজ্যিময় ঘুরে বেড়ায় কিসের জোরে?

আবার দুজনে একত্রে বলে ওঠে, ইউ মিন ত্যাট চ্যাপ গ্যাণ্ডি, গান্ধী লোকটার কথা বলছ ?

আবার কার কথা!

গ্যাণ্ডির কথা পরে হবে, কিন্তু আগে বলো হিজ গোটশিপ শব্দটা বানালো কে ?

বানালাম আমি কনর‍্যাড করফিল্ড।

বার কতক হিজ গোটশিপ উচ্চারণ করে তিনজনে পেট ভরে হেসেছিল। চমৎকার হয়েছে, Tre bein! চমৎকার বানিয়েছ।

তা সে লোকটা কি বলছে ?

একটু ধৈর্য ধারণ করে শোনো। কোথা থেকে এক ইংরেজ ছোকরাকে পাকড়াও করেছে, বুঝিয়েছে তুমি পাদ্রী বংশের সন্তান, পবিত্র ব্যক্তি তুমি, তোমার হাত দিয়ে আমার একটি পবিত্র প্রস্তাব বড়লাটকে পাঠাতে চাই। জানে যে ইংরেজ পত্রবাহককে এইচ. ই. প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না আর যদি বা করেন দেশে বিদেশে সংবাদের গুরুত্ব লাভ করবে ব্যাপারটা।

তুমি কি বলতে চাও এইচ. ই. সে চিঠি নিয়েছেন?

না নিয়ে করেন কি! তাঁর বংশেও পাদ্রীর ধাত আছে কিনা।

তা কি অশ্বডিম্ব ছিল সেই পত্রে, দেখেছ?

অশ্বডিম্বই বটে। দেখেছি বইকি, সেইজন্যেই তো বিলম্ব হ'ল।

তারপরে।

তারপরে চিঠিখানা পড়ে এইচ. ই. তাকান আমার দিকে, আমি তাকাই তার দিকে।

এমন কি প্রস্তাব?

ভারত সরকারকে নোটিশ দিয়েছে সে নাকি লবণ সত্যাগ্রহ করবে।

মুডি ও আবেল'বলে ওঠে, লবণ সত্যাগ্রহ! বাপের জন্মে এমন পরিকল্পনা শুনিনি।

তারপরে মুডি ও আবেল পর পর বলে চলে—

লোকটা একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছে।

তা নয়, দেশের লোকের কাছে ওর আসল রূপটা বের হয়ে পড়েছে, ছাগলের দুধ খেয়ে আর নেংটি পরে কতকাল ভোলাবে লোককে!

করফিল্ড বললেন, আগে আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম কিন্তু পরে এইচ. ই.র কথা শুনে বুঝলাম বেটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছেন, বললেন দেশের লোক আর কিছু খাক বা না খাক একটু লবণ না হলে তার চলে না, এক চিমটি লবণ দিয়ে তারা একরাশ ভাত খেতে পারে।

তার বেশি আর কী বা দরকার হয় এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে!

অত সহজ নয়। ঐ যে বললে সকলেরই একটু লবণের দরকার হয়, সেই লবণ ধরে টান দিলে আপামর জনসাধারণ নড়ে উঠবে।

দেখলে বেটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি!

ভেবে ভেবে আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছে, ছাগলের দুধ যে এমন বুদ্ধিপ্রদ কে জানতো। ওটার একটা রাসায়নিক পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

এখন তা হ'লে কি কর্তব্য?

তিনটা stiff whisky—কড়া হুইস্কি।

করফিল্ড বলল, পথে আসতে কলকাতার এক সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হ'ল—

দেশীয় লোক নাকি ?

পাগল হ'লে নাকি ? পথে আমি কথা বলবো নেটিভের সঙ্গে! না, ইংরেজ। শুধালাম, কিহে, এইসব পাগলামির খবর ছাপাব নাকি। বলল, ছাপবো বই কি। শেষের দিকের কোন একটা পৃষ্ঠার কোণায় "বাতুলের বৈঠক" নাম দিয়ে ছাপলে, গুরুতর সংবাদ পাঠের মধ্যে চাটনির কাজ করবে।

চমৎকার হবে, বলল আবেল।

এমন সময়ে বাবুর্চি এসে খবর দিল, ডিনার তৈরি।

আচ্ছা যাচ্ছি। চলো হে, ছাগ দুগ্ধের প্রতিক্রিয়া তো দেখতে পাচ্ছি, এবারে দেখা যাক ছাগ মাংস কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

যেতে যেতে কথোপকথন হচ্ছিল। করফিল্ড বলছিল, আমরা তো হেসে উড়িয়ে দিলাম কিন্তু খবরটা পাওয়ার পর থেকে এইচ. ই. চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

আর এইচ. ই. দের চিন্তা করাই পেশা, তুমি দেখে নিয়ো ব্যাপারটা আগাগোড়া Flop হবে, Flop, Flop, Flop, আর হিজ গোটশিপ হবে thoroughly exposed—চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে যাবে।

শিমলা শৈলের থ্রি পাইনস্ ক্লাবে যখন এই প্রতিক্রিয়া চলছিল ঠিক সেই সময়ে দিনাজশাহী শহরের অল্ বেঙ্গল লোন অফিসের দোতালার আড্ডায় প্রায় অনুরূপ একটি কাণ্ড চলছিল। এই দুই আড্ডার মধ্যে দূরত্ব গুরুত্ব উচ্চতায় যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও দুটিই একই ধাতুর সৃষ্ট।

অক্ষয় ফৌজদার বলে উঠ্ল, ওহে বীরেন, তোমাদের গান্ধীবাবা শেষে নিমক মাহালের ইজারাদার হ'তে চলল। তা এত বাহ্যাড়ম্বর না করে সোজাসুজি একটা দরখাস্ত করলেই চলতো।

দাদা, মহাত্মা গান্ধীর নামে ওরকম ক'রে বল্লে মনে বড় ব্যথা পাই।

আমার চেয়ে বেশি নয়। তোমাদের ব্যথা শৌখীন ব্যাপার, আর আমার—হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে চীৎকার করে উঠ্ল, ওরে বাবা পীতাম্বর অত জোরে নয়, অত জোরে নয়। রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে উৎকট ক'রে তুলিস নে।

আড্ডার বেয়ারা পীতাম্বর এতক্ষণ ফৌজদারের বাতব্যস্ত কোমরে বাতের ওষুধ মালিশ করছিল, আর একটু আস্তে বাবা, আর একটু আস্তে।

দাদা, এই তো আপনার শরীরের অবস্থা তার উপরে বয়স হয়েছে আপনার, এখন এসব কথার মধ্যে না থাকাই ভালো।

তিড়বিড় করে ফৌজদার বলল কেন না থাকা ভালো। দেশের চিন্তা করা কি তোমাদের ইজারা মাহাল নাকি! কি বলো হে হরিপদ?

কংগ্রেসের সেক্রেটারি হওয়ার পরে হরিপদ গান্ধীটুপি পরেছে। আসল উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান টাকের পরিধি আচ্ছন্ন করা।

কি হে, চুপ ক'রে রইলে যে।

আজ্ঞে হাঁ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ কথাই বলেছেন, অল্প বয়সে কর্ম নিজের জন্য, বেশি বয়সে পরের জন্যে।

কি হে হরিপদ, অবশেষে কংগ্রেসের সেক্রেটারি হ'য়ে স্বীকার করে ফেললে, দেশটা তোমার পর।

এ বিষয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উক্তি মনে না পড়ায় হরিপদ চুপ ক'রে রইলো, তার হ'য়ে উত্তর দিল ফৌজদার, এখানে পর অর্থে শ্রেষ্ঠ যথা পরান্নং দুর্লভং লোকে।

ফৌজদার বৃথা কাব্যতীর্থ পাশ করেনি।

হরিপদ এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে, বলল, যা বলো, বীরেন ভায়া, গান্ধীজির এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পরে লোকের সঙ্গে আর মুখ দেখতে পারছি না।

তোমার মুখ দেখাতে না পারবার আরও কারণ থাকা সম্ভব।

এ ঠাট্টা নয় ভায়া।

মোটেই নয়। তবে বলি শোন তুমি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি হওয়ার পর থেকে আমরাও মুখ দেখাতে পারছি না।

কেন, আমি কি জেলে যাইনি!

গিয়েছ কিন্তু যেতে হবে না ভেবেই রবিনসনের সঙ্গে যোগসাজসে আসামীর খাতায় নামটা লিখিয়ে দিলে, হয়ে গেল উল্টো।

এমন সময়ে সুবোধ চৌধুরী ঢুকলো, বয়সে ছোকরা পেশায় ওকালতী, বলল, জেলে গিয়েছ বটে তবে পুরস্কারটাও পেয়েছ।

এবারে ফৌজদার কথা বলল। আমি তোমাকে সমর্থন করি হরিপদ কিন্তু বাবা একটি অনুরোধ—ঐ গানটা এমন ভাবে গেয়ো যাতে আমার কানে না

ঢোকে, বাত বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণগুলো ওর মধ্যে আছে, সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, বাদ থাকলো কি? যে দেশের বুড়োরা বাতে ভোগে সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত হবে এটা!

আজকার আড্ডা মোটেই জমছিল না, তাই কেবল চলছিল ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতাহাতি। সব কথা বলতে কি লবণ সত্যাগ্রহের সংবাদে সকলেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, শেষে কিনা এক মুঠো লবণ নিয়ে কাড়াকাড়ি। গান্ধী বিদ্বেষীদের মস্ত মওকা জুটে গেল। কি হে কি হ'ল, আমরা গোড়া থেকেই বলছি লোকটা ফ্রড, ধাপ্পাবাজ বললে কম বলা হয়, লোকটা ইংরাজের চর, যাতে সরকারের ভালো হবে সর্বদা তাই করে, বেশ জানে লবণ নিয়ে রাজনীতি হয় না, হয়তো বা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেমেছে; তোমরা মহাত্মা মহাত্মা করে যতই ঢাক পেটাও না কেন এবারে দেশের কাছে ধরা পড়ে যাবেন।

অন্যদিকে গান্ধীবাদীরা এ সব যুক্তির প্রত্যুত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। অপেক্ষা করছিল ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজখানা এসে পৌঁছলে হয়। ভক্তি পরমুখাপেক্ষী।

আড্ডায় যখন এই রকম ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা এমন সময়ে কংগ্রেস অফিসের দারোয়ান রমেশ ঢালী ঘরে ঢুকে একখানা চিঠি দিল বীরেন চৌধুরীর হাতে। বীরেন চিঠি পড়তে আরম্ভ করলে হরিপদ গজ গজ করতে সুরু করলো, আমি কংগ্রেস সেক্রেটারি উপস্থিত থাকতে অফিসের দারোয়ান অন্যের হাতে চিঠি দেয় কেন?

ততক্ষণে বীরেনের চিঠি পড়া শেষ হ'য়ে গিয়েছে, সংক্ষিপ্ত পত্র। অক্ষয়দাদা, যজ্ঞেশবাবু জানিয়েছেন পুলিশে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কংগ্রেস আফিসের মধ্যেই। তিনি আমাকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেছেন।

তোমাকে! বিস্ময়ের অন্ত থাকে না হরিপদর।

তবে আইন অনুসারে সে কথা আমাকে জানতে হয়, আমি সেক্রেটারি।

তুমি আর সেক্রেটারি নও। তিনি সুবোধকে নিযুক্ত করেছেন সেক্রেটারি।

এই ডবল আঘাতে অন্য লোক ভেঙে পড়তো, হরিপদ অন্য লোক নয়, একেবারে অনন্য।

ঐ সেদিনের ছেলে সুবোধ কি জানে সেক্রেটারিগিরির।

কি জানে জানি না, তবে কি জানে না বলতে পারি।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হরিপদ বললো—বলো।

কংগ্রেস সেক্রেটারির পক্ষে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা চলে না,

কংগ্রেস সেক্রেটারির পক্ষে কংগ্রেসের গোপনীয় দলিল গোয়েন্দাকে নকল করে নিয়ে যেতে দিতে নেই—ভয় নেই আরো আছে।

বলো।

কংগ্রেসের তবিল তছরূপ করতে নেই।

ফৌজদার বল্‌ল, ওটাকে বলে মুদ্রাদোষ, ওটা আমাদের হরিপদর আছে।

হাসবার কথা বটে, তবে সময়টা হাসির নয়। সময় ভেদে হাসি কান্নার রূপান্তর হয়।

আহত আত্মসম্মানের ভাব দেখিয়ে হরিপদ বল্‌ল—চললাম আমি।

কোথায় রবিনসনের কাছে নাকি, তারপরে বল্‌ল, দাদা, আমরাও চলি, কংগ্রেস অফিস হয়ে যজ্ঞেশবাবুর বাড়ীতে। ওঠো হে সুবোধ।

এসো ভাই, ফৌজদারের কণ্ঠস্বর ভিজা, বাতের প্রকোপে কি অন্য কারণে দুর্বোধ্য।

ওরে পীতাম্বর, শীতলকে ডাক দিয়ে আমাকে সাবধানে তোল্‌, দেখিস বাবা ফেলে দিয়ে মারিস নে।

৩২

যেদিন সন্ধ্যায় যজ্ঞেশবাবু গ্রেপ্তার হলেন তারপর দিন প্রাতঃকালে অবিনাশ-বাবু লব কুশকে নিয়ে দিনাজশাহীতে পৌঁছলেন। গাড়ীর শব্দ শুনে শচীন বের হয়ে এসে তাঁদের নামিয়ে নিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করলো, লবকুশ বাবাকে প্রণাম করে দৌড়ে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে।

কই, যজ্ঞেশবাবুকে তো দেখছিনে, তাঁর তো সকালে ওঠা অভ্যাস?

শচীন বল্‌ল, কালকে সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

এ দেখছি বোধনের আগেই বিসর্জন। তা কেউ বাদ যাবে না।

গাড়ী থেকে মাল নামিয়ে নিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিল শচীন, তারপরে অবিনাশবাবুকে ঘরে এনে বসালো।

আপনারা আরো আগে আসবেন আশা করছিলাম।

আগেই রওনা হয়েছিলাম, যেদিন গান্ধীজি সদলবলে ডাণ্ডি বলে যাত্রা করলেন, সেদিন সন্ধ্যায় আমরা সাবরমতী থেকে রওনা হই। গান্ধীজি আমার মুখ দিয়ে এদিক সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সেই জন্যেই দেরী।

কি রকম নির্দেশ বলতে বাধা আছে কি?

কিছু না কিছু না, এসব খোলাখুলি ব্যাপার। ৬ই এপ্রিল তিনি লবণ

সত্যাগ্রহ সুরু করবেন ডাণ্ডীর সমুদ্রতীরে, তারপরে দেশের মধ্যে যার যেমন সাধ্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবে। যেখানে লবণ আইন ভঙ্গ সম্ভব সেখানে তাই, অন্যত্র অন্য পাঁচ রকম।

হুগলির আশ্রম সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন কি ?

হুগলির আশ্রম বন্ধ করে দিয়ে সবাই চলে যাবে কাঁথির সমুদ্রতীরে। গৌর-হরিবাবুকে সব কথা জানিয়ে গেলাম কল্‌কাতায়। আমাকে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

তাঁরা কে ?

এই ধরো সুভাষবাবু, সতীশবাবু, প্রফুল্লবাবু, সুরেশ মজুমদার এই রকম সব লোক ; যাকে যা বলবার বললাম।

এবারে শচীন হেসে বল্‌ল, আর আপনার নাতি দু'জন আর আপনার প্রতি কি নির্দেশ ?

এমন সময়ে রুক্মিণী ও মলিনা এসে তাঁকে প্রণাম করলো।

বাবা, তোমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি।

মা সর্বদা ছেলের শরীর খারাপ দেখে। শরীর খারাপ নয় মা। বয়স বেড়ে গিয়েছে।

কতই বা বয়স হ'ল!

তা সত্তর পেরিয়েছে অনেকদিন, রায় মশায় ও আমার মধ্যে সামান্য দু'তিন বছরের ব্যবধান। আর দেখছেও কিনা বছর পনেরো পরে।

মলিনা বলল, পনেরো বছর কোথায়, মাঝখানে যে একবার এলেন।

তবেই দেখো মা বয়স হয়েছে কিনা, বয়সে স্মৃতিভ্রংশ।

বাবা, তোমার চা চলবে তো ? তোমরা নাতিরা নিমপাতা সিদ্ধ জল ছাড়া কিছু খায় না।

অবিনাশ বাবু হেসে বললেন, মা হরিদ্বার ঋষিকেশ উত্তরকাশী বদরীনাথ যেখানেই গিয়েছি দেখেছি চায়ের অবাধ গতি। সাধু সন্ন্যাসীদের লোটা একাধারে কেটলি টি-পট পেয়ালা, সাধু মহারাজেরা চায়ের বড় ভক্ত, কাজেই কোথাও কোন অসুবিধা হয়নি। তারপরে যখন সাবরমতী আশ্রমে গেলাম ভয় হলো এবারে বুঝি চা বন্ধ হয়। আমার আশঙ্কা বোধহয় গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন বললেন, অবিনাশবাবু আপনি, পরিণত বয়সে এসেছেন, চায়ের অভ্যাস থাকলে পাবেন।

আমি বললাম মহাত্মাজী চা ষোল আনা স্বদেশী, চা পাতা, পেয়ালা কেট্‌লি

চিনে দুধ সমস্ত স্বদেশী।

তিনি হেসে বললেন, কেবল অভ্যাসটা বিদেশী, তা ছাড়া চা বাগানের মোটা লভ্যাংশ বিদেশে যায়। চলো, ভিতরে গিয়ে ষোল আনা স্বদেশীর সদ্গতি করা যাক।

চা খেতে খেতে শচীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, লব কুশকে কেমন দেখছ?

শরীর তো ভালই দেখছি।

এ বাপের মতো কথা হ'ল, রুক্মিণী তোমার কেমন মনে হচ্ছে?

রুক্মিণী জবাব না দিয়ে হাসলো।

তারপরে শচীন, তোমাদের স্বদেশী স্কুল কলেজ কেমন চলছে?

চলছে ভালই কিন্তু অরবিন্দ হঠাৎ চলে যাওয়ায় কিছু সঙ্কট হয়েছে।

বিস্মিত অবিনাশ বাবু বললেন, অরবিন্দ হঠাৎ চলে যেতে গেল কেন?

প্রসঙ্গটা উঠতেই মলিনা স্থান ত্যাগে উদ্যত হ'ল।

যাচ্ছ কোথায় মা?

লবকুশ ডাকছে। (কেউ ডাকেনি)

কেন যে গেল জানি না। এখন বঙ্গবাসী কলেজে। মাঝে একদিন এসেছিল, কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছে খবর পেয়ে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল, বাসায় মা একলা ছিলেন।

আর এদিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হ'লেন কে?

বাবা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে গিয়েছেন বীরেন চৌধুরীকে।

এ মনোনয়ন উত্তম হয়েছে। আর সেক্রেটারি।

সুবোধ চৌধুরী।

সুবোধ চৌধুরীটি কে?

ও নামে চিনতে পারবেন না, ন্যাড়া নামে বিখ্যাত, আমাদের বিদ্যালয়েরই ছাত্র।

হাঁ হাঁ, এবার মনে পড়েছে গোলগাল শক্ত বাঁটুলের মতো চেহারা ছিল।

এখন আর তা নেই।

তা থাকবে কি ক'রে। অনেক দিনের কথা।

এবারে বলুন আপনার প্রোগ্রাম কি?

গান্ধীজি কিছু ঠিক করে দেন নি, বলেছেন কলকাতায় গিয়ে সতীশবাবুর সঙ্গে স্থির করতে।

কিছু স্থির করেছেন কি?

হাঁ, সতীশবাবুর ইচ্ছা আমি মহিষবাথানের নেতা হয়ে যাই, ছেলের দল তাঁর হাতে আছে।

আর লব কুশ ?

ওদের আর দূরে পাঠাবো না, শহরেও তো লোকের দরকার হবে।

কিন্তু একটা কথা লোকে ভালো বুঝতে পারছে না, লবণ আইন ভঙ্গ করে কি ভাবে সরকারকে জব্দ করা সম্ভব।

লোকে তো বুঝতে পারেনি চরখায় সুতো কেটে কি ভাবে সরকারকে জব্দ করা সম্ভব। কাগজে দেখেছ তো ল্যাঙ্কাশায়ারের থেকে কাপড় রপ্তানী আধা-আধি কমে গিয়েছে। দেখো শচীন, সম্ভব অসম্ভবের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যে নেতা ত্রিশ কোটি লোককে নিয়ে কাজে নেমেছেন তাঁকে ত্রিশ কোটির মাপকাঠিতে চিন্তা করতে হয়। চরখা এমনি একটা যন্ত্র ত্রিশ কোটি লোকের যাতে প্রয়োজন। বস্ত্র যা, লবণও সেই রকম। কেবল পাতে খাওয়ার বস্তু বলে ওকে দেখো না, চেয়ে দেখো ওর কল্পনার ব্যাপকতা। ত্রিশ কোটি লোকে বুঝবে তাদের জন্যে কিছু হচ্ছে আর তাদের কিছু করণীয় আছে। দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালানো যায় কিন্তু দেশলাইয়ের মধ্যে তো দেশলাইয়ের তাপ নেই। আগে আগুন জ্বলুক তখন বুঝতে পারবে।

স্নানাহারের পরে শচীনের সঙ্গে অবিনাশবাবু স্কুলটি দেখতে গেলেন, বললেন, সমস্তই আগের মতো আছে দেখছি কেবল এই মূর্তিটি নূতন।

আজ্ঞে হাঁ, সকলের ইচ্ছা হ'ল যে নবীন মুদির একটা মূর্তি স্থাপন করা উচিত, তার জন্যেই স্কুলের এই বাড়বাড়ন্ত।

বেশ করেছ, একজন লোকের মতো লোক ছিল বটে।

কলেজের অধ্যক্ষ রমণীবাবু আছেন তো ?

আজ্ঞে না, স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পরে তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে-গিয়েছেন, এখন সহ অধ্যক্ষ হয়েছেন অধ্যক্ষ।

এমন সময়ে নৃপতি ভূপতি ও আরও কয়েকজন শিক্ষক এসে বলল, স্যার, ছেলেরা বলছে অনেকদিন পরে আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে, তারা ছুটি চায়।

অবিনাশবাবু হাসলেন, ছেলেরা চায় কিনা জানি না তবে শিক্ষকরা অবশ্যই চায়। তা যদি তোমরা ইচ্ছা করো, দাও ছুটি।

অমনি তাদের ইচ্ছা আপনি গান্ধীজির আশ্রম সম্বন্ধে তাদের কিছু বলেন।

বেশ বলবো।

লবকুশকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন, তাদের সহপাঠীরা খুশি হতো।
তারা এতক্ষণ মা-পিসিমাদের কাছে আসর জমিয়েছে।

অবিনাশবাবুর অনুমান মিথ্যা নয়, খাওয়ার পরে তারা সাবরমতীর গুণগান সুরু করেছে। ওদের মুখে আর প্রশংসা ধরে না, তারা যদি পৌরাণিক দেবতাদের মতো চতুর্মুখ বা পঞ্চমুখ হ'তো তবু সব কথা বলে উঠতে পারতো না।

রুক্মিণী ও মলিনা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল বটে তবে গান্ধী সম্বন্ধে তাদের তেমন আগ্রহ ও ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। গান্ধীজিই ছেলে দুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এই তার নীরব অভিযোগ আর মলিনার অভিযোগ সূক্ষ্মতর মনস্তত্ত্ব-ঘটিত। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর অরবিন্দকে পরামর্শ দেবার যে গুপ্তকথা বলে ফেলাই তার উচিত হবে। সেই থেকেই তো তার দুঃখের পালা সুরু।

আর সত্যকথা বলতে কি শচীনেরও বিশেষ উৎসাহ ছিল না গান্ধীবাদী ও গান্ধীব্যক্তি সম্বন্ধে। তার 'হীরো' স্বদেশী আন্দোলনের সুরেন বাঁড়ুজ্জে, স্বদেশী আন্দোলন তার কাছে দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পর্ব। তারপরে এলো বোমা পিস্তল, আরও পরে গান্ধী রাজনীতি—দুটো সম্বন্ধেই সে উদাসীন। তার ভাবটা এই রকম যদি এ সবে কিছু হয় তবে হোক, কিন্তু জানতো কিছু হবে না। মনে মনে এখনো সে দেখতে পায় মাথায় পাগড়িবাঁধা নগ্নপদ স্বেচ্ছা-সেবকরা কাতারে কাতারে চলেছে, পথের দুদিকের বাড়ীর ছাদ থেকে নরনারী ফুল ছড়াচ্ছে, বন্দেমাতরম ধ্বনি করে আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে আর ছেলেরা গান ধরেছে—"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি আমি কি মার সেই ছেলে।" তার মনে পড়ে যেতো ওয়ার্ডস্বার্থের সেই ছত্রগুলো, সে ছিল আনন্দযজ্ঞ, "but to be young is very heaven"। শচীনের মনে পড়তো তখন সে তরুণ ছিল, তরুণ ছিল সমস্ত পৃথিবী। সে ছিল একদিন। গান্ধী আন্দোলনে সে ডাঙায় তোলা মাছ, ছটফট করে মরে কিন্তু সে সানন্দ সলিলবিহার কই, স্রোতের উজানে সাঁতার দেবার শক্তি তার নেই, স্রোতের সঙ্গে সাঁতার দিতে সে চায় না, তাই এখন ডাঙায়-তোলা মাছ।

স্কুল থেকে ফিরে এসে অবিনাশবাবু ও শচীন দেখল, বীরেন চৌধুরী বসে আছে।

কি খবর হে?

শচীনের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই তার চোখে পড়লো অবিনাশবাবুকে —এ যে স্যার এসেছেন, বলে প্রণাম করলো।

শুনলাম তুমি প্রেসিডেন্ট হয়েছ, বেশ বেশ। তোমাদের সেই ন-চ খ-চ কোথায় গেল ?

তারা এখন আর কংগ্রেসের মধ্যে নেই।

তা কি খবর ?

সুভাষবাবু আসছেন বলে টেলিগ্রামে জানিয়েছেন।

আমার সঙ্গে কয়েক দিন আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিছু বলেনি তো !

হয়তো তখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি, রায় মশায়ের সঙ্গে অনেক দিন থেকে পত্রাপত্রি হচ্ছিল, তারপরে বোধহয় তাঁর গ্রেপ্তারি খবর পেয়ে আসা ঠিক করে ফেলেছেন।

তা কবে আসছেন।

আগামী কালকে। শচীন, তোমাদের বাড়ীতেই থাকবেন।

এ তো সৌভাগ্য। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ভেবো না। কালকে ভোরবেলা দলবল নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত থেকো। আমিও থাকবো।

আর আমিই বুঝি থাকবো না ভাবছ ? বললেন্ অবিনাশ বাবু।

স্যার এত ভোরে আপনি নাই গেলেন, বয়স হয়েছে।

দেখো বীরেন, বারে বারে বয়সের কথা যদি মনে করিয়ে দাও তবে Stand up on the bench করিয়ে দেখো। বয়সটা মনের ধর্ম্ম। পাকা চুল আর নড়া দাঁতে বয়স নেই। নিশ্চয়ই যাবো, সুভাষবাবু আসছেন আর আমি যাবো না, এ হ'তেই পারে না।

তারপরে একটু হিসাব করে বল্‌লেন, আর চারদিন পরে ৬ই এপ্রিল, মহাব্রত সুরু, তার আগে সুভাষবাবু এসে মদত দিয়ে গেলে ভালই হবে।

এবারে বীরেন বল্‌ল, কাল সন্ধ্যায় পাঁচআনির মাঠে জনসভা হবে, আপনি সভাপতি, সুভাষবাবু প্রধান বক্তা।

বেশ, রাজি আছি।

পরদিন ভোরবেলা হাজার খানেক লোক—ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য লোক সুভাষবাবুকে অভ্যর্থনা করবার জন্তে জাতীয় পতাকা হস্তে, জয়তু সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র স্বাগত প্রভৃতি বাণী লিখিত ফেষ্টুন নিয়ে স্টেশনে হাজির হ'ল। ট্রেন দেখতেই চারদিক স্পন্দিত করে জয়ধ্বনি উঠ্‌ল সেই সঙ্গে বন্দেমাতরম্

মন্ত্র। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা। ক্রমে প্লাটফরমে এসে ট্রেন থামলো, সকলে ছুটলো প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর দিকে। গাড়ীর দরজা খুলে দুটি যুবক বের হয়ে এলো। সুভাষচন্দ্র কই ?

যুবক দুটি করজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল, সুভাষবাবু এই গাড়ীতেই আসছিলেন, রানাঘাট স্টেশনে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের রেখে গেলেন সংবাদটা আপনাদের দেবার জন্যে।

হঠাৎ রানাঘাটে কেন ?

শেয়ালদয় গ্রেপ্তার করলে জোর আন্দোলন হতো সেইজন্যে মনে হয়।

সকলে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অবিনাশবাবু, শচীন, বীরেন চৌধুরী, সুবোধ প্রভৃতি প্রধানগণ বল্‌ল, আপনারা নামুন, তারপরে কর্তব্য স্থির করা যাবে।

যুবকদের নিয়ে তোলা হ'ল যজ্ঞেশ বাবুর বাড়ীতে। স্টেশনেই সকলে পরামর্শ করে জনতাকে জানিয়ে দিল, বিকালে যথাসময়ে যথাস্থানে জনসভা হবে সবাই যেন উপস্থিত হন।

বাড়ীতে এসে পৌঁছে বীরেন বল্‌ল, স্যার, আমাদের মনে হয় দশটার গাড়ীতেই আপনার কল্‌কাতা চলে যাওয়া উচিত।

কেন বলো তো ?

গান্ধীজি আপনার উপরে ভার দিয়েছেন মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গের নেতৃত্ব করবার। এখন আপনি গ্রেপ্তার হ'লে সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

কি বলছ বীরেন, আন্দোলনটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে বলে পালিয়ে চলে যাবো, তুমি ভাবছ শুনলে গান্ধীজি খুশি হবেন। কাপুরুষতাকে তিনি হিংসার চেয়েও খারাপ মনে করেন। তিনি অনেকবার আমাদের বলেছেন বীরের মতো হিংসা করাও ভালো, কিন্তু অহিংসার নামে কাপুরুষতা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। না তা হবে না। জনসভায় আমিই সভাপতিত্ব করবো, তোমরা কেউ প্রধান বক্তা হয়ো।

সুবোধ দ্বিধার সঙ্গে বল্‌ল, হাসান আলি মিঞা কংগ্রেসের অনুরাগী তিনি যদি প্রধান বক্তা হন—

খুব ভালো হয়, তবে বেশ তাঁকেই বলে রাখো। দেখো গান্ধীজিকে লোকে ভুল বোঝে, ভাবেন তিনি সন্ত্রাসকদের বিরোধী।

নন ?

মোটেই না, তাদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, বীরত্বে তিনি মুগ্ধ, তবে তাঁর ধারণা ওতে আসল কাজ হবে না। আর শুধু লোকে ভুল বোঝে না,

সরকারও ভুল বুঝে থাকে, তাদের ধারণা হিংসাবাদীদের সঙ্গে তাঁর তলে তলে যোগ আছে, নইলে তাদের প্রশংসা করেন কেন? তারা ইতিমধ্যেই একটা থিয়োরি খাড়া করেছে, অহিংসা তার দক্ষিণ হস্ত, হিংসা বাম হস্ত, দুই হস্তই সক্রিয়—এখন যেটাতে কার্য হাসিল হয়। না হে, পালালে চলবে না, পালালে তিনি আর আমার মুখ দর্শন করবেন না।

তবে আমার হাসানআলি সাহেবের কাছে যাই।

তাই যাও। তবে আমি জনসভার পরে রাত দশটার ট্রেনে কলকাতায় রওনা হয়ে যাবো। অরবিন্দর ঠিকানাটা দিয়ো, সেখানেই উঠবো।

আজকেই রওনা হবেন? জিজ্ঞাসা করলো শচীন।

হাঁ আজকেই, মাঝখানে আর মাত্র দুটো দিন, ছয়ই এপ্রিল আমার কলকাতায় থাকা দরকার। বিকালে মহিষবাথান বলে রওনা হয়ে যাবো। তার আগে একবার আমার গুরুর সঙ্গে দেখা করা উচিত, তাঁর আশীর্বাদ নিতে হবে তো।

প্রসঙ্গটা কেউ বুঝতে পারলো না দেখে বললেন, আমার শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জীবিত আছেন, তাঁর কাছে পড়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে।

এমন সময়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে জানালো, ভোর রাতে পুলিশ এসে কংগ্রেস অফিস সীল করে দিয়ে পাহারা বসিয়ে গিয়েছে।

অবিনাশবাবু শুধালেন, টাকা-পয়সা কিছু ছিল কি?

বীরেন বল্‌ল, সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করে গিয়েছে প্রথমে ন-চ খ-চ তারপরে হরিপদ দত্ত।

তা হ'লে কাজকর্ম চালাচ্ছ কি করে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি ছোকরা বলে উঠ্‌ল, "আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।"

বাঃ, বেশ বলেছ। এ না হ'লে আর কবিগুরু, সকলের সব কথাই জুগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

জনসভা-অন্তে আহারাদি সেরে সকলকে আশীর্বাদ করে অবিনাশবাবু কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

শচীন, তুমি জেলটা এড়িয়ে চলো, তবে লবকুশকে জেল থেকে বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না। যজ্ঞেশবাবুকে বোধ করি এখানেই রেখেছে।

সেই রকম বলেই শুনেছি।

রুক্মিণী ও মলিনা সাশ্রু নয়নে তাঁকে প্রণাম করলো। শচীন তাঁকে গাড়ীতে তুলে দেওয়ার জন্যে স্টেশনে রওনা হয়ে গেল।

৩৩

অবিনাশবাবুর ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল, অরবিন্দ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল, অবিনাশবাবু দাগী লোক, তাতে আজ ছয়ই এপ্রিল লবণ সত্যাগ্রহের আরম্ভ, পথে পেয়ে ধরেই নিয়ে গেল নাকি—এমন সময়ে লাঠি হাতে অবিনাশবাবু ফিরলেন।

স্যার, আমি তো চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম।

কেন, ধরে নিয়ে গেল আশঙ্কা ক'রে? আরে, পুলিশে অমন ফালতু পরিশ্রম করে না, যে মাছ জালে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে উদ্যত তাকে জলাশয়ে খুঁজে বেড়াবে কেন?

দেখা হ'ল শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে।

হ'ল বই কি, সেখানেই তো বিলম্ব হ'ল।

কথাবার্তা কিছু হ'ল।

বিস্তর।

শুনতে পাই না!

পাবে বই কি। শোনাবার মতো কথা ছাড়া তিনি তো কখনো কিছু বলেন না, তা লঘু রসিকতাই হোক আর গভীর জ্ঞানের কথাই হোক।

তিনি তো রাজনীতিক নন, ভাবছিলাম তিনি আর কি বলবেন।

তোমার কথা যথার্থ। শাস্ত্রী মহাশয় রাজনীতিক নন আবার গান্ধীভক্ত বা পন্থী নন। সে রকম আশা করে যাই নি। গিয়েছিলাম আজকার বিশিষ্ট দিনটিতে শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। মনে যে একটু আশঙ্কা না ছিল এমন নয় কেন না তিনি রাজনীতিকদের উপরে হাড়ে চটা, বঙ্কিমের যুগের লোক তো। বাড়ীতে ঢুকে দেখি বাইরের ঘরে তিনি গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট, প্রণাম করলে বললেন, বসো অবিনাশ, অনেকদিন পরে দেখা। সত্য কথা বলতে কি তাঁর এমন গহন গম্ভীর মূর্তি আগে কখনো দেখিনি, তার পরিহাস-প্রসন্ন মূর্তির সঙ্গেই পরিচয়।

বললাম, আজকার বিশিষ্ট দিনটিতে আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছি।

আজকার দিনটি অত্যন্ত বিশিষ্ট কিন্তু এর বিশিষ্টতা কিছু বুঝতে পেরেছ কি ?

আজ্ঞে আজ এতক্ষণ ডাণ্ডীর সমুদ্রতীরে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

ওতো হ'ল বাইরের ঘটনা, ওর ভিতরের কথাটি যেমন গুহ্য তেমনি বিশিষ্ট।

বললাম, স্যার আমি তো ভয়ে ভয়ে এসেছিলাম না জানি কি ভর্ৎসনা আপনার কাছে শুনবো।

ভর্ৎসনা, ভর্ৎসনা—বলে একটু থামলেন, তারপরে বললেন, দেখো গান্ধী মহাত্মার সব নীতি সব কর্মপদ্ধতি আমার পছন্দ নয়, অনেক সময়ে বিরূপ সমালোচনা করেছি কিন্তু আজকে তিনি যে কর্মযজ্ঞে উদ্যত আর তার প্রেরণায় সমস্ত দেশ যাতে উদ্বুদ্ধ তেমন কর্মযজ্ঞ এই প্রাচীন দেশে, এই বিচিত্র ইতিহাস সমৃদ্ধ দেশে সেই পুরাকালের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। সেদিন লৌহিত্য থেকে দ্বারকা, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ভারতের যত রাজ্য যত রাজত্ব যত প্রদেশ, যত ক্ষত্রপ যত রাজন্য সবাই একমন এক পণ হয়ে সমবেত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। সেদিন যেমন একান্ত ভাবে ভারত আপন অবিচ্ছেদ্যতা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল তেমন আর আগে কখনো হয় নি, আর পরে কখনো হবে এমন স্বপ্নে ভাবিনি। আজ সেই স্বপ্ন সত্যরূপে সত্যাগ্রহ রূপে অনুষ্ঠিত হ'তে চলেছে দেশে। আজ মন নিবিষ্ট করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করে এই মহৎ সত্যটি উপলব্ধির অবকাশ। অবিনাশ, আজ তুচ্ছ কথা নয়—ক্ষুদ্র কথা, অবসাদ—বিষাদ নয়—আজ একাগ্রচিত্তে ভগবদ্গীতার বিষাদ যোগ অধ্যয়নের শুভক্ষণ।

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, থামলেন। সেই সুযোগে আমি বললাম, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার উদ্দেশ্যে ভারত যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন—কিন্তু সক্ষম হয়েছিলেন কি ? মহাহবের পর থেকেই ভারতে যে বিভেদের সূত্রপাত হয়েছিল আজও তার প্রতিক্রিয়া চলছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা পারেননি আমাদের মতো ক্ষুদ্র জীব যদি না পারে তবে দুঃখের কিছু নেই, কিন্তু এমন সামগ্রিক প্রচেষ্টাও আর তারপরে কখনো হয় নি। আমাদের শাস্ত্রে সংহিতায় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রকলায় সাহিত্যে অজস্র তীর্থ মালায় এদেশের অবিচ্ছিন্নতা ঘোষিত কিন্তু সে-সব হ'ল ভাব লোকের সত্য, সেই ভাবলোকের সত্য আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। লোকেরা ভাবছে রাজার আইন ভঙ্গ করে নুন তৈরি করছে, সরকার ভাবছে লোক দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা অনেক বেশি। গান্ধী

মহাত্মা এজন্যে নয় যে তিনি নেংটি পরেন, নাম মাত্র আহার করেন, রঘুপতি রাঘব গান করেন, না, মোটেই তা নয়। তিনি মহাত্মা এই জন্যে লোকের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় লোকাতীতে, তিনি এমন একটি কর্মপদ্ধতি লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন যার অনুষ্ঠান করতে গেলে সমস্ত দেশকে এক প্রাণ এক মন একসূত্রে গ্রথিত হতেই হবে। ভেবে দেখো আজ দেশের ত্রিশ কোটি লোকের ষাট কোটি মুষ্টি লবণ সংগ্রহ করে ঐক্যের আত্মোপলব্ধি করছে, হয়তো বুঝতে পারছে না, তবু তা মহত্তর উপলব্ধি বই নয়। বৃহৎ উপলব্ধির জন্যে দেশকালের দূর প্রেক্ষণী আবশ্যক; সেই দূর প্রেক্ষণী দৃষ্টি কল্পনাসাধ্য, রবীন্দ্রনাথে আছে সেই কল্পনা, সেই জন্যে তিনি মহাকবি, আর সেই দূরপ্রেক্ষণী সৃষ্টিসাধনা-সাধ্য। গান্ধীতে আছে সেই সাধনা, তাই তিনি মহাত্মা; আজকার ভারতে রবীন্দ্রনাথ দিব্য চক্ষু, আজকার ভারতে গান্ধী দিব্যবাহু, শ্রীগীতায় যে বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী তারই অংশ। অবিনাশ, অবিনাশ, এ লবণ সত্যাগ্রহ নয়, এ ভারত সত্যকে উপলব্ধির আগ্রহ, এ হচ্ছে ভারতাত্মার সত্যাগ্রহ।

মনীষীর অন্তঃকুহর নিঃসৃত বাণীমন্ত্রে ঘরের আবহাওয়া থমথম করতে লাগলো, মনে হ'ল ভারতেতিহাসের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীরগণ আমার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন, ফিরে দেখতে ভয় হ'ল পাছে তাঁদের চোখের সঙ্গে চোখ মিলে যায়, কিম্বা অনধিকারীর দৃষ্টির আঘাতে তাঁরা মিলিয়ে যান শূন্যে।

আমি নীরবে মাথানত করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বল্লেন, বৃদ্ধ শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়ে যাও, দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমার উপলব্ধি সার্থক হোক।

আমি প্রণাম করে উঠ্‌তে যাচ্ছি, বল্লেন, বসো, এই বলে উঠে গিয়ে পূজার নির্মাল্যের একটি ফুল নিয়ে এসে আমার মাথায় ঠেকিয়ে হাতে দিলেন, বললেন সঙ্গে রেখে দিয়ো। তারপরেই আবার তিনি কূটস্থ হলেন।

পুনরায় প্রণাম করে বাইরে এসে পকেটে রাখতে গিয়ে দেখি ফুলটি অপরাজিতা।

বাড়ীতে ফিরে এসে অরবিন্দকে বসে থাকতে দেখে অবিনাশবাবু চমকে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, কিহে অরবিন্দ, দশটা বেজে গিয়েছে, এখনো নিশ্চিন্ত বসে, তোমার কলেজ নেই?

না, স্যার আজকে ছুটি।

ছুটি কি উপলক্ষ্যে—ছয়ই এপ্রিল বলে নয় নিশ্চয়।

তা কি সম্ভব!

তবে?

ব্যাপারটা তাই, তবে অন্য উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে হয়েছে।

রহস্য ভেঙে বলো, কৌতূহল বাড়ছে।

আমাদের অধ্যক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

হাঁ তাকে জানি।

তিনি সর্বদা এমন সব এমার্জেন্সির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

যে রকম দিন কাল পড়েছে প্রস্তুত থাকাই উচিত, তবে এক্ষেত্রে কি ঘটেছে বলো।

আমাদের কলেজের দোতলার একটি বন্ধ করে প্রকাণ্ড একটি ভীমরুলের চাক হয়েছিল, সবাই বলেছে স্যার ওটাকে ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন নইলে বিষম বিপদ ঘটতে পারে।

শুনে তিনি হেসে বললেন, নাহে থাক, কাজে লাগতে পারে। তিনি উপলক্ষ্যটা তৈরি করে রেখেছিলেন, প্রয়োজন উপস্থিত হ'তেই লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

কি রকম?

তিনি কলেজের দারোয়ানদের কালকে সন্ধ্যাবেলায় হুকুম দিয়েছিলেন তোরা ভোরবেলা গায়ে কম্বল জড়িয়ে সাবধানে ঢিল ছুঁড়ে চাকটা ভেঙে দিবি।

তারা তো অত বোঝে না, বল্ল, বাবু, তা হ'লে তো কলেজ বসতে পারবে না।

বসতে পারে না পারে আমি দেখব, তোদের যা বললাম করবি, কিন্তু সাবধান হয়ে, ভীমরুলে ঘিরে ধরলে আর রক্ষা নেই।

তারা নির্দেশ মতো কাজ ক'রে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, ছেলেরা আসতেই বল্ল, সাবধান বাবুরা, ভিতরে যাবেন না, চাক-ভাঙা ভীমরুল ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরলে রক্ষা নেই।

এই মধ্যে কলেজের গেটে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল—ভীমরুলের উৎপাতে কলেজ ছুটি দেওয়া হ'ল।

এবারে বুঝলেন?

চমৎকার বুদ্ধি। কিন্তু রিপন কলেজে কিসের চাক ভাঙলো, সকলেই কি

ভীমরুল পোষে নাকি ?

না, তারা বাড়ীটা চুনকাম করতে লাগিয়ে দিয়েছে, অনেকদিন চুনকাম হয় নি।

আর বিদ্যাসাগর ?

তাদের কি উপলক্ষ্য জানি না, তবে নিশ্চয় একটা কিছু সৃষ্টি করে থাকবে।

দেখো অরবিন্দ, কল্‌কাতার এই তিনটি কলেজকে নিকৃষ্ট কলেজের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এদের দ্বারা দেশের শিক্ষা-বিস্তারে যত উপকার হয়েছে এমন আর কোন কলেজ দিয়ে হয়নি। বিনা বেতনে আধা বেতনে হাজার হাজার ছেলে লেখা-পড়া শিখেছে এই সব কলেজের কল্যাণে, দেশের কাজেও এরা অগ্রণী। আর এরাই নাকি নিকৃষ্ট কলেজের দৃষ্টান্ত। দেশের কি অদৃষ্ট!

আচ্ছা, সতীশবাবুর লোক কি ইতিমধ্যে আমার সন্ধানে এসেছিল ?

না কেউ তো আসেনি।

চলো তবে একবার রাস্তায় বের হয়ে দেখা যাক কি ঘটছে, আর বাড়ীতে বলে যাও কেউ এলে যেন বসিয়ে রাখে।

মুসলমানপাড়া লেন থেকে মির্জাপুর স্ট্রীটে প'ড়ে বৈঠকখানা রোড দিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে অবিনাশবাবুরা দেখতে পেলেন সারি সারি ট্রাম অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারা ইলেকট্রিক রডের দড়ি কেটে দিয়েছে ট্রামের চলবার উপায় নেই।

এ সব কারা করলো ?

অরবিন্দ বল্‌ল, যারা ভীমরুলের ভয়ে কিম্বা চুনকামের ছুটিতে কলেজে ঢুকতে পারেনি তারাই; আর কারা!

হ্যারিসন রোড ধরে শেয়ালদর দিকে এগোতেই দেখতে পেলেন, এক সার ঠেলা গাড়ী আর গোরুর গাড়ী দিয়ে রাস্তা বন্ধ। এমন সময়ে কয়েকখানা পুলিশের গাড়ী এসে দেখলো আর চলবার উপায় নেই, তখন তাঁরা গাড়ী থেকে নেমে রাস্তা খোলসা করতে উদ্যত হ'ল। আর অমনি কোথা থেকে বড় বড় থান ইট তাদের উপরে এসে পড়লো। পুলিশে মাথায় হেলমেট পরে আবার কাজে লাগলো, কিন্তু পুলিসের মাথা থাক বা না থাক পৃষ্ঠদেশ থাকবেই আর সেগুলো ইটের প্রশস্ততর লক্ষ্য। তখন আর একদল পুলিশ দমাদম ক'রে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করলো, ট্রামের তারে উপবিষ্ট কাকগুলো তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উড়লো। কিন্তু কাকের চেয়ে যাদের বুদ্ধি বেশি তারা বলে উঠ্‌ল, কি ভায়া, বুলেট জুটে ওঠেনি, সরকার দেখছি দেউলে হয়ে গিয়েছে,

মাসান্তে তন্‌খা পাবে না, তার চেয়ে আমাদের দলে এসে ভিড়ে পড়ো।

পুলিশের রসজ্ঞান প্রবল না হওয়ায় এবারে তারা কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে আরম্ভ করলো, অমনি দুদিকের বাড়ীর ও দোকানের দরজা বন্ধ হ'তে লাগলো। গ্যাস হাওয়ায় ভেসে এসে অনবহিত পথিকের চোখে লাগলো, অবিনাশবাবুদের লাগলো, চোখ দিয়ে জল পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, অরবিন্দ, এই দেখো ভারতমাতার জন্যে অশ্রুপাত করছি।

অরবিন্দ বল্‌ল, আজ্ঞে অশ্রুপাতটা কিছু বেশি হচ্ছে, চলুন ফেরা যাক।

তারা ফিরতে উদ্যত এমন সময়ে বন্দুকের আওয়াজ কানে এলো। অরবিন্দ বল্‌ল, এ যেন বুলেটের আওয়াজ মনে হচ্ছে, চলুন দেখাই যাক না কি হচ্ছে।

একটু অগ্রসর হ'তেই দেখতে পেলো, খান তিনেক পুলিসের ভ্যান দাউ-দাউ করে জ্বলছে, লোকে ছুটে পালাচ্ছে, হল্লা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আবার গুলির আওয়াজ, একজন নিহত হয়ে পথের উপরে পড়ে গেল, আহত একজন একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো, সেটা মেস বাড়ী, দুজন সশস্ত্র পুলিশ তার পিছু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো, অমনি লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেল। ওরা দেখতে পেলো আহতের খোঁজে পুলিশ দোতালায় উঠেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোজন যুবক তাদের উপরে এসে প'ড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করলো, কেড়ে নিল তাদের বন্দুক, একজন পুলিশ নিরুপায় দেখে দোতালা থেকে লাফ দিয়ে পড়লো, আর পড়বি তো পড় পড়লো এক ঝাঁকা মুটের মাথার উপরে। লোকটা এক ঝাঁকা কুমড়ো নিয়ে বৈঠকখানা বাজারে যাচ্ছিল। সে বেচারা ইয়া আল্লা বলে ঝাঁকা ফেলে দিয়ে পালালো। অসম্বৃত পুলিশ ঝাঁকার মধ্যে কিছুক্ষণ কুমড়োগুলোর সামিল হয়ে থাকলো। উপর থেকে একজন শুধালো, ওহে ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটার দাম কত নেবে। ইতিমধ্যে দোতালার 'মেসিক'গণ দ্বিতীয় পুলিশটিকে পর্যুদস্ত করে ফেলে তার বন্দুকটা কেড়ে নিল, আর একটা বন্দুক আগেই হস্তগত হয়েছিল, তারা চীৎকার করে উঠল—বলো ভাই বন্দে মাতরম্। চারদিক থেকে বন্দে মাতরম ধ্বনি উঠ্‌ল। যে 'মেসিক' বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল সে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। ওদের মধ্যে একজন খদ্দরধারী ছিল, সে বল্‌ল, ভাই, এ আমাদের অহিংস যুদ্ধ মনে থাকে যেন।

আর মনে আছে বলেই তো ফাঁকা আওয়াজ করলাম, ফাঁকা আওয়াজে হিংসা কোথায়। এমন সময় মেসিনগান নিয়ে দুখানা সাঁজোয়া গাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির প্রভাবে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল, কোথাও

জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই।

অবিনাশ বাবু বল্লেন, ওহে অরবিন্দ, চলো এবার ফেরা যাক। নইলে হয়তো এখানেই মহিষবাথান পর্ব শেষ হয়ে যাবে।

হাঁ ফিরে চলুন, হয়তো ইতিমধ্যে সতীশবাবুর লোক এসে পৌঁছেছেন।

ওরা ফিরে এসে দেখ্‌ল, সতীশবাবুর দূত হিসাবে সত্যই দুজন যুবক এসে বসে আছে। তারা বল্‌ল, স্যার, আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সতীশবাবু পাঠিয়েছেন।

অরবিন্দ ভিতর থেকে এসে জানালো, মা বল্লেন, আপনারা তিনজনেই খেয়ে যাবেন, মায়ের অনুরোধ।

ছেলে দুটি বল্‌ল, আমরা তো শুধু ডাল ভাত ছাড়া আর কিছু খাইনে।

তাই খাবেন।

ছেলেরা শুধালো, স্যার আপনি কি খান?

যা পাই, তবে মাছ মাংস বাদে।

দুধও খান? বিস্ময়ের অন্ত থাকে না ওদের।

পেলে খাই বইকি।

দুধ যে poison স্যার।

তবে খুব slow poison। আমাকে নীলকণ্ঠ বলেই মনে করো না কেন। অন্ততঃ অবিনাশ যে তাতে সন্দেহ নেই।

ছেলে দুটি রসিকতা বুঝলো কিনা জানা গেল না, তবে হাসলো না, তাদের বিশ্বাস হাসিটা হিংসার মধ্যে পড়ে।

মহিষবাথান যাত্রার আগে মাথায় ঘোমটা টেনে অরবিন্দর মা অবিনাশ-বাবুর সম্মুখে এসে বল্লেন, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন, দেশ স্বাধীন হলে যাতে ভোগ করবার জন্যে থাকতে পারেন।

এই রসিকতায় অবিনাশবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

ছেলে দুটি হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলো, একি লোকটা হাসে যে! অহিংসা দেখছি এখনো এঁর মজ্জাগত হয়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে ভরসা হ'ল বাপুজি যখন পাঠিয়েছেন, অহিংসার সম্ভাবনা আছে এঁর মধ্যে, আমাদের আশ্রমে কিছুদিন থাকলেই শুধরে যাবেন।

জাতীয় সপ্তাহের প্রাক্কালে ছয়ই এপ্রিল প্রভাতে ডাণ্ডী সমুদ্রতীরে স্নান ও উপাসনার অন্তে একমুষ্টি লবণ সংগ্রহ করে গান্ধীজি যখন সত্যাগ্রহ সুরু করেছিলেন তারপরের ইতিহাস সুবিদিত। আর শুধু তাই নয় ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও বর্তমান ইতিহাসের পক্ষে তার গুরুত্ব অসীম। কিন্তু আমাদের কাহিনীর পক্ষে তার মূল্য অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে যে তার প্রয়োজন এখানে খুব বেশি নয়। যেটুকুতে আমাদের একান্ত প্রয়োজন, যেটুকু না বললে কাহিনীর অঙ্গহানি হবে মাত্র সেইটুকুই এখানে বাচ্য। তবু একবার বড় কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ সেই সব বড় কথার ছায়াতপ আমাদের কাহিনীর অঙ্গের বিভূতি।

ডাণ্ডী সমুদ্রতীরে পুরোদমে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেল পুলিশের পিতল বাঁধানো লাঠি চালনা। গান্ধীজির পরিচালনাধীন, খাস সত্যাগ্রহীরা নীরবে নির্ভয়ে লবণমুষ্টি আঁকড়ে ধরে আহত হয়ে পড়তে লাগলো, যেখানে সম্ভব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল পুলিশ, যেখানে সম্ভব নয় অমনি পড়ে রইলো। তারপরে একদিন গভীর রাত্রে পুলিশ এসে গান্ধীজিকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

অন্যদিকে তামাম হিন্দুস্থান উথলে গেল। বোম্বাই, করাচি, পুনা, আমেদাবাদ, দিল্লী, পাটনা, কল্‌কাতা সর্বত্র বিচিত্র মূর্তি ধারণ করে দেখা দিল সত্যাগ্রহ বিপ্লব। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, বুলেট, পেশোয়ারে হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপ কিছুই বাদ গেল না। আহত নিহতের সংখ্যা বেড়েই চল্‌ল। তারপরে সুরু হয়ে গেল আইনের বদলে অর্ডিনান্সের প্রচার। প্রথমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। তাতেও যখন ফাঁক বের হ'ল, কাগজের পর কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হ'তে লাগলো। তার বদলে দেখা দিল বে-আইনি কাগজ, হাতে লেখা, টাইপ করা, সাইক্লোস্টাইল করা, পরিবেশন হ'তে লাগলো সত্য মিথ্যা মিশিয়ে নানাপ্রকার "সংবাদ"। "আড়াই লক্ষ কাবুলী সৈন্য কাবুল নদী পার হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।" লোকে যা শোনে বিশ্বাস করে, সত্যের চেয়ে গুজবের উপরে অধিকতর বিশ্বাস, কারণ বেচারা সত্য কিছুতেই গুজবের মতো মুখরোচক হতে পারে না। ফলে নানারকম প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেল।

এক চিমটি লবণের মধ্যে যে এমন দেশব্যাপী দৈত্য ছিল কে জানতো। সরকারী মহলের তন্ত্রমন্ত্র ঝাড় ফুঁ কিছুতেই কিছুই হয় না, সরকারী মহলের

বৈমাত্র ভাই বৃটিশ সদাগরী মহলের ক্ষতির অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো, বিদেশী যে সংবাদপত্রখানা এক কোণে "বাতুলের বৈঠক" বসিয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যে বামনের তৃতীয় চরণের মতো সেই ক্ষুদ্র বৈঠক সমস্ত কাগজখানা জুড়ে বসলো। দেশী লোকদের মধ্যে গান্ধী সম্বন্ধে যারা উদাসীন বল্‌ল, দেখা যাক না একটা সুরাহা হ'লে ছেলেটার একটা চাকুরি হ'তে পারে। গান্ধীবিদ্বিষ্টগণ ব্যাপারের গুরুত্ব দেখে হকচকিয়ে গেল, তবু ভাবলো, শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না, কারণ হঠাৎ দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তাদের অনেক রকম ক্ষতি, আর গান্ধীভক্তগণ পথে পথে তাথৈ নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলো, দেখো আমাদের বাপুজির হাতযশ।

থ্রি পাইনস ক্লাবের অতি সম্ভ্রান্ত সভাদের জুতা আর তেমন সগর্বে মস্‌মস্ করে না, stiff whiskyর পরে stiff whisky চালিয়েও আর নিজেদের stiff রাখা যায় না, সর্বদা তাদের আশঙ্কা ঐ অপরিহার্য বাবুর্চি বেয়ারা চাপরাশির দল বোধ করি মনে মনে খুশী হচ্ছে। তুলমোহন নামে এক বেয়ারার সামনের কয়েকটা দাঁত উঁচু ছিল, মুণ্ড অনেক দিন দেখেছে, হঠাৎ আজ তার মনে হ'ল লোকটা হাসছে; হাসতা কাহে? বলে সাহেব গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। লোকটা বল্‌ল, সে হাসেনি। হাসতা ফিন ঝুটা বোলতা! দড়াম করে লাগালো তার দাঁতের উপরে ঘুষি। stiff whisky প্রণোদিত ঘুষিতে লোকটা বাপজি বলে বসে পড়লো, সাহেবের কান শুনলো বাপুজি অর্থাৎ যে নামে মিঃ গ্যাণ্ডি অভিহিত হয়। তখনি লোকটার নোকরি খতম হয়ে গেল।

দেশের অন্য প্রান্তে, অল বেঙ্গল লোন আফিসে প্রায় অনুরূপ প্রতিক্রিয়া।

বাবা হরিপদ, তুমি তো আইনের ঘোরপ্যাচ জানো। এই যে সেদিন সাহেবের সিগারেট কোম্পানীকে আমার বাড়ীটা পাঁচ বছরের চুক্তিতে ভাড়া দিলাম আর তারপরেই দেখো না তোমাদের গান্ধী বাবা কি তুকতাক করে দিল, আজ শহর খুঁজলে একটা সিগারেট মেলে না, কত ডা-বড় ডা-বড় লোক বিড়ি ধরেছে, বাবা আমার চুক্তিটা বলবৎ থাকবে তো, টাকটা মাস মাস পাবে তো?

ফৌজদার মশায়, আপনি বৃথা ভয় পাচ্ছেন, এসব দুদিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা—

কথা হয়েছে, কার সঙ্গে, রবিনসনের সঙ্গে বুঝি, বড় ভালো লোকটি, তা কি কথা হ'ল?

সে-সব বলবো পরে, এখন আসুন, ঐ যে ওরা এসে পড়েছে।

বীরেন ও সুবোধ ঘরে প্রবেশ করলো।

কি হে, কিছু খবর আছে নাকি?

আজ্ঞে, অবিনাশবাবু মহিষবাথান থেকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

লিখেছেন নাকি, পড় পড় শুনি।

ওহে হরিপদ, তোমার আশা করি কংগ্রেসী বুলেটিন শুনতে আপত্তি নেই।

তোমাদের ঐ এক কথা। চিলে কান নিয়ে গেল তো চিলের পিছে পিছে ছুটবে, আরে কানে হাত দিয়ে দেখ আছে কিনা। হরিপদ কংগ্রেসের ফাণ্ড মেরেছে, আরে, ফাণ্ডে কিছু ছিল কি! ন-চ খ-চ কিছু থাকতে কি গিয়েছে! আর এখনো যে তারা কংগ্রেসের নামে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে তার খবর রাখো কি?

খুব হয়েছে হরিপদ, তুমি এখন থামো, কংগ্রেসের ফাণ্ড মারোনি বিশ্বাস করি, কারণ এ ফাণ্ডে বিশেষ কিছু থাকে না, তবে ঐ যে তারাচরণ চক্রবর্তীর বিধবার কাছে যাতায়াত সুরু করেছ সেটা বন্ধ করো।

কি যে বলেন দাদা, তিনি আমার মায়ের বয়সী—

কিন্তু তাঁর টাকাটা যে তোমার শালীর বয়সী। নাও বীরেন পড়ো অবিনাশবাবুর চিঠি—

"কল্যাণীয়েষু বীরেন, এখানে এসে তোমাকে কয়েকখানা চিঠি দিয়েছি তার মধ্যে কতগুলো পেয়েছে জানি না, কারণ এখান থেকে লিখিত চিঠিপত্র ছাঁকনি হয়ে যায়, কিছু কিছু অবশ্যই আটকে যাবে তবে সে-সব চিঠিতে এমন কিছু লিখি না যা আটকে যাবার মতো। সে সব চিঠিতে প্রধানত ছিল এখানকার গ্রাম্য দৃশ্যের বর্ণনা, গ্রামের লোকের ব্যবহার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুলভতা ইত্যাদি বিষয় যা নাকি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক লিখিত হলে পাঠক কর্তৃক অভিনন্দিত হতো। কিন্তু আজকার এ চিঠি পাঠাচ্ছি লোক মারফৎ, কলকাতায় পৌঁছে ডাকে দেবে কাজেই ছাঁকনিতে আটকাবার ভয় থাকবে না, অবশ্য তোমার নামের গুণে ওখানকার ডাকঘর যদি আটকায় তবে তার দায় আমার নয়। ভূমিকা এখন থাক। আমি ভাবছি মহিষবাথান জায়গাটা লবণ সত্যাগ্রহের জন্ত কেন স্থির করা হলো বুঝতে পারছি না, এ না সমুদ্রতীর না আছে এখানে লবণের সরকারী গোলা। তবে এ কথা সত্য যে এখানকার নদীর জল বিষম লবণাক্ত, জোয়ারের সময়ে লবণের মাত্রা বেড়ে যায় কাজেই আগুনে জাল দিলে

লবণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোন কোন বার সমুদ্রে সাইক্লোন হলে জোয়ারের জল এখানকার ক্ষেত-খামার, বিশেষ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়ে লবণাক্ত করে ফেলে—তার ক্রিয়া চলে কয়েক বছর। চাষীদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। এখানে যে-সব গ্রাম আছে, অধিকাংশই চাষী গ্রাম, আগে তাদের মধ্যে সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রচারিত হয় নি, আর খবরের কাগজের সাপ্তাহিক সংখ্যা দু'একখানা এলেও এই নিরক্ষর গ্রামে তার প্রভাব বেশি পড়ে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝেছি, এরা জানে না ডাণ্ডীতে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এখানে আমাদের আগমনের কারণ—যদিচ গান্ধীর নাম সবাই জানে, তবে একজন সাধুপুরুষ বলে। আমাদের এখানে আগমনের আগে থেকেই পুলিশ-ছাউনি বসে গিয়েছে, ওটাতে গাঁয়ের লোক অভ্যস্ত, কাছে অনেক মেছো ভেড়ি আছে সে-সব নিয়ে প্রায়ই হাঙ্গামা বাধে, তখন শুভাগমন হয়ে থাকে পুলিশ প্রভুদের। এবারকার পুলিশ ছাউনিকেও সেই জাতের ভেবেছিল। তারপরে যখন ধ্বজা পতাকা নিয়ে শুভাগমন হল আমাদের, ওরা হকচকিয়ে গেল। ওদের পুলিশকেও ভয়, আবার যারা পুলিশের বিরুদ্ধে তাদেরকেও ভয়। প্রথম দু'চার দিন আমাদের কাছে ঘেঁষেনি, তারপরে যখন সভা করে সব কথা বোঝাতে সুরু করলাম, তখন পুলিশ আমাদের কাছে ঘেঁষলো, এতদিন দূরে দূরে ছিল। এমন সময়ে সতীশবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন, সমস্ত অবস্থা দেখে বললেন, অবিনাশবাবু, এ ইস্কুল মাস্টারের কর্ম নয়, দেখুন আমি কি করি। তিনি লবণ তৈরি করে, বাড়ী বাড়ী বিলি সুরু করলেন, বললেন, তোমাদের ঘরের কাছে নুন থাকতে কিনে খাও কেন, গান্ধীজির হুকুম—এই নুন খাবে, তৈরি করে নিয়ে খাবে।

ওরা বলল, হুজুর যদি পুলিশে ধরে।

পুলিশে তো ধরবেই, কিন্তু কতজনকে ধরবে।

যাদের ধরবে জেলে নিয়ে যাবে।

জেলে তো নিয়ে যাবেই, তবে জেলে কত জায়গা? জানো গান্ধীজিকে জেলে নিয়ে গিয়েছে, নেহরুজীকে নিয়ে গিয়েছে—

কি বাপ বেটা দুজনকেই—

হাঁ দু জনকেই!

আরে ওঁরা যে বড় লোক—

সত্যাগ্রহে আবার বড় ছোট কি, সবাই সমান। এই রকম কত বক্তৃতা করে ওদের ভয় ভাঙাই, খবরের কাগজ এলে পড়ে শোনাই, বলি যে এর মধ্যেই বিশ হাজার লোক জেলে গিয়েছে—

ওরা বিস্ময়ে বলে ওঠে, বিশ হাজার!

এখনি কি হয়েছে, বিশ লাখ জেলে যাবে, দেখি জেলে কত জায়গা আছে।

তখন ওরা বলে ওঠে, তবে আমরাও যাবো।

যাবেই তো ভাই সব।

তখন সকলে লবণ তৈরি করতে লেগে যায়। আর পুলিশেও শুরু করে লাঠি চালাতে। তবে বাঙালী পুলিশ বুদ্ধিমান, তাদের লাঠির চোট পড়ে সেখানে যেখান থেকে আমাদের মাথাটা অনেক দূরে। বাঙালী দারোগা আরও বুদ্ধিমান, বলে, দেখিস লাঠি ভাঙে তো ভাঙুক সাপ না মরে যেন। এমন সময়ে একজন আই জি এলো, এক নজরেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে তারপর দিন এক কোম্পানী গুর্খা পুলিশ পাঠিয়ে দিল। ওদের আবার মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যায় না। ভাবলাম এবারে মাথা বাঁচানো দায় হবে। কিন্তু দেখা গেল ওরা বাঙালীর চেয়েও বুদ্ধিমান, ওরা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে তেড়ে আসে তবে মার ধোর করে না।

ডি আই জি বল্‌ল, একি হচ্ছে, ওরা যে বেআইনি কাজ করছে ওদের মারো।

ওরা বল্‌ল, নিমক তো আমাদের কিনে খেতে হয়, ওরা তৈরি করুক আমরা খাবো।

কেন, তোমরা সরকারের নিমক খাও না?

এতদিন তাই ভাবতাম, এখন দেখছি নিমক দেশের মাটির।

সরকার পুলিশকে বড ভয় করে তার চেয়ে বেশি ভয় করে ফৌজকে, ওরা বিগড়ে গেলে সরকার নিরুপায়। তাই ওদের আর কিছু না বলে অন্যত্র বদলি করে দিল। শুনছি এবারে আসবে পাঠান ফৌজ। ওরা রাম নামে ভুলবার পাত্র নয়। এর পরের চিঠিতে পরবর্তী সংবাদ পাবে যদি তখনো পাঠানী লাঠিতে মাথাটা আস্ত থাকে। এখানে চিঠি লিখতে চেষ্টা করো না, কারণ সে চিঠি পৌঁছবে না। এ চিঠিখানাও লোক মারফৎ গোপনে কলকাতায় যাচ্ছে। সেখানে ডাকে দেবে। বর্ত্তমান অবস্থায় নিরাপদে আছ এমন অবাস্তব প্রত্যাশা করবো না। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলেও শ্রোতারা কোন মন্তব্য করলো না যে, তারা প্রত্যাশা করছিল আরও কিছু আছে। এমন সময়ে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ভূপতির প্রবেশ।

মাফ করবেন ফৌজদার মশায়, আপনাদের এই আড্ডায় প্রবেশের আমি

একান্ত অনধিকারী, তবে অত্যন্ত গুরুতর ঘটনার চাপে এহেন গর্হিত কার্য করতে বাধ্য হয়েছি। বেশিক্ষণ থাকবো না।

তারপরে বীরেন আর সুবোধের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, তোমরা দু'জন একবার শোনো।

হতচকিত বীরেনের হস্তস্খলিত চিঠিখানা ওখানেই পড়ে রইলো। ওদের একান্তে ডেকে দিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌ল, কৈলাস এসেছে, চট্টগ্রামের অবস্থা ভয়ঙ্কর। না, না, আর কোন প্রশ্ন নয়, এখনি আমার সঙ্গে এসো।

ওরা ভূপতির সঙ্গে চলে গেল, অবিনাশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লো না।

প্রায় সভ্যহীন সভায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফৌজদার বল্‌ল, হঠাৎ কি হ'ল, সবাই ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গেল। ওকি হরিপদ, ঐ চিঠিখানা আবার হাতালে, এখনি তো দিয়ে আসবে প্রভু রবিনসনের পাদপদ্মে। আমার এতটুকু শক্তি নেই যে স'রে গিয়ে চিঠিখানা সরাই। ওখানা পড়তে পড়লো কি না শেষে তোমারই হাতে।

কি যে বলছেন দাদা। এসব জাতীয় সম্পত্তি কি যত্রতত্র ফেলে রাখা যায়—এখনি গিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো।

আর যাই করো বেটা রবিনসনের হাতে যেন না পড়ে।

পাগল নাকি। চল্‌লাম দাদা। এই বলে সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে রওনা হ'ল, বলাবাহুল্য রবিনসনের কুঠির দিকেই। ভূপতির মৃদুস্বরের বার্তা তার কানে প্রবেশ করেছে, যার কাছে এ চিঠি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

গোয়েন্দাদের ইন্দ্রিয়গুলি কিছু অতিরিক্ত সজাগ।

৩৫

বীরেন ও সুবোধকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে ভূপতি দেখলো ঘর শূন্য, কেউ কোথাও নেই, বাইরের দরজা অবশ্য যেমন খোলা ছিল তেমনি খোলা আছে।

কৈলাস গেল কোথায় ?

কাছেই কোথাও আছে, এখনি আসবে, অপেক্ষা করা যাক্ না।

কোথাও যাওয়ার মতো শক্তি তার নেই, পায়ে মস্ত ঘা।

ঘা ! কি করে হ'ল ?

সেটা বড় কথা নয়, কি করে এতদূর এলো সেটাই ভাববার বিষয়।

ভূপতি ভাই, তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কৈলাস অবশ্যই

তোমাকে কিছু বলেছে।

যা বলেছে না বলবারই সামিল। স্কুল থেকে ফিরে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে কৈলাস দণ্ডায়মান।

একি হে, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে। আর তোমার সাহসও তো কম নয়, সেবারে এক কাণ্ড করে গেলে, তখন অবশ্য তোমাকে ধরতে পায়েনি, পরে জানাজানি হয়ে তোমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল।

সে বল্ল, ওসব জানা কথা। কিন্তু দাদা, আর চলতে পারছি না বলে বসে পড়লো।

একি পায়ে দেখছি যে মস্ত ঘা, ছোরা না বন্দুক।

ওসব জিজ্ঞাসা করবেন না, কেবল আমাকে কোথায় লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করুন, পিছনে ফেউ লেগেছে।

তা না হয় করছি, কিন্তু এখন আসছ কোত্থেকে।

চট্টগ্রাম থেকে। সেখানকার অবস্থা ভয়ঙ্কর। বাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, যা বল্লাম সেই রকম ব্যবস্থা করুন, আমি আর পারছি না।

তবে তুমি বসো, আমি দু-একজনকে নিয়ে আসি, একাজ একা করবার নয়। বুঝলে হে বীরেন, তারপরে গিয়ে তোমাদের ক্লাবে পৌছলাম, তোমাদের নিয়ে ফিরে এলাম, এখন দেখছি সেই বিকল লোকটা উধাও। আমি তাই কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু ঐ যে বল্লে, চট্টগ্রামের অবস্থা ভয়ঙ্কর ওটার অর্থ কি ?

অর্থ অনর্থ আর কি। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ আজ চার-পাঁচ দিন সংবাদপত্রে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কোন খবর নাই, আমার ক্লাসে কয়েকটি ছেলে আছে নোয়াখালি চট্টগ্রাম অঞ্চলের, তারা আজ কয়েকদিন চিঠি পায়নি। এসব বোধ করি ঐ ভয়ঙ্কর শব্দটার ভাষ্য।

খুব সম্ভব কৈলাসের পায়ের আঘাতটাও আর একটা ভাষ্য।

কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে দিনাজশাহী তো অল্প পথ নয়, ছোকরা এলো কি করে ?

ঐ যে তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

কৈলাস ঘরে প্রবেশ করেছে, পায়ে দগ্‌দগে ঘা, গায়ে মলিন চাদর, শরীর যতদূর সম্ভব শীর্ণ।

কি হে, গিয়েছিলে কোথায় ?

সিদ্ধেশ্বরী মাকে একবার প্রণাম করে এলাম।

তোমার সাহস তো কম নয়, খোঁড়া পায়ে যাতায়াতে চার মাইল পথ এসে গেলে, মা তো পালিয়ে যেতেন না।

কি বলছেন দাদা, এসেছি মায়ের আশ্রয়ে তাঁকে একটা প্রণাম না করে কি থাকতে পারি। কিন্তু আগে আমার পায়ের যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন, আর পারছি না বলে মাদুরের উপরে শুয়ে পড়লো।

ভূপতিরা তিনজনে পরামর্শ করে সুবোধকে পাঠিয়ে দিল সত্যেন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। এ রুগী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চলে না, যেকোন ডাক্তার ডেকে দেখানো যায় না। সত্যেন ডাক্তার স্বদেশীদলের লোক, এক সময়ে ছোরা পিস্তল চালিয়েছে। এখন অনেকটা নিরীহ, ছুরি ও পেটেন্ট ওষুধ চালায়। অন্তরঙ্গরা বলে, ভায়া, তোমার আগের গুলোই অনেক কম মারাত্মক ছিল।

ভূপতি বল্ল, সত্যেন ডাক্তার আসুক ততক্ষণ, বলো তো চট্টগ্রামে এমন কি হয়েছে যে ভয়ঙ্কর বললে।

ওর বেশি জানি না দাদা।

তার মানে বলতে রাজি নও।

তার মানে আমাদের মাস্টারদা যার উপরে যেটুকু ভার দিতো তার বেশি জানবার উপায় বা অধিকার তার ছিল না। সমস্ত পরিকল্পনা যাতে ফাঁস না হয়ে যায় তার মধ্যে এই মন্ত্রগুপ্তি।

আচ্ছা তার বেশি না হয় নাই জানলাম, কিন্তু ঐ মাস্টারদাটি কে ?

ওটাও এখন মন্ত্রগুপ্তির অন্তর্গত, কিন্তু নিশ্চয় জানবেন দাদা ঐ নামটা চিরদিনের জন্যে দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আচ্ছা এটাও না হয় না মানলাম, তোমার উপরে কি ভার ছিল যেটা নিশ্চয় বলতে বাধা নেই।

না বাধা নেই, কারণ সেটুকু সম্পন্ন করেছি। একদিন মাস্টারদা গোটা কতক ডিনামাইটের স্টিক দিয়ে আমাকে বললেন, চট্টগ্রাম আর লাকশাম জংশনের মধ্যে রেলের গোটা কতক পুল উড়িয়ে দাও গিয়ে। তারিখটা আর বলবো না। ও লাইনে ছোট ছোট অনেক রেলের পুল আছে। যখন মাস্টারদাকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি, বললেন, তোমাকে একটা বস্তু উপহার দি, নাও। এই বলে ছোট্ট একটা কাঁচের ক্যাপসুল দিলেন। বললেন, যদি দেখো যে ধরা পড়েছ তবে এটা মুখের মধ্যে ফেলে একটু চাপ দেবে—বাস, সব শেষ হয়ে যাবে, পেটের কথা পেটেই থেকে যাবে। হাঁ আরও দিয়েছিলেন একটা তারকাটা কাঁচি, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবে।

সে-সব কাজ উদ্ধার করেছ।

হাঁ সমস্ত।

তবে পায়ের আঘাত কি করে হল?

শেষের পুলটা উড়িয়ে দেবার আগে লক্ষ্য করিনি এক বেটা সশস্ত্র সিপাহি ছিল, তার গুলি এসে লাগলো পায়ে। পড়ে গেলাম। ভাবলাম এবারে সেই উপহার গলাধঃকরণ করবার সময়। কিন্তু সত্য কথা বলবো দাদা. যতই গীতা পড়ি আর প্রাণায়াম করি এই ক্ষুদ্র প্রাণটার উপরে মায়া কি সহজে যেতে চায়। ভাবলাম দেখিই না কি হয়, মরা তো হাতেই আছে। তারপরে যখন দেখলাম যে পুলিশ বেটা এলো না, রাতটাও ছিল অন্ধকার কিনা, তখন দাঁড়াতে গিয়ে দেখি যে একেবারে অসম্ভব নয় তখন খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে ঢুকে পড়লাম পাটের ক্ষেতে। চমৎকার নিরাপদ আশ্রয়, খুঁজে পায় কার সাধ্যি। বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মূর্ছাও হ'তে পারে হঠাৎ কানে এলো একটা করুণ আর্তনাদ—করুণ আর মর্মান্তিক।

কে?

আমি।

আরে, আমি তো বুঝতেই পারছি, এখানে এ অবস্থায় কেন?

সে বলল, আগে বলো তুমি কে?

ভাবলাম বলিই না, কি আর করবে, ওর তো দেখছি অন্তিমকাল। বললাম, আমি মাস্টারদার লোক।

আমিও।

পুল উড়িয়ে দিতে এসেছিলে?

হাঁ।

তারপরে। সশস্ত্র পুলিশটা আগে আমাকে দেখল, গুলি এসে লাগলো পাঁজরে। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করছি। বড় যন্ত্রণা, বড় পিপাসা।

মাস্টারদা কি বিদায়-উপহার দেননি?

দিয়েছিলেন।

তবে?

ঐ দেখো।

খুব ঠাহর করে করে দেখলাম একটা কুকুর পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ও ঘুম আর ভাঙবে না।

কেন ?

সিপাহি বেটা মনে হচ্ছে দুটো গুলি ছুঁড়ে ছিল, একটা লাগলো আমাকে, আর একটা ওকে। ওঃ কি সে অসহ্য আর্তনাদ। এখনো শুনতে পাচ্ছি দাদা, এখনো শুনতে পাচ্ছি। ভাবলাম আমার তো হয়েই গিয়েছে, ও বেচারাকে আর কষ্ট দি কেন ? আমি এসেছিলাম সজ্ঞানে কর্তব্য করতে, আমার দেশ স্বাধীন হবে, আর ঐ অবুঝ জানোয়ারটা এসেছিল আমার সঙ্গে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে সে জানতো না, মানতো না, ওর আর দেশ কোথায়! বেচারা আমার জন্যে কষ্ট পাবে কেন ? দিলাম ওর মুখে ঢুকিয়ে মাস্টারদার উপহার। বিশ্বাস করবে না ভাই যখন আমি ওর মুখ ফাঁক করে ধরলাম খুশিতে ওর চোখ জল জল করে উঠ্‌ল, ও তো জানে সুখাদ্য ছাড়া ওকে কখনো দি না। তার পরেই সব শান্তি !

কিন্তু বুঝলো না তোমার শান্তি যে হরণ করলো ও।

কি আর করা যাবে। আজ পাঁচ বছর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে আমাকে ছাড়েনি।

সামান্য একটা কুকুরের জন্যে নিজেকে বিপন্ন করলে।

লোকটা হাসলো। আমাদের পরস্পরের মধ্যে নাম বলাবলি নিষিদ্ধ ছিল, মুখেও কদাচিৎ চিনতাম।

আমার কথা শুনে লোকটি হাসলো, মুমূর্ষুর হাসি। বল্‌ল দাদা, কুকুরে মানুষের সব গুণ আছে, নেই কোন দোষ। বিধাতা মানুষের ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে কুকুর গড়েছেন। তার বিপদ দেখে মনে হ'ল একজন বিপন্ন সহকর্মীর দুঃখ দূর করতে পারছি না আর ভাবছি দেশের দুঃখ দূর করবো, তখনি মনের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা ভাবের উদয় হ'ল। দাদা লোকে ভেবে-চিন্তে হিসেব করে পরোপকার করে না, ভূতে ঘাড়ে ধরে পরোপকার করায়, না করে উপায় থাকে না।

আমি বললাম, হাঁ করো।

কেন ?

মাস্টারদার উপহার নাও, মরতেই তো বসেছ কষ্ট পেয়ে লাভ কি ?

তোমার ?

আমার এমন কিছু হয়নি।

তার মুখ ফাঁক করে ধরে ক্যাপসুলটি ঢুকিয়ে দিলাম। আঃ, অমনি পরম প্রশান্তি।

হঠাৎ এখানে আসবার কথা মনে হ'ল কেন ? ভেবো না যে আমরা দুঃখিত হয়েছি, অমনি জিজ্ঞাসা করছি।

দাদা, তীর খাওয়া হরিণটা ঘুরতে ঘুরতে নিজের ঝোপটিতে এসে মরে। তা ছাড়া আরও কিছু কারণ আছে। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নিতান্ত আর্ত রোগীও ঘুমের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় না। স্বপ্ন দেখলাম সিদ্ধেশ্বরী মা বলছেন, বাবা এখানে আয়, তোর ভয় নেই।

তারপরে এলে কি করে ?

কখনো পাটের নৌকায়, কখনো গহনার নৌকায়, কখনো W. T. যাত্রী হয়ে ট্রেনে। সবাই শুধায়, পায়ের ঘা হ'ল কি করে ? আর বলো কেন ভাই, ভাইয়ের সঙ্গে শরিকি দাঙ্গায়। শুনে সবাই মন্তব্য করে, আপন ভাই যখন শত্রু হয় তখন তার চেয়ে বড় শত্রু আর কে !

তার চেয়ে বড় শত্রু ডাক্তার,—বলতে বলতে হাতে ব্যাগ, মুখে হাসি, চোখে চশমা, গলায় স্টেথোসকোপ সুধীরের সঙ্গে প্রবেশ করলো সত্যেন ডাক্তার।

কিহে বাপু আবার জ্বালাতে এসেছ ? এই সেদিন এক কাণ্ড করে পালালে, এখনো মাথার উপর হুলিয়া ঝুলছে, আবার এসেছ, তোমাদের কি ভয়ডর নেই !

কৈলাস সত্যেন ডাক্তারকে চিনতো। মুখে যত কটুভাষা মনে তত সহৃদয়তা, কাজেই নিরুত্তর হয়ে রইলো।

দেখি কি রকম কি ঘা বাধিয়েছ।

টর্চের আলো ফেলে দেখে বল্ল, একেবারে গ্র্যাংগ্রিন বাধিয়ে তবে এসেছ, তার আগে তো আসবে না। ভূপতিবাবু আপনার রোগীটি বেশ চৌকস, একে হাসপাতালে নেওয়া চলবে না, আমার ডাক্তারখানায় নেওয়া চলবে না, আর এখানে দু-এক দিন থাকলেই কথাটা উঠবে গিয়ে পুলিশের কানে, সেই গোবিন্দ গোয়েন্দা খুন হওয়ার পর থেকে রবিনসন বেটা ক্ষেপে আছে। কাজেই আমাদের কৈলাসের পক্ষে যমের দক্ষিণ দিকের দরজাটাই শুধু খোলা। কি বলো হে ?

ভূপতি বল্ল, যা হয় একটা চটপট করে দিন, বড় কষ্ট পাচ্ছে।

গ্র্যাংগ্রিণ হ'লে কবে আরাম পায় তা তো জানিনে। এদের আবার জিজ্ঞাসা করা চলবে না কি ক'রে লাগলো, কবে কোথায় লাগলো, এরা সব বিপ্লবী কিনা। তা বাবুর কিছু খাওয়া হয়েছে কি ?

দুধ খেয়েছি।

দুধের কর্ম নয়। ভূপতিবাবু, সাহেব বাজারে বড় ওষুধের দোকানে চিকেন স্যুপ পাওয়া যায়, নিয়ে এসে খাইয়ে দিন। গায়ে তো বেশ জ্বর আছে দেখছি।

এই বলে ঘা গরম জল দিয়ে ধুইয়ে আইডোফরম দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। নাও এখন চিকেন স্যুপ আসতে আসতে খানিকটা গরম দুধ খেয়ে নাও।

বীরেন সুবোধ ডাক্তার প্রভৃতি ঘণ্টা দুই পর চলে গেল, কৈলাস ও ভূপতি ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোর হতে বোধ করি বেশি বিলম্ব নেই এমন সময়ে দরজায় পড়লো ধাক্কা। ভূপতি দেখল্ দরজা না খুললে ভেঙে যাবে। দরজা খুলতেই দেখতে পেলো, সদলবলে রবিনসন দণ্ডায়মান।

কাকে চাই ?

রবিনসন বল্‌ল, চিটাগাংকো ফেরারী আসামী কো চাই। আউর তুমকো ভি চাই।

ঘরমে ঢুকনে সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে ?

টানামে হোগা।

সার্চ ওয়ারেণ্ট না দেখলে যাবো না।

জরুর যায়েগা—বলে রবিনসন ঘুষি তুললো। সেই ঘুষি যথাস্থানে পড়বার আগেই ভূপতি মারলো এক ঘুষি সাহেবের মুখে। অমনি তিন-চারজন সিপাই এসে পড়লো ভূপতির ঘাড়ে। এতক্ষণ কৈলাস নিরীহ ভালো মানুষটির মতো বিছানায় শুয়েছিল, এবারে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পিস্তল ধরলো রবিনসনের বুকের কাছে। সেই মুহূর্তেই রবিনসনও পিস্তল বের করে গুলি করলো, গুলি কারো গায়ে লাগলো না, ফস্কে গেল। এটা বোধ করি ভূপতির ঘুষির প্রতিক্রিয়া। তার গুলি ফস্কে যাওয়ার পরেও পিস্তল নামায়নি কৈলাস, হঠাৎ সাহেবের মুখের দিকে তাকাতেই তার কি মনে হ'ল, অমনি জানলা দিয়ে হাত বার করে পাশের পুকুরটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল অতৃপ্ত-জিঘাংসা সেই পিস্তলটা। এ সমস্তই ঘটে গেল এক খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে।

নাও সাহেব, এবারে বাঁধো, আর ভয় নেই।

তুমকো ডর লাগা ?

বেশ না হয় তাই হ'ল।

রবিনসনের ইঙ্গিতে একজন দারোগা ভূপতি ও কৈলাসকে হাত কড়া পরিয়ে পাল্কী-গাড়ীর মধ্যে তুলে দিল। নিজেরা বসলো কোচ বাক্সে। রবিনসন সাইকেলে চড়ে এগিয়ে গেল।

ভূপতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, ওটা পেলে কোথায় হে ?

সেবারে পালাবার সময়ে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের জিম্মায় রেখে গিয়েছিলাম।

আজ তাই বুঝি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে জিম্মা উদ্ধার করে এনেছিলে।

কতকটা তাই বটে।

তবে বেটাকে নিকেশ করে দিলে না কেন ?

দেব বলেই তো ভেবেছিলাম। হঠাৎ একটা মুখ মনে পড়ে গেল।

বিস্মিত ভূপতি শুধায়, কার হে ?

কুচবিহার জেঙ্কিন্স স্কুলের সাহেব হেড মাস্টারের।

হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো কেন ?

কেন কেমন করে বলবো। সাহেব বড় দয়ালু ছিল, ছাত্রদের বেত মারতো না, জরিমানা করতো না, শুনেছি তলে তলে ফেরারী স্বদেশীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করতো—

সেই আর এই !

তা বটে দাদা, কিন্তু কেন জানি মুখটা মনে পড়ে গেল, হাত চল্‌লো না। থাকগে। আপনাকে কিন্তু বড় কষ্ট দেবে।

এমন কিছু নয়, যা ভাবা যায় তার বেশি নয়।

রবিনসন সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে এসে জানলা দিয়ে বল্‌ল, ইহা আড্ডা বাড়ী নয়, নো স্পিকিং।

তারপরে কৈলাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, লালমুখ দেখকে ডর লাগা, পিস্টল নেহি চালায়া। হো হো।

মানুষের এমনি বিচার বটে।

কৈলাসকে সশস্ত্র পাহারায় চিটাগাং পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, আর ফেরারী আসামীকে আশ্রয় দানের অভিযোগে ভূপতির তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

৩৬

অবশেষে শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা চল্‌ল না। প্রথমে সরকারী সংবাদে জানানো হ'ল যে বঙ্গোপসাগর থেকে একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণিঝড় প্রচণ্ড বেগে চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে সমস্ত জেলা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিটা প্রধানতঃ হয়েছে রেল লাইন, টেলিগ্রাফ লাইন, ডাকঘর,

থানা, আদালত প্রভৃতির, নাগরিকগণের বাড়ীঘর, বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতিও বড় অল্প হয়নি। রেল লাইন, টেলিগ্রাফ লাইন এবং ডাকঘর মেরামত হওয়া মাত্র আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হবে। বলা বাহুল্য মেরামতের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং ন্যূনতম সময়ের অধিক জরুরি ব্যবস্থা চালু থাকবে না।

জনসাধারণের অবিশ্বাসের হেতু ছিল না। কারণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই চট্টগ্রাম জেলা, আর বঙ্গোপসাগরের যত পাগলা ঝড়ঝঞ্ঝার প্রধান লক্ষ্য এই হতভাগ্য জেলা, বিশেষ সদাশয় সরকার বাহাদুরের অযথা কতগুলো কথা বলবার কি সার্থকতা থাকতে পারে। কিন্তু সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও অল্প-অল্প করে খবর চুঁইয়ে বাইরে এসে পৌঁছুতে লাগলো। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে যে-সব লোক অন্যত্র এলো, তারা বল্‌ল, কই এর মধ্যে তো সাইক্লোন হয়নি, আর চিঠি পত্রই বা বন্ধ হবে কেন! না, না, থানা ডাকঘর সরকারী অফিস আদালত বহাল তবিয়তে আছে। তবে সরকারী ইস্তাহারের এ উদ্দেশ্য কি? তবে শোনো, দেখো ঘরে কেউ তো নেই। না, না, কেউ নেই। তবু একবার দেখে এসো। তখন কানে কানে ফিস ফিস শব্দোচ্চারণ। বলো কি, এত বড কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, আর আমরা কেউ জানলাম না। এ যে লবণ সত্যাগ্রহের চেয়েও ভীষণ। হুঁঃ. কোথায় স্বাধীন চট্টগ্রাম আর কোথায় লবণ সত্যাগ্রহ। কি যে বলো। শাকের আড়াল থেকে মাছ এই ভাবে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। কল্‌কাতার বড় নির্ভীক সংবাদপত্রগুলো নানা সূত্রে সমস্ত খবর পেয়েছিল, কিন্তু একদিকে ভারতরক্ষা আইন অন্য দিকে সংবাদপত্র সংস্থার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে তৌল করে নির্ভীক সংবাদপত্র সমূহ নির্ভীকভাবে মৌন হয়ে থাকলো। এ হেন অবস্থায় সমস্ত দেশ যখন জানা না জানা সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দোদুল্যমান এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র নগণ্য অজ্ঞাতনামা সংবাদপত্র হাটের মধ্যে সশব্দে হাঁড়ি ভেঙে দিল। যে সংবাদপত্রের নাম আগের দিনেও কেউ জানতো না, আড়াইশখানা বিক্রি হতো কিনা সন্দেহ এক দিনের মধ্যে তার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেল, "এই সংখ্যার কপিরাইট নাই" মুদ্রিত নির্দেশে উৎসাহিত কল্‌কাতার ও মফস্বল শহরের ছোট বড় প্রেসে, বলা বাহুল্য কোন প্রেসের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত হ'ল না, যে হেতু তারাও নির্ভীক এবং দেশের জন্য সমর্পিতপ্রাণ, দেখতে দেখতে একদিনের মধ্যে এই নিতান্ত স্থানীয় পত্রিকা জাতীয় পত্রিকায় পরিণত হয়ে গেল।

॥ "এই সংখ্যার কপিরাইট নাই" ॥

সোনার দেশ

সাপ্তাহিক পত্র,—তৃতীয় বর্ষ,—পঞ্চাশত্তম সংখ্যা

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল

ধন্য চট্টল

সম্পাদকীয় মন্তব্য

"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে নায়ক হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্যের মুখ দিয়া সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন যে এই দেশ এই এই ভারতবর্ষ পরাধীন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল পশ্চিম দিক হইতে। ইহার প্রতিকারের সূত্রপাত হইবে পূর্ব্বদিগন্ত হইতে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সেই সূত্রপাতের শুভ উষা লগ্ন। চট্টগ্রামের একদল নির্ভীক যুবক আর শুধু চট্টগ্রামেরই বা বলি কেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে তাহারা সমাহৃত, যাহাদের চিত্ত ভাবনা-হীন সেই মুষ্টিমেয় যুবকের অগ্নিময় তাণ্ডবের ফলে শতবর্ষ পরে চট্টগ্রাম স্বাধীনতার অমৃতময় স্বাদ লাভ করিল। হে ভারতবাসী, অবগত হও চট্টগ্রাম আজ স্বাধীন, হে ভারতবর্ষ আশ্বস্ত হও অচিরে তোমরাও এই স্বাধীনতার যোগ্য অংশ লাভ করিবে। পরাধীনতায় অভ্যস্ত জাতির হঠাৎ মনে হইতে পারে এমন দিন কি হবে মা তারা! কিন্তু জানো, বিশ্বাস করো "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন এসেছে সেদিন এসেছে"—চট্টগ্রামে আসিয়াছে, সারা ভারতবর্ষে আসিবে।

"বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা সমস্ত খবর দিব, যথার্থ খবর দিব, অকুতোভয়ে সমস্ত খবর দিব, এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত বীরগণের সকলের নামের উল্লেখ করিব, কেবল এখনো যাঁহারা জীবিত, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পর্বের জন্য যাঁহারা অস্ত্র শাণিত করিতেছেন তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিতে পারিব না। কেন পারিব না সকলেই বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য নিহতদের নাম উল্লেখ করিতে বাধা নাই, তাঁহাদের আর কি ভয়! আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র সংবাদপত্রেরই বা কি ভয়। আমাদের বড় সহযোগীগণ নির্ভীক কাজেই নীরব, আমরা নিঃস্ব কাজেই নির্ভীকতার বিলাসে আমাদের প্রয়োজন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য মৌন, মুখর এই দরিদ্র বিদুর। নেংটের আবার বাটপাড়ের ভয় কোথায়!

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সামরিক পোষাকে ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েকজন যুবক ট্যাক্সি গাড়ী চালাইয়া গিয়া সরকারী অস্ত্রাগার দখল করে, সরকার পক্ষের একজন শ্বেতাঙ্গ মেজর ও একজন দেশীয় পাহারারত সৈনিক মাত্র নিহত

হইয়াছে। আক্রমণকারী বীরগণ কেহই হতাহত হয় নাই। তারপরে যখন বৃহত্তর শত্রুবাহিনী সংবাদ পাইয়া নিকটে আসিয়া পড়িল তখন আক্রমণকারীগণ দুর্গম জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। খাদ্য নাই, পানীয় জল লবণাক্ত, এই অবস্থায় তিন দিন কাটিবার পরে শত্রুবাহিনী আসিয়া গুলিবর্ষণ সুরু করিল, বীরগণও গুলিবর্ষণে পশ্চাদপদ্ নহে কিন্তু শত্রু সৈন্যের লুইস গানের গুলি বর্ষণে একে একে ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্ম্মল সেন, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন ও মতি কানুনগো নিহত হইয়া পড়িয়া গেল। শত্রু সৈন্য যে আরও অধিক সংখ্যায় আসিতে পারে নাই, তাহার মূলে ছিল সর্বাধিনায়কের দূরদৃষ্টি। তিনি আগেই লোক পাঠাইয়া রেল লাইন, পুল এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটি সংবাদ সব শেষে পাঠককে উপহার দিব বলিয়া এতক্ষণ লিখি নাই। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নারীরাও পিছাইয়া নাই, তাহারাও আগাইয়া আসিয়াছিলেন, বীর ভাইদের সঙ্গে তাঁহারাও সশস্ত্র হইয়া, সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সম্মুখ সমরে গুলিবিদ্ধ হইয়া শহীদ হইয়াছেন তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে এখন আর বাধা নাই, না করিলেও অন্যায় হইত, কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে—সেই স্বর্গতা রাধা চক্রবর্ত্তী দিনাজশাহী জেলার অধিবাসী। অন্যান্য শহীদ ভাইদের সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মার জন্যও শান্তি প্রার্থনা করিতেছি। বন্দে মাতরম্।"

৩৭

শহরের অধিকাংশ লোকে কৈলাসের উপরে ক্ষেপে গেল। ছিলি বেটা উকীলের কেরাণী, পেটে পেটে এত ছিল কে জানতো। আগে হ'লে রাধাকে বের ক'রে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠাতো, কিন্তু সোনার দেশ পত্রের "ধন্ত চটুল" সম্পাদকীয় সে পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বল্ল, সেবার এসে গোবিন্দ গোয়েন্দাকে খুন করে সরে পড়লো, জেলে গেল আমাদের নিরীহ ছেলেরা। আরে খুন করেছিস খুদিরামের মতো ফাঁসি যা, আমরা তোকে নিয়ে গর্ব করি। যাক গেল, নিশ্চিন্ত হলাম। এবারে আবার হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে নিরীহ ছেলেদের সম্মুখে জেলের দরজা খুলে দিল। আবার শুনলাম হাতে একটা পিস্তল ছিল রবিনসনের লাল মুখ দেখে হাতের পিস্তল হাতে রয়ে গেল, সাহস থাকে বাঘা যতীনের মতো পিস্তল চালা শহিদ হ, তা নয়

মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে শহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। এসব কথা যে একজন একটা উপলক্ষ্যে বলেছিল তা নয়, নানা জনের মন্তব্যকে ঘনীভূত করলে এই রকম দাঁড়ায় বটে।

আর এক ধরণের মন্তব্য ঘনীভূত করলে দাঁড়ায় এই রকম।

আর ঐ একজন আমাদের গান্ধীবাবা। সুরেন বাঁড়ুজে তিলক দেশবন্ধু যা পারলো না এবারে তিনি তাই করবেন। প্রথমে বললেন এক বছরে স্বরাজ আনবো—সেই এক বছর যখন পার হয়ে গেল বললেন, এবারে সবাই মিলে চরকা কাটো দেশ স্বাধীন হবে। আরে, এদেশে ইংরেজ আসবার আগে সবাই তো চরখা কাটতো তবে দেশ পরাধীন হ'ল কেন? একটু ভেবে দেখ্। মাথায় তো কিছু নেই, তোর আর কত বুদ্ধি হবে। এর পরে বললেন কি জানো তেমন করে তোমরা চরখায় পাক দাওনি তাই ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালালো না। আরে বুঝেছেন যে ওতে কিছু হবে না তাই এবারে ধরেছেন নুন। এই জগা খিচুড়িতে অভাব ছিল নুনের, এবারে সেটা দূর হ'ল। লোকটার হাড়ে হাড়ে শয়তানি, জানে যে তাকে কিছু বলবে না। জেল জরিমানা মার-ধোর মাথা ফাটানো ওসব হবে ও গয়রহদের উপর দিয়ে। ফাটলো কিনা মাথা অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর। আরে তুই বাপু বুড়ো হাবড়া তোর নাচন্তে নাচন্তে চ্যাংড়ার দলে ঢুকে নুন তৈরি করতে যাওয়া কেন। আবার ঢঙ করে বলা হয় লবণ সত্যাগ্রহ। নে এখন ঠেলা বোঝ। হাত বা পা সব জুটো করে, একটা গেলে আর একটা থাকে—মাথা একটা বই নয়। মেয়ে জামাইকে খরচান্তের ফেলে, যেতে হ'ল তো ছুটে কল্‌কাতায়। আর ওদিকে জেল থেকে বুড়ো বাণী দিয়েই খালাস—অবিনাশ মাস্টার কিনা "সন্ট মার্টার।"

যোটের উপরে দেখা গেল শহরে উৎপাত ঘটানোর জন্য কৈলাসের উপরে, দেশে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য গান্ধীর উপরে, স্বকীয় মাথা ফাটানোর জন্য অবিনাশ চক্রবর্তীর উপরে লোকে অত্যন্ত বিরক্ত। ইংরেজ সরকার বেনিফিট অব্ ডাউটে খালাস।

কৈলাস ধরা পড়বার তিন চার দিন পরে একদিন সকালবেলায় অরবিন্দর কাছে থেকে শচীন টেলিগ্রাম পেলো, মাস্টার মশাই মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, হাসপাতাল থেকে আমার বাসায় নিয়ে এসেছি, অবস্থা ভালোও নয় মন্দও নয়, তোমরা সকলে অবিলম্বে এসো।

শচীন টেলিগ্রামখানা রুক্মিণী ও মলিনাকে দেখালো, দুজনেই কাঁদতে সুরু করলো। শচীন বলল, এখনো কাঁদবার মতো কিছু হয়নি, দেখছ না লিখেছে

অবস্থা মন্দও নয়।

সেই সঙ্গে যে আছে ভালোও নয়।

মন্দটাই বা ধরছ কেন ? যাও এখন তৈরি হয়ে নাও, রাত দশটার গাড়ীতে রওনা হ'তে হবে।

রুক্মিণী বল্‌ল, লবকুশকে এখানে রেখে যেতে পারবো না।

না, না, ওরা সঙ্গে যাবে, ওদের দেখলে স্যার মনে শান্তি পাবেন। যাও মলিনা, তোমরা তৈরি হয়ে নাও গে।

ওরা ঘর থেকে বের হ'তে উদ্যত এমন সময়ে প্রবেশ করলো উকীল তারা চক্রবর্ত্তীর বিধবা, চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মুখে জমাট বাঁধা নীরব হাসি, আর হাতে একখানা লম্বমান সংবাদপত্র, দেখেই সকলে বুঝলো ১৮ই এপ্রিলের সোনার দেশ পত্র। যে পত্রখানা সকলেরই পরিচিত, রাধার মৃত্যুসংবাদটাও, সকলে ভয়ে ভয়ে ছিল খবরটা তার মায়ের কানে না ওঠে। সুসংবাদ হ'লে উঠ্‌তো না, কিন্তু সংসারে দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব প্রায় হয় না, হরিপদ দত্ত স্বয়ং গিয়ে পাঁচ কাহন করে বিধবার কাছে বিবৃত করে অতঃপর তার কি কর্তব্য সমঝে দিয়ে এসেছিল। হরিপদ চলে যাওয়ার পরেই সেই সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে রাধার মা, এসেছে মলিনাদের বাড়ীতে।

ওরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল, মাসিমা, বসুন বসুন, এত সকালে।

কাল রাতেই আসতাম, কিন্তু অন্ধকারে চোখে দেখতে পাইনে, তারপরে মুন্সীপালের (মিউনিসিপ্যালের) আলোতে তেজ নাই, হরিপদ বুঝিয়ে গেল সবকটা মুন্সীপালী চোর, তেল চুরি করে বিক্রি করে, ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত। হরিপদ একজন সৎ বুদ্ধিমান লোক, বলি খবরটা দেখেছ। বাবা, তোমরাই তো আমার সবচেয়ে আপন, খাওয়াতে নাওয়াতে শোয়াতে ধোয়াতে, মলিনা আর বউমা ছাড়া আমার কে আছে। তবে বাবা, এ সুখবরটা দাওনি কেন!

শচীনরা ভেবে পায় না কি উত্তর দেবে।

শেষে ঐ হরিপদ এসে দিয়ে গেল, দেবেই তো কর্তার জুনিয়ার ছিল কিনা। আরও কত কি বোঝালো।

মাসিমা একটু বসুন।

আমার কি বসবার সময় আছে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সুখবর দিতে হবে না। যত সব মুখপুড়িরা বলে বেড়ায়, রাধা আমার বেরিয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে উঁচু গলা ঐ হরিমোতি মাগীর যার দুই সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আর

আমার মেয়ে কি পুরুষের লোভে বেরিয়ে গিয়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে দেশের কাজে—এই দেখো কি লিখেছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, সেই স্বর্গতা রাধা চক্রবর্তী (উচ্চতর কণ্ঠে) দিনাজশাহী জেলার অধিবাসী। এবারে বিশ্বাস হ'ল তো। অন্যান্য শহীদ ভাইদের সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করিতেছি। বন্দে মাতরম্।

আরে চুপ করে রইলে কেন ? মাঠে ঘাটে এত বন্দে মাতরম্ হেঁকে বেড়াও আর এখন গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না, বলো বন্দে মাতরম্ বলো বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

কি কর্তব্য স্থির করতে না পেরে ওরা স্থাণুবৎ বসে রইলো আর সেই অপ্রকৃতিস্থা বিধবা ঘরময় বলে বেড়াতে লাগলো, রাধা আমার সতী মায়ের মেয়ে, রাধা আমার ঘর-জ্বালানী পর-ভোলানি নয়, রাধা আমার বুকে গুলিবিদ্ধ হইয়া শহীদ হইয়াছেন। কয়জন পারে এমন হ'তে, কয়জনের মেয়ে এমন হয়েছে, একি খানকি মেয়ের কর্ম ? রাধা আমার সতী, স্বর্গে তাহার গতি, কর সবে প্রণতি। একি ঠায় বসে রইলে যে সতী সাধ্বী শহীদের পায়ে প্রণতি করতে লজ্জা ! ছি, ছি এই দেখো আমি মা হয়ে প্রণতি করছি। এই বলে দেয়ালে সশব্দে মাথা ঠুকতে লাগলো।

মলিনা ও রুক্মিণী বাধা দিয়ে বলতে চেষ্টা করলো, বসুন মাসিমা, মাসিমা, রাধাদি স্বর্গে গিয়েছেন জানি।

জানো, তবে চুপ করে আছ কেন ? থাকো থাকো, ভালো খবর সবাই চাপা দিতে চায়, কেউ এ সংসারে আত্মীয় বন্ধু নয়। না, না বসবো না, যাই খবরটা শুনিয়ে আসি পোড়ারমুখী হরিমোতিকে যার দুই সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে গিয়ে ভবানীগঞ্জে ঘর তুলেছে।

বন্দে মাতরম—বলে ছুটতে ছুটতে বের হ'তে যাচ্ছে, মলিনা বাধা দেবার জন্যে আঁচল ধরলো, হাতের আঁচল হাতেই রইলো উলঙ্গিনী অবস্থায় ছুটে বের হয়ে গেল রাধার মা। সে এখন ঘোর উন্মাদিনী।

শচীন বল্ল, এ আর এক বিপদ। এই পাগলকে এখানে একা রেখে যাই কি ক'রে ? বাবা আসলেও না হয় হতো।

মলিনা নিজেই আগ বাড়িয়ে বল্ল, দাদা, বউদি আর লবকুশকে নিয়ে তুমি যাও, আমি একে এখানে আগলাবার জন্য থাকি।

থাকবে ভাই ? বল্ল রুক্মিণী।

না থাকলে চলবে কি করে। উন্মাদ অবস্থায় কি করে বসেন ঠিক কি, হয়তো জলে ডুবে মরবেন, নয় তো কাউকে খুন করে ফেলবেন, না দাদা আমাকে রেখে যাও।

তাই থাক বোন, তাই থাক। ওখানকার খবর নিয়মিত দেব, বাড়াবাড়ি দেখলে যেতে টেলিগ্রাম করবো।

সেই ভালো, চলো বউদি, সব গোছগাছ করা যাক।

সকলে যথাসময়ে কলিকাতা রওনা হয়ে গেল, পাগলকে ঠেকাবার উদ্দেশ্যে রয়ে গেল মলিনা। তার না যাওয়ার এই কি একমাত্র কারণ?

৩৮

ইংরাজের মতো ঘড়েল জাত বিরল। তাদের মধ্যে যারা ভালো তাদের সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। রাজনীতির উপরে তাদের প্রভাব সামান্য। ইংরেজ যদি দু'পা এগোয় পিছোয় তিন পা, এমনি ভাবে পিছোতে পিছোতে একদিন আবিষ্কার করে পিছন দিকেই ছিল তার অভীষ্ট বস্তু। ইংরেজ যখন বিষম গর্জন করে বুঝতে হবে এবারে সরু সুতো কাটার পালা আরম্ভ হবে। আর তার চরম অস্ত্র আপোষ'রফা। কখন্ কি ভাবে আপোষ করতে হবে আর আপোষটাকে জয় বলে ঘোষণা করতে হবে এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই, সহায়ক তাদের ঐতিহাসিকগণ।

ইংরেজ যখন দেখ্‌ল নুনের আগুন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে থামাবার কোন উপায় নেই, আর ওদিকে ভারতে বিলিতি কাপড়ের চালান প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে, ভোটারগণ ও তাদের দাদাদের দল চাপ দিতে লাগলো একটা কিছু করো। তখন তারা স্থির করলো রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স করতে হবে। গান্ধীকে কারারুদ্ধ রেখে একদফা রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স হ'ল—কিন্তু মীমাংসা হবে কি করে! নুনের আগুন তখনো সমান প্রজ্বলিত। কাজেই ইংরেজ তার মোক্ষম অস্ত্র আপোষের শরণাপন্ন হয়ে গান্ধীকে মুক্তি দিয়ে লবণ তৈরি সম্বন্ধে একটা জোড়া-তাড়া রকমের আপোষ করে দ্বিতীয় দফা রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স বসালো। সবাই জানতো কিছু হওয়ার নয়, সবচেয়ে বেশি জানতেন গান্ধী। কিন্তু আপোষ অস্ত্র চালনায় তিনিও কম দক্ষ নন। তারপরে এবং তার ফলে কি হ'ল সে-সব ইতিহাসের বড় কথা কিন্তু আমাদের উপন্যাসের পক্ষে ছোট কথা। তবে গোটা কতক কথায় আমাদের দরকার। হঠাৎ ইংরেজের মনটা ভারতের পাঁচকোটি অনগ্রসর অবহেলিত মানুষের জন্য হু হু করে কেঁদে

উঠ্‌ল। তারা তফশিলি জাত নামে নূতন একটা জাতিভেদের পত্তন করবার চেষ্টা করলো। হিন্দু মুসলমানে ভেদটা বেশ কায়েম করে তুলেছে, এবারে তার সঙ্গে তফশিলি জাত যুক্ত হ'লেই ভারতের ভবিষ্যতের দফা রফা। বুদ্ধিটা ভালোই বের করেছিল কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমানেরও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে থাকে। তারা গান্ধীকে বাদ দিয়ে হিসাবটা করেছিল। গান্ধীর প্রাণপণ অনশনের ফলে ইংরাজের সে মতলবটা ফেঁসে গেল—আবার হ'ল আপোষ, সেটাও এক রকম জোড়াতাড়া। এবারে গান্ধীজি নামলেন হরিজন আন্দোলনে, ১৯২০ সালের আন্দোলনের পরে যেমন নেমেছিলেন খদ্দর প্রচারে, হরিজন আন্দোলনের তাৎপর্য প্রায় সবাই ভুল বুঝলো, ভাবলো "হারিয়ে মারিয়ে কাশ্যপ গোত্র"—লবণ ছেড়ে গান্ধীবাবা এখন হরিজন হরিজন করে প্রদেশে প্রদেশে পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে যত বড়, লোক তাকে তত ভুল বোঝে, ভগবানকে ভুল বোঝে সবচেয়ে বেশি।

থি পাইনস ক্লাবের করফিল্ড, মুডি, আবেল প্রভৃতির দল বল্‌ল—ঐ পাদ্রী ভাবাপন্ন আরউইনটা গিয়েছে বাঁচা গিয়েছে, বাবা এর নাম উইলিংডন যিনি কিনা এখন বড়লাট। করফিল্ড বলল, তোমরা ঐ বুড়ো শয়তান গান্ধীকে বুঝতে পারোনি, ও লোকটা মুখে যতই অহিংসা অহিংসা বলুক না কেন হিংসাবাদীদের সঙ্গে ওর তলে তলে যোগাযোগ আছে। প্রমাণ চাও? ভারতের পশ্চিমে লবণ লবণ সত্যাগ্রহ বাধিয়ে দিয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি পশ্চিমে টানলো ঠিক তখনই দেশের পূর্বতম প্রান্তে চিটাগং-এ বাধিয়ে দিল সশস্ত্র সংগ্রাম। পুব পশ্চিম দুদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ। যোগাযোগ আর কাকে বলে।

মুডি বল্‌ল, করফিল্ড তোমার মাথাটা আজ বেশ খুলেছে।

শুধু মাথাটা নয়—এই দেখো না যে বোতলটা খুলেছি সেটা সদ্য আমদানি স্কচ হুইস্কি। আর রণনীতিতেও আমার কিছু বংশগত অধিকার আছে, আমার গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্রেট আংকল স্যার জন মুর বোনাপার্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পেনিনসুলায় গিয়েছিল—

মুডি মনে মনে বল্‌ল, হাঁ, তাড়াটাও দিব্যি খেয়ে হজম করেছিল।

আবেল এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিল এবারে বল্‌ল, ঐ যে ক্ষুদ্রাশয় বুড়োটা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে "শেডিউল্ড" কাস্টদের ক্ষেপিয়ে তুলছে এটা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

নিশ্চয় দেবে তুমি জেনো, বাবা এর নাম উইলিংডন। মাদ্রাজ বোম্বাইয়ে লাটগিরি করে হাত পাকিয়েছে। এখন বড়লাট। এ গান্ধীর ইনার ভয়েসের ধার ধারে না। বেগতিক দেখলেই ক্ষুদে শয়তানটা ইনার ভয়েসের দোহাই পাড়ে। লোকটার মধ্যযুগে জন্মানো উচিত ছিল।

করফিল্ড বল্‌ল, ভারতে তো এখনো তো চলছে মধ্যযুগ। যদি আমাদের বিদায় নিতে হয়, যা আমি মুহূর্তের জন্ত বিশ্বাস করি না, দেখো আবার নেমে আসবে ডার্ক এজ—Dark age !

Phew ! বলে মুডি একটা স্কচ খুললো। তরল অগ্নিময় স্কচ অন্ধকার যুগের উত্তম প্রতিষেধক।

থ্রি পাইনস ক্লাবের পাশটি ঘর অল বেঙ্গল লোন আফিস। আজকাল সদস্যের অভাবে ম্রিয়মাণ, তিন-চার জনের বেশি কেউ আসে না।

ফৌজদার বল্‌ল, এখন তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ উপস্থিত নেই, হরিপদ তোমাকে একটা কথা বলি, শেষে তারা চক্রবর্তীর বিধবার টাকাগুলো হাতালে !

হরিপদ দুই হাতে কান ঢেকে বল্‌ল, এমন কথা শোনাও পাপ—কেউ আপনাকে মিথ্যা খবর দিয়েছে।

দেখো হরিপদ যে আমাকে খবর দিয়েছে তাকে তুমিও চেনো আমিও চিনি। কাজটা ভালো করনি।

ব্যাঙ্কের বিনোদ চক্রবর্তী দিয়েছে না বললেও জানতাম, কিন্তু যে কথাটা আপনাকে জানায়নি সেটি হচ্ছে টাকা তার নামেই আছে, কেবল টাকা তোলবার ভারটা আমাকে দিয়েছে।

তবে আর বাকি রইলো কি।

সবটাই বাকি রইলো। আমি শুধু চিনির বলদ।

এরপরে তুলোর বলদ হ'তে হবে মনে থাকে যেন।

দেখুন দাদা, মহিলাটি মেয়ের শোকে পাগল, ছ্যাঁচড় লোকের তো অভাব নেই। পাছে ভোগা দিয়ে টাকা তুলে নেয় তাই এই গুরুদায়িত্বটা মাথা পেতে নিলাম। প্রতিবেশীর একটা কর্তব্য আছে তো!

সেই কর্তব্য স্মরণ করেই সেই বুড়ীকে তোমার বাড়ীতে এনে তুলেছ, কি বলো।

দাদা, আপনি সব কথারই শুধু অর্ধেকটা জানেন। তাকে বাড়ীতে এনে

তুলেছি জানেন, কেন তুলেছি জানেন না।

সেটা কি শুনি।

এতদিন তার দেখা শোনা করছিল রায় মশায়ের মেয়ে মলিনা। পরশু দিন সে কল্‌কাতা গিয়েছে অবিনাশবাবুর বাড়াবাড়ি সংবাদ পেয়ে। এখন ঐ পাগলি বুড়ী একলা বাড়ীতে থাকলেই কি ভালো হ'তো!

তার ভালো হ'তো কিনা জানি না, তবে তোমার নিশ্চয় হ'তো না।

তারপরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল, যাক, একসঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দু-ই জুটে গেল। ভাগ্য, ভাগ্য, যার জুটে যায় এমনি করেই জোটে।

হরিপদ কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে বীরেন চৌধুরী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলো।

বীরেন ব্যস্ত যেন—ওখানা তোমার হাতে কি।

ফৌজদারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বীরেন জানালো, দাদা, এই মাত্র টেলিগ্রাম এলো—অবিনাশবাবু গত হয়েছেন।

অবিনাশবাবু গত হয়েছেন—বলো কি!

আজ্ঞে হাঁ।

'অবিনাশবাবু গত হয়েছেন'—এই বাক্যটা ফৌজদার তিন-চারবার উচ্চারণ করলো, বোধকরি নিজের বয়সের কথা স্মরণ করে। প্রত্যেক বৃদ্ধের মৃত্যু অপর বৃদ্ধকে তার বয়স স্মরণ করিয়ে দেয়।

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে হরিপদ বল্‌ল—দাদা আমি আসি।

হরিপদ সেগুড়ে বালি, অবিনাশ চক্রবর্তী তোমার মতো লোকের জন্য কি পয়সাও রেখে যায়নি।

হরিপদ চলে গেলে ফৌজদার বল্‌ল, বড় খাঁটি লোক ছিলেন।

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল না, তাই দেয়াল ঘড়িটা ঠিক ঠিক ঠিক বলে সমর্থন ক'রে চলল।

৩৯

শচীনের জরুরি তার পেয়ে মলিনা ভোর বেলায় শেয়ালদ স্টেশনে নেমে দেখতে পেলো পিতা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

প্রণাম করে বল্‌ল, বাবা, তুমি যে!

একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিস তাই না? হওয়ারই কথা। আমি নিজে

জানতাম না। আলিপুর জেলের বাইরে এসে দেখলাম শচীন আর অরবিন্দ অপেক্ষা করছে। চল্ এখন যেতে যেতে সব শুনবি। কাছেই বাসা, হেঁটে যাবি না গাড়ী করবো ?

না এইটুকু পথ তো, আবার গাড়ী কেন।

সেই ভালো। ওরা এখন গুদাম সাবাড় করে সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তুমি তো স্যারের কথা একবারও বলছ না, ভালো আছেন তো ?

আরে বুড়ো মানুষের ভালো আর মন্দ, কোন রকমে কাটলেই হ'ল।

বাড়াবাড়ি হয়েছিল।

এখনো বাড়াবাড়িই আছে, আমিই শচীনকে বললাম, মলিকে জানিয়ে দে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে পিতাপুত্রী মুসলমানপাড়া লেনের বাসায় এসে পৌছলো, দরজাতেই দেখা হ'ল অরবিন্দর সঙ্গে।

মলিনা জিজ্ঞাসা করলে, স্যার কেমন আছেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন—চলুন ভিতরে।

সেদিনের পরে অরবিন্দের ধারণা হয়েছিল যদিবা ঘটনাচক্রে মলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথা নিশ্চয় হবে না দুজনের মধ্যে। আজ প্রথমেই একসঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথা। তার মনের মরচে পড়া তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। মনে হ'ল অবিনাশবাবু গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলো বলেই তো এমনটি সম্ভব হ'ল। স্বার্থ-পরতা ও প্রেম এক নৌকার যাত্রী।

দোতালার ঘরে পালঙ্কের উপরে অবিনাশবাবুর শয্যালগ্ন অসাড় আচ্ছন্ন দেহ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ তার উপরে বরফের থলি। মাথার কাছে উপবিষ্ট রুক্মিণী। শয্যার দু'পাশে দণ্ডায়মান লব ও কুশ।

অরবিন্দর মা মলিনাকে বললেন, অবিনাশবাবুর মতো এমন নাতি-ভাগ্য যেন সকলের হয়, ঐ অতটুকু ছেলে দিন রাত এক করে দিয়ে খাটছে !

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন যজ্ঞেশবাবু, বললেন, ওদের শিক্ষা কোথায় আর কার কাছে ভেবে দেখুন—এ রকম না হ'লেই তো ভাবনার কথা ছিল।

তোমরা যাও বাছা খেয়ে এসো, অনেক বেলা হ'ল।

না দিদিমা, বেলা এমন কিছু হয়নি, আর তা ছাড়া এখন দাদুর মুখ ধোয়াতে হবে।

সে জন্য তোর মা আছে।

না, মা তো হরলিক্স খাওয়াবেন।

মুখটাও না হয় ধোয়ালেন।

না দাছু, যার উপরে যে ভার। উল্টোপাল্টা হ'লে বাপুজি বিষম রাগ করেন।

এবারে শুনলেন তো—যজ্ঞেশবাবুর কথার লক্ষ্য অরবিন্দর মা।

তা যা বললেন রায় মশায়, ওদের মুখে বাপুজির প্রশংসার খই ফুটছে, একটু কামাই নেই।

এমন সময়ে অবিনাশবাবুর তন্দ্রা কেটে গেল, তাকালেন, তাকিয়েই দেখতে পেলেন মেয়েকে, খুশি ফুটে উঠল্ চোখে।

বাবা, একটু হরলিকস্ খাও।

আর কত হরলিকস্ খাওয়াবি মা, তার চেয়ে একটু গঙ্গাজল খাওয়া।

ব্যথিত কণ্ঠে মেয়ে বল্ল, ওকি বলছ বাবা!

অন্যায় কিছু বলিনি মা, কল্‌কাতায় গঙ্গাজল ছাড়া আর কি পাবি?

মা, তার আগে দাদুর মুখটা ধুইয়ে দি।

আরে তোরা মুখ ধুয়েছিস তো?

কখন!

খেয়েছিস কিছু?

এবারে খাবো।

তা হবে না, আগে তোরা খেয়ে আয়, তারপরে তোদের হাতে খাবো।

আমাদের হাতে তো খাবে না, খাবে মেয়ের হাতে।

আমার মতো মেয়ে কার আছে!

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে রুক্মিণী বল্ল, বাবা, ঐ যে পায়ের কাছে মলিনা, আজ ভোরে এসেছে।

এসো মা বলে হাতটা তার মাথায় ঠেকাতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, মলিনা মাথা নত হয়ে হাতখানা মাথায় গ্রহণ করলো।

আমি ভাবতে পারিনি তুই আসবি।

আমি তো গোড়াতেই আসতে চেয়েছিলাম, রাধার মাকে সামলাবার জন্যে থেকে গেলাম।

এখন কেমন আছেন?

পাগলের আবার থাকা না থাকা।

তবু কার কাছে রইলেন?

উকীল হরিপদবাবুর কাছে।

হাঁ হাঁ, লোকটি ভালো বলে শুনেছি।

অবিনাশবাবুর চোখে কোন মানুষ খারাপ নয়।

অবিনাশবাবুর মন্তব্যে হরিপদকে যারা জানতো তারা হাসতো, কিন্তু এখন হাসির সময় নয়।

দুপুরবেলা অবিনাশবাবু নিদ্রাচ্ছন্ন হ'লে নীচের তলার ঘরে সকলে বসে কথা বলছিল, বিষয় অবিনাশবাবু কিভাবে কি অবস্থায় কলকাতায় এলেন। শচীনরা সকলেই বিবরণটা অরবিন্দর মুখে আগে শুনেছে, এখন যজ্ঞেশবাবু ও মলিনাকে জানাবার জন্যে পুনরায় বিবৃত হচ্ছিল, বক্তা অরবিন্দ। সে বলছিল, সকালবেলা উঠেই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংবাদপত্র খতিয়ে দেখা, মহিষবাথানের সংবাদ পাওয়া যায় কিনা। প্রায়ই কিছু থাকতো না, কারণ সরকারী ইঙ্গিতে ওসব খবর চেপে যেতো। তারপরে বের হ'তাম গোলদীঘিতে, সিনেট হাউসের দেয়ালে, বসন্ত কেবিনের আশেপাশে সাইক্লোস্টাইল পত্রের সন্ধানে, ভোর রাতে কারা এসে সেঁটে দিয়ে যায়। ছাপা সংবাদপত্রের অভাব তারা পূরিয়ে দিত, সে-সব খবর এমনই বীরত্বব্যঞ্জক যে প্রায় অবিশ্বাস্য। ওরই মধ্যে ক'দিন আগে মেডিকেল কলেজের গেটে সংলগ্ন এক পত্রে দেখতে পেলাম মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহে শহীদ অশীতিপর বৃদ্ধ আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী মাথায় দারুন লাঠির আঘাতে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাম্পবেল হাসপাতালে আনীত। বাকিটা পড়বার জন্যে আর অপেক্ষা না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম ক্যাম্পবেল হাসপাতালে। বেশি খুঁজতে হ'ল না। একজন যুবক ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো, কাকে খুঁজছেন? জানালে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি তার ছাত্র?

হাঁ, আমি তার ছাত্র। জানলেন কি করে?

যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে আমি তাঁর ছাত্র। আর অত কথায় কাজ কি—আমি নিজেই তাঁর একজন ছাত্র।

তারপরে বলল, আপনি যদি এখানে বাসা করে থাকেন তবে স্যারকে সেখানে নিয়ে যান এখানে চিকিৎসা হয় না। রুগী আসে, গিনতি হয়, তার পরে হয় এসপার নয় ওসপার।

কথা আর বাড়ালাম না, রিস্ক বণ্ড সই করে দিয়ে স্যারকে নিয়ে চলে এলাম। সেই ডাক্তারটি বলল, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে যান, রুগীর অবস্থা খুব ভালো নয়, তারপরে বয়সটাও আশী।

রুক্মিনী বল্‌ল, বাবার বয়স তো আশী নয়।

আরে আশী কোথায়! আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। বুঝলে না মা, ওগুলো হচ্ছে সংবাদপত্রের পরিভাষায় সত্য। যাক, তারপরে কি করলে?

আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হ'ল না, নার্সটি বেশ দক্ষ আর স্বভাবতই আহত সত্যাগ্রহীর প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ, ব্যবস্থা সব তিনি করলেন।

স্যারকে বাসায় রেখে কলেজে গেলাম। আমার অবস্থা শুনে কলেজের প্রিন্সিপাল বললেন তোমার এখন কলেজে আসবার প্রয়োজন নেই, আপনি অবিনাশ বাবুকে সারিয়ে তুলুন।

ছুটি নিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময়ে হেড ক্লার্ক বল্‌লো, ওহে অরবিন্দ, টাকা নিয়ে যাও।

কিসের টাকা? মাইনে তো নিয়ে গিয়েছি।

আরে মাইনে কে বলচে, রোগীর ট্রিটমেণ্ট খরচ।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হওয়ায় চুপ করে রইলাম। কি বলবো ভেবে পাইনে।

ওদিকে আমাদের হেড ক্লার্কটি একটু রঙ্গদার আবার ছড়াদারও বটে।

ছড়াদার কি হে!

আজ্ঞে মুখে মুখে ছড়া কাটে। আমার নীরবতা দেখে বলে উঠ্‌ল, কলেজের নাম বঙ্গবাসী, শিক্ষা ক্ষেত্রের গয়া কাশী, পাই একশ লিখি আশী, পাতের টাকা হয় না বাসি। ওহে ছোকরা, সুযোগ পাচ্ছ নিয়ে নাও।

দরকার হলেই নেবো।

এ যে বেক্কার মতো কথা বলছ, যাও সিটি কলেজে গিয়ে ভর্তি হওগে। পরম কারুণিক টাকা জোগায় না হে, জোগায় এই বঙ্গবাসী কলেজে। আচ্ছা দরকার হলে এসো। আমার উপরে সরকারী খোলা হুকুম আছে, সত্যাগ্রহীদের দরকার হলে টাকা দেবে।

সরকারের হুকুম, সে আবার কি রকম?

ও বুঝতে পারছ না, এ তোমাদের বাংলা সরকার নয়, আমাদের বঙ্গবাসী সরকার। আচ্ছা যাও এখন।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, এটাই আশার কথা, চারদিকে সহানুভূতি, আর মমতা।

বিকাল বেলা চার-পাঁচ জন ডাক্তার এসে হাজির, বল্‌ল, তারা সবাই মাস্টার মশায়ের ছাত্র, এক রোগীর উপরে চারজন গিয়ে পড়লো। বেচারা নার্স সামলাতে পারে না আর কি।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, নার্স মেয়েটি লক্ষ্মী, কোন কাজ বলে দিতে হয় না।

রুক্মিণী বল্‌ল, হাঁ বাবা, আর স্বভাবটাও মিষ্টি।

আর তারপরে সারারাত জেগে থাকতে হয়।

অরবিন্দ বল্‌ল, না সারারাত জাগাতে দিই না, ওর অসুখ হয়ে পড়লে আমি যে বিপাকে পড়বো। ঘরে দুটো আরাম-কেদারা আছে পালা ক'রে ঘুমিয়ে নিই।

নার্সের প্রসঙ্গটা মলিনার ভালো লাগেনি, তারপরে যখন প্রশংসা সুরু হল তার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠ্‌ল। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই দেখা নার্সটির সঙ্গে।

দিদি চললেন কোথায়, আপনাদের জন্যে চা নিয়ে যাচ্ছি যে।

তার হাতে প্রশস্ত ট্রের উপরে চায়ের পেয়ালা।

আপনি তো সেবা করেন রুগীর!

দরকার হলে রুগীর আত্মীয়স্বজনেরও সেবা করতে হয়।

এক feeতে দুটো কাজ।

Feeটাই কি সব দিদি, এই যে আপনাদের সেবা করতে পারছি এর কি মূল্য নেই?

সে মূল্য দেয় কে?

মূল্য কেউ দেয় না, নিতে হয়। চলুন ভিতরে, এতগুলো পেয়ালার ভারে হাত ভেরে গেল।

নার্সটির কথায় ও ব্যবহারে মলিনাকে হটতে হ'ল। কাজেই ভিতরে গিয়ে একটি পেয়ালা তুলে নিতে হ'ল তাকে।

ওকি, তোমার চা কই শুভ্রা? জিজ্ঞাসা করলো অরবিন্দ।

মলিনার মনে হ'ল নার্সকে স্বনামে ডাকা বিধি-বহির্ভূত অশিষ্টতা। নার্স নামধেয় মেয়েদের জন্যে এক সাপটা নার্স নামটাই যথেষ্ট, বয়স কিছু বেশি হলে সিস্টার অবধি চলতে পারে। এর যে বয়স তাতে—

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো, মলি, চায়ে চিনি কম হয়েছে নাকি?

কম কেন হবে বউদি, আমি সব কাপে সমান দিয়েছি।

মলিনা মনে মনে বলে, কোন কোন কাপে কিছু বেশি।

চা গিলতে গিলতে মলিনা ভাবে, নামটি আবার শুভ্রা! কিন্তু তখনি মনে পড়ে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন পরিহাস এ ক্ষেত্রে অচল, রঙটি সত্যই শুভ্র। তার উপরে মনে হ'ল অরবিন্দর মুখে শুভ্রা নামটা যেন নূতন একটা মাত্রা লাভ

করে। আরও বিপদ এই যে এই তরুণী নার্সটি ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছে মায় লবকুশ অবধির। তারা ডাকে নার্স মাসি। এ যে চার দিকে বেড়া আগুন, মলিনা এমন একটি অস্বস্তি বোধ করে যার অনুরূপ আর কখনো করেনি।

সন্ধ্যার দিকে তিন-চার জন ডাক্তার এসে অবিনাশবাবুকে দেখে, কলেজের সকলেই অবিনাশবাবুর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র, তাঁরা এক বাক্যে আশ্বাস দিয়ে গেলেন : আর ভয় নেই, রুগী ভয়ের সীমানা কাটিয়ে উঠেছেন। ডাক্তারেরা চলে যেতেই রুক্মিণীকে নিভৃতে ডেকে শুভ্রা জানালো, বউদি, ডাক্তারবাবুরা যাই বলুন আমার কেমন ভালো লাগছে না।

রুক্মিণী ভয়ে পেয়ে গিয়ে শচীনকে জানালো।

কথাটা মলিনার কানে আসতেই সে বল্‌ল, দাদা তোমরা মিছা ভয় পাচ্ছ, ডাক্তারের উপরে নার্সের কথা। উনি নিজের মূল্য বাড়াবার জন্যে বলছেন।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল অরবিন্দ, বল্‌ল, দাদা, শুভ্রাকে তো তেমন দেমাকী মেয়ে বলে মনে হয় না। অনেক রকম রুগী দেখতে উনি অভ্যস্ত, আমার মনে হয় একজন প্রবীণ ডাক্তার এনে দেখানো ভালো।

শচীন বল্‌ল, তোমার কথা মন্দ নয় এরা সবাই নতুন পাশ করা ডাক্তার, সব সময়ে ভালো মন্দ বোঝে না।

কিঞ্চিৎ ঝাঁঝের সঙ্গে মলিনা বল্‌ল, তবু তো পাশ করা—আর নার্সরা তো কেবল ব্যাণ্ডেজ বাঁধে আর আইডোফর্ম লাগাতে শেখে।

তা নয় মলিনা, ডাক্তারদের দেখায় আর ওঁর দেখায় তফাৎ আছে। ডাক্তাররা দেখে গেলেন রুগী, আর শুভ্রা দেখলেন আত্মীয়।

আত্মীয় শুনে মলিনার গা জ্বলে গেল। আত্মীয়! কোথাকার কোন্ গলি থেকে কুড়িয়ে আনা নার্স, সে হল কিনা অবিনাশবাবুর আত্মীয়, যে অবিনাশবাবুকে সারা বাংলাদেশ মান্য করে।

তোমরা যা ভালো বোঝো করো।

অবশেষে রুক্মিণীর কাঁদো কাঁদো মুখের জয় হল। যজ্ঞেশবাবু সমস্ত শুনে বললেন, বেশ তো, একজন প্রবীণ ডাক্তার এনে দেখাও না। এই তো বৈঠকখানা রোডে ডাক্তার ধর আছেন, প্রবীণ আর আমার পরিচিত।

ডাক্তার ধর এসে রুগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মেপে, নাড়ীর গতি লক্ষ্য করে যজ্ঞেশবাবুকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল, রায় মশায় আমি তো খুব

ভালো বুঝিনে, এখনি বিপদ হবে অবস্থা তেমন নয়, তবে বিপদের সীমানা এখনো কাটেনি রুগীর। না, না, ওষুধপত্র বদলের প্রয়োজন নাই। ওষুধের চেয়ে সেবার প্রয়োজন এখন বেশি। অষ্টপ্রহর রুগীকে এমন চোখের উপরে রাখতে হবে, আর হরলিক্স, বেদানার রস, গ্লুকোজ জল অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে।

এমন সময়ে শুভ্রা এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতেই ডাক্তার ধর বলে উঠলো, আরে তোমাকে পেয়েছে দেখছি, আর ভয় নেই। রায় মশায়, মিস চৌধুরী এ অঞ্চলের সব নার্সের মধ্যে সেরা। যে কঠিন রুগীর বাড়ীতে যাই, ওকে দেখতে পাই। আপনারা খুব ভালো লোক পেয়েছেন।

মলিনা অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছিল আর জ্বলে মরছিল। একে তো প্রবীণ ডাক্তার এসে তার আশঙ্কাকে সমর্থন করে গেল, তার পরে আবার সেবার প্রশংসা।

ডাক্তার চলে গেলে মলিনা বল্‌ল, দাদা, অরবিন্দবাবু পর পর অনেক ক' রাত রুগী নিয়ে জেগেছেন, ওঁকে আজ বিশ্রাম করতে দিন।

এ কথা মন্দ বলোনি মলিনা।

শুভ্রা কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌ল, কিন্তু কয়েক রাত রুগীকে দেখবার ফলে উনি তাঁর ইসারা ইঙ্গিত বুঝতে শিখেছেন, এখন নূতন লোক এলে—

না, না তা ঠিক হবে না মলিনা, বিশেষ ডাক্তারের কথা তো শুনলে।

বেশ তবে ওঁরা দুজন থাকুন, অতিরিক্তর মধ্যে আমিও থাকি না কেন।

তাতে আর আপত্তি কি শুভ্রা?

আজ্ঞে আপত্তি হবে কেন, তবে রুগী নিয়ে রাত জাগার কষ্ট আছে।

না এমন কিছু কষ্ট হবে না।

আসল কথা সে রুগীর ঘরে পাহারা বসাতে চায়। অরবিন্দ ও নার্সের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আর না বাড়ে। রুক্মিণী যেন এতক্ষণে কিছু কিছু বুঝতে পারছে, স্বাভাবিক সময় হ'লে অনেক আগেই বুঝতে পারতো। কিন্তু এ সময়ে এসব সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের খেলা অনুধাবন করবার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তার পিতার জীবন-সঙ্কট পীড়া।

পরদিন সকাল বেলায় দেখা গেল অবিনাশবাবুর আচ্ছন্ন ভাব সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে, চোখ স্বচ্ছ, কথায় জড়তা নেই, সকলেরই মন খুশি, তবে বোধহয় সেরে উঠলেন।

মলিনা বল্‌ল, বউদি, দেখলে তো তোমাদের প্রবীণ ডাক্তার ও তরুণী

নার্সের ভবিষ্যদ্বাণী। আসলে কি জানো বউদি, সকলেই নিজ নিজ কদর বাড়িয়ে দেখাতে চায়।

মলিনা, ডাক্তার ধর প্রবীণ আর প্রসিদ্ধ ডাক্তার, ওঁর কদর অনেক দিন স্থির হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তরুণীটির—যার প্রশংসা তোমাদের মুখে ধরে না।

ভাই, এ রকম ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হলেই তো আনন্দ।

তাই তো করতে এলাম তোমার কাছে।

তোমার দাদা কি বলেন?

তাঁরা সবাই স্যার এর সঙ্গে কথা বলছেন।

অবিনাশবাবু বললেন, শুভ্রা দিদি, পিঠের দিকে গোটাকতক বালিশ দিয়ে আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে পারো।

সেটি হবে না দাদু, কথা যত খুশি বলতে পারেন উঠে বসা চলবে না।

দেখেছেন রায় মশায়, আজকালকার মেয়েদের দাপট।

দাদু, আজকালকার বুড়োদের দাপটও কিছু কম নয়। এই এক বুড়োকে শায়েস্তা করতে বাঙালী পল্টন, গুর্খা পল্টন হার মেনে গেল শেষে কিনা ডাকতে হ'ল পাঠান পল্টন। আর এক বুড়ো ভারত সরকারকে তুর্কী নাচন নাচাচ্ছে, তাদের কাছে এ কালের ছোঁড়া ছুড়িরা নিতান্ত নাবালক।

শুনলেন তো রায় মশায়।

শুনবো কেন, দেখতেই পাচ্ছি।

রায় মশায়, আমার মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল, মলিনা দিদির বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না।

এতে আর দুঃখের কি আছে। সেরে উঠুন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবেন, আমি তো পারলাম না।

আমিও যে পারতাম এমন মনে হয় না, তবে সেরে উঠবার সম্ভাবনা আর নেই।

সে কি! ডাক্তারে অভয় দিয়ে গেল।

ডাক্তারে যখন অভয় দেয় আর বাঘে যখন ধান খায় সত্যি তখন দুঃসময়।

ডাক্তারের কথা না হয় ছেড়ে দিন, অনেকদিন পরে আজ স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারছেন।

অনেকদিন আর কথা বলতে পারবো না সেই জন্যেই যা কিছু বলবার বলে

নিচ্ছি। আর কথা এই একটাই, মলিনার বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না। আর একটা দুর্ভাবনা ছিল দেশ নিয়ে, তবে তা এখন যোগ্যতম হাতে পড়েছে।

শচীন এতক্ষন চুপ করে শুনছিল, এবার বল্‌ল, মলিনার বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা বাবা করেছেন, কখনো ঘটনাচক্রে কখনো ওর অনিচ্ছায় বিয়ে হয়ে ওঠেনি। বলে সকলকেই বিয়ে করতে হবে এমন কি কথা আছে।

না এমন কোন বাঁধাধরা কথা নেই, তবে মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা জীবন-যাপনের প্রশস্ত পথ।

শচীনের মুখে শুভ্রার নামটা প্রায় এসেছিল, সেটা চেপে দিয়ে সাধারণ ভাবে বল্‌ল, কেন অনেক নার্স আছেন তাঁরা তো বিয়ে করেন না।

করেন না একথা সত্যি নয়, করতে বাধা নেই, বেশির ভাগই করেন। আর তা ছাড়া তাঁরা আছেন একটা মিশন নিয়ে।

আলোচনাটা তাকে নিয়ে গড়িয়েছে দেখে শুভ্রা বাইরে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ফল আর ওষুধ নিয়ে ঢুকলো অরবিন্দ। শুভ্রাকে যেতে দেখে বল্‌ল, ফল আর ওষুধগুলো নিয়ে যাও। আড়ালে বোধ করি দাঁড়িয়ে ছিল মলিনা, বল্‌ল, আমাকে দিন।

আপনি ফলগুলো নিন, শুভ্রা না হ'লে ওষুধগুলো গোলমাল করে ফেলবেন।

আমরাও ওষুধ খাইয়ে থাকি, বলে ওষুধের প্যাকেটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল মলিনা।

শুভ্রা বুঝতে পারে না মলিনার বিরক্তির কারণ, অরবিন্দও অবাক হয়ে যায়।

বিকালের দিকে শুভ্রার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল, দাদাবাবু, একবার উপরে আসুন।

অরবিন্দকে 'দাদাবাবু' আর শচীনকে 'দাদা' বলে শুভ্রা।

তার কণ্ঠস্বরে সঙ্কটের আভাস ছিল। কাজেই শুধু অরবিন্দ নয়, শচীন মলিনা রুক্মিণীও ছুটে উপরে রুগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দেখ্‌ল থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্রা।

কি ব্যাপার ?

নীরবে এগিয়ে দিল থার্মোমিটার।

অরবিন্দ দেখ্‌ল তাপাঙ্ক স্বাভাবিকের নীচে, গা ঘামছে, চোখ নিস্তেজ, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন। সকলেই বুঝলো অবস্থা অতিশয় খারাপ, কেবল এক

রুক্মিণী ছাড়া, ততক্ষণে যজ্ঞেশবাবু ও অরবিন্দর মা ঘরে এসে ঢুকেছেন। ডাক্তার এলো, যথাসাধ্য করলো, কিন্তু যা হওয়ার নয় তা হ'ল না। মোহানায় এসে নদীর ধারা যেমন বিশেষ কোন চিহ্ন না রেখে নিঃশব্দে মিশে যায় সমুদ্রে, তেমনি ভাবে অবিনাশবাবুর চৈতন্য মহাচৈতন্যে বিলীন হয়ে গেল, ডাক্তার ও নার্স ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলো না যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার চলে যেতে উদ্যত হ'লে, অরবিন্দ বল্‌ল, চললেন যে—

আর তো কিছু করবার নেই।

একটা ইনজেকসন বা আর কিছু—ডাক্তার জবাব না দিয়ে বের হয়ে গেল।

নার্স ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছতে লাগলো।

তবে কি বাবা নেই! বলে ডুকরে কেঁদে উঠে বুকের উপরে লুটিয়ে পড়লো রুক্মিণী। লব কুশ বুঝতে পারলো না কি ঘটে গেল, মৃত্যুর সঙ্গে এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

যজ্ঞেশবাবু বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না, শুধু তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল—যাওয়ার কথা তো আগে আমার—

এক ঘণ্টার মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো আর দেখতে দেখতে বাড়ী ও গলি লোকে ভর্তি হয়ে গেল। অধিকাংশই অবিনাশবাবুর ছাত্র, ছাত্রের ছাত্র, তার ছাত্র, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী, বাংলা সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ক্যামেরা সহ উপস্থিত হ'তে ভোলেনি। ফুলে সাজানো পালঙ্কে শায়িত তাঁর দেহ কাঁধে কাঁধে চল্‌ল, মুখে গম্ভীর রঘুপতি রাঘব রাজারাম গুঞ্জন। বাড়ীর পুরুষ সকলে সঙ্গে গেল। এমন কি যজ্ঞেশবাবুও নিষেধ মানলেন না। রুক্মিণীকে কিছুতেই পিতার শূন্য শয্যা থেকে সরানো সম্ভব হ'ল না, ওই তার কাছে পিতার শেষ স্পর্শ।

বাইরের বারান্দার এক কোণায় চেয়ারে বসে কাঁদছিল শুভ্রা। মলিনা শুধালো, আপনি কাঁদছেন কেন, উনি তো আপনার কেউ হ'তেন না, দুদিন আগেও ওঁকে জানতেন না।

শুভ্রা বল্‌ল, দিদি, আমরা পয়সার বদলে সেবা করি, কিন্তু আমরাও মানুষ, দুদিন আগেও যাঁকে জানতাম না তিনি চিরদিনের জন্য আপন হয়ে যায়।

এ তো আপনাদের ব্যবসা।

ব্যবসা ছাড়া আর কি বলবো দিদি, পয়সা যখন নিই। রুগী সেরে উঠুক আর যাই হোক আমাদের কেউ মনে রাখে না, আমরা কিন্তু ভুলতে পারি না। তা ছাড়া আরও কিছু আছে—

আবার কি ?

মাস খানেক আগে কাঁথির সমুদ্রতীরে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে মাথায় আহত হয়ে ঠিক এই ভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছেন আমার এক ভাই।

এবার আর তার চোখ থেকে রুমাল নামলো না, মলিনারও চোখ ভিজে উঠেছিল।

রুক্মিণী শুধালো, আর ভাই আছেন ?

সবচেয়ে যিনি বড় ছিলেন তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী দলে—

তারপরে ?

তারপরের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না দিদি, তখন আমার বয়স খুব অল্প—এই বলে রুমালখানা আরও জোরে চেপে ধরলো চোখের উপরে।

মলিনার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, বুঝলো রুমাল নামালেই দেখতে পাবে শুভ্রা, তাই সে পালালো।

রুক্মিণী বল্‌ল, বাবার কাছে শুনেছি স্বদেশী আমলে বাঙালী মাত্রেই বিপ্লবী ছিল, কেউ কাজে কেউ মনে মনে। বুঝেছি তিনি কাজে ছিলেন, না আর কিছু জিজ্ঞাসা করবো না ভাই, তবে দুঃখ করো না ভাই, এ হচ্ছে সে যুগের বাঙালীর বিধিলিপি।

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে নীচে থেকে কানে শব্দ এলো—টেলিগেরাম—

টেলিগ্রাম আবার কে করলো ভেবে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

শুভ্রার চোখে তখনো রুমাল চাপা।

৪০

বীরেন চৌধুরীর জরুরি তার পেয়ে যজ্ঞেশবাবুরা সকলে চলে এলেন, চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা সম্পন্ন করবার জন্যে দিন চারেক মাত্র বিলম্ব হয়ে'ছল কল্‌কাতায়। তাঁরা আসবেন শুনে অরবিন্দর মা অনুরোধ করলেন, রায় মশায়, আর কয়দিন থেকে গেলে হ'তো না।

দিদি সে ইচ্ছা আমারও ছিল, আশা হয়েছিল আপনার কাছে কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারবে।

তবে এত তাড়া করছেন কেন ?

তাড়া করেছে ভূতে দিদি ভূতে। সব কথা খুলে বললে বুঝতে পারতেন, তবে সে-সব আপনার ভালো লাগবে না। তা ছাড়া বীরেন আর একটি কাজ

করে বসেছে যে জন্তে রওনা না হয়ে উপায় নেই। অবিনাশবাবুর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে রবিবারে জনসভা ডেকে বসে আছে। আজ শুক্রবার এ থেকেই বুঝতে পারছেন রওনা না হয়ে উপায় নেই।

সেদিন রাত্রে যজ্ঞেশবাবু সপরিবারে দিনাজশাহী রওনা হলেন।

অরবিন্দর মায়ের কাছে শুনেছিল যে শুভ্রা আরও হু'চার দিন বাড়ীতে থাকবে। হঠাৎ মলিনার অর্থনৈতিক চেতনা তৎপর হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌ল, অরবিন্দবাবুর এত খরচ গেল, আবার কেন নার্স রেখে খরচ বাড়ানো।

এই নিরীহ প্রশ্নের উত্তরে যে দুটি তথ্য সে অবগত হ'ল, তা প্রায় হতচৈতন্ত করে ফেলবার মতো।

না, মা, ও মেয়ে লক্ষ্মী, রুগী সত্যাগ্রহী জানবার পরে ও ফিস্ নিতে অসম্মত হয়েছে। অরবিন্দ কত বুঝিয়েছে, বলেছে, আপনার চলবে কি করে। তা ও কি বলে জানো মা, বলে, কেন এই তো বেশ চলে যাচ্ছে, এখানে থাকছি খাচ্ছি চলার আর বাকি কি। অরবিন্দ যখন আরও পীড়াপীড়ি করলো, বল্‌ল, দাদা, এই সত্যাগ্রহ করতে গিয়েই মাস খানেক আগে আমার ভাই মারা গেল, খবর পেয়েছি কেউ তার সেবা করেনি। মনে করুন না দাদা, আমি সেই অসেবিত ভায়ের হয়ে সেবা করলাম অবিনাশবাবুকে। অরবিন্দ শুনে বল্‌ল, না এর পরে আর কথা নেই।

তখন আমি বললাম, মা, তুমি এখানে দু' চার দিন বিশ্রাম করে যাও, কেবলি তো পায়ের উপরে ছিলে—এবারে একটু বসে জিরিয়ে নাও।

সর্ব্বনাশ!

কিন্তু মা, ওকে যে রাখলেন সে কয়দিন তো উনি রোজগার করতে পারতেন।

মা, বয়স হ'লে বুঝবে সবাই রোজগারের কথা ভাবে না।

মলিনাকে রওনা হ'তেই হল, কিন্তু মনের মধ্যে চোরকাঁটার মতো যত্র তত্র বিঁধতে লাগলো শুভ্রার চিন্তা। শুভ্রা রয়ে গেল। এখন আর অরবিন্দর সঙ্গে তার দেখা-শোনার কথা-বার্তার কোন বাধা রইলো না।

শুভ্রার চেয়ে তার বেশি রাগ হ'ল অরবিন্দর উপরে। গাড়ীতে উঠবার সময়ে তাকালো না তার দিকে, এমন কি সাধারণ সৌজন্মের নমস্কারটি অবধি করলো না।

যজ্ঞেশবাবু ফিরে দেখলেন, বীরেন কংগ্রেসের সঙ্কটের যে মাত্রা জানিয়েছিল

সঙ্কট তার চেয়ে অনেক গুরুতর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবার জন্যে কংগ্রেসের যে সঞ্চিত অর্থছিল ন-চ থ-চ অনেকদিন হল তা নিয়ে পালিয়েছে, তারপরেও যা বাকি ছিল নূতন সেক্রেটারি হরিপদর মুষ্টিগত। এ বিষয়ে সে পরমহংস দেবের যোগ্য শিষ্য, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে হরিপদর হাতটা উল্টো দিকে বাঁকে।

এদিকে মুন্সিপালি ট্যাক্স বাকি পড়বার অজুহাতে কংগ্রেসের ঘর দু'খানা নীলাম হয়ে গিয়েছে এবং সরকারের নির্বন্ধাতিশয্যে একখানায় বসেছে মদের দোকান। একখানায় বিলিতি কাপড়ের। নাও, আর সত্যাগ্রহ করবে! বিপদের উপরে আরও বিপদ, পুলিশ সাহেব রবিনসন এবং ম্যাজিস্ট্রেট পিল্লাই দুজনেই বদলি হয়ে গিয়েছে। তাদের স্থানে এসেছে যথাক্রমে রিংলার ও মনরো। রিংলার ট্যারা, মনরো খোঁড়া। শহরের লোক ইতিমধ্যেই বলতে সুরু করেছে সরকার সুবিচারক বটে, গড়ে পুষিয়ে দিয়েছে। রিংলার তাক করে পেঁচা মারে বাদুড়, আর মনরো যখন তখন ঘোড়াছুটিয়ে শোভাযাত্রার মধ্যে উপস্থিত হয়ে অকৃত্রিম বাংলা ভাষায় বলে, "বেশ বাবা, বেশটো যুডঢ ঘাট্টা করেছ, ইংরেজকে ডেশছাড়া না করে ছাড়বে না।" দু'জনেই আসামীর যম, বিশেষ সত্যাগ্রহী আসামীর, তার সাজা হবেই। একটা পাঁচ আইনের মামলায় আসামীর নাম ছিল সত্যনারাণ; আর যায় কোথায়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে পুলিশ সাহেব তাকে চালান দিল। আর ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে ঠুকে দিল ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। সত্যনারান হ'লে আর সত্যাগ্রহ হ'তে বাধাকি। একেই বলে নাম-মাহাত্ম্য। কলৌ নামৈব সত্যম্। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের আগ্রহ যতই সত্য হোক হিসাবে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, ছ'মাস দণ্ড দেওয়ার অধিকার তার নেই। জজের কাছে আপীল হওয়া মাত্র লোকটা খালাস হয়ে গেল। শহরের লোক পেট ভরে হেসে নিল। মনরো সাহেবের খোঁড়া পা আবার গর্তে পড়লো। রিংলায়ের সঙ্গে যোগসাজসে লোকটাকে আবার চালান দিইয়ে সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করলো, মেয়াদের সীমাটা এবারে নিজের অধিকারের মধ্যেই রাখলো। কিন্তু তাতেও তো আপীলের বাধা নেই। এবারে জজ আসামীকে খালাস দিলেও পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে খালাস দিল না, রীতিমতো ধিক্কার দিল রায়ে। এবারে শহরের লোকে খুশী হয়ে বট গাছটার গোড়ায় ফুল বেল পাতা আর জল দিয়ে এলো। এই বট গাছটার একটু ইতিহাস আছে।

জজ সাহেব হেনরি উইলিয়াম ওয়ার্ডস্বার্থ একদিন শহরের শিক্ষিত লোকদের বাংলোয় চায়ের নিমন্ত্রণ করে জানিয়ে দিল গ্রেট পোয়েট ওয়াডস্বার্থ তার

গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার। গ্রেট পোয়েটের মতই সে প্রকৃতির শিশু, ভারতের প্রকৃতি বড় সুন্দর আর উদার তাই সে ভারতকে পেয়ার করে। এই বলে এক নিঃশ্বাসে We are seven কবিতাটি আবৃত্তি করে দিল, এর পরে আর অবিশ্বাসের কারণ থাকতে পারে না।

একজন বৃদ্ধ রায় বাহাদুর ধন্যবাদ দিতে উঠে জানালো দিনাজশাহী শহরের বড় সৌভাগ্য এই যে, যত সব ইংরেজ গ্রেট পোয়েটদের বংশধরেরা অনুগ্রহ করে এখানে এসে থাকেন। বছর চল্লিশেক আগে জজ হিসাবে একজন সেক্সপীয়র এখানে এসেছিলেন, তিনি নিশ্চয় গ্রেট পোয়েটের গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড সন। আমরা কৃতার্থ হলাম।

এই সমাচার অবগত হয়ে কয়েকজন ধুরন্ধর উকীল সাহেবের বাবুর্চি ও খানসামার কাছে খবর নিয়ে জানলো, সাহেব পাক করা খাদ্য খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কাঁচা টোমাটো, কাঁচা শাক সবজি, কাঁচা দুধ ডিম প্রভৃতি তাঁর প্রিয় খাদ্য। আর মাঝে মাঝে Salad হিসাবে কচি দূর্বাঘাস খাওয়া আরম্ভ করেছেন, এখন সপ্তাহে দুদিন মাত্র। উকীলরা স্থির করলো যথেষ্ট পরিমাণে কচি দূর্বাঘাস যোগাবে যাতে সাহেবের সাতদিনের খোরাকের অভাব না হয়। কিন্তু এহো বাহ্য, সাহেব যে সত্যই প্রকৃতির শিশু তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম দিনের এজলাসেই।

জজ কোর্টের কাছেই একটা প্রবীণ বটগাছ ছিল। সাহেব এজলাসে না ঢুকে সেই বটগাছটার কাছে ঘুরতে সুরু করলো, কাজেই পেস্কার চাপরাশিরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণমান হল। সাহেব লক্ষ্য করলো, বটগাছটির কাণ্ডের ঠিক ওপরেই দুটো ডাল দুদিকে ছড়িয়ে গিয়ে একটা আসনের মতো তৈরি করেছে। সাহেব সোজা গাছে উঠে পড়ে সেই আসনটিতে উপবিষ্ট হয়ে পেস্কারকে বল্‌ল, বাবু তুমি এই শাখাটির উপরে উপবিষ্ট হও আর নথীপত্র ঐখানে ঝুলিয়ে রাখো। বাবু মনে রেখো, বৃক্ষই মানুষের আদিম আশ্রয়, আমাদের পূর্বপুরুষ বৃক্ষবাসী ছিল। সেই জন্য টাডের শাখামৃগ বলে।

সাহেবের কথাশুনে পেস্কার হাতজোড় করে বল্‌ল, হুজুর, আপনার ও আমার পূর্বপুরুষ একজাতীয় ছিল শুনে আমার গর্বের সীমা নাই, কিন্তু হুজুর আমার পেন্সনের আর মাত্র ছ'মাস বাকি, এখন পড়ে যদি মারা যাই না হয় গেলাম একদিন তো সকলকেই মরতে হবে, তবে দুঃখ এই যে পেন্সনটি পাবো না। সাহেব দেখ্‌ল কথাটা মিথ্যা নয়, তখন বল্‌ল, তবে বাবু তুমি নীচে দাঁড়িয়ে একটা আঁকশী দিয়ে নথীপত্র আমার কাছে পেশ করো। সেই ব্যবস্থাই বাহাল

থাকলো। এ হেন বত্রিশ সিংহাসনে শাখারূঢ় বিক্রমাদিত্যকে দেখবার উদ্দেশ্যে গাছটির চারদিকে ভিড় জমে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই গাছটির চারদিকে ঘুগনিদানা, চানাচুর, কাচাগোল্লা প্রভৃতি বিক্রয়ের পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই প্রকৃতির শিশুর একটি সদ্‌গুণ ছিল। আসামী পেলেই খালাস দিত, সত্যাগ্রহে মিথ্যাগ্রহে ভেদ করতো না। একদিকে পুলিশ সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট এককাট্টা হয়ে আসামী চালান দিয়ে দণ্ডিত করছে, অন্যদিকে প্রকৃতির শিশুটি বৃক্ষশাখায় বসে তাদের বেকশুর খালাস দিচ্ছে।

নগর প্রশাসনের যখন এহেন অবস্থা, যজ্ঞেশবাবু, বীরেন চৌধুরী ও সুবোধ মিলে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল।

বীরেন বল্‌ল, রায় মশায়, তবিল শূন্য অথচ খরচ বেড়েই চলেছে, যে-সব লোকে সত্যাগ্রহ করে জেলে যাচ্ছে তাদের পরিবারকে কিছু কিছু সাহায্য করতে হয়, এতদিন সুবোধ আমি ও দু-চার জন বন্ধুবান্ধবে মিলে চালিয়েছি, কিন্তু আর বোধহয় চল্‌ল না।

সত্যাগ্রহীর সংখ্যা কি রকম?

প্রতিদিন বাড়ছে, পাটের দাম এমন পড়ে গিয়েছে যে কাটবার খরচ পোষায় না।

বেগুন এক পয়সায় পাঁচসের, হাটে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করে না, গোরুতে খায়।

আর বলবো কি দুঃখের কথা রায় মশায়, ওদিকে পুলিশের লোক সাধারণের মধ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে গান্ধীর সত্যাগ্রহের জন্যই পাটের বেগুনের উচ্ছের দাম পড়ে গিয়েছে।

বীরেন বল্‌ল, এখন একমাত্র উপায় কংগ্রেস অফিস বে আইনি ভাবে যে দখল হয়েছে এই মামলাটা কোন রকমে প্রকৃতির শিশুর এজলাসে উপস্থিত করতে পারলে উপায় হয়।

তবে সেই চেষ্টাই না হয় করো।

এমন সময়ে দেখল অল্ বেঙ্গল লোন অফিসের সেক্রেটারি বিনোদ চক্রবর্তী বিষণ্ণ মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ রবিবার লোন অফিস বন্ধ।

আজ্ঞে বড় দুঃসংবাদ।

কি রকম?

কালকে সন্ধ্যায় ফৌজদার মশায় দেহরক্ষা করেছেন।

বীরেনরা বল্‌ল, কি সর্বনাশ, আমরা তো কিছুই জানতাম না।

আজ্ঞে কাউকে জানাবার সময় পাওয়া গেল না। একটা চাকরের উপরে ভরসা করে একলা একটা কুঠুরিতে থাকতেন। শরীর কোন দিনই ভাল নয়; যখন বাড়াবাড়ি বুঝলেন, ছোকরাকে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ডেকে আনতে। গিয়ে দেখি শেষ অবস্থা। আমাকে কোন রকমে বল্‌লেন, আমার বালিশের তলায় সীলমোহর করা একখানা বড় লেফাফা আছে তুমি নিজে গিয়ে সেখানা রায় মশায়ের হাতে দেবে—আর বালিশের তলাতেই নগদ পঁচিশ টাকা থাকলো, তাই দিয়ে আমার সৎকারাদি যা হয় করো। আমার শ্রাদ্ধাধিকারী কেউ নেই, কাজেই খরচটা বেঁচে গেল। তারপরেই সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে চোখ বুজলেন।

তখন ডাকলেন না কেন?

প্রয়োজন হ'ল না, ইস্কুলের ছাত্ররা মিলে যথা কর্তব্য করলো—সব সমাধা হলে আসছি। এই বলে রায় মশায়ের হাতে সীল করা খাম খানা সমর্পণ করলো বিনোদ চক্রবর্তী। রায় মশায় মাথায় ঠেকিয়ে বীরেন চৌধুরীর হাতে দিয়ে বল্‌ল, দেখো তো বীরেন, তাঁর শেষ আদেশ কি?

বীরেন সীল ভেঙে চিঠিখানা বার তিনেক পড়লো, তবু কথা বলে না।

কি হ'ল হে বীরেন?

কি বলবো রায় মশায়, সংসারে এত আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে!

কি হয়েছে?

এই দেখুন।

আমার চশমা নেই—তুমিই বলো।

ফৌজদার মশায় উইল করে লোন অফিসে সঞ্চিত তাঁর যাবতীয় অর্থ প্রায় দেড় লাখ টাকা দিনাজপুরী জেলা কংগ্রেস কমিটিকে দান করে গিয়েছেন—এক্সিকিউটার একমাত্র শ্রীযজ্ঞেশ রায়।

অপ্রত্যাশিত সংবাদ সকলকে এমন অভিভূত করে দিল যে কারো মুখে কথা সরলো না।

কিছুক্ষণ পরে যজ্ঞেশ বাবু বলে উঠ্‌লেন, বীরেন তোমার কথাই সত্য, সংসারে অঘটনও ঘটে। অবশ্য তিনি একবার জেলে গিয়েছিলেন বটে।

সেটা দেশের জন্য নয়—জেলে চিকিৎসা হবে আশায়, মাত্র পনেরো দিনের মেয়াদ হওয়ায় তিনি হাড়ে চটে গিয়েছিলেন সরকারের উপরে।

কিন্তু যাই বলো বীরেনদা, কংগ্রেসের এত বড় নিন্দুক কেউ ছিল না।

সে কথা একশ বার। তবে এই যে টাকাটা তিনি দান করে গেলেন এট

কংগ্রেসের প্রতি টানে নয়—

তবে ?

এই যে এর মধ্যে আলাদা একখানা ছোট চিঠি আছে। পড়ে দেখো।

তুমি তো পড়েছ বীরেন দা, তুমিই বলো না।

ফৌজদার জবাবদিহি স্বরূপ বলছে, আমি বেওয়ারিশ, আমার সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত হাতে দান না করে গেলে শেষ পর্যন্ত ও-টাকা হরিপদর হাতে গিয়ে পড়বেই। এই জেলার যাবতীয় বেওয়ারিশের সর্বজনীন অছি ঐ হরিপদ। রাধার মায়ের টাকা ও হাতাবেই আমি নিঃসন্দেহ। রায় মশায় ও বীরেন ভায়া শক্তলোক, তাঁরা টাকাটা সামলাতে পারবেন। তবে এ নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করা ভালো নয়, কারণ কংগ্রেসে শত্রু অনেক।

তবে বীরেন এক কাজ করো, আজকে অবিনাশবাবুর স্মরণে যে জনসভা হবে তাতে এ দানের কথাটা ঘোষণা করে দিয়ো। লোকে জানুক কংগ্রেস নির্বান্ধব নয়।

সুবোধ বলল, কিন্তু উচ্চবাচ্য করতে নিষেধ আছে।

ও একটা কথার কথা। তা ছাড়া আমরা তো দাতার নিন্দা করছি না।

বেশ তাই হবে।' তবে রায় মশায় একথা নিশ্চয় জানবেন হরিপদর অনেক দিন থেকে নজর ছিল টাকাটার উপরে। তার কানে কথা উঠ্‌লে একটা মোচড় সে দেবেই। তার সহায় রিংলার ও মনরো।

আমাদেরও সহায় প্রকৃতির শিশু।

সকলে হেসে উঠলো।

ও যা পারে করুক।

বলা বাহুল্য তাই সে করছিল। ঠিক সেই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে রিংলার ও মনরোর সঙ্গে হরিপদর পরামর্শ চলছিল।

৪১

হরিপদর অনেক দিন থেকে নজর ছিল ফৌজদারের সঞ্চিত অর্থের উপরে, নিজের টাকার চেয়েও যেন তার উপরে বেশি মমতা ছিল। মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের কেরানী মারফৎ খবর নিতো টাকা তোলা হয় কিনা, ছয়মাস অন্তর সুদকষা হয় কিনা আর সুদে আসলে তহবিল কি রকম ফেঁপে উঠছে। ফৌজদার নিঃসন্তান ও নিঃসম্পর্কিত, ওয়ারিশ বলতে তার কেউ ছিল না। দিনাজশাহী জেলার

বেওয়ারিশের ওয়ারিশ উকীল শ্রীহরিপদ দত্ত। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো তাকে ওয়ারিশ বলে স্বীকার করবে না—তাই টাকাটা হস্তগত করবার জন্যে একটা চক্রান্ত স্থির করে রেখেছিল সে। ফৌজদার ও হরিপদ দুজনেই কায়স্থ, কাজেই একটা আত্মীয়তার সূত্র ধরে মামলা দায়ের করে দেবে। যদি কেউ দাবীদার না থাকে ব্যাঙ্ক তাকে দিতে বাধ্য হবে—আর দাবীদার কেউ থাকলে মামলার ঘানিগাছে কি ক'রে তাকে ঘুরিয়ে কাহিল করে ফেলতে হয়, কাহিল করে ফেলে আপোষের ফলে তাকে সামান্য কিছু দিয়ে মোটা অঙ্কটা হস্তগত করতে হয় হরিপদর চেয়ে সে বিদ্যা কারো বেশি জানা নেই। সেইজন্য পরিচিত বেওয়ারিশ বৃদ্ধগণ মনে মনে প্রার্থনা করতো প্রভু, অন্তিমে যেন হরিপদ পাই কিন্তু হরিপদে যেন না পায়।

এ হেন হরিপদ যখন শুনলো যে ফৌজদার উইল করে সঞ্চিত সমস্ত টাকা কংগ্রেসকে দিয়ে গিয়েছে প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো, তারপরেই আরম্ভ করলো নূতন চক্রান্ত।

পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেট তার হাতের পুতুল তাই বলে তারা উইলের উপরে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হবে না, কারণ উইল করা প্রথাটা তাদের দেশের মাটি থেকে উদ্ভূত, ওর উপরে ওদের সহজাত বিশ্বাস। আর বাঙালী হিসাবে হরিপদ জানে উইল মানেই জাল—প্রমাণ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল। না ও পন্থায় কিছু হবে না, তবে কংগ্রেসকে বিপন্ন করতে পারলে সেই রন্ধ্র পথে কিছু রস তার করায়ত্ত হ'তে পারে। আর লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস তো সরকারী কামানের প্রধান চাঁদমারি। সাহেবদের দিয়ে কামান দাগাবার উদ্দেশ্যে অদ্য সুপ্রভাতে শুভাগমন ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে। পুলিশ সাহেব আগেই উপস্থিত ছিল। রিংলার, মনরো ও হরিপদর মধ্যে কথোপকথন চলছিল।

রিংলার। মিঃ ওয়ার্ডস্বার্থকে নিয়ে বিপাকে পড়া গিয়েছে।

মনরো। মিঃ ওয়ার্ডস্বার্থ বলছ কেন, বলো প্রকৃতির শিশু।

রিংলার। বেটা বলে বেড়াচ্ছে পোয়েটের বংশধর।

মনরো। নাম সাক্ষ্যে বংশধর হ'লে আমিও তো বলতে পারি আমি মনরো ডকট্রিনের মনরো।

হরিপদ দেখলো তারও পূর্বপুরুষের গৌরব ছাড়া উচিত নয়। সে দেখলো এই বিলিতি মূর্খ দুটো ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, কাজেই কোন দাবী উত্থাপন করলে স্বীকার করা ছাড়া ওদের উপায় থাকবে না। বললো,

স্যার হরিপদ নামে একজন ভারতীয় মহাকবি ছিল—

মনরো। তাই নাকি। আমরা তো শুধু কালিডাসার নাম জানি!

হরিপদ। মহাকবি হরিপদ কালিডাসার চেয়ে অনেক আগে আর অনেক বড়। সে আমার পূর্বপুরুষ।

রিংলার। তাই বলো। তোমার কথাগুলো কবিতার মতোই মধুর আর মিথ্যা।

হরিপদ। স্যার মধুর হ'লে মিথ্যা হ'তেই হবে কারণ মধুর হবে আর সত্য হবে, সত্য এমন সুপ্রচুর নয়।

মনরো পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বল্‌ল—রাইটো। ফেয়ার এণ্ড ফল্‌স্।

চমৎকার, তারপরে ডাটা, সহরের খবর কি?

হরিপদ। সেই কথাই তো হচ্ছিল মিঃ রিংলারের সাথে। আজ বিকালে পাঁচ আনির মাঠে জবর জনসভা হবে।

মনরো। কি উপলক্ষ্যে?

হরিপদ। আজকার দিনে আবার উপলক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে অবিনাশ চক্রবর্তীর মৃত্যু উপলক্ষ্য।

মনরো। লোকটা করেছে কি?

হরিপদ। কিছুই না, কেবল সময় মতো মরেছে।

মনরো। সেটাও কম গুণ নয়। এই দেখো না কেন ডিউক অব্ ওয়েলিংটন পরাজিত করেছিল নেপোলিয়ানকে, কিন্তু তারপরে এত দীর্ঘকাল বাঁচলো যে লোকে ভুলেই গেল কি করেছিল সে।

রিংলার। মুস্কিল হয়েছে প্রকৃতির শিশুকে নিয়ে, আসামী চালান দিলে জামিন দিয়ে দেয়।

মনরো। আসামীকে সাজা দিলে খালাস দিয়ে দেয়।

হরিপদ বল্‌ল, সেইজন্যই শহরের লোকে জজ সাহেবের নাম দিয়েছে খালাসী!

বাংলা শ্লেষটা না বুঝবার ফলে হরিপদর রসিকতাটা ভিজে পটকার মতো নিঃশব্দে জলে গেল।

মনরো। রিংলার আজকার সভা যেমন করে হয় রদ করো।

রিংলার। আমি তো এখনই কংগ্রেসের পাণ্ডাগুলোকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারি—

মনরো। আমি জামিন দেব না।

রিংলার। প্রকৃতির শিশুর কাছে দরখাস্ত করলে সঙ্গে সঙ্গে জামিন দেবে।

মনরো। ঐ গেছো ভূতটাকে নিয়ে আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল তো। কি করা যায় হে হরিপদ ?

হরিপদ। স্যার, আমি বলি এমন কোন পন্থা নিন যার উপরে জজ সাহেবের হাত নেই।

মনরো। কেমন ?

হরিপদ। এই যেমন ধরুন ১৭৪ ধারা জারি করে দিন পুলিশ সাহেব, সভা হ'তে পারবে না।

রিংলার। ডাটা ও চলবে না। এর আগে ১৪৪ ধারা জারি করে দেখেছি, কল হয়েছে উল্টো, শহর সুদ্ধ পথে বেরিয়ে পড়েছে।

হরিপদ। অমনি সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ জারি করে দেবেন—বাস সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

হরিপদর ব্যবস্থা শুনে শ্বেতদ্বীপবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল, বেশ কয়েক মিনিট লাগলো তাদের যোগ্য ভাষা খুঁজে পেতে। তারপরে রিংলার বিস্ময়ে বলে উঠল—এই হিণ্ডু জাতটার মস্তিষ্ক অতুলনীয়, সবচেয়ে বেশি খোলে নিজের জাতির এগেনস্টে। (সাহেব বাংলা জানে)।

মনরো। হবেই বা না কেন, এই মাটির মড্ডেই টো নানকুমার টেকে নার্ণ গোসাইন্ জন্মে গিয়েছে।

হরিপদ নির্বোধ নয়, বদলোকের নির্বোধ হ'লে চলে না, তবে সে পথে সে অগ্রসর হতে সুরু করেছে নিরীহের অস্থিখণ্ডে তা কণ্টকিত।

সেই কথাই স্থির হয়ে গেল। রিংলার অবিলম্বে অফিসে গিয়ে ঢোল শহরত যোগে প্রচার করে দিল শহরে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ।

রিংলারের আশা অপূর্ণ থাকলো না। সভায় যারা যাবে না স্থির করেছিল ১৪৪ ধারা সংবাদ পেয়ে তারাও গেল, মাঠ উপচে পড়লো জনতায়। নাও কত ধরবে। কত পুলিশ আছে রিংলারের। হাজতে কত স্থান আছে মনরোর।

সন্ধ্যার পরে শহরের সংবাদ যখন শুনতে পেলো প্রকৃতির শিশু, তখন তিনি কচি ঘাস, কাঁচা শসা ও দইয়ের স্যালাড সহযোগে কাঁচা টোমাটো দিয়ে ডিনার সমাধা করছিলেন, খবরটি তাঁকে এতই বিচলিত করলো যে তিনি পূর্বপুরুষের একটি সনেটের একটি শব্দ বদলে সজোরে আবৃত্তি ক'রে উঠলেন—"Grand pa, thou shouldst be living at this hour, India hath need of

thee."

কিন্তু রিংলারের বিবেচনায় ইণ্ডিয়ার তখন প্রয়োজন ছিল সান্ধ্য আইনের। সান্ধ্য আইন ঘোষিত হ'ল।

ওদিকে হরিপদ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না, সে সরাসরি ফৌজদারের উইলের ব্যবস্থা যাতে সক্রিয় না হ'তে পারে তার বিরুদ্ধে ইনজাংশন প্রার্থনা করলো।

মুন্সেফ বল্‌ল, উইলের প্রোবেট নেওয়ার আগে এ প্রার্থনা অচল।

কিন্তু প্রবেট নেবে কে? কংগ্রেসের সমস্ত পাণ্ডা সান্ধ্য আইন লঙ্ঘন করবার দায়ে ধৃত হ'য়ে হাজতবন্দী। তাদের ধারণা ছিল যে পরদিন প্রকৃতির শিশুর কাছে দরখাস্ত করবামাত্র খালাস পাওয়া যাবে, অন্তত: জামিনে খালাস। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে কাঁচা ঘাস ও ফলমূল খাওয়ার ফলে বেশ কিছুদিন হ'ল প্রকৃতির শিশু গ্যাসট্রিক আল্‌সারে ভুগছিল—হঠাৎ রোগটা এমন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল যে রাতারাতি সিক রিপোর্ট করে কল্‌কাতায় রওনা হয়ে গেল। অগত্যা জামিনের দরখাস্ত গিয়ে পড়লো দেশী এক সাব জজের কাছে। দেশী চাকরের সহজাত বুদ্ধির বলে লোকটি বুঝলো, পিছনে আছে স্বয়ং পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেট, কাজেই জামিন মিলল না। প্রায় পঞ্চাশজন ব্যক্তি হাজতে পচতে লাগলো। কিন্তু তাতে হরিপদর সুবিধা হ'ল কই? যারা এ উইলের প্রোবেট নেবে তারা আবদ্ধ—আর উইলখানা নাকি তাদেরই হেফাজতে। হরিপদ নিজের জালে নিজে আটকা পড়লো। তবে হরিপদ সেই জাতের জলচর জালে পড়তেও যার বাধে না, জাল কাটতেও যার বাধে না, হরিপদ জাল কাটবার চেষ্টা করতে লাগলো।

হরিপদ চায় যে আসামীরা জামিনে খালাস পাক, কিন্তু বুড়ো সাবজজ শ্যামাচরণ যে তাদের জামিন মঞ্জুর করবে না সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তবে সে একথাও জানতো জজ সাহেব এলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে জামিন পাবে। কিন্তু জজ সাহেব এখন কল্‌কাতার হাসপাতালে কি অবস্থায় আছে কে জানে। তবে যেহেতু ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, তিন চার দিনের মধ্যেই 'প্রকৃতির শিশু' আবার ফিরে এসে বটগাছের শাখা সন্ধিতে উপবিষ্ট হয়ে বিক্রমাদিত্যবৎ বিচার-কার্য সুরু করে দিলেন। প্রথমেই তিনি সাবজজের এজলাস থেকে কারফিউ ভঙ্গের কেস নিজের হাতে নিয়ে এসে সমস্ত আসামীকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। হরিপদর আনন্দ ধরে না। সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা মানৎ করে বসলো, কিন্তু তখনি মনে পড়লো এই নিয়ে পঞ্চাশ জোড়া মানৎ হ'ল, একটাও দেয়নি। তখনি মনে

মনে বল্‌ল, এবারের কাণ্ডটা উদ্ধার ক'রে দাও মা, একসঙ্গে সব দেবো। কিন্তু অন্তর্যামী সিদ্ধেশ্বরী তার কথায় আর ভুললেন না।

বীরেন চৌধুরী একদিন সকালে যজ্ঞেশবাবুর কাছে এসে বল্‌ল, স্যার, এখন কিছুদিন উইলটার প্রোবেট নেওয়া বন্ধ থাক।

কেন বলো তো ?

আমি খবর পেয়েছি, প্রোবেট নিলেই একটা জাল দাবীদার খাড়া করে মামলা জুড়ে দেবে হরিপদ।

কিন্তু পারবে কেন ?

পারবে না জানি ; তবে খামোকা হয়রান তো করবে।

তা করবে বটে। তবে না হয় এখন বন্ধ থাক।

প্রোবেট নেওয়া বন্ধ থাক্‌লো দেখে হরিপদ বুঝলো ফৌজদারের টাকা গভীর জলে পড়লো, রাধার মায়ের টাকাটা আবার পাছে বেহাত হয় ভেবে সে টাকা হস্তগত করতে উদ্যত হ'ল। শহরের লোকে হরিপদর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ছিল। সত্যই সে ঈর্ষ্যার পাত্র। না হবেই বা কেন ? তার দুটি বয়স্থা মেয়ে বিয়ে হয় না দেখে বের হয়ে গিয়েছিল, দুটি ছেলের একটি অন্ধ, অপর মূর্খ, পত্নী উন্মাদ, আর হরিপদ হরিপদ, যার তুলনা হয় না। আর জমার অঙ্কে তার কম করে তিন-চার লাখ টাকা।

৪২

বেলা দশটার সময়ে শচীনের ঘরে ডাক পড়লো রুক্মিণীর, সে গিয়ে দেখ্‌ল টেবিলের উপরে একখানা খামের চিঠি খোলা পড়ে আছে আর চুপ করে বসে আছে শচীন।

কার চিঠি, কি খবর ? শুধালো রুক্মিণী।

শচীন বল্‌ল, পড়ে দেখো।

চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়ে স্ত্রী বল্‌ল, এ আর এমন নূতন কি ?

নূতন নয় তবে অপ্রত্যাশিত।

অপ্রত্যাশিতই বা বলছ কেন ?

শচীন বল্‌ল, এইজন্যে বলছি যে অরবিন্দ হিংস অহিংস সব রকম রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশের এ সংবাদ না জানবার কথা নয়। রুক্মিণী, তুমি চিঠিখানার মর্ম বুঝতে পারোনি তাই এমন বলছ।

বেশ বুঝিয়ে দাও।

অরবিন্দকে রাজনীতি করবার জন্যে গ্রেপ্তার করেনি, গ্রেপ্তার করেছে সত্যাগ্রহীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে।

এ কি রকম বিচার! যে সত্যাগ্রহী হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাকে বাড়ীতে আনবার জন্যে গ্রেপ্তার!

কেন নয় বলো। হাসপাতালে পাঠানো মানে যমের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দেওয়া, তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে সেরে উঠতে পারে।

সেরে তো ওঠেনি।

আরে সারিয়ে তোলবার চেষ্টা তো হয়েছিল সেটাও কম অপরাধ নয়।

আমি তো বাপু কিছু বুঝতে পারছিনে, এই যে শুনলাম গান্ধী আরউইন দুপক্ষে আপোষ হয়ে গিয়েছে, তবে আবার এ ধরাধরি কেন।

এই জন্যে যে যেখানে দু পক্ষের মধ্যে এক পথ প্রবল, অন্যপক্ষ দুর্বল সেখানে এমন অনিবার্য। কিন্তু এসব সূক্ষ্ম বিচারের জন্যে ডাকিনি, ওখানে অবিলম্বে কারো যাওয়া দরকার, অরবিন্দর মায়ের শরীর সুস্থ নয়; আমাদের উপর বরাত দিয়ে অরবিন্দ নিশ্চিন্ত মনে জেলে গিয়েছে।

তা তুমি একবার গিয়ে না হয় দেখো এসো।

একবার গিয়ে দেখে আসবার কথাই নয়—কিছুদিন থাকতে হবে।

সে রকম তো কাউকে দেখছি না, থাকবার মধ্যে তুমি আর ঠাকুরঝি, আর সব তো বগুড়ার জেলে।

বগুড়ার জেলে কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। দিনাজশাহী ও বগুড়া পাশাপাশি জেলা। সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা একটা জনসভার আয়োজন করে যজ্ঞেশবাবু, বীরেন চৌধুরী প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মীকে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান করে। যজ্ঞেশবাবু দেখলেন, এ শহরে সভা করলে জেল পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই জজের হস্তক্ষেপে আসামীরা মুক্তি লাভ করে। এক পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব, অন্য পক্ষে 'প্রকৃতির শিশু' জজ সাহেব—দুই পক্ষে বিষম রেষারেষি। অনেকবার যজ্ঞেশবাবুরা চেষ্টা করেছেন জেলে ঢোকবার জন্য। হয়ে ওঠেনি। অথচ জেলে না গেলে লোকের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বার আশঙ্কা। এমন সময়ে বগুড়া থেকে আহ্বান আসবামাত্র তিনি দলবল নিয়ে রওনা হ'য়ে গেলেন, লব কুশও বাদ পড়লো না। বগুড়ার জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেব সকলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে। কাজেই নির্বিবাদে কংগ্রেস কর্মীরা জেলে গিয়ে ঢুকলো। এসব কাণ্ড ঘটেছে অবিনাশবাবুর মৃত্যুর পরে

সকলে বাড়ী ফিরে এসে।

আসবার সময়ে বৃটিশ সরকারের মনস্তত্ত্বজ্ঞ যজ্ঞেশবাবু সাবধান করে দিয়ে এসেছিলেন অরবিন্দকে, বলেছিলেন, অরবিন্দ তুমি খুব নিশ্চিন্ত থেকো না, তোমার উপরেও চোখ পড়লো সরকারের।

তখন তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফল্‌লো।

অরবিন্দ লিখলো, শচীনদা জেলে যেতে হচ্ছে—বাসায় রইলো অসুস্থ মা আর এক ছোকরা চাকর। কাকে আর জানাবো, আপনাকে লিখলাম, জানি যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। গান্ধী আরউইন প্যাক্‌টের পরিণাম দেখছেন তো! আমার ভূতপূর্ব সংকর্মী রবিন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের সামনে গোমেস লেনের মুখে, ধিক্কার দিয়ে বল্‌ল, কি হে, তোমাদের অহিংস বাবার কাণ্ড তো দেখলে! এদিকে তিনি সহ্য করতে পারেন না হিংসাবাদীদের—অথচ নিজের সাধ্য নেই অহিংসপন্থীদের রক্ষা করবার। বুঝলে না অরবিন্দ, হিংসা-অহিংসায় গোঁজামিল চলে না। আমার মনটা খারাপ ছিল কোন উত্তর দিইনি—কারণ আমার মনের মধ্যে কোথাও গোঁজামিল নেই। বেশি লিখবার সময় নেই, বাইরে ইন্সপেক্টার অপেক্ষা করছে। আপনাকে ও বৌদিকে প্রণাম।

শচীন ও রুক্মিণী দুজনেই লক্ষ্য করলো পত্রের মধ্যে কোথাও মলিনার নাম-গন্ধ নাই। অথচ দু'জনেই মনে মনে বুঝলো মলিনাকে ছাড়া ওখানে যাওয়ার লোক অন্য কেউ নেই।

শচীনের মুখ দিয়েই সন্দেহটা প্রকাশিত হল—মলিনাকে বল্‌লে কি যাবে?

অরবিন্দ থাকলে অবশ্য যেতো না।

বাধা দিয়ে শচীন বল্‌ল, সে থাকলে যাবার প্রয়োজনই বা হবে কেন, আর আমরা বলবোই বা কেন?

আমার মনে হয় মলিনা অসম্মত হবে না, অরবিন্দর মায়ের উপর তার টান আছে।

তবে তুমি তার কাছে প্রস্তাবটা করে দেখো।

সমস্ত অবস্থা শুনে মলিনা রাজি হ'ল। বল্‌ল, অরবিন্দবাবু জেলে। তাঁর মা অসুস্থ, এমন সময়ে আমাদের কারো যাওয়া উচিত। দাদাকে বলো আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে।

রুক্মিণী একটু ঠোকর দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না, বল্‌ল,

অরবিন্দবাবু জেলের বাইরে থাকলেও বোধ করি তোমার আপত্তি হতো না।

আর কি যে বলো বউদি, যা একেবারে চুকে গিয়েছে আবার সে বিষয়ে ইঙ্গিত কেন ?

ভাই, চুকে গিয়েছে বললেই কি সত্যি সত্যি চুকে যায় ?

ও সব কথা আর তুলো না, তা ছাড়া বয়সটা হিসাব করে দেখো।

দেখেছি বলেই তো বলছি।

কি দেখলে ?

দেখলাম বয়সটা শুধু এক পক্ষে বাড়েনি।

ছিঃ ছিঃ, চলো এখন খাওয়ার যোগাড় করা যাক।

বড়ো যে আগ্রহ, চলো।

মলিনার আসল লক্ষ্য শুভ্রা নামে সেই নার্সটি। অরবিন্দর বাসায় তাকে দেখে, অরবিন্দর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে সে হাড়ে চটে গিয়েছিল। যতক্ষণ পেরেছে, যতবার পেরেছে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে মলিনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রেখে দিনাজশাহী ফিরতে একেবারেই তার মন সরেনি—অথচ থাকবারও উপায় নেই—যে উপায় ছিল তাকে স্বহস্তে ভেঙে ফেলেছে। সে ক্ষতিও একরকম করে সহ্য করেছিল কিন্তু একি নূতন বিপদ উপস্থিত।

নার্স নামধেয় জীবগণ সাধারণ মানুষের কাছে বড় রহস্যময়—তারাও যে সাধারণ মানুষ এ সত্যটা চাপা পড়ে যায় তাদের বিচিত্র পোশাক ও মধুর ব্যবহারের মধ্যে ; সকলের জন্যই তাদের সমান মমতা, সমান দায়িত্ব, সমান হাসি ; এ সব তাদের ঘিরে একটি অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, তার মধ্যে যে মাদকতার আরোপ সেটা দর্শকের মনের প্রতিক্রিয়ায় ; তারা যেন রঙীন প্রজাপতি জাতের, রুগীতে রুগীতে উড়ে বেড়িয়ে ওষুধের নানাস্তরে মধু বিতরণ যাদের একমাত্র কাজ। সেই নার্সকে সাধারণ মেয়ের পোষাক পরিয়ে দিলে কেউ ফিরেও তাকায় না। এদের মতো ভাগ্যহত বুঝি আর কেউ নেই। শুভ্রা সেই দলের একজন।

দিনাজশাহীতে ফিরে আসবার পরেও অনেক দিন মনে মনে মলিনা বিসম্বাদ করেছে শুভ্রার সঙ্গে।

মলিনার মনের মধ্যে পূর্বপক্ষে উত্তরপক্ষে উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল।

অত দাদা পাতানো কেন, দাদাবাবু, দাদাবাবু মুখে লেগেই রয়েছে ?

উত্তর পায়, কিছু বলে তো ডাকতে হবে।

বেশ অরবিন্দবাবু বলো, না হয় বলো মিস্টার রায়।

উনি বয়সে আমার কত বড়, নাম ধরে কি ডাকতে পারি। আর মিস্টার রায়টা বড়ই বিদেশী ধাঁচের। তার চেয়ে আমাদের দেশী দাদা শব্দটা বড় মিষ্টি।

দাদা বলবার আগে ওর কাছে অনুমতি নিয়েছেন?

শুভ্রা হেসে ওঠে। টাঁকশাল থেকে সদ্যোজাত রজতমুদ্রার মতো চিক্কণ আর উজ্জ্বল শুভ্রার হাসিটি। বলে, 'দিদি, ওটা কি বললেন, দাদা একটা সাধারণ ডাক, বৃদ্ধ দাদামশায় থেকে সুরু করে ছোট্ট শিশুকে অবধি দাদা বলে ডাকা যায়—এর আবার অনুমতি কি!

মলিনা বুঝতে পারে অথচ বোঝাতে পারে না, বোঝাতে লজ্জা বোধ করে, ঐ সাধারণ দাদা ডাকটি একটু অসাধারণ হয়ে বের হয় শুভ্রার মুখ থেকে। ভাবে ছি, ছি, একথা কি বলা যায়। আবার ভাবে, শুনলে হয়তো একটি চিক্কণ হাসির শুভ্রতা দিয়ে অর্ধপথে তার পক্ষচ্ছেদ করে দেবে। কি বলবে ভেবে না পেয়ে মলিনা চুপ করে থাকে। ওদের ঘনিষ্ঠতা তার ভালো লাগে না। রোগীর ঘরে ঘনিষ্ঠতা বড় দ্রুত হয়।

মলিনা ভাবলো অরবিন্দ লিখেছে তার মা অসুস্থ, সে অর্থ করলো এখানে অসুস্থ মানে রুগ্ণ আর বৃদ্ধ তো বটেই, একেবারে শয্যাশায়ী একথা তার আদৌ মনে আসেনি। তবু যেতে হবে, প্রয়োজন শুধু অরবিন্দর মায়ের নয়, তার নিজেরও।

মলিনা ভেবেছিল অবিনাশবাবুর মৃত্যুর পরেই শুভ্রা বিদায় হয়ে গিয়েছে, কাজেই অরবিন্দর সঙ্গে আর তার নিশ্চয় দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু তখনি আবার মনে হয়েছিল এই নার্সগুলো নাছোড়বান্দা, একবার সুযোগ পেলে তার পুরো সুযোগ নিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। সে যে আর অরবিন্দর বাড়ীতে আসেনি—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তখনি মনে হয়েছিল নার্স নিযুক্ত হ'লে সে কথাটা নিশ্চয় দাদাকে জানাতো অরবিন্দ। কি অবস্থা ঘটেছে স্থির করতে পারে না।

তখন মনে মনে শুভ্রার সঙ্গে ঝগড়া বন্ধ করে নিজের মনটাকে নিয়ে পড়ে, বলে, তুমি তো বাপু অরবিন্দর আশা ছেড়েছ তবে আবার এত নার্সটির সঙ্গে চুলোচুলি কেন! তখনি মনের এক কোণ থেকে উত্তর পায়, ছেড়েছি কে বলল। আমি তো চূড়ান্ত 'না' বলে দিইনি। মনের আর এক কোণ থেকে

শুনতে পায় মুখে হয়তো চূড়ান্ত 'না' বলোনি কিন্তু ভেবে দেখো রমণী চৌধুরীর হত্যাকারীকে বিয়ে করতে রাজি আছ কি? এ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর খুঁজে পায় না। আর যদি সে চূড়ান্ত ভাবে চুকিয়ে দিয়েই থাকে তাই বলে সে কি বিয়ে করবে ঐ নার্স ছুঁড়িটাকে।

বিয়ে করবে হঠাৎ এমন কথা তোমার মনে হ'ল কেন? অরবিন্দ বা শুভ্রার ব্যবহারে এমন কোন ইঙ্গিত পেয়েছ কি?

তখনি মনে প'ড়ে যায়, ঐ দাদা সম্বোধনের মারাত্মক সম্ভাবনা।

মলিনা বুঝতে পারে না, বুঝবার মতো শক্তি তার নেই—মেয়েদের মন গাছের ও তলার কোনটির অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। অরবিন্দকে সে বিয়ে না করে যদি থাকতে পারে তবে অরবিন্দই বা কেন বিয়ে না ক'রে থাকতে পারবে না। মেয়েদের চেয়ে পুরুষের পক্ষে বিয়ে না করা অনেক বেশি সম্ভব।

শেষ অবধি রাগটা গিয়ে পড়ে অরবিন্দর উপরে। তার মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দিনে পলায়নপর অরবিন্দকে সে যদি আশ্রয় না দিত তবে এতদিন সে থাকতো কোথায়। কিন্তু তার মনে পড়া উচিত ছিল সেদিন ধরা না পড়লেও শেষ অবধি সে তো ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে আর বেকসুর খালাস হয়েও বেরিয়ে এসেছিল।

মানুষের স্বভাব এই যে উভয় সঙ্কটের স্থলে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে শান্তি পেতে চেষ্টা করে। মলিনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। সে স্থির করলো মিছামিছি শুভ্রা ও অরবিন্দকে দোষী করছে। কল্‌কাতায় এমন শত শত নার্স আছে, একবার দৈবাৎ শুভ্রাকে নিযুক্ত করেছিল, প্রয়োজন স্থলে আবার যে তাকেই নিযুক্ত করবে এমন কি কথা। আর আবার কবে অরবিন্দরও বাড়ীতে দরকার হবে সেই সম্ভাবনা শুনে সে বসে থাকবে। তার ব্যবসা রুগীর সেবা করে অর্থোপার্জন, এতদিন নিশ্চয় অন্য কোথাও নিযুক্ত হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া যে-নার্স শত শত রুগীর সেবা করে তার পক্ষে কি বিশেষ এক রোগী বা তার আত্মীয়কে মনে রাখা সম্ভব! আর সব রোগীর আত্মীয় স্বজনকেই নিশ্চয় দাদা সম্বোধন করে থাকে, মনে পড়ে শুভ্রার উত্তর, দাদা একটা নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ সম্বোধন। সেই সম্বোধনকে অসাধারণ ভেবে নিয়েছিল তার কলুষিত মন। ছি ছি।

ভোর রাতে যখন ট্রেনের মধ্যে তার ঘুম ভেঙে গেল দেখ্‌ল আকাশ আলোয় ভরে গিয়েছে, শিয়ালদ আসবে-আসবে। দিনের প্রসন্ন আলোর দিকে

তাকিয়ে তার গত রাত্রের দুশ্চিন্তাকে নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হ'ল—বুঝলো রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গেই মনের অন্ধকার দূরীভূত হ'য়ে গিয়েছে। সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকলো।

শিয়ালদ স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে রওনা হ'ল—মুসলমান পাড়া লেন কাছেই। দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হ'ল। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল—চোখে পড়লো শুভ্রাকে। প্রথম নজরে চিনতে পারেনি, কারণ তার গায়ে নার্সের অভ্যস্ত পোষাক ছিল না। দ্বিতীয় নজরে চিনতে কষ্ট হ'ল না। মলিনার মুখ বোধহয় কঠিন হয়ে উঠেছিল, কথা জোগালো না মুখে।

শুভ্রা নমস্কার করে বল্‌ল, আসুন দিদি!

আপনি এখানে কি করে এলেন।

কাগজে দেখলাম দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে, বাড়ীতে বৃদ্ধ মা কেমন আছেন; খোঁজ নিতে এসে দেখি তিনি রীতিমতো অসুস্থ।

কথাগুলি স্বাভাবিক আর সময়োচিত। কিন্তু মলিনা সে ভাবে গ্রহণ করলো না, জিজ্ঞাসা করলো, আপনাকে কেউ call দিয়েছিল।

দাদা নেই কে আর call দেবে? তবে একেবার জানতাম না এও ঠিক নয়। দাদার বন্ধু রবিনবাবুর সঙ্গে কলেজের সামনে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, অরবিন্দর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম তার মা অসুস্থ, মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন।

রবিনবাবুটি কে?

দাদার বন্ধু, এ বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়, আপনিও তাঁকে দেখেছেন, তবে হয়তো লক্ষ্য করেননি।

এ কবেকার কথা?

আজ তিন রাত হ'ল।

এখানেই আছেন?

না থেকে কি করি!

কিন্তু অরবিন্দবাবু তো নেই, আপনার ফিস দেবে কে?

শুভ্রা দারুণ আঘাত পেলো মলিনার উত্তরে, বুঝলো রণং দেহি ভাব। তবে বুদ্ধিমতী মেয়েটি সে পথে গেল না। বল্‌ল, ফিসের জন্যে কি ভাবনা। দাদা নেই আপনি আছেন, আপনারা ধনী, আমার ফিস মারা পড়বে না।

এর পরে আর কথা চলে-না, মলিনা বুঝলো তার পরাজয় হল। আপাতত পরাজয়ের মাত্রা আর বৃদ্ধি করতে চায় না, তাই ভিতরে গেল।

শুভ্রা আগেই কুলির মাথা থেকে মাল নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিল।

কুলিটা গেল কোথায় ?

তাকে বিদায় করে দিয়েছি।

তাকে পয়সা দিল কে ?

আপাতত আমিই দিয়েছি, ফিস দেবার সময়ে সে পয়সাটাও ধরে দেবেন, আপনার হাতে আমার পয়সা মারা যাবে না।

মলিনা রুগীর শয্যার কাছে গিয়ে বসলো।

অরবিন্দর মা বলল, এসেছ মা ? অরবিন্দ বলে গিয়েছিল চিঠি পেলে তোমরা কেউ না কেউ আসবেই। তা একেবারে তুমি এসেছ ভালই হয়েছে।

এ কয়দিন আপনার বড় কষ্ট হ'ল। •

হ'তে পারতো মা, তবে হয় নি। কোথা থেকে খবর পেয়ে ঐ লক্ষ্মী মেয়েটি এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ভার নিল।

পাশেই শুভ্রা দাঁড়িয়ে ছিল, মলিনা বুঝলো তার আর এক হাত পরাজয় হল।

শুভ্রা বলল, দিদি এসেছেন, এবারে আমি যাই মা।

অরবিন্দর মা নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, মলিনা কলকাতার কি জানে, কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার কিছুই জানো না ও। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো মা, তবে আমি নিশ্চিন্ত হই।

মলিনার আর এক হাত পরাজয়।

বুঝলে মা মলিনা, মেয়েটি শুধু লক্ষ্মী নয়, সরস্বতীর মতো বুদ্ধিও রাখে। কাকে ধরে জেলখানার চিঠি পাঠিয়ে অরবিন্দকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে। তার উপরে আবার তুমি এসে পড়েছ, আমার আর কোন ভাবনা নাই।

শুভ্রা বলল, মা আর কথা বলো না, এখন চুপ করো, আবার বুকের ব্যথা বাড়বে।

পরাজয়, পরাজয়, নিশ্ছিদ্র পরাজয় মলিনার।

বুড়ীকে আজ সামলানো সহজ নয়। আবার মলিনার দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করলো, ভেবেছিলাম মা তুমি আমার ঘরে আসবে, অরবিন্দর ভার তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো। তা তো হ'ল না।

এবারে শুভ্রার দিকে তাকিয়ে বলল—আর এমন সব মেয়ের বিয়ে হয় না কেন, হ'লে স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করতো।

মা তুমি যদি ডাক্তারের কথা না শুনে কথা বলতে থাকো তবে আমার

থেকে লাভ কি, আমি চল্লাম।

না, না, মা, এই আমি চুপ করলাম।

৪৩

শুভ্রা ঘরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। সিনিয়ার নার্স বা সিস্টার বলে হোস্টেলে একলা একটি ঘরে থাকবার অধিকার সে পেয়েছিল। নিঃসঙ্গের একলা একটি ঘর বড আবশ্যক।

শুয়ে পড়লো তবে ঘুম এলো না, ঘুমবার জন্যেই যে লোক শোয় এমন নয়—অনেক সময়েই শোয় বিস্তারিত চিন্তা করবার জন্যে। চিন্তার বিষয়ের অভাব শুভ্রার ছিল না। শুধু আজ বলে নয়। চিরদিনই সে চিন্তালু।

মলিনা আসবার পরে তিন দিন অরবিন্দর বাড়ীতে সে ছিল, কিন্তু আর থাকা চল্‌ল না। দৃষ্টিতে ও বাক্যে মলিনার ধিক্কার তাকে অহরহ খোঁচা মারতে লাগলো। আমরা অত ফিস যোগাতে পারবো না। আমি তো আছি তবে আবার কেন, এই দুদিনে আমি সব দেখে শুনে নিয়েছি, ওষুধের দোকান, ডাক্তারের বাড়ী সমস্তই তো চিনেছি, আপনি অনেক কষ্ট করেছেন, আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে—এই জাতীয় বক্তব্য বাক্যে চাহনিতে দুঃসহ করে তুলল শুভ্রার জীবন। অবশেষে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল সে।

মা তবে আসি।

রুগী বলে, বেশ তো ছিলে মা, মনে একটা ভরসা ছিল।

আসল কথা ব্যক্ত না করে শুভ্রা জানায়—এখন তো দিদি আছেন, আর মা মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে যাবো।

তবে এসো মা।

শুভ্রা কিছুতেই বুঝতে পারে না মলিনার বিরক্তির কারণ। আগের বার যখন তারা এসেছিল তখনো অনুভব করেছিল মলিনার বিরক্তি, কিন্তু অনেক-গুলি লোক থাকায় চারদিকে ধাক্কা খেয়ে বিরক্তি যথাযথ লক্ষ্যে এসে পৌছত না, এবারে নির্বাধ বিরক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে চাঁদমারিতে এসে আঘাত করছিল।

তার চিন্তার রথ ছুটতে ছুটতে কখন এসে প্রবেশ করেছে তন্দ্রার রাজ্যে—তন্দ্রা ঘুমের উপকণ্ঠ। আর একটু হ'লেই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতো এম সময়ে রথখানা বিষম ধাক্কা খেলো, চমকে উঠে ভাবলো, ও এতক্ষণে বুঝেছি জীবনের অনেক বড় সত্য এমন হঠাৎ বোঝার পরিণাম। হাসবে না কাঁদে

বুঝতে পারে না। তার মনে হল অরবিন্দর প্রতি সে অনুরক্ত এই অদ্ভুত ধারণা হয়েছে মলিনার। এমন অসম্ভব কথা যে কারো মনে হ'তে পারে ভাবতে পারে নি। ব্যাপারটা এমনি অসম্ভব, এমনি অদ্ভুত, এমনি অবাস্তব যে হাসিতে সমস্ত দেহ তার তরঙ্গিত হতে লাগলো। অবশেষে অনুভব করলো, তার দুই গাল বেয়ে জল পড়ছে। ভাবে, জল আবার কেন! অদ্ভুত বলেই কি, না কোথাও কোন একটা সত্যের কণিকা আছে বলে, সেটা এত ক্ষুদ্র যে আগে চোখে পড়েনি, এখন হাসির দমকা হাওয়ায় ফুলের বন ওলট-পালট হয়ে যাওয়ায় দেখতে পেলো। তখন সে বিচারে বসলো।

আচ্ছা, যদি সত্যই সে অনুরক্ত হয়ে থাকে মলিনার তাতে আপত্তির কি আছে। তবে কি সে-ও অরবিন্দর প্রতি অনুরক্ত? প্রতিযোগীর উপর বিরক্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। আগে কখনো তার মনে হয় নি মলিনা সম্বন্ধে এমন সম্ভাবনা, এখন মলিনার সন্দেহ তার সন্দেহকে জাগিয়ে দিল। তখনি তার মনে হ'ল, সত্যই যদি সে অনুরক্ত হতো অরবিন্দর প্রতি তবু তাকে কখনো প্রশ্রয় দিত না সে। এক্ষেত্রে তারা দুজনে অসম প্রতিযোগী। নিশ্চিত পরাজয়ের জন্যে জেনে শুনে কে যুদ্ধে নামে। তখন দুজনের গুণাবলী বিচারে বসলো।

মলিনা ধনী কন্যা ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, শুভ্রা চাকুরে আর লোকচক্ষে ভদ্র-সমাজের নীচের তলায় তার স্থান; অবশ্য মলিনার বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, তবে তার বয়সটাও কম নয়, ত্রিশের দু এক ধাপ নীচে অর্থাৎ দুজনেরই বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত প্রায়; দুজনেই অবিবাহিত, তবে ঐ একটি মাত্র গুণের ভরসায় কি এ হেন ক্ষেত্রে শুভ্রার অগ্রসর হওয়া সম্ভব! আর রূপ? মলিনা এই বয়সেও রূপসী। সে নিজে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মনে পড়ে যায় একজনের চোখ তার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল বটে। তবে সে অনেক দিনের কথা। তখন সে কৈশোরের শেষ ধাপে আর নার্সগিরির প্রথম ধাপে অবস্থিত। একজন তরুণ ডাক্তার মনোযোগী হয়ে উঠেছিল তার সম্বন্ধে, প্রয়োজন সৃষ্টি করে নিজে কাছে আসতো, কাজের ছুতোয় কথা বলতো, আর কোথাও অদূরে শুভ্রার হাসির নিক্বণ শুনলে উৎকর্ণ হয়ে উঠতো। একদিন সেই তরুণ ভিষক্ স্বীকার করে ফেলল, মিস চৌধুরী, আপনার এই হাসিটির মূল্য লক্ষ টাকা।

শুভ্রা উত্তর দিয়েছিল, পাইতো মাত্র দেড়শ টাকা। উত্তর পেয়েছিল, সেটা সমাজের বিচার বিভ্রান্তি, আপনি ইচ্ছা করলে এই হাসি দিয়ে জগজ্জয় করতে পারেন। উত্তর দিয়েছিল, তা জানিনে, তবে জানি যে আমাদের মেট্রনকে এখনো জয় করতে পারিনি।

শুভ্রার দুই কান গরম ও মুখ রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল, কাজের ছুতোয় তাড়াতাড়ি পালালো। ঘরে এসে ক্যালেণ্ডারে তারিখটার নীচে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখলো, তার মনে হ'ল সমস্ত আকাশটা সেই লাল দাগে চিহ্নিত। কিশোরী নারী যেদিন প্রথম পুরুষের মুখে রূপের প্রশংসা শোনে সেদিন তার নারীত্বের অভিষেক।

আজ নিঃসঙ্গ ঘরে শুয়ে শুয়ে কত কথাই না তার মনে পড়ে। হায় সে সব কথা সুখের, গৌরবের, পরাজয়ের। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, সঙ্গিনীগণ কানাকানি সুরু করেছে, এমন সময়ে তার কানে এলো ডাক্তারটির বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে। জীবনমৃগয়ায় অনভিজ্ঞা তরুণীর কিছুতেই বিশ্বাস হল না। একদিনের অবিশ্বাসে সহস্র দিনের বিশ্বাসের বনিয়াদ কি সহজে টলতে চায়? সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছ? প্রবঞ্চক উত্তর দিল, সে কি কথা! তোমার হাসির ঝরণাতলায় যে স্থান পেয়েছে আর কোথাও যেতে কি তার মন সরে? শুভ্রা স্থির করলো, এ রটনা ঈর্ষ্যাপরায়ণ সঙ্গিনীদের কাজ। তারপরে একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে এসে ডাক্তারের শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পেলো (ওটা ঈর্ষ্যাপরায়ণা সঙ্গিনীদের কারসাজি নিঃসন্দেহ) বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সারারাত্রি কেঁদে কাটলো, শহরের কোন প্রান্তে তখন বাঁশী বাজছিল সাহানা রাগে, এই সেই ঘর, এই সেই পালঙ্ক। সেই থেকে বাণ খাওয়া হরিণী পুরুষের দৃষ্টিকে একসাপটা অবিশ্বাস করতে শিখেছে।

রাত কত হ'ল খেয়াল ছিল না শুভ্রার, ক্ষুধা ও নিদ্রা দুই তাকে বর্জন করেছে, আছে শুধু অনির্দ্দিষ্ট চিন্তার স্রোতের দুর্নিবার টান। মনে পড়লো কেমন করে এসে পৌছলো এই ঘরটায় যা এখন তার জগৎ সংসার। তাদের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, লোকেও বলতো চৌধুরীবাবু বড় লোক। হ'লে কি হয়; তার বাবা ছিলেন স্বদেশীর ছোঁয়াচ লাগা। স্বদেশী ধুতি শাড়ী প্রভৃতি কিনে গ্রামে দোকান খুললেন, লোকে সাগ্রহে নিলো, দাম দেবার বেলায় তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। দোকান ফেল পড়লো। তারপরে তাঁতি ডাকিয়ে এনে কাপড় বোনালেন, এবারে নগদ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা। লোকে নিলো না বললো, মোটা কাপড়, দোকানে ওর চেয়ে সস্তা। সেগুলো দিয়ে তাঁতিদের পাওনা মিটিয়ে তাঁত বন্ধ করে দিলেন। তারপরে আরম্ভ হ'ল পুলিশের হাঙ্গামা, পুলিশ স্বদেশী কিন্তু কাপড়গুলোর চেয়েও মোটা তাদের ব্যবহার। বোমা পিস্তলওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগের অজুহাতে তাঁকে জেলে দিল, স্বদেশী জেলার এই প্রবীণ ব্যক্তিকে দিয়ে ঘানি টানালো, তেল

হ'ল অকৃত্রিম ও স্বদেশী, তবে ঘানির পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ বেরিয়ে গেল স্বদেশী ও অকৃত্রিম প্রাণটি। জেলের ডাক্তার বল্‌ল, হার্ট দুর্বল ছিল, অসম্ভব নয়, ঘানি ঘোরাবার দারোগা অত্যন্ত সবল ছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বড় ছেলেটি, শুভ্রার বড় ভাই, অনেক বড, ঢুকলো বোমা পিস্তল-ওয়ালাদের দলে। এরকম ছেলেরা বাড়ী ছাড়ে নতুবা বাড়ীর লোকের উপরে পুলিশী অত্যাচার হয়ে থাকে। এই ভাবে পিতা-পুত্রের দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টার ফলে তাদের বিষয়-সম্পত্তি অস্তিত্বের শেষ কলায় এসে পৌছলো। এহেন অবস্থায় শুভ্রার এক মাসি তাকে কল্‌কাতায় নিয়ে এসে নার্সের ট্রেনিং দিয়ে ঢুকিয়ে দিল হাসপাতালে। কিছুদিন পরে চাকুরিতে দু-এক ধাপ উঠ্‌লো, পেলো সে এই ঘরটি একাকী ব্যবহার করবার অধিকার। সেই থেকে এই তেইশ নম্বর তার জগৎসংসার। বাড়ীতে রইলো তার মা ও ভাই. শুভ্রার চেয়ে বয়সে ছোট। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে স্বদেশীর গান্ধীযুগ।

দুর্ভাবনার দুর্ভাবনায় তার মা গেলেন মারা, এবারেও মৃত্যুটা আকস্মিক না হলেও অকৃত্রিম, যদিচ পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়নি। ছোট ভাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে খদ্দর পরে কংগ্রেস কর্মীরূপে দেখা দিল, শুভ্রার নিষেধ শুনলো না, বল্‌ল, পড়বো যে টাকা কোথায়? শুভ্রা বল্‌লো, আমি রোজগার করছি কার জন্যে। উত্তর পেলো না। শূন্য বাড়ী বেওয়ারিশ পড়ে রইলো। শূন্যতা প্রকৃতির পছন্দসই নয়। সেই নিয়মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রতিবেশীরা এসে বাড়ীটা অধিকার ক'রে নিলো। শুভ্রা একবার গিয়ে আপত্তি করেছিল, সাতপুরুষের প্রতিবেশীরা বল্‌ল আমরা আছি বলে বাড়ীটা আছে, লোকে দখল করেনি, তুমি এলেই ছেড়ে দেব।

তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে লবণ সত্যাগ্রহ, নিত্য হতাহতরা আসছে হাসপাতালে। একদিন খবর পেলো, খবরের কাগজেও দেখ্‌ল, কাঁথির কাছে লবণ তৈরি করতে গিয়ে তার ছোট ভাই নিহত হয়েছে। সেই থেকে চুকলো তার বাড়ীর সঙ্গে যোগ। এখন থেকে সমুদ্রে সে ভাসমান ভেলা।

শুভ্রার কানে এলো থানায় ঘড়ি বাজছে, গুণে দেখলো বারোটা। উঠে কুঁজো থেকে জল ঢেলে খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ক'দিন বাদে এক হাউস সার্জেন তার যোগাযোগ করে দিল অরবিন্দর সঙ্গে। রুগী আহত সত্যাগ্রহী শুনে ধনী মাড়োয়াড়ী বাড়ীর 'কল' ছেড়ে দিয়ে সেখানে গেল। এতদিন পরে মনের মতো কাজ পেলো সে।

নূতন পট উঠলো নূতন অঙ্কে। পাত্র পাত্রীগণ সবাই যেন কত দিনের

পরিচিত, তারা সবাই স্বদেশীওয়ালা, সুরেন বাঁড়ুজ্জের স্বদেশী, অরবিন্দর স্বদেশী, গান্ধীর স্বদেশী সব রকম আছে এদের মধ্যে। বেশ জলে জল মিশে যাচ্ছিল, এমন সময়ে তৈল নিষেক করলো মলিনা। এই রকম ভাবতে ভাবতে কখন্ অতর্কিতে ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুম রত্নাকর দস্যু, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে খাতির করে না।

আলোয় ভরে যাওয়া আকাশের নীচে জেগে উঠে কি যেন অস্বস্তি অনুভব করলো শুভ্রা, ঠিক বুঝতে পারলো না কিসের জন্য অস্বস্তি, কি যেন করা হয়নি, কি যেন ভুল হয়ে গিয়েছে। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অরবিন্দবাবুদের বাড়ীতে যাওয়ার আগে তাগিদ ছিল, ক'দিন তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছে সেখানে, আজ সে প্রয়োজন না থাকাতেই শূন্যতা, সেই শূন্যতাই অস্বস্তির কারণ। কারণ জানতে পেরে মনটা শান্ত হ'ল। তারপরে একটু হাসিও পেলো। মলিনার সন্দেহ হাস্যকর ভাবে ভ্রান্ত, অরবিন্দর প্রতি তার মনে অণুমাত্র অনুরাগ জন্মেনি, জন্মাতে যে পারে আদৌ মনে হয়নি। তবে মলিনার সন্দেহের খোঁচাতে এ বিষয়ে সে প্রথম সজাগ হ'ল।

তবে একটা আগ্রহ ছিল, তার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সত্যাগ্রহী অবিনাশ-বাবুর সেবা ক'রে নিহত ছোট ভাইয়ের সেবা যেন সে করছিল, যাকে সেবা করবার সুযোগ পেলো না—অবিনাশবাবুর মধ্যে তারই সেবা করছিল। তা ছাড়া আরও এক জায়গায় মিল ছিল, অবিনাশবাবুর পরিবার, যজ্ঞেশবাবুর পরিবার আর তার নিজের পরিবার সকলেই যে স্বদেশীর ভূতে-পাওয়া, সকলেই স্বদেশ ব্রতে গুরুভাই।

একবার তার মনে হ'ল অরবিন্দর মা কেমন আছেন দেখে আসা উচিত. তখনই মনে হ'ল মলিনা বিরক্ত হবে, মনকে বোঝালো রোগের কঠিন অবস্থা তো কেটে গিয়েছে—আর মলিনাও কিছু অনভিজ্ঞ নয়। কিন্তু ছুটির সারাটা দিন কাটে কি ভাবে। হাতে কাজ থাকলে এমন অসহায় বোধ করতো না। কাজটাই নিঃসঙ্গের সঙ্গ। জল খেয়ে এসে একখানা ছবির বই নিয়ে শুয়ে পড়লো। এমন সময়ে দরজার কাছে একটা ছায়া পড়লো।

কে ?

শুভ্রাদি আমি।

ও শীলা, কি খবর ?

যদি রাগ না করো তো বলি।

শীলা ভাই আমি কি খুব রাগী ?

এটাও বলতে পারি অভয় পেলে।

আচ্ছা সম্পূর্ণ অভয়।

তুমি রাগী নও তবে বড্ড বেশি গম্ভীর।

ও দুই কি এক ?

অনেক সময়ে।

অন্ততঃ এ সময়ে নয়, বলো কি বলতে এসেছিলে ?

আজ তিনটার সময়ে ছবিঘরে একটা ছবি দেখতে যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।

বাংলা ছবি হলে যাবো না।

কেন, বাংলা ছবির কি দোষ ?

বাংলা ছবি কান্নার জোলাপ—

তবে তোমার টিকিট কেটে আনি—এ রোমান কমেডি নামে একটা হাসির ছবি, এডি ক্যাণ্টর নায়ক, ভীষণ হাসাচ্ছে, কালকে দেখে এসেছে অণিমা, মঞ্জু ওরা সব।

আচ্ছা যাবো, পয়সা নিয়ে যাও।

পরে নেবো।

তার মানে নেবার ইচ্ছা নেই।

কতকটা বটে।

কেন বলো তো ?

তুমি যে রাগ না করে আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছো এটাই টিকিটের দাম বলে নিলাম।

শুভ্রা হেসে উঠে বল্ল—আচ্ছা তাই সই।

শীলা ছুটে পালালো।

শীলা, অণিমা, মঞ্জু এরা সব জুনিয়ার নার্স—শুভ্রার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

ছবি দেখে ফিরবার পথে শীলা বল্ল, শুভ্রাদি হাসিতে যখন ঘর ফেটে পড়ছে আপনাকে হাসতে শুনলাম না।

কি করে শুনবে ভাই, সব হাসি তোমরাই হেসে নিলে, আমার জন্যে তো কিছুই বাকি রাখোনি।

আর একটি মেয়ে বল্ল—আচ্ছা ঐ জায়গাটা কেমন লাগলো, এডি ক্যাণ্টর

যখন হাঁসের পেট টিপে হর্ণ-এর মতো বাজাচ্ছিল।

আবার একটা হাঁসও ছিল নাকি!

তিন সঙ্গিনী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, আপনার মন ছিল কোথায় দিদি?

আর যেখানেই থাকুক ছবি ঘরে ছিল না, খুব সম্ভব অরবিন্দর বাড়ীর আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরছিল।

ভালোবাসা সম্বন্ধে সন্দেহের খোঁচা অতি মারাত্মক সম্ভাবনায় পূর্ণ, মলিনার সন্দেহ শুভ্রাকে সজাগ করে দিয়েছে। সন্দেহ যেখানে সম্ভাবনাও সেখানে, নয় কেন?

এই ভাবে কাজে-অকাজে এক সপ্তাহ কেটে গেল, পরের রবিবারে সকাল বেলায় শুভ্রা বেরিয়ে পড়লো। আজ যাবেই অরবিন্দবাবুদের বাড়ীতে, সাত আট দিন পরে গেলে মলিনার তেমন বিরক্তির কারণ না হ'তেও পারে। কলেজের সম্মুখেই তার দেখা হ'য়ে গেল রবিনের সঙ্গে। শুভ্রা নমস্কার করে বল্‌ল, আপনার সঙ্গে সর্বদা কি এখানেই দেখা হবে।

রবিন হেসে উত্তর দিল, হ'তেই হবে এখানে দেখা, এই রাস্তাটার নাম গোমেষ লেন—এক সঙ্গে গো এবং মেষ, শুধু বাসস্থান নয়, বাসিন্দাদের পরিচয়টাও আছে।

শুভ্রা হেসে উঠ্‌ল।

আপনার হাসিটি নূতন টাকার মতো উজ্জ্বল।

এই উত্তর শুনে শুভ্রার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার আর একজন পুরুষের মুখে তার হাসির বর্ণনা, তবে তার পরিণামটা শুভ্রার পক্ষে সুখের হয়নি। সেই থেকে পুরুষের চাহনির অর্থ করতে শিখেছে। একবার চকিতে রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

চলুন যাওয়া যাক।

আমি কোথায় যাচ্ছি কি করে জানলেন।

কেন, অরবিন্দর বাড়ীতে, কালকে সন্ধ্যায় সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরেছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে বল্‌ল, ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরেছেন!

আপনি যেন দুঃখিত হ'লেন মনে হচ্ছে।

দুঃখিত হবো কেন, ছি ছি, তবে কিছু বিস্মিত হয়েছি সন্দেহ নেই। এই ধরে নিয়ে গেল, এই ছেড়ে দিল—ধরাই বা কেন ছাড়াই বা কেন।

এই হচ্ছে গান্ধী রাজনীতি, ইঁদুরের সঙ্গে বিড়ালের শিকার শিকার খেলা।

শুভ্রা মনে প্রাণে গান্ধীবাদী ছিল, কিছু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, আর আপনাদের রাজনীতিটা কি রকম ছিল।

সে এমন খেলা খেলা নয়, ধরলো তো একেবারে সেলুলার জেল। বের হয়ে বড় কেউ আসে না।

আপনাকে তো বাইরেই দেখছি।

দু'জনে চলতে চলতে কথা হচ্ছে।

তার কারণ টিকিটটা উঠেছিল দৈবাৎ আমার নামে না উঠে অরবিন্দর নামে।

টিকিট! টিকিট কিসের?

কে তাকে নিকেশ করতে যাবে তার নাম লেখা টিকিট।

সাহেব মেরেছেন নাকি?

সাহেব কোথায়। এই যে চলুন এসে পড়েছি।

শুভ্রা বুঝতে পারলো এসব নিষিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করতে চান না রবিনবাবু, হয়তো ইতিমধ্যে অনেকটা বেশি বলেছেন। কেন না, তারপরে একাধিকবার প্রশ্নের টোপ ফেলেও আর মাছের দেখা পেলো না. অগত্যা অন্য প্রসঙ্গে গেল, জিজ্ঞাসা করলো, অরবিন্দবাবু কি বলেন?

তাঁর কাছেই শুনবেন। এই যে অরবিন্দ। দুজনেই দেখল বৈঠকখানা বাজার থেকে থলি ভরে বাজার করে নিয়ে অরবিন্দ ফিরছে।

এসো রবিন!

পরমুহূর্তে শুভ্রাকে দেখে বলল, এই যে, আপনিও এসেছেন। আসুন, ভিতরে যাওয়া যাক।

৪৪

নলিনা চলে এসেছে দিনাজশাহীতে, কলকাতায় থাকতে কোন বাধা ছিল না, বরঞ্চ অরবিন্দর মা আর অরবিন্দ স্বয়ং থাকবার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল।

মা তুমি চলে যাবে, আমি এখনো ভালো করে পা পেলাম না, তুমি থাকলে বলতাম।

মা, আমার কি অনিচ্ছা! ওখানে বাড়ীতে বউদি একা, আর সবাই জেলে অবশ্য দাদা আছেন, তবে যে কোনদিন তাকে ধরতে পারে। আর এখানে তো আপনার ছেলে ফিরে এসেছে।

অরবিন্দর মা এ সব যুক্তির সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন, তা বটে।

অরবিন্দ একবার বলল, চলে যাবেন কেন? আর কয়েকদিন থেকে গিয়ে মাকে আর একটু সুস্থ করে দিয়ে যান না।

মলিনা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—না।

অরবিন্দর মা জানতেন না মলিনা ও অরবিন্দর প্রণয় প্রত্যাখানের বিবরণ, তাই তাঁর পক্ষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হয়েছিল, অরবিন্দ বেশি কথা বলতে পারলো না, বেশি কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অরবিন্দ নীরব হয়ে থাকলে মলিনা বলল, মায়ের জন্য আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। শুভ্রা এসে পড়েছে।

হ্যাঁ তা এসেছে বটে, সেবা-শুশ্রূষায় সে নিপুণ।

তবে আর আমাকে কেন?

তাজার হোক সে পর, আপনি আপন।

অরবিন্দবাবু, সংসারে নিত্য পর আপন হয়ে উঠছে। আর আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধই বা কোথায়। দেখবেন শুভ্রাও আপন হয়ে উঠবে।

উঠবে কেন উঠেছে।

আরও বেশি করে উঠবে, আমি গেলেই হয়।

খুবই সম্ভব, তখন তো সব ভার তার উপরে পড়বে।

সব ভার যাতে পড়ে সেইজন্যেই তো যাচ্ছি।

অরবিন্দ আদৌ জানতো না শুভ্রা সম্পর্কিত মলিনার মনোভাব, তাই সে তার কথাগুলো স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করে উত্তর দিচ্ছিল, আর আড়ালে দাঁড়িয়ে (কানের আড়ালে নয়) শুভ্রা উত্তর প্রত্যুত্তর শুনে মনে মনে ঘামছিল।

শুভ্রা ভাবলো তার একবার অনুরোধ করা আবশ্যক। তাই শেষ মুহূর্তে বলল, দিদি না গেলেই কি চলতো না?

মলিনা এই কথার উত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যার ভাষ্য করতে গেলে আর একখানি উপন্যাস লিখতে হবে। তারপরে ভাষ্যর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটি টীকা জুড়ে দিল—থাকলে আবার কারো কারো অসুবিধা হতো।

শুভ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কার?

আর যার হোক, মায়ের নয়।

দুজনেই দু'জনের মনের কথা বুঝলো।

না, না, আমাকে তুলে দিতে স্টেশন যেতে হবে না আপনাকে, আসবার

সময়ে তো একাই এসেছি।

তখন তো আমি ছিলাম না।

মনে করুন না কেন, এখনো নেই।

শচীনদা শুনলে কি মনে করবেন।

বেশ, তাঁকে বলবো যে আপনি স্টেশনে এসেছিলেন।

আমাকে বাঁচাতে এত বড় মিথ্যা কথাটা বলবেন!

মলিনার মনে প্রশ্ন ছিল যে এর আগে আরও গুরুতর পরিস্থিতিতে আপনাকে বাঁচিয়েছি, তবে তার বদলে বলল, সদুদ্দেশ্যে মিথ্যা-কথনে দোষ নেই।

মলিনার একাই স্টেশনে রওনা হয়ে গেল, তার যে এত বড একগুঁয়ে স্বভাব জানতো না অরবিন্দ। রওনা হওয়ার সময়ে শুভ্রার প্রণামের বদলে শুধু একবার তাকালো, ভাবল, আর কি, এবারে খোলামাঠ, যথেচ্ছ গোল দাও।

বাড়ীতে পৌঁছলে রুক্মিণী বলল, একি ঠাকুরঝি, খবর না দিয়ে—

বাড়ীতে আসবো তারও খবর দিতে হবে!

কিন্তু অরবিন্দবাবুর মা যে একা রইলেন।

একা রইবেন কেন, ছেলে ফিরে এসেছে।

তাই নাকি, তবে একা পুরুষ মানুষে কি করবে। একজন নার্স রাখে না কেন?

তাতে ভুল হয়নি বউদি, নার্স রেখেছে বই কি।

কাকে, সেই শুভ্রাকে নাকি?

কি করে বুঝলে বউদি।

কেন, তোমার মুখ দেখে।

কি করে বুঝলে?

শুভ্রা এসেছে বলেই তুমি চলে এলে।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। গিয়ে দেখি ছেলে জেলে গিয়েছে। এদিকে শুভ্রা স্বয়ম্বৃতা হয়ে এসে রুগীর মাথায় বরফের থ'লে চাপাচ্ছে। আর প্রয়োজন নেই বলে তাকে বিদায় করে দিলাম। ওদিকে জেল থেকে ফিরেই এসেই বলল, আপনি এসব করছেন কেন, শুভ্রা কোথায়? সে যে আমাকে জানিয়েছিল এসে মায়ের ভার নিয়েছে। তখনি জরুরি তলব আর নির্দিষ্ট অভিনেতার মতো শুভ্রার আবির্ভাব। আমি থাকবো কেন!

এই বলে বসে পড়লো একখানা চেয়ারে, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রুক্মিণী বলে উঠল—ঠাকুরঝি! সম্বোধনটি বাষ্পগূঢ়।

এতক্ষণ সহ্য করে আসছিল মলিনা, ঐ স্নেহ ও বিস্ময়ময়, সম্বোধনটির আঘাত আর সহ্য করতে পারলো না, দুই হাতে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। অপ্রস্তুত রুক্মিণী পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো, মাঝে মাঝে ডাকতে লাগলো তার নাম ধরে। মলিনার কান্না আর থামে না।

কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী বল্‌ল, এতই যদি ভাই তবে তাকে না করে দিলে কেন?

হাতে মুখ ঢেকেই সে বল্‌ল, বাঃ, আমি কখন্ না করলাম।

তুমি নিজ মুখে অবশ্য না বলোনি, তবে তোমার ইঙ্গিতেই যে আমরা না বললাম।

মলিনা মরীয়া হয়ে উঠেছিল, বল্‌ল, ইঙ্গিত ইসারায় উপরে নির্ভর করতে গেল কেন, কেন গেল না আমার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে।

রুক্মিণী মৃদু পরিহাসের সঙ্গে বল্‌ল, সুভদ্রা-হরণের মতো, কি বলো!

আজ আর মলিনার লজ্জা সরম ছিল না, বল্‌ল, হাঁ তাই।

তবে তারপরেই বা এতদিন চুপ করে ছিলে কেন?

কেমন করে জানবো!

কি জানবে ভাই?

নিজের মন কি এত সহজে জানা যায়?

তা জানা যায় না সত্যি কিন্তু হঠাৎ এখন জানলে কি করে?

ঐ নার্স ছুঁড়িটার অত্যাচারে।

এবারে না হেসে পারলো না রুক্মিণী, বল্‌ল, এ দেশ বিচার তোমার।

হাসলে যে!

হাসবোনা! নিজে খাবে না আবার অপরকেও খেতে দেবে না।

তাই বলে উড়ে এসে জুড়ে বসবে!

জুড়ে যে বসেছে তার প্রমাণ তো পাওনি।

প্রমাণ আবার কাকে বলে। বিনা ডাকেই মায়ের সেবাতে আসে, আবার গোপনে জেলের মধ্যে চিঠি পাঠিয়ে মায়ের খবর দেয়, আবার জেল থেকে বের হ'তে না হতে এসে জোটে। আর ওদিকে পুরুষটিও কম যায় না, শুভ্রা তুমি কেন গিয়েছিলে, তোমার ভরসাতেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম জেলের মধ্যে, এসেছ এখন মায়ের ভার তোমার উপরে। এত প্রমাণের পরেও প্রমাণ পাইনি! হাসছ যে!

হাসছি এই ভেবে নিতান্ত বালিকার যোগ্য তোমার কথাগুলো।

তুমি বুঝবে না বউদি এই সব নার্স ছুঁড়িকে, ওরা শিকারী মেয়ে, রুপীর ফাঁদ পেতে শিকার ধরে।

তুমি অবিচার করছ শুভ্রার প্রতি, আমি তো তাকে দেখেছি, সে মোটেই সে শ্রেণীর মেয়ে নয়।

তোমরা সবাই ওর দলে, ফরসা রঙে জগজ্জয়।

তা হ'লে তোমার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মলিনা। এমন সময়ে শচীন প্রবেশ করে ঘরে।

কে মলিনা নাকি! কাঁদছে কেন ?

রুক্মিণী বল্ল, সর্দি লেগেছে তাই স্বরটা ভারি, নাকে মুখে চোখে জল।

অরবিন্দবাবু জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ী ফিরে'ছন বলে মলিনা চলে এলো।

বেশ করেছে। আমার মনে হচ্ছে দিনাজশাহীর দলও শীঘ্রই বগুড়ার জেল থেকে খালাস পাবে।

হঠাৎ সরকারের এখন সুমতি ?

গরজ। নূতন ইণ্ডিয়া অ্যাকট চালু করতে হ'লে কংগ্রেসের হাজার হাজার লোক জেলে আটকে রাখা চলে না, তাই বললাম গরজ।

না বাপু, আমি তোমাদের পলিটিক্স বুঝতে পারি না।

আর বুঝে কাজ নেই। কি মলিনা, তোর শরীর ভালো তো ?

এক রকম।

অরবিন্দর মা সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন ?

এখনো সম্পূর্ণ সারেন নি।

ক্রমে সেরে উঠবেন। শুভ্রা আছে তো, তা হ'লেই হ'ল।

আবার শুভ্রা, সকলের মুখে শুভ্রা, সে যেন কেউ নয়, সে যেন কিছু করেনি। সে উঠে চট করে দাদাকে একটা প্রণাম সেরে বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করলো —এতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের ঘরে।

শচীন উঠে ভিতরে যেতে উদ্যত অরবিন্দদের বিস্তারিত খবর জানবার আশায়, এমন সময়ে প্রবেশ করলো ভূপতি। শচীন বল্ল, এসো, এসো, আজ এত সকালে যে ?

ভূপতি বলল, ছুটির সকাল, তাই ভাবলাম শচীনের কাছে যাই, একটু দেশের চিন্তা করা যাক।

অতি উত্তম প্রস্তাব, তবে দেশের চিন্তার অতি উৎকৃষ্ট সহায়ক গরম চা।

বেশ নিয়ে আসতে বলো।

শুনেছ, অরবিন্দকে ছেড়ে দিয়েছে।

আগে শুনিনে—এই শুনলাম। এটাও আমার জিজ্ঞাসার বিষয়, আর শুধু অরবিন্দকে নয়, গুদাম সাবাড় করে সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছে—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, হঠাৎ কেন এই উদারতা?

প্রশ্ন যখন তুমি করলে উত্তরটাও না হয় তুমিই দাও।

আমার উত্তর তোমার পছন্দ হবে না।

না হ'লে জানাবো।

সরকার এখন চায় যে নূতন ইণ্ডিয়া অ্যাক্টটা দেশে চালু হোক, তবে জানে যে কংগ্রেসীদের জেলে আটকে রেখে তা সম্ভব নয়।

তা হ'লে বুঝতে হবে কংগ্রেস বেশ শক্তিশালী।

কে অস্বীকার করছে সে কথা?

এক সময়ে তুমিই অস্বীকার করতে।

করতাম শচীন, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর পেলাম না। এই শক্তির কি অপব্যয় হচ্ছে না কংগ্রেসের পক্ষ থেকে?

আর একটু বুঝিয়ে বলো, আমি তো দেখছি ক্রমেই অধিকতর শক্তিমান হয়ে উঠছে কংগ্রেস।

সে কথাও মানতে রাজি আছি। শক্তি বাড়বে সত্য কিন্তু সব শক্তি যদি একদিকে না টানে তবে বিপরীত টানাটানিতে শক্তি কি মাঠে মারা যাবে না?

বিপরীত দিকে টানাটানি হবে কেন? নামত না হ'লেও কংগ্রেসের কর্তা একমাত্র গান্ধীজি।

সেদিন বুঝি আর থাকে না।

কেন?

এমন অশুভ লক্ষণ দেখলেও মানতে চাও না। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের প্রধান কারা? গান্ধীজি, রাজাগোপালাচারি, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেহরু আর সুভাষবাবু।

ঠিক কথা, এবারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীর ইয়েস ম্যান হিজ মাস্টারস্ ভয়েস, ওঁদের

আলাদা করে ধরবার প্রয়োজন নেই। রাজাজি কালো চশমার ভিতর দিয়ে কোন্ দিকে তাকান, কার দিকে তাকান ঠিক বুঝবার উপায় নেই—ওঁর কথাও ছেড়ে দাও। বাকি রইলেন নেহরু আর সুভাষ বাবু।

উত্তম বিশ্লেষণ। ওরে আর একদফা গরম চা নিয়ে আয়।

ভূপতি বলতে লাগলো, নেহরু ইউরোপ থেকে ফিরে এসে সোসালিজম মন্ত্র আউড়াচ্ছেন, সোসালিজম না হ'লে নাকি দেশের গত্যন্তর নেই। আর লোকের কথায় যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বলতে হয়, সুভাষবাবু নাকি ধীরে ধীরে এক-নায়কবাদের দিকে ঝুকছেন।

বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় তোমার কথা স্বীকার করে নিলাম—ক্ষতি কি?

ক্ষতি এই যে দেশে যত ইংরেজ আছে সরকারী, বেসরকারী, আধা সরকারী সকলেই একদিকে টানছে, আর আমাদের টান ভাগাভাগি হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—ক্ষতি এই।

দেখো ভূপতি, কংগ্রেস একটা পার্টি নয়, কংগ্রেস একটা প্ল্যাটফর্ম। এখানে সব দলের সব মতের লোকের স্থান, যারা হিংসায় বিশ্বাসী তারাও তো বারে বারে কংগ্রেসের ডাকে এসে জেলে গিয়েছে। এক নিতান্ত লিবারেল ছাড়া সকলেই কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয়। তোমার কথাই ধরো না কেন, তুমি অহিংস পন্থায় বিশ্বাস করো না—তুমিও কি কংগ্রেসের ডাকে জেলে যাওনি?

গিয়েছি তার কারণ গান্ধীর মতে যাদের বিশ্বাস নেই তারাও তাঁর জাদুতে মুগ্ধ হয়। আমার জেলে যাওয়ার মূলে কংগ্রেসের নীতি নয়—গান্ধীর ব্যক্তিগত জাদু। কিন্তু তাঁর জাদু মন্ত্রের ফলে হিংসাবাদীদের হাত কি দুর্বল হয়ে পড়ছে না, কত হিংসাপন্থী অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করেছে—এই আমাদের অরবিন্দর কথাই ধরো না কেন।

সেই সঙ্গে আমাদের ভূপতি বিশ্বাসের কথাটাও ধরতে হয়।

না ভাই, আমি এখনো মনে প্রাণে সহিংস বিপ্লবী, তাই না চট্টগ্রামের ফেরারী কৈলাস এত জায়গা থাকতে আমার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়।

চট্টগ্রামের কথাই যদি ওঠালে তবে সেই সঙ্গে মনে করো চট্টগ্রামের সহিংস বিপ্লবীদের প্রশংসা কি গান্ধীজি করেননি?

অবশ্যই করেছেন, তবে সে তাদের দেশপ্রেমের, আত্মত্যাগের আর সাহসিকতার পন্থার নয় আর সেই জন্যেই সরকারের বিশ্বাস মুখে তিনি যতই অহিংসার কথা প্রচার করেন, সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর তলে তলে যোগ।

ভাই শচীন, পন্থার প্রশংসাই প্রশংসা, অন্য গুলোর মূল্য কি?

মূল্য অপরিসীম। ও রকম দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস, কয়জন গান্ধী-পন্থীর আছে ?

কেন, তোমারই বা কম কি ?

ভুল করলে ভূপতি, আমি গান্ধীপন্থীও নই, আবার গান্ধী-বিরোধীও নই, মনে মনে এখনো আমি স্যুরেন বাঁড়ুজ্জের পতাকাবাহী। স্বদেশী আন্দোলনের মতো মহাবিপ্লব এদেশে আর কখনো ঘটেনি। পরবর্তী সমস্ত বিপ্লব মায় গান্ধী-বিপ্লব বীজাকারে ছিল এই মহা-বিপ্লবের মধ্যে।

সেই মহাবিপ্লবের পরিণাম কি নূতন ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ ?

ক্ষতি কি, নানারকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তো ইতিহাস এসেছে।

শচীন, ইতিহাসে আগুপিছু নেই আছে চক্রাবর্তন। তোমার স্যুরেন বাঁড়ুজ্জের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ চক্রাকারে ঘুরে দেখা দেবে নূতন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে।

অপেক্ষা করেই দেখো না, কংগ্রেস কি করে।

কি আর করবে ইংরেজের টোপ গিলবে। স্বীকার করছি কংগ্রেসে খাঁটি লোক অনেক আছে তবে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে মেকি, তাদের কানটা মহাত্মাজী জয়ের দিকে মনটা বাতাসার ঝুড়ির উপরে।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ভূপতি, তোমাদের সহিংস বিপ্লবে দেশ স্বাধীন হলে কি রাজ্য শাসনের ভার নিতে হতো না ?

হতো, তবে সে এ রকম দানেপাওয়া শাসন ভার নয়। সত্যি বলছি শচীন, আমি তোমাদের মহাত্মাকে বুঝতে পারি না। প্রথমতঃ এক বছরে স্বরাজ দিলেন। তারপরে দিলেন সুতো কাটা স্বরাজ ; তার পরে এলো লবণ সত্যাগ্রহ, ঘোষণা করলেন হয় স্বরাজ নয় আমার দেহ আরব সমুদ্রে ভাসমান হবে। এবারে নূতনতম পালা হরিজন উন্নয়ন, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে হরিজন উন্নয়ন উপলক্ষ্যে দেশে এক নূতন জাতের সৃষ্টি করেছেন। বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে হবে। একেই আমাদের শাস্ত্রে বলে লীলা।

ভূপতি, তোমার কথা শুনে বুঝতে পারি না এ নিন্দা না প্রশংসা।

ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। লোকটাকে ছাড়তেও পারি না, ধরতেও পারি না। নিন্দা করি তবে সে কেমন যেন গোড়া-আলগা নিন্দা, প্রশংসা করি সেটাও কেমন যেন কমজোরি। সবশুদ্ধ মিলিয়ে কেমন যেন নানা-বিরুদ্ধ গুণের ধাঁধা। বেঁচে থাক আমাদের সুভাষবাবু, তার মধ্যে এমন স্বতো-বিরুদ্ধ

ভয় নেই—একবগ্‌গা তাঁর গতি।

ভূপতি, সুভাষবাবু বেঁচে থাকবেন, কিন্তু মরেছ তুমি। তোমার অবস্থা এখন রবিবাবুর সেই ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা বুড়োর মতো—সব ঝুটা হায় হেকে যে সকলকে সতর্ক করে দিত। আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাচ্ছি একদিন মাথা মুড়িয়ে গান্ধীজির পায়ে গিয়ে পড়বে। আমাকে যেমন দেখছ তেমনি থাকবো, বেঁচে থাকুন আমার সুরেন বাঁড়ুজ্জে।

ভূপতি কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো লব আর কুশ।

বিস্মিত শচীন বলে উঠ্‌লো, আরে তোরা কোথা থেকে হঠাৎ?

বগুড়া থেকে।

তোরাই শুধু—?

না, দাদা, বীরেনবাবু, সুধীরবাবু সবাই আছেন। ওঁরা স্টেশন থেকে গাড়ীতে আসছেন, আমরা ছুটতে ছুটতে আসছি—বলে কথান্তর না করে তারা অন্দর মহলে দিকে চলে গেল।

ওরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো যজ্ঞেশবাবু গাড়ী থেকে নামছেন, সঙ্গে বীরেন চৌধুরী আর সুবোধ।

সকলে প্রণাম করলো, বল্‌ল, খবর না দিয়ে!

খবর দেবার সময় দিল কই। সন্ধ্যাবেলায় এসে বল্‌ল, আপনাদের সকলকে এখনি যেতে হবে বলে পাল্কী গাড়ীতে তুলে নিয়ে চল্‌ল, ভাবলাম না জানি আবার কোন জেলে নিয়ে যাবে। স্টেশনে এনে দিনাজশাহীর ট্রেনে তুলে দিয়ে এক গোছা টিকিট আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—আপনাদের খালাসের হুকুম হয়েছে। এর মধ্যে খবর দেব কি করে?

আসুন ভিতরে আসুন।

বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, একেবারে গুদাম সাবাড় অবস্থা।

সুধীর বল্‌ল, বগুড়া জেলে জন পঞ্চাশেক সত্যাগ্রহী ছিলাম—সব খালাস।

চলো হে বীরেন ভিতরে যাওয়া যাক, দেখা যাক চা পাওয়া যায় কিনা। লব কুশ এসেছে তো?

তারাই তো এসে খবর দিল।

বাইরে লোক-সমাগমের খবর পেয়ে মলিনা ও রুক্মিণী এসে যজ্ঞেশবাবুকে প্রণাম করে সকলকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

লব কুশ কোথায় রে?

মলিনা বল্‌ল, যথাস্থানে।

তার মানে ?

পেয়ারা গাছের উপরে, কাঁচা পাকায় অনেকগুলো অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে।

সকলে হেসে উঠ্‌ল।

৪৫

আমাদের গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবন যখন ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে মন্দগতিতে চলছিল, দেশের ইতিহাস চলছিল লম্বা দশকুশি ধাপ ফেলে। তিনবার গোলটেবিলে বৈঠক হয়ে নূতন ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ হয়ে গিয়ে সর্বভারতীয় নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। তার আগে যাবতীয় সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, কারণ ব্রিটিশ সরকার বুঝেছে এ নাটের গুরু কংগ্রেস, কংগ্রেসীদের আটকে রেখে নূতন সংবিধান চালানো সম্ভব নয়। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে নিরঙ্কুশ কংগ্রেসের প্রাধান্য, বাংলা দেশে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হ'লেও একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। কংগ্রেসের সম্মুখে সমস্যা হ'ল কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে কিনা। অনেক টালবাহানা করে মুখ্যত গান্ধীজির পরামর্শে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলো, তবে সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটকে জানিয়ে দিল তিনি যদি নিরঙ্কুশভাবে স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে কংগ্রেস মন্ত্রীপদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। কংগ্রেসের অনেক প্রধান ব্যক্তি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে দ্বিমত ছিল। তবে ঠিক সে কারণে না হ'লেও, নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি মন্ত্রীপদ গ্রহণ করলেন না, অবশ্য রাজাজি মুখ্যমন্ত্রী হলেন মাদ্রাজ প্রদেশে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ সঞ্চার হতে আরম্ভ করেছে। কংগ্রেসের কর্তৃত্ব যাদের হাতে তাদের সতর্ক করে দিলেন সুভাষচন্দ্র ;—যুদ্ধ আসন্ন, এই সুযোগ, অতএব প্রস্তুত হোন। নেহরু সর্বদা যেমন এবারেও তেমনি, তিনি দ্বিমত ; বৃহৎ পৃথিবী ও স্বদেশ দুইকে মিলিয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, তাই তাঁর মনঃস্থির করতে বিলম্ব হয় ; তিনি ভারতীয় রাজনীতির প্রিন্স হ্যামলেট। গান্ধীজি কি অর্থে যে কোন্ কথা বলেন ইংরেজ বুঝতে পারে না, কেউ ভাবে লোকটা নিতান্ত ভণ্ড, কেউ ভাবে গূঢ়গর্ভ রাজনীতিক। তিনি বললেন, শত্রুর বিপদের সুযোগ নেওয়া সত্যাগ্রহীর পক্ষে অকর্তব্য। ইংরেজ আশ্বস্ত হল না, দেশের লোক বিশ্বস্ত হ'ল না, গান্ধীজি চরখায় সুতো কাটতে লাগলেন।

এবারে কিছু পিছিয়ে যেতে হ'ল। কংগ্রেস প্রধানদের সঙ্গে মতভেদ ঘটায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতিপদ পরিত্যাগ করেছেন, তবে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন নি, ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি দল তৈরি করেছেন, সেটি কংগ্রেসেরই একটি শাখা। ভূপতি সরাসরি ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছে; শচীন ও নৃপতির সেই দিকে ঝোঁক হ'লেও এখন পর্য্যন্ত মনস্থির করতে পারেনি। খুব সম্ভব নিষ্ক্রিয়ভাবে কংগ্রেসেই থেকে যাবে; অরবিন্দ কংগ্রেস আঁকড়ে পড়ে রইলো। আর যজ্ঞেশবাবু বারে বারে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও নির্বাচনে দাঁড়াতে সম্মত হলেন না, জানালেন নির্বাচনে দাঁড়ানো বুড়ো মানুষের কাজ নয়, আমি কংগ্রেসের সেবক হয়েই রইবো, পদাধিকারী হতে চাইনে। তবে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য বশতঃ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করলেন না। লব ও কুশ কংগ্রেসের উৎসাহী ভলান্টিয়ার হয়ে রয়ে গেল। এ পর্য্যন্ত ইতিহাস। ইতিহাস যেখানে থামে কাহিনীর সেখানে সূত্রপাত।

অক্ষয় ফৌজদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অল্ বেঙ্গল লোন আফিসের আড্ডাটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রবীণ সদস্যরা সকলেই মৃত, নবীন সদস্যগণের মতিগতি আড্ডার পোষক নয়, কালধর্মেই হোক আর স্বভাবধর্মেই হোক তাদের জমার অঙ্কের চেয়ে খরচের অঙ্কের দিকে বেশি ঝোঁক, তা ছাড়া কংগ্রেসী যে কয়জন সভ্য ছিল তাদের উপস্থিতি নিয়মিত নয়, বীরেন চৌধুরী ও সুধীর চৌধুরী জেলা কংগ্রেসের পদাধিকারী, অনেকটা সময় কাটে তাদের জেলে, ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে আবার জেলে যাওয়ার প্রস্তুতি করেন।

যজ্ঞেশবাবু নির্বাচনে দাঁড়াতে অসম্মত হ'লে তাঁর বদলে দাঁড়ালেন বীরেন চৌধুরী, নির্বাচনে জিতলে অল্ বেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হ'ল, বলা যেতে পারে সেটিই আড্ডার শেষ অধিবেশন, কারণ ইতিমধ্যে যে গাছটিকে অবলম্বন করে এই পরগাছার অবস্থিতি সেই মূল গাছটির অবস্থা মুমূর্ষু। ব্যাঙ্কিং কারবার বলতে যা বোঝায় এই সব লোন অফিস তার কিছুই করতো না। ব্যাঙ্ক নামধারণ করে এরা আসলে মহাজনী কারবার করতো। পাট বুনবার আগে এসব লোন অফিসে অসম্ভব সুদে চাষীদের ঋণ দিত, পাট উঠলে আদায় করে নিত সুদে আসলে। ১৯৩২-৩৩ সালের পৃথিবী ব্যাপী মন্দার ফলে পাটের দাম কমতে কমতে ২।৩ টাকায় এসে ঠেকল। পাট কাটবার খরচও কুলোয় না। অনেক চাষী পাট কাটলো না। ক্ষেতের পাট ক্ষেতে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল, লোন অফিসগুলোর লগ্নী টাকাও সেই সঙ্গে শুকিয়ে মাঠে মারা গেল। সরকার সুযোগ পেয়ে রটিয়ে দিল গান্ধীর সত্যাগ্রহের

ফলেই পাটের দর পড়ে গিয়েছে, উল্টো প্রচার যারা করতে পারতো তারা সবাই জেলে। এ হেন অবস্থায় একমাত্র বনস্পতি হরিপদ দত্ত উকীল। জোন অফিসের অবস্থা বুঝতে পেরে তার আমানতী সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে কলকাতার এক বড় ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করলো। ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও সঙীন হয়ে উঠ্‌ল। কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারে না, আমানতকারীদের সুদ দেওয়া দূরে থাক আসল অবধি দিতে পারে না। হরিপদ বুঝলো আর দেরী নয়, এবারে তারা চক্রবর্তীর বাবদ টাকাটা তুলে নেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে তার সংসারের ভার বেশ হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বয়স্কা মেয়ে দুটি বুঝেছিল বিয়ের জন্য বাপ টাকা খরচ করবে না, ভরসা নিজেদের উপরে। কাজেই তারা পাড়ার দুটি ছোকরার সঙ্গে বের হয়ে গেল। একটি ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। প্রতিবেশীরা বল্‌ল, দত্ত মশাই রোগ বেঁকে দাঁড়িয়েছে, চিকিৎসা করুন। হরিপদ বল্‌ল, চিকিৎসার হদ্দ করেছি, এখন ভগবান ভরসা। ভগবান ছেলেটিকে টেনে নিলেন। অন্ধ ছেলেটি নিজের পথ দেখ্‌ল।

উন্মাদ স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো, বাড়ী খালি কেন, ছেলে-মেয়েরা সব গেল কোথায়?

হরিপদ বল্‌ল, সবাই কাজে বেরিয়েছে এখনি ফিরবে।

চাকর গেল কোথায়।

বাজারে গিয়েছে।

হরিপদ বুঝলো আর দেরী করা নয়, এবারে সরে পড়া উচিত। একবারে মনের মধ্যে খোঁচা মারলো, অসহায় উন্মাদ স্ত্রীর কি গতি হবে। তখনি মনে পড়লো, পাড়ায় যে "সহায়ক সমিতি" আছে তারাই দেখবে অসহায়কে, আর সকলের উপরে ভগবান আছেন তিনি দেখবেন, তুমি আমি কে।

একদিন ভোর বেলায় রাধার নামের আমানতী সমস্ত টাকার চেক দাখিল করলো ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বিনোদ চক্রবর্তী বল্‌ল—এত টাকা আপনাকে দেবো কেন?

বিস্মিত হরিপদ বল্‌ল, তুমি কি জানো না রাধার অ্যাকাউন্টের টাকা লেন-দেন করবার অধিকার আমাকে দিয়েছেন রাধার মা, কতবার টাকা তুলে নিয়েছি তোমার হাত দিয়েই।

তুলে নিয়েছেন সত্য, একবারও জমা দেননি।

তাতে তোমার কি? আইন মোতাবেক চলো।

না দত্ত মশাই, রাধার মা নিজে এসে উপস্থিত না হলে এত টাকা আপনাকে

তে পারবো না।

অবাক করলে হে। পর্দানসিন সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রকাশ্যে আসবেন ব্যাঙ্কে। ার বেশি যদি তেরিমেরি করো তবে আজই আদালতে গিয়ে উকীল ঘরে টিয়ে দেবো লোন অফিস আমানতী টাকা দিতে পারছে না, ফেল পড়েছে, লই লাল বাতি জ্বালাতে হবে তোমাকে।

লাল বাতি জ্বালাবার আর দেরী কি ! আচ্ছা, আজ রাতে একবার আমার ড়ীতে যাবেন।

রাতে তাদের মধ্যে কি কথা হ'ল তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারলো না।

এদিকে অরবিন্দ পরপর দু'খানা চিঠি লিখেছে শচীনকে। তার মর্ম এই কম, শচীনদা, মায়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, আর যে সেরে উঠবেন এমন াশা নেই। আমার অনেকটা সময় কাটে কলেজে, একমাত্র ভরসা শুভ্রা, নে রাতে সমস্ত ভার তার উপরে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে সে কিছুতেই কা নেবে না। বলে তার বাবা, আর দুই ভাই স্বদেশী আর সত্যাগ্রহে ারা গিয়েছেন—আমার মতো স্বদেশী আর তোমার মতো সত্যাগ্রহীদের কাছে কে টাকা নিলে অধর্ম হবে। আমি বললাম, তোমার তো চলা চাই, সে বলল কন এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন এ কোন কাজের কথা নয়। খন এক উপায় আছে, তা আপনার হাতে। ওখান থেকে আপনাদের পরিচিত কান বর্ষীয়সী মহিলাকে যদি পাঠাতে পারেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যেও তাহলে আমি শুভ্রাকে ছুটি দিতে পারি। অবশ্য তাতেও সে যাবে কিনা সন্দেহ, সে ত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছে মাকে। শুভ্রা অবসর সময়ে আবার কাছে বসে গল্প রে, তার বাপ স্বদেশী করতে জেলে মারা গিয়েছেন, ছোট ভাই মারা গিয়েছে বণ সত্যাগ্রহে পুলিশের লাঠিতে, আর এক বড় ভাই ছিল, সে বিপ্লবী দলে যাগ দিয়েছিল, পিস্তলের গুলিতে মারা গিয়েছিল সে। অনেক সময়ে রবিন এসে যাগ দেয়—রাবনকে তো দেখেছেন। এক সময়ে সে-ও বিপ্লবী দলে ছিল, খন ছেড়ে দিয়েছে—বলে যে আমার দৃষ্টান্ত দেখেই, এখন তার সংসারী হওয়ার চ্ছা। সে যাই হোক আপনার পত্রের আশায় রইলাম, একজন বর্ষীয়সী হিলা যদি পাঠানো সম্ভব হয় তবে সব দিক রক্ষা হয়, মায়েরও দেখা শোনা হয়, আবার শুভ্রারও অযাচিত ঋণ থেকে মুক্তি পাই।

শচীন চিঠিখানা রুক্মিণী ও মলিনাকে পড়ে শোনালো। তারপরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কি বলো, আমি তো লোক দেখি না।

তিনজনেরই মনে হল, একমাত্র যে যেতে পারে সে হচ্ছে মলিনা,

যদিচ তিনজনেই বুঝতে পারলো মলিনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ পরে রুক্মিণী বল্ল, এখন থাক, কালকে ভোরে ভাব্‌লেই চলবে।

রুক্মিণী উঠে দাঁড়ালো, বাইরে যাওয়ার সময়ে মলিনাকে ইঙ্গিত করলো তার সঙ্গে আসতে। তারপরে মলিনার ঘরে গিয়ে বসে বল্ল, মলিনা ভাই, তোমাকে ছাড়া তো আর কাউকে দেখি না, তুমি যাও না।

বউদি, এ কি কখনো সম্ভব!

কেন নয়?

কেন নয় আমিও যেমন জানি তুমি তার চেয়ে কম জানো না। তারপরে সমাধানের কণ্ঠস্বরে বল্ল, না, তা আদৌ সম্ভব নয়।

তবে আর কি হবে। বলে প্রস্থান করলো রুক্মিণী। শুয়ে পড়লো মলিনা।

শুয়ে পড়লো কিন্তু ঘুমোল না, এ-পাশ ও-পাশ করে চিন্তা করতে লাগলো।

অরবিন্দর প্রতি তার মন বিমুখ নয়—বাধা সৃষ্টি করেছিল রমণী চৌধুরীর স্মৃতি। সেই দুর্লঙ্ঘ্য স্মৃতিটা মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে আজ তো স্বাভাবিক ভাবেই অরবিন্দর বাড়ীতে তার স্থান। তখন মনে হ'ল সেই স্থানটি অধিকার করবার চেষ্টা করছে শুভ্রা। যে বিনা ডাকে আসে, বিনা পয়সায় খাটে, আবার অরবিন্দ লিখেছে তাকে বিদায় করলেও হয়তো যাবে না। মলিনা ভাবলো, এ সব কিসের লক্ষণ। মেয়েছেলে হয়ে কি তা সে জানে না। আরও জেনেছে বিপদের মুখে ঘনিষ্ঠতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুখের গতি ধীর, দুঃখের দ্রুত। একবার ভাবলো যাই না চলে, আর কিছু না হয় সেই দ্রুত ঘনিষ্ঠতার পথে বাধা সৃষ্টি করা যাবে। হাঁ যাবেই সে, অরবিন্দকে পাওয়ার আশায় নয়, সেটা অসম্ভব। তবে শুভ্রা যাতে তাকে করতলগত করতে না পারে সে চেষ্টা করবে। হাঁ সে যাবে, কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই সিদ্ধান্ত রুক্মিণীকে জানায় কোন্ মুখে, একবার দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছে যে। সেই ভ্রম সংশোধনের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরবেলা যখন তিন জনে চায়ের টেবিলে মিলিত হ'ল শচীন বল্ল, দেখো আমি বলি কি ওখানে রাধার মাকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

রুক্মিণী বল্ল, সে যে পাগল!

না, তাঁর যা অবস্থা তাতে তাঁকে পাগল বলা যায় না। নিদারুণ আঘাতে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন।

তার উপরে আবার এসেছে রাধার মৃত্যুসংবাদ।

সে আঘাত যতই মর্মান্তিক হোক সেটা মন্দর ভালো। যাকে তিনি কলঙ্ক

ভেবেছিলেন রাধার আত্মত্যাগে তিলক হয়ে উঠেছে তা।

মলিনারা উত্তর করলো না।

তাছাড়া স্থানান্তর হ'লে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে একেবারে সেরে উঠবেন আমার বিশ্বাস।

মলিনারা বুঝলো যুক্তির মধ্যে কিছু সার আছে।

তোমরা দুজনে গিয়ে একবার দেখেই এসো না তাঁর ভাবগতিক কি রকম।

সেই সিদ্ধান্তই স্থির হ'ল। মনে মনে দুঃখ পেলো মলিনা সেই সঙ্গে স্বস্তিও—যাওয়ার কথা মুখ ফুটে বলতে হ'ল না, ভাবলো তৃতীয় ব্যক্তি গিয়ে পড়লে শুভ্রা আধিক্যেতা করবার সুযোগ পাবে না।

মলিনা ও রুক্মিণী রাধার মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো।

আগের দিনে পাড়ার ছেলেরা এসে রাধার মাকে ধরেছিল, বলেছিল, মাসিমা রাধাদি তো স্বর্গে গিয়েছেন, কাগজে কাগজে কত সুখ্যাতি, আমাদের শহরের—

একজন বাধা দিয়ে বল্‌ল, শহরের কেন আমাদের জেলার—

আর একজন বাধা দিয়ে বল্‌ল, শুধু জেলার কেন, সমস্ত দেশের তিনি গৌরব। এখন তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে আমাদের কিছু করা দরকার।

রাধার মা অনেক ধীর স্থির হয়েছিলেন, এখন মেয়ের প্রশংসায় প্রফুল্ল হয়ে বললেন, তা কি করবে ভাবছ বাবা?

একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা।

অন্য একজন বল্‌ল, মূর্তি প্রতিষ্ঠায় কি হবে—সভা করবার মতো বড় হল নেই, শহরে একটা বড় দেখে হল ঘর করা যাক—

নাম হবে রাধা নিকেতন মন্দির—

ওকি একটা নাম হলো, নাম দিতে হবে রাধা সৌধ—

বরঞ্চ রাধা নিকেতন বেশ মানানসই হয়।

পরের পয়সায় নামকরণে কার্পণ্য করা চলে না।

কিন্তু টাকার দরকার যে অনেক!

এতক্ষণ রাধার মা নীরবে শুনছিলেন, এবার আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, টাকার অভাব হবে না বাবা, সব টাকা রাধার নামে আছে, এক পয়সাও খরচ করিনি।

তবে আমাদের সঙ্গে একবারটি লোন অফিসে চলুন, এত টাকা আপনি না গেলে দেবে কেন?

টাকা কার হাতে দেব বাবা ?

বোঝা গেল রাধার মা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

যজ্ঞেশবাবুর হাতে দেবেন।

তা হ'লে চলো বাবা লোন অফিসে।

রাধার মাকে নিয়ে একদল লোন অফিসে রওনা হল, কয়েকজন গেল যজ্ঞেশ-বাবুর বাড়ীতে।

লোন অফিসে গিয়ে রাধার মা টাকা তুলবার দাবী করলে, বিনোদ চক্রবর্তী বলল, রাধার নামের সব টাকা তো কালকে হরিপদ দত্ত তুলে নিয়ে গিয়েছেন।

বিস্মিত ছেলের দল বলে উঠল—সে কেমন হ'ল!

ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, এফিডেভিট করে তাকে টাকা তুলবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন কিনা।

রাধার মা কিছুই বুঝতে না পেরে মূঢ়ের মতো বসে রইলেন।

একজন ছেলে, সে আইন পড়ে, বলল, দেখি কেমন এফিডেভিট ?

বিনোদ চক্রবর্তী হাত-বাক্স খুলে একখানা রেজিস্ট্রীকরা কাগজ ফেলেছিল।

ইতিমধ্যে যজ্ঞেশবাবু এসে উপস্থিত হলেন, সমস্ত কথা শুনে বললেন, এত টাকা দেবার আগে একবার রাধার মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন তো!

বিনোদ ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, স্যার, সরকারী কাগজের উপরে আবার জিজ্ঞাসা।

তা বটে, বললেন যজ্ঞেশবাবু। তারপরে বললেন, বৌঠান, আপনি বাড়ী যান, আমরা একবার হরিপদর বাড়ীর দিকে যাই।

হরিপদকে কোথায় পাওয়া যাবে। সে আগেই 'অনাগত বিধাতা' নীতি অনুসারে একপ্রস্থ খদ্দরের গেরুয়া কাপড় তৈরি করে রেখেছিল, গেরুয়ার চিরকালীন মান আর হালে খদ্দরের মান উচ্চ—কাজেই দুয়ে মিলে সাধুত্বের দুর্ভেদ্য বর্ম, সেই পোশাক পরে রাতের বেলাতেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

যজ্ঞেশবাবু গিয়ে দেখলেন হরিপদর বাড়ী খাঁ খাঁ করছে, কেবল একটা ভিতরের ঘরে শয্যার উপরে শয়ান তার অশক্ত উত্থানশক্তি-রহিত স্ত্রী। তাকে আর কি জিজ্ঞাসা করবেন।

ফিরবার পথে তিনি ছেলেদের বললেন, তোমরা দুঃখ করো না বাবা, আমরা কংগ্রেস থেকে রাধামায়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবো।

পরদিন মধ্যাহ্নে মলিনা ও রুক্মিণী রাধাদের বাড়ীতে এসে পৌছলো। দেখল বাইরের দরজা বন্ধ। পিছন দিকে গিয়ে দেখল একটা জানলা খোলা,

আর সেই খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেলো, গলার পরণের কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে রাধার মায়ের দেহ।

দুদিন পরে মলিনা রওনা হয়ে গেল কলকাতায়।

৪৬

মলিনাকে দেখে চমকে গেল অরবিন্দ। সে ভাবতে পারেনি মলিনা আসবে। তার চমক বিশ্লেষণ করলে স্বস্তির চেয়ে বিস্ময়ের ভাব বেশি পাওয়া যাবে। বলল, আপনি এলেন!

মলিনা বলল, একবার 'তুমি' একবার 'আপনি', যা হয় একটা স্থির করুন।

এর উত্তরও খুঁজে পায় না অরবিন্দ। যতক্ষণ সে যথাযথ উত্তর খুঁজছে মলিনা চলে গিয়েছে অরবিন্দর মায়ের কাছে। তিনি শয্যাশায়িনী। মলিনার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদের হাত তুলে বললো, মা, আমার কচ্ছপের প্রাণ বের হয় না মাঝ থেকে তোমাদের সকলের কষ্টের শেষ নেই।

কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন মা, এতে আর কষ্ট কি।

ব্যস্ত হ'ব না। ঐ শুভ্রা মেয়েটি আর জন্মে নিশ্চয় আমার মেয়ে ছিল। দিবারাত্রি খেটে মরছে, ও না থাকলে অরবিন্দর সময় মতো ভাত জুটতো না।

আর আমি বুঝি আপনার কেউ নই।

কি যে বলো মা। তোমাকে তো বউ ক'রে ঘরে আনতে চেয়েছিলাম, সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ঐযে শুভ্রা এসেচে—দেখো শুভ্রা, কে এসেছে?

শুভ্রা তার পায়ের কাছে প্রণাম করে বলল, দিদি, আপনি এসেছেন খুব ভালো হল।

শুভ্রাকে পরিবারের সুখ দুঃখের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে দেখে মলিনার মন খিন্ন হয়ে উঠেছিল. এখন তার কথাগুলোকে ব্যঙ্গোক্তির মতো মনে হল, শক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, হাঁ আপনার খুব কষ্ট গেল, এখন ক'দিন বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।

শুভ্রা জানতো তার মনের বিমুখতা কিন্তু এতখানি আশঙ্কা করেনি, ভাবলো এত সহজে হাতের পাশা ছেড়ে দিলে চলবে না। সে-ও তো মেয়ে-ছেলে। মেয়েরা রাজ্য ছেড়ে দিতে পারে, পারে না ঘরকন্নার দাবি ছেড়ে দিতে।

তার আঁচলে বাঁধা অনেকগুলো চাবি দেখে মলিনা বলল, আপনার হোস্টেলের ঘরে নিশ্চয় এতগুলো চাবি লাগে না?

না, এগুলো এবাড়ীর চাবি।

আপনার আঁচলে কেন?

মা অসুস্থ, চাবি আঁচলে বাঁধবার লোক তো আর নেই?

এখন আমাকে দিয়ে যেতে পারেন, আমি এসেছি।

মেয়েদের পক্ষে আঁচলের চাবি খোলা আঁচলের গাঁঠ খুলবার চেয়ে কম মর্মান্তিক নয়।

যাওয়ার আগে দিয়ে যাবো নিশ্চয়, কিন্তু দাদার মুখে থেকে না শুনলে তো যেতে পারি না, তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিনা।

তার হুকুমটা না হয় আমার মুখ থেকেই শুনলেন।

চললেন কোথায়! চাবির গোছাটা খুলে দিয়ে যান।

শুভ্রা না দিল চাবির গোছা, না বল্‌ল কোন কথা, সোজা বাইরের ঘরে গিয়ে চাবির গোছা অরবিন্দর হাতে দিয়ে বলল, দাদা, আমি হোস্টেলে চললাম।

সেখানে যে রবিন উপস্থিত ছিল লক্ষ্য করেনি শুভ্রা, তার অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে কখনো তার উপস্থিতি চোখে এড়াতো না।

অরবিন্দ বুঝেছিল ভিতরে একটা কিছু দুঃসহ কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, প্রশ্ন করলে মীমাংসা হবে না কেবল কাণ্ডটা দুঃসহতর হয়ে উঠবে। শুধু বল্‌ল, খেয়ে গেলে না!

শুভ্রা হেসে উত্তর দিল, আর কতদিন হোস্টেলের ভাত নষ্ট করবো। ভাববেন না, আমি গিয়ে খেয়ে নেবো।

অরবিন্দ বল্‌ল, দেখো, দিনকাল ভালো নয়, মুসলীম লীগের রাজত্ব, রাত্রিও অনেকটা হয়েছে, হেঁটে গিয়ে কাজ নেই, আমি বরঞ্চ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিই।

রবিন এগিয়ে এসে বল্‌ল, মিস চৌধুরী চলুন না, আমি ট্যাক্সি ধরে দেব।

শুধু ধরে নয় রবিন, তুমি ওকে হোস্টেলে পৌঁছে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হব!

শুভ্রা এতখানি আশঙ্কা করেনি, রবিন আশা করেনি এতটা।

ওরা রওনা হয়ে গেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ভিতরে গেল অরবিন্দ।

হোস্টেলে পৌঁছালে শুভ্রাকে দেখে পাচক জিজ্ঞাসা করলো, দিদি আপনার ভাত নিয়ে আসি?

সাধারণতঃ সে নিজের ঘরে খেতো।

না যোগীন, আমি খেয়ে এসেছি।

শুভ্রা শুয়ে পড়লো। অনিদ্রা তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথের সাথী। তার

মুখে সমস্ত বিস্বাদ লাগছিল। মলিনার ব্যবহার, অরবিন্দর অনায়াসে বিদায়দান, এ দুয়ে মিলে তার দেহ ও মন এমন বিকল করে ফেলেছিল যে ট্যাক্সির মধ্যে বিনা ভূমিকায় রবিন যখন তার হাত ধরলো বাধা দেবার শক্তি পর্যন্ত তার ছিল না। হাতখানা যেন তার নিজের নয় এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখলো। হোস্টেলের দরজায় এসে গাড়ী থামলে যখন নামতে যাবে, হঠাৎ একটা চাপ অনুভব করলো হাতের উপরে। হাতে কোন সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে সে নেমে গেল।

রবিন বল্ল, দিনকাল খারাপ আর পাড়াটাও ভালো নয়—এখন থেকে দরকার হ'লে আমি নিয়ে যাবো, ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

এ আগ্রহের কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি সে।

কিন্তু তার সবচেয়ে রাগ হ'ল অরবিন্দর উপরে। এ কি রকম ব্যবহার! বহু ভূমিকা করে প্রয়োজনের সময়ে ডেকে নিয়ে গেলেন, আর প্রয়োজন মিটতেই বিনা ভূমিকায় বিদায়! তার ষোল বছর বয়সের সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে সমস্ত পুরুষজাতি তার চোখে এক ছাঁচে ঢালাই, ইদানীং অরবিন্দকে ব্যতিক্রম বলে মনে হ'য়েছিল। এখন বুঝলো ভুল হয়েছিল—সবাই এক ছাঁচে তৈরি। কিন্তু বিশ্লেষণ করবার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না, এ রাগ না অভিমান! অভিমান বহুরূপী।

মলিনার উপরে সে অবশ্যই খুশী নয়, কারণ সে বুঝে নিয়েছিল শুভ্রাকে সে প্রতিযোগী মনে করে। হয়তো এমন অবস্থায় সে নিজেও এমনি ব্যবহার করতো। কিন্তু এমন অবস্থায় পড়বে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। একবার বনগাঁ থেকে রেলগাড়ীতে আসবার সময়ে চোখে পড়েছিল একটা মৃতদেহ নিয়ে দুটো শকুনির কাড়াকাড়ি। সে এ হেন প্রতিযোগিতায় রাজি নয়। আর যদি বা কখনো তার এমন উৎকট ইচ্ছা হয় তার হাতে যথেষ্ট সময় আছে, মলিনার চেয়ে সে আট-দশ বছরের ছোট।

এ দুজনের সম্বন্ধে তার বিচার শেষ হ'তেই মনে পড়ে গেল ট্যাক্সির মধ্যে রবিনের ব্যবহার। হঠাৎ চমকে উঠে বল্ল—তাই বটে। ষোল বছর বয়সে পুরুষের চোখে যে জ্বালা দেখেছিল এখন মনে পড়লো কিছুদিন থেকে সেই চাহনি যেন উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছে তার চোখে। তারই রূপান্তর ঐ হাত চেপে ধরা।

তার মনে হ'ল, পুরুষগুলো ভাবে কি? নার্সজাতীয় মেয়েরা কি এতই সহজলভ্যা! তারা ঝকঝকে পোশাক প'রে অবাধে অনায়াসে পুরুষরোগীর

গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্বদা হাসি লেগেই আছে মুখে, হাসির বদলে হেসে কথা বলছে, ব্যথার বদলেও হেসে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ডাক্তারদের সঙ্গে প্রসন্ন মুখে কথা বলছে, পরপুরুষের এই নিত্য সান্নিধ্য তাদের উপরে এক মায়া রসায়ন ছড়িয়ে দিয়ে তাদের যেন এক ঝাঁক চিত্রবর্ণ প্রজাপতির অস্তিত্ব দিয়েছে। কেবল ধরবার অপেক্ষা মাত্র, একটু ছুটোছুটি করাবে সেটুকু দাম বাড়িয়ে নেবার জন্যে, তারপরে অবশ্যই ধরা দেবে। ভাবে কি পুরুষগুলো! তখন মনে হ'ল ভাববেই বা না কেন। এমন দৃষ্টান্ত কি নেই? আছে বই কি। মীনা ও লীনার মতো মেয়েও তো আছে।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। মীনা ও লীনা নামে দুটি মেয়ে পাশ করে নার্সগিরির চাকরি নিয়ে এলো আর অল্প দিনের মধ্যেই অবলম্বন করলো প্রজাপতির ভূমিকা। শিকারীও গেল জুটে। দুটি ছোকরা বয়সের ডাক্তার এই উঠতি বয়সের নার্সের পিছন নিল, শাস্ত্রে যেমন লেখে আর ছায়াছবিতে যেমন দেখায় তেমনি হাসাহাসি, ছোটাছুটি ছলাকলা আরম্ভ হ'য়ে গেল। তারা ভাবলো, এ রকম অবস্থায় সবাই ভাবে আর কেউ দেখছে না। দেখছে সবাই, মেয়ে দুটি ভাবে অপরে না দেখলে এর আসল মজাটাই মাটি। নার্সমহলে এ নিয়ে হাসাহাসি, গা টেপাটিপি বিশেষ ধরনের একটু কাশি আরম্ভ হয়ে গেল। ডাক্তার মহলের এমনি ভাব যেন তারা কিছুই জানে না। কিন্তু জানে যে তা অপ্রত্যাশিতভাবে শীঘ্র প্রকাশ পেলো। ডাক্তার দুটির উপরে সরকারী নোটিশ পড়লো অবিলম্বে মেয়ে দুটিকে বিয়ে করতে হবে, নতুবা চাকুরিতে ইতি। বাঙালীর চাকুরি গেলে আর থাকে কি। কাজেই প্রজাপতিদ্বয়ের উপরে প্রজাপতির আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ল। আর এখানেই শেষ নয়—দম্পতিযুগল কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গেল সুদূর মফঃস্বলে। মজা এবারে সত্যিই মাটি হ'ল।

শুভ্রা অভিজ্ঞতার আঘাতে ঠেকে শিখেছে তারা প্রজাপতি নয়, প্রজাপতি তাদের ঐ ঝকঝকে পোশাক আর মাথার বিচিত্র ফুল। সেই প্রজাপতির ছদ্মবেশ খুলে ফেলে যখন তারা ঘরে এসে ঢোকে, বিছানায় শুয়ে পড়ে আর দশজন গেরস্ত মেয়ের সঙ্গে তাদের কোন ভেদ থাকে না। সংসারের দাবী, ভায়ের পড়বার খরচ, বোনের বিয়েতে সাহায্য, বিধবা মায়ের ভরণপোষণ, বিপত্নীক বৃদ্ধ পিতার সেবা, মহাজনের ঋণ শোধ—ছিন্ন জামা, জীর্ণ শাড়ী সমস্তই আছে, শতরকম অভাব অভিযোগে আর দশজনের মতোই তাদের জীবন চিহ্নিত।

অনেকদিন হ'ল শুভ্রা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ঠেকে এবং দেখে, ঠেকে সেই ষোলবছর বয়সের অভিজ্ঞতায় আর দেখে মীনা লীনার দৃষ্টান্তে, নার্সদের গতি ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে, একটু স্খলিত হ'লেই দুর্দশার চরম, চাকুরি যাওয়াটা নিতান্ত লঘুদণ্ড। মীনা লীনার তো শেষ পর্যন্ত সদ্‌গতি হয়েছিল। প্রথম যখন সে চাকুরিতে প্রবেশ করে কোন সহৃদয় প্রবীণা মেট্রন তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, তোমার উঠ্‌তি বয়স, আর তুমি রূপসী, খুব সাবধান বোন। এ পথের মোড়ে মোড়ে রত্নাকর ডাকাতের মতো অপেক্ষা করে আছে পুরুষের চোখ। একটা ঘটনা বলি শোন, একবার একটি ধনী রোগী এসে কেবিন নিয়ে রইলো, সেঁজুতির উপরে পড়লো তার দেখাশোনার ভার, সে উঠ্‌তি বয়সের রূপসী। ঐ ধনী রোগীটি জানতো কি ক'রে ঐশ্বর্যের কলাপ মেলে মেয়েছেলের মন ভোলাতে হয়। ধনী রোগী জানিয়েছিল তার সাতটা কারখানা, পাঁচটা পাটের কল, সাতচল্লিশখানা মোটর গাড়ী, দশখানা বাড়ী, অভাব কেবল গৃহিনীর। সরলা সেঁজুতি বিশ্বাস করলো, মুগ্ধ হ'ল। রোগী সেরে বাড়ী যাওয়ার পরে সেঁজুতির আর দেখা নেই। পরে শোনা গেল তার দুর্গতির চরম হয়েছে, শেষে থাকতো এক খোলার ঘরে। আর শেষবার তার সাক্ষাৎ পেয়েছিল এখানকার এক ডাক্তার আউটডোর রোগী হিসাবে যখন সে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল—অবশ্য এ হাসপাতালে নয়—এখানে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়! অতএব খুব সাবধান বোন খুব সাবধান। এ চাকুরি ক্ষুরের উপর দিয়ে হাঁটা, সামান্য পদস্খলনে পা কাটা তো তুচ্ছ কথা, সভ্য সমাজ থেকে নাম কাটা যায়। আমার এক-একবার কি মনে হয় বোন জানো, যে শয়তান বিধাতার ছদ্মবেশে রোগের সৃষ্টি করেছে—তারই আর এক কীর্তি নার্সগিরি পেশা।

এতদিন পরেও ভোলেনি সেই উপদেশ শুভ্রা। আর ভুলবেই বা কি ক'রে, প্রথমে ঢুকতেই পদস্খলন হওয়ার মতো হয়েছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেই ডাক্তার, তখন যাকে মনে মনে দিয়েছে ধিক্কার এখন তাকে দেয় প্রশংসাবাদ।

দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে জেগে উঠ্‌ল শুভ্রা,—কি রামযশ খবর কি ?

সে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, বাবু দেখা করতে এসেছেন।

কাগজ পড়ে শুভ্রা বল্‌ল, বাবুকে বলো গিয়ে আমার মাথা খুব ধরে রয়েছে, এখন দেখা হবে না।

রামযশ চলে গেলে কাগজের টুকরোখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। কাগজখানায় লিখিত ছিল—রবিন।

রবিন স্থায়ীভাবে বিপ্লবী দল ত্যাগ করেছে। চৌরিচৌরার ঘটনায় মোহভঙ্গ হ'লে বিপ্লবী দল আবার যখন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলো আর দশজনের মতো রবিনও ফিরে গেল বিপ্লবী দলে। এই সময়ে একবার তার দেখা হয়েছিল অরবিন্দর সঙ্গে। তারপরে দীর্ঘকালের ছেদ ছু'জনের মধ্যে। এবারে বিপ্লবী দলে ঢুকে সে দেখল আগের মতো উৎসাহ আর উন্মাদনা অনুভব করতে পারছে না, মনে হ'ল এ সমস্তই পণ্ডশ্রম। কেন এমন পরিবর্তন তার হ'ল বিশ্লেষণ করবার শক্তি বা ইচ্ছা তার ছিল না, থাকলে বুঝতে পারতো মাঝখানে কয়েক বছর স্বাধীন সংসারী জীবন যাপন করবার ফলেই এমন পরিবর্তন ঘটেছে। আরও অনেকের হয়তো ঘটেছে, তবে চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক বা পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক তারা দলে রয়ে গেল। রবিন দল ছাড়লো, গোপনে নয় জানিয়ে শুনিয়ে, দলের কর্ত্তা আপত্তি করলেন না। তার কারণ দলের মধ্যে রবিনের রেকর্ড ভালো ছিল না, অনেকদিন আগে একবার রমণী চৌধুরী নামে একজন বেয়াড়া বিপ্লবীকে হত্যার হুকুম সে অমান্য করেছিল, সে কাজটা করাতে হয়েছিল অন্যকে দিয়ে। তাছাড়া মেয়েদের সম্বন্ধে রবিনের দুর্বলতা ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়লো, কর্তা বার কয়েক তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, অবশেষে দলের মধ্যে মেয়েছেলে নেওয়া তিনি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। রবিন বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এসব গুপ্ত জীবনের কথা জানতো অরবিন্দ।

রবিন দীক্ষার সময়ে বিশেষভাবে আদিম রিপুটা দমনের শিক্ষা পেয়েছিল—অন্য সকলের মতো চেষ্টাও করেছে। এই রিপুটিকে যারা দমন করতে চেষ্টা করে তারা নামে অসম প্রতিযোগিতায়। রিপু তার শিকার ছেড়ে দেবে কেন, তার অসীম শক্তি, বিচিত্র তার ছলাকলা, অজস্র তার অনুচর পরিচর, ত্রিভুবন-ব্যাপী তার অবাধ আধিপত্য। যারা নিজেদের কামজয়ী ঘোষণা করে হয় তারা অবতারবৎ মহামানব, নয় নিতান্ত ভণ্ডাচারী। রবিনের অনুকূলে এইটুকু বলবার আছে সে ভণ্ডাচারী নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায় না, ঐ বিক্ষুব্ধ রিপুর তাড়নায় সে কদাচারী হয়ে উঠ্‌ল। তারই শেষতম লক্ষ্য শুভ্রা।

সে সরল ভাবে বিবাহ করতে চাইলে শুভ্রা হয়তো সম্মত হতো, বিশেষ যখন সে জানতো যে সে দলছুট বিপ্লবী। কিন্তু এসব ক্ষুধিত শিকারীরা প্রায়ই খেলোয়াড় জাতের জীব হয়। ভাবে বিবাহের অনেক সময় আছে—তার আগে কিছুদিন খেলায় শিকার হোক, ভাবে বিপ্লবী দলে ঢুকে রিপুদমন অভ্যাস করতে

গিয়ে যে সময়টা অকারণে নষ্ট করেছে সুদে আসলে তার জের মিটিয়ে নেওয়া দরকার। সংসারে এত নারী থাকতে মাত্র একটিতে কেন সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। সাধু সন্ন্যাসী ও রিপু-দমনকারী বিপ্লবীদের যখন পতন হয় পর্বতচূড়া স্খলিত হয়ে পড়ে। এ কয় বছরে অনেক নারী জয় করেছে সে, এই প্রথম আঘাত পেলো শুভ্রার কাছে। সে মরীয়া হয়ে উঠলো।

সারাদিন অভিমানের পাথরে বুদ্ধিকে শান দিয়ে তীক্ষ্ণতর করে নিয়ে বিকালের দিকে এলো অরবিন্দর বাড়ীতে। সে বুঝে নিয়েছিল এ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র আর শুভ্রার দেখা পাওয়ার সুযোগ হবে না।

তাকে দেখে অরবিন্দ সাগ্রহে বলে উঠল, এই যে ভাই রবিন এসেছ, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ!

প্রায় হঠাৎ, মিথ্যা নয়। কালকে সন্ধ্যাবেলায় শুভ্রা চলে গেল, সারারাত মার ঘুম আসেনি।

ঘুমের ওষুধ দাওনি?

এ ওষুধের কাজ নয়, সেবার কুশলতা। কখন্ কোন পাশ ফিরে শুলে ঘুমোতে পারবেন, রাতে কখন বেদানার রস বা জল খাওয়াতে হবে এতদিনের সাহচর্যের ফলে জানে শুধু শুভ্রা। মলিনা অবশ্য প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করেছে কিন্তু রোগীর ধাত তো জানে না সে। এখন শুভ্রা ফিরে না এলে যে কয়দিন মা বাঁচতেন তাও বোধ করি বাঁচবেন না। তুমি ভাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাও, তাকে নিয়ে এসো গিয়ে।

বেশ, তুমি ভালো করে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে দাও নতুবা শুধু আমার কথায় আসবেন কেন।

অরবিন্দর চিঠি নিয়ে রবিন রওনা হয়ে গেল। এ সব শয়তানের চেলাকে স্বয়ং শয়তান সুযোগ জুটিয়ে দেয়।

রামযশ যখন চিঠিখানা নিয়ে উপরে গেল ঘরেই ছিল শুভ্রা। চিঠি পড়ে বলল—তুমি নীচে যাও, আমি যাচ্ছি।

চট করে বাইরে যাওয়ার কাপড় পরে নিয়ে নীচে নেমে দেখল ট্যাক্সির কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। চিঠিতে রবিনের উল্লেখ ছিল না।

তখন আর ফিরবার উপায় নেই, ইচ্ছাও নেই।

শুভ্রা বলল, আপনি ড্রাইভারের পাশের সীটে বসুন।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রবিন ভিতরের সীটে বসলো, তার অভিজ্ঞতায় বলে,

মেয়েরা একটু জোরের প্রত্যাশা করে।

শুভ্রা ভাবলো, কমিউনিটের পথ বই তো নয়।

রবিন যখন শুভ্রাকে আনতে গিয়েছে সেই সময়ে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাতে এসে উপস্থিত ভূপতি।

অরবিন্দ বলে উঠল, ভূপতিদা যে!

ভূপতিদা নিশ্চয়, তাতে একটুও ভুল নেই।

কখন্ এলেন ?

দুপুরের দিকে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

যাঁর ডাকে এসেছি তার কাছে।

দাদা, হেঁয়ালি ছেড়ে সাধারণ মানব ভাষায় কথা বলুন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

আপাতত জেনে রাখো আজ রাতে এখানেই থাকবো খাবো।

হাঁ, এবারে মানব ভাষা বটে।

অরবিন্দ ডাক দিয়ে বলল, মলিনা—

ভূপতিদা এসেছেন, আজ রাতে এখানেই খাবেন থাকবেন।

প্রসন্নমুখে মলিনা এসে ভূপতিকে প্রণাম করলো, শুধালো, আমাদের বাড়ীতে সব ভালো তো ?

খারাপ হ'লে অবশ্যই জানতে পারতাম।

বসুন, চা নিয়ে আসছি।

শুভ্রা বিদায় নেওয়ায় তার মনটা বেশ হাল্কা ছিল। তার উপরে সদ্য বাড়ীর কুশল জানলো। সে জানতো না যে আবার শুভ্রাকে আনতে গিয়েছে।

মলিনা চলে গেলে অরবিন্দ শুধালো, দাদা, ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

এক কথায় তো বলা যায় না।

বেশ, দশ কথাতেই না হয় বলুন।

তাই বলবো, তবে রাতের বেলায় নিরিবিলি। আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখো, সুভাষবাবু লোক পাঠিয়ে তলব দিয়ে ডেকে আনিয়েছেন।

এই সামান্য কারণে লোক পাঠানো—চিঠি লিখলেই চলতো।

চললে আর লোক পাঠাতে যাবেন কেন ? তাঁর চিঠি পুলিশের হাত এড়িয়ে ঠিকানায় বড় পৌছায় না। এখন এই পর্যন্ত।

বাইরে ট্যাক্সির শব্দ হলো, ঘরে প্রবেশ করলো শুভ্রা। ঠিক সেই সময়ে অন্য দরজা দিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে মলিনার প্রবেশ। দুই নারীতে চোখোচোখি হওয়া মাত্র মলিনার হাত কেঁপে উঠে চায়ের পেয়ালা মেঝেতে পড়ে গেল।

অরবিন্দ বলে উঠ্‌ল, দিবারাত্রি পরিশ্রম, এ রকম না হওয়াই অস্বাভাবিক। যান, আর এক কাপ পাঠিয়ে দিন।

চায়ের পেয়ালা পতনের রহস্য বুঝলো একমাত্র শুভ্রা।

৪৭

রাত্রে আহারান্তে অরবিন্দ ও ভূপতি শোবার ঘরে এসে বস্‌ল। অরবিন্দ বল্‌ল, দাদা, এবারে বলুন, ব্যাঘাত হওয়ার আর আশঙ্কা নেই।

রুগীর খবর কি, জিজ্ঞাসা করলো ভূপতি।

মা আচ্ছন্ন ভাবে ঘুমোচ্ছেন, ওরা দুজনে জেগে আছে, শুভ্রা আছে ভয় নেই। নিন এবারে আরম্ভ করুন।

দাঁড়াও আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই। হাঁ অরবিন্দ, এই রবিন লোকটির সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

হঠাৎ একথা?

বলোই না।

অনেক বছরের পরিচয়, এক সময়ে এক পার্টিতে ছিলাম। আবার ডাক পড়লে ও ফিরে গিয়েছিল, হঠাৎ একদিন চলে এলো। বল্‌ল, আমি পার্টি ছেড়ে দিলাম ভাই।

কেন?

জিজ্ঞাসা করিনি, ওসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে নেই।

করলেও সদুত্তর পেতে না। লোকটি ভালো নয়।

অরবিন্দ চমকে উঠে বল্‌ল, কেন বলুন তো?

কেন জানি না, ওটা আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত। যাক এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

সেই ভালো।

ভূপতি আরম্ভ করলো—সুভাষবাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দেখি আরও তিন-চার জন লোক অপেক্ষা করছেন, রবি সেন ছাড়া আর কাউকে চিনি না। উপরে খবর পাঠাতে সুভাষবাবু নেমে এলেন—

এই যে তোমরা এসেছ।

রবি সেন শুধালো, আপনার শরীর ভালো তো ?

শরীরের কথা ছেড়ে দিন। হাঁ যেজন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ভূপতি তোমার কাছে ঠিক সময়ে লোক পৌঁছেছিল দেখছি।

আজ্ঞে হাঁ।

দেখো, এবার আর জেলে পচে মরবো না, একটা কিছু করতে হবে।

এই তো সেদিন জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

আবার যে কোন দিন ধরতে পারে। এখন যুদ্ধের বাজারে সরকারের মাথা গরম।

কে একজন বল্‌ল, সরকারের মাথা ঠিক নেই।

খুব ঠিক আছে হে, সেই জন্যেই সরে পড়বার মতলবে আছি।

কোথায় আবার যাবেন ?

এখনো ঠিক করিনি। তবে দেশ স্বাধীন করবার এই চরম সুযোগ। প্রয়োজন হলে অন্য দেশের সাহায্য নিতে হবে।

কে সাহায্য করবে।

ইংরাজের শত্রু এখন আমাদের মিত্র, তাদেরই সাহায্য নিতে হবে।

দেখুন মনে কিছু করবেন না, এ পরিকল্পনা নূতন নয়, গত যুদ্ধের সময়েও এ চেষ্টা হয়েছে কাজে কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি একথা সত্য নয়—কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। বোঝা গিয়েছে যে আমাদের পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল, যতটা উৎসাহ ছিল ততটা অভিজ্ঞতা ছিল না। এবারে আর সে ভুল করবো না, আমাকে বাইরে যেতে হবে।

বাইরে যেতে হবে শুনে সকলে চমকে উঠ্‌ল।

কোথায়, কোন্ দেশে ?

এখনো স্থির করিনি, আর করলেও প্রকাশ করা উচিত হবে না।

একজন বল্‌ল, সাহায্য করতে পারে এক জার্মানী, রাশিয়া করবে বলে মনে হয় না।

নিশ্চয়ই করবে না, জার্মানীর সঙ্গে এখন সে চুক্তিতে আবদ্ধ।

জার্মানীর সাহায্য নিলে লোকে ফাসিস্ত বলে অপবাদ দেবে।

দেখো ফাসিস্ত, নাৎসী, কমুনিস্ট, ইম্পিরিয়ালিস্ট এসব কাগজের ছেলেখেলা। কাজের বেলায় ওসব ধোপে টেকে না। তবে হাঁ একমাত্র স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য

ন্যাশানালিস্ট। আমি যে দেশেই যাই, যে দেশেরই সাহায্য নিই না কেন আমি ন্যাশানালিস্ট ছাড়া আর কিছুতে নই। স্বামীজির সেই উক্তি—ভারত আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, এই আমার জীবনের বীজমন্ত্র।

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক বল্লেন, গান্ধীজি জানেন আপনার পরিকল্পনা ?

একমাত্র তাঁকেই সব খুলে বলেছি।

কি বল্লেন ?

বল্লেন, সুভাষ, ও-পথ আমার নয়। আর তোমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি আরও ভালো করে ভেবে যা করবার করো।

আমি বল্লাম, অবশ্যই আপনার অনুরোধ ভুলবো না। আজ এসেছি আপনার আশীর্বাদ চাইতে।

দেখো সুভাষ, যে আশীর্বাদ চাইতে হয় তার কি বিশেষ মূল্য আছে! আমার অযাচিত আশীর্বাদ সর্বদা তোমাকে ঘিরে থাকবে।

একজন অল্প-বয়সের লোক ফস করে বলে ফেললো, এসব কথাবার্তার সময়ে বাপুজি নিশ্চয় চরখা কাটছিলেন।

সুভাষবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল, গম্ভীর ভাবে বল্লেন, দেখো ঐ একটি মাত্র লোক সারা দেশের ভরসা, তাঁর সম্বন্ধে লঘুভাবে কিছু বলো না। আমার সঙ্গে তাঁর মতে পথে কোন দিন মেলেনি, মিলবেও না। তবু ঐ একটিমাত্র লোক ছাড়া আর নির্ভরযোগ্য কেউ নেই সারা দেশে।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ। তারপরে রবি সেন বল্ল, বাইরে যাবেন, বাইরে যাওয়ার বিপদ আছে।

ভিতরে থাকবার বিপদটাও কম নয়; জেল আছে, আন্দামান আছে, ফাঁসি আছে। ওসব থাক। তোমরা তো এত কথা জিজ্ঞাসা করলে কই, জিজ্ঞাসা তো করলে না কেন ডেকেছি তোমাদের ?

বলুন, আমরা হাজির আছি।

এক সময়ে ডাক দেবো তখন যেন তোমাদের সাড়া পাই।

সারা দেশের সাড়া পাবেন।

সারা দেশের কথা হচ্ছে না। তোমাদের যেন সাড়া পাই। আচ্ছা আজ যাও। বলে বিনা উপসংহারে চলে গেলেন যেমন বিনা ভূমিকায় সুরু করেছিলেন।

ভূপতি বল্ল, শুনলে তো গুরুশিষ্য সংবাদ—দাও আর একটা সিগারেট।

কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে অরবিন্দ বল্‌ল, বড় গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে্ন সুভাষবাবু। ওঁর মতো লোক এছাড়া আর কি রকম সিদ্ধান্তই বা নেবেন্‌! দেখুন দাদা, আমাদের দেশের সব আর নেতাই অল্প-বিস্তর গান্ধীজির প্রতিধ্বনি, সুভাষবাবুতে শোনা যায় একটা নিজস্ব কণ্ঠস্বর।

একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে—অবশেষে এত বড় গান্ধীভক্তের মুখে এমন কথা!

কেন দাদা, গান্ধীভক্ত হ'লে কি আর অন্য লোকের মূল্য বুঝতে নেই!

নাও এবারে শুয়ে পড়ো যাও।

আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একবার দেখে আসি মা কেমন আছেন

অরবিন্দ উঠতে যাবে এমন সময়ে দরজা ঠেলে এসে উপস্থিত হ'ল শুভ্রা.

দাদা একবার আসুন, মায়ের অবস্থা বড় ভালো বুঝিনে।

অরবিন্দ ও ভূপতি দ্রুত রোগীর গৃহে প্রবেশ করলো। দেখলো রোগী আচ্ছন্ন নিশ্চল ভাবে শয়ান।

ভূপতি নাড়ী দেখে জিজ্ঞাসা করলো, এত রাতে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে অরবিন্দ?

যাবে—আমি নিয়ে আসছি, বলে প্রস্থান করলো।

রোগীর ঘর নিস্তব্ধ, কেবল ঘড়ির টিকটিকানি শব্দ।

শুভ্রা 'মা' বলে ডাকলো, সাড়া নেই।

মলিনা হাতখানা কোলে তুলে নিল, হিম শীতল।

ডাক্তার নিয়ে অরবিন্দ ঘরে প্রবেশ করলো। ডাক্তার কিছুক্ষণ রোগীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে দেখে নাড়ীর পরীক্ষা করলো, চোখের পাতা টেনে খুলে দেখবার চেষ্টা করলো, তারপরে ইঙ্গিতে অরবিন্দকে ডেকে নিয়ে বাইরের ঘরে এলো।

কেমন দেখলেন ডাক্তার রায়?

কোন আশা নেই, কিছু করবার নেই। দু'চার দণ্ডের ব্যাপার। আচ্ছা আসি।

অরবিন্দ ফি দিতে গেল—ডাক্তার মাথা নেড়ে অস্বীকার করে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল।

রোগীকে নিয়ে ঘরে পাঁচ জন।

অরবিন্দ মুখের কাছে গিয়ে মা বলে ডাকলো, মনে হ'ল শুনতে পেয়েছেন,

হয়তো বা সেটা মনের মিথ্যা আশা। একবার মনে হ'ল রোগী যেন আঙুলে চুপ করছেন, হঠাৎ বলে উঠলো—ঐ যে কর্তা এসেছেন। তারপরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল, পড়লো একটা সুদীর্ঘ টানা নিঃশ্বাস, তারপরেই অন্তিম স্তব্ধতা। মলিনা ও শুভ্রা কেঁদে উঠল, অরবিন্দকে টেনে নিয়ে ভূপতি চলে এলো কক্ষান্তরে।

অরবিন্দ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল, দাদা, আজ আমি একসঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হলাম। বাবাকে মনে পড়ে না, মা ছিলেন এক দেহে পিতা মাতা—আজ আমি অনাথ।

এসব শোকোক্তির কি কোন উত্তর আছে! ভূপতি নিঃশব্দে তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে লাগলো—ঐ যথার্থ উত্তর।

সকালবেলায় খবর পেয়ে কলেজের ছাত্ররা এসে দাহের ব্যবস্থা করলো। সবাই মিলে মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে চল্‌ল নিমতলার ঘাটে। সঙ্গে চলল অরবিন্দ আর ভূপতি। সেই শূন্য বাড়ীতে রইলো শুধু মলিনা আর শুভ্রা, যাদের মধ্যে একমাত্র সাময়িক যোগ শোকের।

বিকালের দিকে শ্মশান থেকে ফিরে এলো অরবিন্দ ও ভূপতি।

অরবিন্দ বল্‌ল, দাদা, কালকে ভোরের গাড়ীতে মলিনাকে নিয়ে চলে যান, ও আর থেকে কি করবে।

মলিনা আপত্তি করলো, বল্‌লো, আপনার দেখাশোনা করবে কে?

ভূপতিদাকে দেখাশোনা করে কে?

মলিনা বল্‌ল, শম্ভু।

আমারও আছে কালু।

ভূপতি বল্‌ল, অবিবাহিতদের সেবক হচ্ছে সুহৃদ।

শুভ্রা এতক্ষণ নীরব ছিল বল্‌ল, আর আমি তো আছি।

মলিনা মনে মনে বল্‌ল, হাঁ, এখন খালি মাঠে গোল দিতে থাকো।

এই উক্তিটা শিখেছিল সুশীলের কাছে থেকে।

যদি অসুখ-বিসুখ হয়!

শুভ্রা বল্‌ল, কি সব অশুভ আশঙ্কা করছেন দিদি। দাদার তো অসুখ বিসুখ হতে বড় দেখি না, তেমন কিছু হ'লে আপনাদের খবর দিতে ভুলবো না। কি বলেন দাদা?

মলিনা আবার মনে মনে বল্‌ল, হাঁ, সম্বন্ধটা সুরু হয় দাদা দিয়ে, শেষ পর্যন্ত ঠেকে গিয়ে উনিতে।

বিধাতা ও শয়তানের যুগ্ম হাতের সৃষ্টি নারী, তাই সে একই দেহে এত উচ্চ, এত নীচু।

পরদিন সকালবেলা মলিনা ও ভূপতি রওনা হয়ে গেলে অরবিন্দ বল্‌ল, শুভ্রা, তুমি আর থেকে কি করবে। তোমাকে তো টাকা দিতে গেলে নেবে না, জানি না আর কিভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি।

পারেন, আমার কিছু কথা আছে আপনাকে শুনতে হবে। অবশ্য আজ নয়—যথাসময়ে আমি বলবো।

আচ্ছা আজ তবে এসো কেমন।

শুভ্রা বিদায় হয়ে গেল।

৪৮

মাঝারি গোছের টেবিলের উপরে মানচিত্র একখানা পাতা, আর গোটা কয়েক নানা বয়সের মাথা উপরে ঝুঁকে পড়েছে কিছুক্ষণ সকলেই নীরব, হঠাৎ একজন হতাশভাবে বলে উঠ্‌ল, না কোন আশা নেই, ইউনাটেড পাওয়ার গেল বলে।

অমনি আর একজন বলে উঠ্‌ল, অত আপনি ভাবছেন কেন, এলায়েড (allied) পাওয়ার এসে তাকে সাহায্য করবে।

আরে আসবে তো বলছ, আসবে কোথা দিয়ে, ইংরাজের জাহাজ ডুবি মাসে কত হচ্ছে তার খোঁজ রাখো?

রমেশদা, কিছু ভাববেন না, যত ডুবছে তার চারগুণ বানাচ্ছে।

বানাচ্ছে! বানাবে অত লোহা কাঠ পাবে কোথায়?

কেন এদিকে রামগড় থেকে হাজারিবাগ অঞ্চলের সব গাছগুলো কাটা গেল গেল কোথায় বলুন, আর টাটা কোম্পানী এখন সবছেড়ে জাহাজ তৈরি করবার লোহা জোগাচ্ছে ইংরাজকে।

এই সারগর্ভ তথ্যে রমেনবাবু বোধ হয় কতকটা আশ্বস্ত হ'ল, বল্‌লো, তা বটে। দাও একটা বিড়ি।

ভাবটা এই রকম যে ইংরাজের যখন আশু বিপদ নেই তখন একটা বিড়ি ধরানো যেতে পারে।

রমেশবাবুদের মধ্যে যখন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই রকম সূক্ষ্ম আলোচনা চলছিল টেবিলের বাকি কয়েকটি মাথা বিস্ময়ে কৌতূহলে কৌতুক রসে অভিভূত হয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। মাথার মালিকরা ভাবছিল, রমেনবাবু ও শিবেনবাবু এতও জানেন। রমেনবাবু স্বদেশী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত, আর শিবেনবা

ড্রিল মাস্টার। যুদ্ধ সংক্রান্ত তর্কটা এদের মধ্যেই বেশি জমতো। ভূপতির মনে পড়ে গেল মাত্র কয়েক দিন আগে ঘণ্টা দুই নিদারুণ তর্ক চালাবার পরে রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ ভূপতি, ফ্লীট (Fleet) আর কলোনির (colony) মধ্যে তফাৎ কি। ভূপতির জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হ'ল। সে বুঝলো, ও দুটোর মধ্যে সামান্য যে প্রভেদ আছে তা না জেনেও ঘণ্টা দুই যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক চালানো যায়। বাস্তবিক, যুদ্ধের কল্যাণে ভূগোল ইতিহাস ও রণনীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব ঘরে ঘরে হয়েছিল। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের যখন এই অবস্থা সরস্বতীর খাস মহাল বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই বিতর্কের স্থল ভূপতির বাসা-বাড়ী হলেও বিতর্ককারী ও শ্রোতাগণ সকলেই শিক্ষক, কাজেই সাময়িক ভাবে এটিকে সরস্বতীর খাস মহাল বলা অনুচিত নয়। সত্য কথা বলতে কি, অলবেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডাটি ভেঙে যাওয়ার পরে ভূপতির বাসাবাড়ী শহরের মনীষীগণের প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়েছিল।

রমেশ পণ্ডিতের বিড়িটি নিঃশেষপ্রায়, এমন সময়ে শিবেনবাবু বলে উঠ্‌ল, পণ্ডিত মশায়, আপনি তো বলছেন ইউরোপের মানচিত্রে অদল-বদল হবে—

বাধা দিয়ে রমেশ পণ্ডিত বলে উঠ্‌ল, বলছি বইকি, তুমি দেখে নিয়ো—

আহা আমি কি অস্বীকার করছি?

তা হ'লে কি বলছ বলো।

বলছি এই যে আমাদের দেশের মানচিত্রেও অদল-বদল কম হবে না—লাহোরে মুসলীম লীগের প্রস্তাবটা মনে পড়ছে?

ঐ পাষণ্ডদের খবরাখবর আমি রাখিনে, কি বলেছে বেটারা!

বলেছে পাকিস্থান তাদের দাবী—ভারত ভাগ করে মুসলমানদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে না দিলে ইংরাজকে কিছুতেই দেশ ছেড়ে যেতে দেবে না।

ওঃ এই কথা, বলে পণ্ডিত হাত বাড়ালো—অর্থাৎ আর একটা বিড়ি।

দেখো ওসব লঘু কথায় কান দিয়ো না।

পণ্ডিত মশাই, হাতে লাঠি থাকলে কার্যকালে লঘু কথাও গুরুতর হয়ে ওঠে।

লড়াই করাই যদি ওদের ইচ্ছা করুক না ইংরাজের সঙ্গে লড়াই।

দরকার হ'লে করবে।

ওরা করবে লড়াই। মুসলিমলীগ কংগ্রেস নয়, আর জিন্নাও গান্ধী নয়। ওদের ক'টা লোক জেল খেটেছে? এই দেখো এখানে আমরা সাতজন শিক্ষক

আছি প্রত্যেকেই কম করে একবার শ্রীঘর দেখে এসেছি। কি বলো হে শচীন ?

শচীন বল্‌ল, আজ্ঞে তা বইকি।

রমেশ পণ্ডিতের বয়স ষাট অতিক্রম করেছে, প্রায় সকলেরই তিনি ভূতপূর্ব শিক্ষক।

তবে! বলে তিনি স্বগতে মাথা নাড়লেন, চাণক্য পণ্ডিতের শিখার মতো তার সুপুষ্ট শিখাটি দুলে উঠে তাঁকে সমর্থন জানালো।

নৃপতি বল্‌ল, ভূপতিদা, আর তো পারা যায় না, এতক্ষণেও কি তোমার চা হ'ল না ? ও বাবা শম্ভু, যা হয় তাড়াতাড়ি করো, এদিকে এলায়েড (allied) পাওয়ার ও ইউনাইটেড (united) পাওয়ারের মধ্যে বিষম লড়াই বেধে উঠেছে।

এমন সময়ে চা-এর ট্রে হাতে শম্ভু প্রবেশ করলো ঠিক যেন লেণ্ড এণ্ড লীজ-এর (lend and lease) দলিল হস্তে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট। ক্ষণকালের জন্য এলায়েড ও ইউনাটেড পাওয়ার যুদ্ধ ক্ষান্ত করলো।

চা শেষ হওয়া মাত্র আবার দ্বিগুণ তেজে তর্ক আরম্ভ হ'ল। শিবেন বলল, এদিকে গান্ধীজি কি করছেন। তাঁর সুতো না ছুতো কোন রকমে অশুভস্য কালহরণং।

ওরে বাবা, শিবেন যে আবার সংস্কৃত বলে!

বলবো না! পণ্ডিত মশাই, আমার পিতা পিতামহ দুজনেই চতুষ্পাঠীতে ছাত্র পড়িয়েছেন, দেশে তাঁদের কত না খাতির ছিল। আমিই না হয় ড্রিল মাস্টার হয়ে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন, বামপদ সম্প্রসারণ করছি!

এবারে তর্কের বিষয়টা ঘরের মধ্যে এসে পড়লো দেখে ভূপতি অবতীর্ণ হল। বল্‌ল, গান্ধীজি কি করছেন দেখতে পাও না! যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সুরু করে দিয়েছেন।

ভূপতিবাবু ও তো ছেলেখেলা, সেই বালকের বক রাক্ষস মারা।

বালক হোক আর বীর হোক, বক রাক্ষস তো মরেছিল।

হাঁ, ইংরেজ মরে গিয়ে মরবে।

শচীন বল্‌ল, গান্ধীজি যখন লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন তখনো সকলে এই রকম ছেলেখেলা মনে করেছিল।

আর ছেলেখেলা হ'লে কি ইংরেজ এর মধ্যে দশ হাজার সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে।

কি বলছেন শচীনবাবু, দশ হাজার!

হাঁ হে, কম করে। বিনোবাভাবে থেকে সুরু করে জহরলাল, প্যাটেল,

বাংলা দেশ থেকে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে, প্রফুল্ল সেন বড় বড়রা সবাই গিয়েছে—ছোটদের আর নাম ধাম জানবো কি ক'রে।

উপস্থিত সভ্যগণ কেউ নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত নয়, তবে সকলেই জাতীয়তাবাদী আর যেহেতু গান্ধীজি জাতির প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছেন তাঁর উপরে আঘাত যেন সমস্ত জাতির দেহে এসে লাগে। এদের স্থূলভাবে সুভাষপন্থী বল্‌লে অন্যায় হয় না।

ড্রিল মাস্টার শিবেন বিস্মিত আনন্দে বার কয়েক বল্‌ল, দশহাজার! বাহবা বাহবা।

কিহে শিবেন, তুমিও যাবে নাকি জেলে?

পণ্ডিত মশাই, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনের সমস্যা না থাকলে নিশ্চয় যেতাম; যখন ছিল না যাইনি কি।

দেখো শিবেন, সমতলে এসে যে নদী মহানদী গিরিশিখরে তা একটি ক্ষীণ জলরেখা, যেন খেলার জিনিস। বর্তমান সত্যাগ্রহকে এখনো কারো ছেলেখেলা মনে হলেও এ শীঘ্রই মহানদীতে পরিণত হবে।

তা যেন পরিণত হবে, কিন্তু এ সময়ে আমাদের সুভাষবাবু কি করছেন, চুপ ক'রে বসে থাকা তাঁর উপস্থিত হচ্ছে না।

রমেশ পণ্ডিত ব্যঙ্গ করে বলে উঠ্‌লো, বাস্তবিক সুভাষবাবুর উচিত ছিল শিবেনবাবুর কাছে এসে পরামর্শ করা। দেখো শিবেন, ছোট মুখে বড় কথা বলতে চেয়ো না। গান্ধীজি, সুভাষবাবু, পণ্ডিত নেহরু এঁরা হ'লেন সব বাঘ ভালুক, তুমি আমি নেকড়ে শেয়াল, ওঁদের কাছে না ঘেঁষাই ভালো।

তবে তো চিরকাল চুপ করে থাকতে হয়।

চিরকাল আসবে কেন, সঙ্কট কালে থাকলেই হ'ল।

এইভাবে তর্ক চলতে লাগলো। এ সব তর্কের আদিও নেই, এসব তর্ক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চালালেও মীমাংসা হয় না আর না করলেও কারো ক্ষতি হয় না। ভূপতি, শ্রীপতি, শচীন প্রভৃতি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তবে কিছু বলতে পারে না, পণ্ডিত মশাই সকলের শিক্ষক আর শিবেন নিতান্ত জুনিয়ার শিক্ষক, অর্থাৎ একজন গুরু, আর একজন লঘু কাউকে বাধা দেওয়া ভদ্রতা সঙ্গত নয়। এমন সময়ে নৃপতি ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠ্‌ল, পণ্ডিত মশাই, সাতটা বাজে, আপনার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হ'ল যে!

পণ্ডিত একবার ঘড়িটা দেখে, একবার জানলা দিয়ে শীতের সন্ধ্যায় ঘনায়মান অন্ধকার দেখে বলে উঠ্‌ল, ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ হে, আমি

উঠ্লাম।

শিবেন বল্ল, তবে আমিও উঠি।

ভূপতি বল্ল, তুজনে তুই পথে যাবেন নতুবা আবার তর্ক আরম্ভ হয়ে যাবে।

সকলে হেসে উঠ্লো।

ওদের উঠতে দেখে নৃপতি ও রতনবাবুও উঠলো। রতনবাবু স্বদেশী স্কুলের নূতন শিক্ষক, নানা দফায় তিন-চার বার জেল খেটে এখানে চাকুরি পেয়েছে। থাকল তুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শচীন ও ভূপতি।

শচীন ভাই, এতক্ষণে কান জুড়ালো, ওঁদের তর্ক ঢাকের বাজনার মতো, থামলে তবে বোঝা যায় নিস্তব্ধতা কি মধুর।

তুমিই তো তর্কের মালমশলা জোগাও।

কি রকম করে?

কেন, চা পাঁপর ভাজা জুগিয়ে—দো ফিরতি, তিন ফিরতি করে দিয়ে যায় তোমার শঙ্কুলাল।

এবারে কাজের কথা হোক। তুমি আমাদের স্বদেশী কলেজের জন্ম একজন ইংরাজির অধ্যাপক খোঁজ করো।

হঠাৎ একথা কেন ভূপতি?

হঠাৎ নয়, আগে আরও তু এক বার মনে করিয়ে দিয়েছি, তুমি বলেছ তোমাদের উপরে একটু বেশি চাপ পড়ছে জানি, তবে এখন চালিয়ে নাও। আর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না, শীঘ্রই আরও বেশি চাপ পড়বে আমাদের উপরে।

ভাই ভূপতি, তোমার কথা ক্রমেই অধিক রহস্যময় হয়ে উঠছে—ব্যাপার কি!

তবে রহস্যভেদ করেই বলি—শীঘ্রই আমাকে গ্রেপ্তার করবে, শীঘ্র মানে আজকালের মধ্যে।

তুমি কি শেষে জ্যোতিষচর্চা আরম্ভ করলে নাকি?

সেটা পণ্ডিত মশায়ের একচেটিয়া হয়ে থাক। আজ বিকালের ট্রেনে কল্‌কাতা থেকে আমাদের পুরানো ছাত্র নন্দ কর্মকার এসেছে, স্কুল থেকে বের হওয়ার মুখেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বল্ল, স্যার, সুভাষবাবু বাড়ী থেকে অন্তর্ধান হয়েছেন।

সে কি কথা হে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আজকার সকালবেলার কাগজে পড়েছি কল্‌কাতায়।

বলো কি, কাগজখানা আনলে না কেন ?

সঙ্গে নিয়েই রওনা হয়ে ছিলাম, পোড়াদহে গাড়ী থেকে নামবার সময়ে একজন যাত্রী চেয়ে নিয়ে গেলেন।

আমি আর বেশি কথা বাড়ালাম না, চলে এলাম।

সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের সঙ্গে তোমার গ্রেপ্তারের সম্বন্ধ কি।

খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুলিশের খাতায় ঘনিষ্ঠ সুভাষপন্থীদের নাম লেখা আছে, নেতাকে যখন পেলো না, চেলাদের ধরতে বাধা কি।

আচ্ছা আগে ধরুক, তখন দেখা যাবে।

না, না, বিলম্ব করো না, খুব বেশি সময় যাবে না। এবারে ধরলে বেশ কিছুদিন আটকে রাখবে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ছাড়া পাবো মনে হয় না। তুমি এক কাজ করবে, আমার শঙ্কুকে তোমাদের স্কুলে একটা বেয়ারার কাজ দিও, তা হ'লে সে এখানে থেকে আমার বাসাটা আগলাতে পারবে।

বেশ, তা যেন করলাম, কিন্তু হঠাৎ এখন যোগ্য ইংরাজির শিক্ষক পাই কোথায় ?

সেটাও ভেবে রেখেছি। অরবিন্দকে আনিয়ে নাও, শিক্ষক হিসাবে যোগ্য, তা ছাড়া এখন তার মায়ের মৃত্যুর পরে নিবান্ধব অবস্থায় কলকাতায় থাকতেই বা যাবে কোন্ দুঃখে। দেশের লোক দেশে ফিরে আসুক।

কিন্তু আসবে কি ?

কেন আসবে না।

আসবে তবে গেল কেন ?

তখন মা ছিল, হয়তো তিনি গঙ্গাতীরে বাস করতে চেয়েছিলেন, বা এমনি কিছু হবে। যাই হোক তুমি লিখেই দেখো না।

বেশ, তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করেই, তবে লিখবো তাকে।

হাঁ তাই করো। আর দেখো শচীন, একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাই, আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে। তবে এ কথা নিশ্চয় জেনো এবারে ইংরাজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কি করে এমন দুঃসাহসী ভবিষ্যদ্বাণী করছ হে !

অনেক কারণে করছি। যুদ্ধে জিতলেও ইংরেজ এমন কাবু হয়ে পড়বে যে এ অসন্তুষ্ট দেশকে সামলাতে পারবে না। শীঘ্রই আবার আরম্ভ হয়ে যাবে গান্ধীজির প্রচণ্ড আন্দোলন।

তুমি দেখছি শেষে গান্ধীভক্ত হয়ে পড়লে।

শচীন, আমার স্বভাবে ভক্তির উপাদান খুব অল্প, আমি গান্ধী-ভক্ত নই, কিন্তু ঐ লোকটির ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে মাথা না নুইয়ে পারি না। তার উপরে আবার সুভাষবাবু গেলেন বাইরে, একটা জোর নাড়া না দিয়ে ছাড়বেন না।

তোমার কথায় মনে আশা ভরসা হচ্ছে।

তবে যাওয়ার আগে ইংরেজ দুটি স্থায়ী ক্ষতি করে দিয়ে যাবে। ভারত খণ্ডন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আর কমুনিস্ট পার্টি নামে বিষবৃক্ষ রোপণ।

ও দুটোর একটাও হবে না, তবে আজ আর তর্ক বাড়াবো না, রাত অনেক হ'ল।

দেখো, অরবিন্দকে লেখো আর নাই লেখো, আমার শঙ্কুর কথাটা ভুলো না।

তবে কোনটারই প্রয়োজন হবে না, কালকে তোমার সঙ্গে স্কুলে কলেজে দেখা হবে।

কালকে দেখা হলেও পরশু নিশ্চয় হবে না।

শচীন বিদায় হয়ে চলে এলো।

পরদিন প্রাতে বসবার ঘরে বসে আছে এমন সময়ে শুকনো মুখে শঙ্কুলাল এসে হাজির।

কি শঙ্কু, খবর কি?

কালকে অনেক রাতে বাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশে।

খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো শচীন, তারপরে বলল, শঙ্কু, তুমি আজ এগারোটার সময়ে স্কুলে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমাকে একটা বেয়ারার চাকুরি দেব, ওখানে কাজ করবে, আর বাবুর বাসায় থেকে বাড়ীটা আগলাবে, তোমার কোন চিন্তা নেই। এখন এসো।

শঙ্কু চলে গেলে তখনি একখানা পত্রে সাকুল্য বিবরণ জানিয়ে অবিলম্বে স্বদেশী কলেজে যোগদানের জন্ম অরবিন্দকে আহ্বান জানালো। এবং স্কুলে যাওয়ার মুখে স্বহস্তে চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলে দিল।

৪৯

সেদিন রাতে শচীনকে নিরিবিলি পেয়ে রুক্মিণী বলল, তুমি কি লবকুশের বিয়ে দেবে না?

শচীন বলল, বাবা থাকতে ওদের বিয়ে দেওয়ার কর্তা তো আমি নই।

মনে রেখো ওরা বাবার নাতি, আর তোমার ছেলে।

এ সহজ কথাটা বুঝিয়ে বলতে হবে কেন?

এইজন্যে যে, ওরা যে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল।

রুক্মিণী, আজ যে দেশশুদ্ধ লোককে বাউণ্ডুলেপনায় পেয়ে বসেছে।

তাই বলে কি কারো ছেলে-মেয়ের বিয়ে আটকে রয়েছে।

তা নেই বটে আবার জেলে যাওয়াও আটকে নেই। ধরো আজ বিয়ে হ'ল, তারপরে কালকে জেলে গেলে তখন—

তখন আর কি, আবার পরশু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বউয়ের কাছে ফিরে এল। এ জেলে যাওয়া তো ইঁদুর বেড়ালের খেলা, এর মধ্যে কতবার জেলে গেল কতবার এলো। এই তো বীরেনবাবু, সুবোধ চৌধুরী জেলে গিয়েছেন তাঁদের ঘরে কি স্ত্রীপুত্র নেই?

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আহ্বান দিনাজশাহীতে এলে যজ্ঞেশবাবু সত্যাগ্রহ করতে চেয়েছিলেন, কলকাতার কংগ্রেস অফিস জানিয়েছিল—না, আপনার যাওয়া চলবে না, আপনি জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, আপনি জেলে গেলে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। অল্পবয়স্ক আর কাউকে পাঠান। আসল কথা তারা চায়নি যে অশীতিপর বৃদ্ধ জেলে যান। তখন অগত্যা প্রথমে বীরেন চৌধুরী, তারপরে সুবোধ চৌধুরী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে জেলে গেল।

রুক্মিণী বল্‌ল, বাবার মুখে শুনেছিলাম যে এ জেলা থেকে আর কেউ জেলে যাবে না কাজেই এখন নির্ভয়ে লব কুশের বিয়ে হতে পারে।

রুক্মিণী, তুমি যতটা নির্ভয় আমি ততটা নই।

তোমার মুখে এই প্রথম শুনলাম যে তুমি ভয় পেয়েছ।

ভয় পাইনে সে কথা সত্য, কিন্তু আমি যতটা জানি তুমি জানো না।

বেশ জানাও আমাকে।

শচীন আরম্ভ করলো, এই যে দেশময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলছে এ হচ্ছে দেশব্যাপী বিরাট সত্যাগ্রহের মোহাড়া মাত্র। এবারে আসছে সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান।

রুক্মিণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো, কার আহ্বান? সুভাষবাবুর?

না, সুভাষবাবুর আহ্বান আসবে অন্য পথে, অন্যভাবে, তার বিলম্ব আছে।

তবে কার?

আহ্বান জানাবার কর্তা একজন মাত্র আছেন।

কে তিনি?

গান্ধীজি।

তিনি তো শুনতে পাই আপোষপন্থী।

এমন কথা কার কাছে শুনলে ?

কার কাছে আবার, লোকে বলে।

তবে আমার কাছে শোনো—মনে রেখো আমি গান্ধীপন্থী নই, তাই আমি যা বলবো নির্জলা সত্য, অকারণ প্রশংসা নয়।

বেশ বলো।

গান্ধীজি আপোষপন্থীও নন, আবার সংগ্রামপন্থীও নন। তিনি সময় বুঝে আপোষ করেন, আবার সময় বুঝে সংগ্রাম করেন। তিনি প্রাণপণে আপোষের চেষ্টা করেন, সাড়া না পেলে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, এই হ'ল তাঁর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে লবণ সত্যাগ্রহ সুরু করবার আগে যথাসাধ্য আপোষে কার্য্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, যখন ফল হল না, তখন ডাক দিলেন, সেকি বিষম তোলপাড় নিশ্চয় ভুলে যাওনি। আবার সুযোগ বুঝে আপোষ করে ফেললেন।

সে তো সবাই দেখেছে, আর সেই জন্তেই তো লোকে বলে তিনি মস্ত সুবিধাবাদী আর—

বাধা দিয়ে শচীন বল্‌ল, সুবিধা তো রণকৌশলের অঙ্গ, সে বিচারে সমস্ত সেনাপতিই সুবিধাবাদী, এমন কি নেপোলিয়ানও।

আমার কথাটা তুমি শেষ করতেই দিলে না।

হাঁ, 'আর' বলে থেমে গিয়েছিলে, আর কি ?

লোকে বলে তিনি ভীরু।

রুক্মিণীর বক্তব্য শুনে শচীন হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল। উচ্চহাসি শচীনের স্বভাব নয়—তাই বিস্ময়ে রুক্মিণী শুধালো, তুমি হাসলে যে ?

হাসির কথা শুনে হাসবো না তো কি।

আচ্ছা স্বীকার করলাম তিনি ভীরু নন, তিনি মহা সাহসী। কিন্তু লব-কুশের বিয়ে না দেওয়াটা নিশ্চয় তাঁর রণকৌশলের অঙ্গ নয়।

এবারেও হেসে উঠ্‌ল শচীন, তবে তত উচ্চস্বরে নয়।

দেখো এ হাসির কথা নয়।

বলো কি, এক সঙ্গে দুই ছেলের বিয়ে হাসির কথা নয়।

দেখো এই ভাবেই টালবাহানা করতে করতে ঠাকুরঝির বিয়ের বয়স পেরিয়ে চল্লিশ উৎরে গেল।

সে দোষ বাবার নয়।

তবে কার?

তোমার ঠাকুরঝির অদৃষ্টের। দু'দুবার বিয়ের সম্বন্ধ এলো, শেষ মুহূর্তে ভেঙে গেল।

ভাঙবে না! তাঁরা ভদ্রলোক, মুখে বিয়ে না করবার রহস্য প্রকাশ করেন নি, পরে তো সব প্রকাশ পেলো। পিতৃহন্তার ভগ্নীকে বিয়ে করতে চায় কোন্ সুপুত্র?

একথা মানি। কিন্তু অরবিন্দর বেলায়?

সেখানেও ঐ বিপদ। রমণী চৌধুরীকে সে হত্যা করেছিল।

হাঁ করেছিল, তখনকার বিপ্লবীদের অনেকেই অনেককে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। অরবিন্দ অত্যন্ত সৎ ও নির্ভীক বলেই কথাটা প্রকাশ করেছিল, নইলে তো মলিনা রাজি ছিল। আর এ-ও মলিনার বাড়াবাড়ি। রমণীর সঙ্গে তার চেনাশোনার বেশি সম্বন্ধ নয়, তার উপরে এত জোর দিয়ে অরবিন্দর প্রস্তাব অস্বীকার করা গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঠাকুরঝির মনের দিকটাও তো দেখতে হবে।

দেখেছি বলেই বলছি অরবিন্দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে ও মস্ত ভুল করেছে। অরবিন্দর মতো পাত্র সহজে মেলে না। আরও দেখো, মলিনার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল না বলে আজ পর্যন্ত সে বিয়ে করলো না।

বিয়ে করতে কেউ তো তাকে বাধা দেয়নি।

দেখো রুক্মিণী, তোমরা মেয়েদের মনের দিকটাই দেখো, পুরুষদেরও যে মন থাকতে পারে সেটা ভুলে যাও। বলো তো না হয় আর একবার অরবিন্দকে বলি। তাকে এখানকার কলেজে যোগদানের জন্য জরুরি চিঠি লিখে দিয়েছি।

তাতেও যে মলিনা রাজি হবে তা মনে হয় না, তা ছাড়া চল্লিশের পরে বিয়ের কোন অর্থ হয় না। ওর কি সুন্দর চেহারা কি হয়ে গিয়েছে লক্ষ্য করেছ।

মেয়েরা যখন অপর মেয়েকে সুন্দর দেখে বুঝতে হবে সত্যই সে সুন্দর।

শচীনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাত্তে, সন্ধ্যাবেলায় রুক্মিণী ও মলিনাতে প্রায় এই কথাগুলিই এইভাবে আলোচিত হয়েছিল। রুক্মিণী অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলেছিল, ভাই, তোমার কি সুন্দর চেহারা, শুকিয়ে কি হয়ে গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মলিনা উত্তর দিয়েছিল, তবে আর ও কথাটা ওঠাচ্ছ কেন!

বলো তো ভাই আর একবার কথাটা ওঠাই। তোমার দাদার কাছে শুনলাম অরবিন্দকে এখানকার কলেজে যোগ দেওয়ার জন্য জরুরী চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে।

এ সংবাদ শুনে মুহূর্তের জন্য মলিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সেটুকু এড়ালো না রুক্মিণীর দৃষ্টি।

কি ভাই, বলি?

না, না বউদি, দোহাই তোমার ও কথা আর নয়। বলতে বলতে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ রেখে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ এ হাসি কেন! অরবিন্দকে পাওয়ার ইচ্ছায় নয়। সাধারণ মেয়েদের চল্লিশের পরে এ ইচ্ছা বড় হয় না। তবে কেন? সে যে শুভ্রার কবল থেকে দূরে চলে আসবে এই বোধেই তার আনন্দ। কলকাতা থেকে আসবার পর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত তাকে পীড়িত করেছে—দুঃস্বপ্নের মতো পীড়িত করেছে, মেয়েটা এখন খোলা মাঠে গোল দিচ্ছে। এক দিকে অবোধ নিঃসঙ্গ পুরুষ, আর এক দিকে চতুর নিঃসঙ্গ তরুণী। ঐ তরুণী শব্দটা জলমগ্ন শিলার মতো অতর্কিতে নৌকাখানাকে বিষম আঘাত করলো। চক্রী, চক্রী বইকি? বয়স যে ওর অনেক কম। যেন ওর তারুণ্য সেটাও ওর হাতে। বয়সে জিতে গেল মেয়েটা। যে পুরুষ নিজের ভোগে লাগলো না সে যে আর কেউ ভোগ করবে, সহ্য করতে পারে না মেয়েরা।

তার মনে পড়লো, কি সুন্দর চেহারা শুকিয়ে কি হয়ে গেল। এ কথা কি সত্যি! না, না, তা হতেই পারে না। পরীক্ষা করবার ইচ্ছায় দাঁড়ালো গিয়ে আয়নার সামনে। কি যে বলে বউদি, নিজের চোখে সে তো তেমনি সুন্দরী আছে। মন আর বয়স এক সঙ্গে চলে, তাই কেউ কারো পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারে না। চোখের সাক্ষ্যে ভারি স্বস্তি অনুভব করলো সে। ভাবলো শুভ্রার নিতান্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বী সে নয়। এমন সময়ে দৃষ্টি পড়লো পাশে টাঙানো একখানা ছবির উপরে। চমকে উঠে ভাবলো, কার এই মুখচ্ছবি! কে এই সুন্দরী, কে এই তরুণী, কে এই সুন্দরী তরুণী! চোখে পড়লো ফটোগ্রাফখানির নীচে বউদির হাতে লেখা, "ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ি।"

তবে কি এই ছবি তার, অনেককাল আগেকার তার, যখন শুধু নিজের চোখে নয়—অপরের চোখেও সুন্দরী ছিল, তরুণী ছিল। হাঁ, অরবিন্দর চোখেও। আয়নায় যে চোখ সাক্ষ্য দিয়েছিল এক রকম, ছবিতে দিল সে অন্যরকম সাক্ষ্য। মিথ্যাবাদী ভঞ্চক চক্ষু। মনের মধ্যে হু হু করে উঠল,

বয়সের যমুনায় উজান বয়ে আর ফিরবার উপায় নেই ঐ ছবির ঘাটে। বয়সে জিতে গেলি তুই শুভ্রা, বয়সে জিতে গেলি। আর তাকিয়ে দেখতে পারলো না, ঝুপ্ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো এবারে হাসির বদলে কান্না।

রাতের বিধাতা অনিদ্রার অশ্রুবিন্দুগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে মালা গেঁথে আকাশ ভরে সাজিয়ে রাখেন। কোন্ দুর্জ্ঞেয় পন্থায় সেগুলি দেশ-দেশান্তর থেকে সঞ্চয় করেন, কোন্ অজ্ঞেয় নিয়মে একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে তিনি নিপুণ হাতে মালা গাঁথেন, সে মালার বিন্যাস কি, উদ্দেশ্য কি কেউ জানে না, সেদিকে তাকিয়ে দেখে মানুষের শুধু বিস্মিত হওয়ার অধিকার। দিনাজশাহী নামে শহরে মলিনা নামে মেয়েটির বীতনিদ্রা অশ্রুর সঙ্গে কলিকাতা নামে শহরে শুভ্রা নামে মেয়েটির বীতনিদ্রা অশ্রুপঙ্ক্তির মধ্যে কোথায় মিল। মিল নেই তবু মিলন আছে বিধাতার বিনিসুতার গাঁথনিতে। মলিনার অশ্রুধারায় বালিশ ভিজে গিয়েছিল, শুভ্রারও।

শুভ্রা আজ এক মাসের উপর হোস্টেল ছেড়ে বের হতে পারেনি। অথচ অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু যেমনি হোস্টেলের বাইরে পা ফেলতে উদ্যত, চোখে পড়েছে ওদিকের ফুটপাতে অদৃষ্টের প্রহরীর মতো রবিন দণ্ডায়মান, আবার গিয়ে জুটেছে ঘরে। হোস্টেলে এসে অনেক বার দেখা করতে চেষ্টা করেছে রবিন, ভাগ্যে উপরে ওঠবার নিয়ম নেই বাইরের লোকের, দারোয়ান রামযশের মুখে খবর পেয়ে জানিয়ে দিয়েছে দেখা হবে না। সে চেষ্টায় হতাশ হয়ে এখন সে অপেক্ষা করে থাকে ফুটপাতের উপরে।

এতদিনের অসাক্ষাতে না জানি কি ভাবছেন অরবিন্দবাবু। চিঠি লিখে জানালেও চলতো। কাগজ কলম নিয়ে বসে বুঝতে পেরেছে সব কথা চিঠিতে লেখা চলবে না। সব কথা লিখলে কালির আঁচড় লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে, আর সব কথাই যদি না লিখতে পারলো দুটো কুশল সংবাদ লিখে কি লাভ। শাদার উপর কালো অক্ষর লাল হয়ে ওঠা হয়তো অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, কিন্তু সেদিনের স্মৃতি মনে হ'লে তার কানের ডগা দুটি লাল হয়ে উঠে, কপাল থেকে কপোল বেয়ে তরঙ্গিত হয়ে যায় একটা রক্তিমাভা। ছি ছি!

মলিনা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার দু'তিন দিন পরে একদিন বিকালে বেরিয়েছিল অরবিন্দর বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছায়। পথের মোড়েই দেখা রবিনের সঙ্গে। আসুন আসুন, ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে, একসঙ্গে যাওয়া

যাক।

শুভ্রা ভাবলো সেও যাচ্ছে অরবিন্দর কাছে। বল্‌ল, চলুন।

তখনও সে চেনেনি রবিনকে।

এই ট্যাক্সি, শোনো।

এইটুকুন যাবো আবার ট্যাক্সি কেন?

না, না, উঠুন, দিনকাল খারাপ আর পথটাও ভালো নয়।

অগত্যা উঠতে হ'ল শুভ্রাকে :

গাড়ী বেগে ছুটলো।

ওকি, এ কোন্‌ পথে চল্‌ল ট্যাক্সি?

ঠিক পথেই চলেছে, জানে কিনা। কিছুক্ষণ আগেই শেয়ালদা স্টেশনের মোড়ে মারামারি হয়ে গিয়েছে!

গাড়ী ছুটেছে বৌবাজার ধরে।

তবে কি আমহার্স্ট স্ট্রীট হয়ে যাবেন?

হাঁ তাই বটে।

কিন্তু এ কি, ঐ তো ডান হাতে আমহার্স্ট স্ট্রীট রয়ে গেল।

ও পথটাও ভালো নয়, এই ড্রাইভার জোরে চালাও।

গাড়ী লালদীঘিতে এসে পৌঁছলো। সেদিনটা ছিল ছুটির বার। লালদীঘির আশপাশ নির্জন, তারপরে শীতের সন্ধ্যা স্বভাবতই আবছায়া, একটুখানি কুয়াশার মতোও ছিল।

এবারে সত্যই ভয় হ'ল শুভ্রার। এর আগে অনেকবার রবিনের চোখে তৃষ্ণার জ্বালা দেখেছে।

কোথায় নিয়ে চললেন আমাকে!

ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাবো, ভয় পেয়েছ নাকি?

ভয় পাইনি, তবে ভাবছি আপনি অনধিকারীর কাজ করছেন।

অধিকারী কি কেবল ঐ অরবিন্দটা?

ও নাম আপনার মুখে সাজে না।

ইস, এতখানি দরদ!

শুভ্রার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল—সদম্ভে বল্‌ল, হাঁ।

গাড়ী স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে ছুটেছে।

গাড়ী থামাতে বলুন, আমি নামবো।

এখানে কোথায় নামবে, পাশেই গঙ্গা।

তবে গঙ্গাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো।

হাঙর কুমীর আছে জানো কি!

জানি না, তবে গাড়ীর মধ্যে আছে জানি।

বটে! তবে তাই হোক,—বলে সজোরে শুভ্রাকে জড়িয়ে ধরে এক সঙ্গে পাঁচ-সাতটা চুমো খেলো।

গাড়ী হঠাৎ থেমে গেল।

বাবু, আপ উতার যাইয়ে।

কেন, চোরের উপরে বাটপাড়ি করবে নাকি?

বহুৎ শরমকি বাৎ, উতার যাইয়ে, জলদি।

সর্দারজীর বিশাল বপু, রক্ত চক্ষু আর মেঘমন্দ্র গর্জনে ভীত রবিন দুড় দুড় করে গাড়ী থেকে নেমে গেল—যাও, এবারে পড়লে সর্দারজীর পাল্লায়।

তার কথার উত্তর না দিয়ে সর্দারজী শুভ্রাকে সেলাম করে বল্‌ল, পহেলা কশুর মেরা মাইজি, ক্যায়সা জানুঙ্গা বাবু এসা লুচ্চা হ্যায়!

তারপরে কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে বল্‌ল, কিধার যায়েঙ্গী মাইজি?

শুভ্রার কি তখন উত্তর দেবার মতো অবস্থা ছিল, তার চোখে জলের ধারা, কণ্ঠ রুদ্ধ আর রুমাল দিয়ে সবলে ঘষছে দুই গাল।

কিধার যায়েঙ্গী মাইজি?

কলেজ মে চলো সর্দারজী।

কলেজের দরজায় নামিয়ে দিলে। শুভ্রা ভাড়া দিতে গেল।

মাপ কিজিয়ে মাইজি।

ভাড়া নেবে না কেন সর্দারজী?

কশুরকা খেসারৎ দেনে পড়েগা। বলে সেলাম করে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

লিখতে গেলে এই ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, কিন্তু একি লিখবার না বলবার। তারপরে আরও আছে। দু-তিন বাদ বাদ খামে চিঠি আসতে লাগলো রবিনের। প্রথমখানা পড়েছিল, বিষয়টা স্ট্র্যাণ্ড রোডের ঘটনার অনুরূপ। তারপরে আর পড়তো না, হাতের লেখা চিনে পুড়িয়ে ফেলতো। একদিন এলো টাইপ করা ঠিকানায় খাম। খুলে দেখলো সে চিঠিখানায় একসঙ্গে মধু ও গরল, পরে আর টাইপ করা চিঠিও না খুলে পুড়িয়ে ফেলতো।

এ হেন বিষম সঙ্কটে একমাত্র নির্ভর অরবিন্দ। কিন্তু তাঁকে জানাবার

উপায় কি ? চিঠিতে লেখা চলে না, আর তাঁর বাসায় যাওয়ার পথে ঐ সদা-জাগ্রত প্রহরী। নিঃসঙ্গ কে ? যার মনের সুখদুঃখের অংশ নেবার লোক নেই। শুভ্রা নিঃসঙ্গের চরম।

একদিন বিকালবেলা নিজের ঘরে বসে কিভাবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায় ভাবছে শুভ্রা এমন সময়ে রামযশ এসে জানালো, এক বাবু দেখা করতে এসেছে।

না, না, দেখা হবে না, বাবুকে বলো গিয়ে।

দিদিমণি, এ নূতন এক বাবু, আগে যিনি আসতেন তিনি নন।

নূতন আবার কে আসবে, ভাবতে ভাবতে নেমে এসে শুভ্রা চমকে উঠ্‌ল, দাদা আপনি!

অরবিন্দ বল্‌ল, হাঁ নিতান্তই আমি।

এতদিন কেন আসেন নি দাদা ?

তুমিও তো যেতে পারতে।

যাওয়ার উপায় থাকলে অবশ্যই যেতাম।

হাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি—রবিনটার যে এতদূর অধঃপতন হয়েছে জানতাম না।

কার কাছে শুনলেন।

অধঃপতনের কাহিনী বিবৃত করতে অধঃপতিতের বড় আনন্দ। ভাবে খুব বাহাদুরি হ'ল।

আপনি কি ভিজিটরস রুমে বসবেন ?

না, সেখানে বড় ভিড়।

এতক্ষণ দুজনে কথা হচ্ছিল সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে—চলো।

তারপরে হেসে বল্‌ল, ভয় নেই।

দাদা তোমার কাছে আমি নির্ভয়, যেখানে নিয়ে যেতে চাও যাবো।

এই প্রথম 'তুমি' বলে সম্বোধন করলো অরবিন্দকে।

একটু দাঁড়াও দাদা, আমি আসছি।

ঘরে ঢুকে শাড়ীখানা বদলালো, মুখটা ধুলো, তারপরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে মুখ দেখলো। হঠাৎ গালের দিকে নজর পড়তেই রুমাল দিয়ে বারকতক ঘসলো, কলঙ্ক-চিহ্ন যেন কিছুতেই মুছছে না। তারপরে রুমালখানা হাণ্ড ব্যাগে পুরতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে সেখানা মেঝেতে ফেলে

দিয়ে নূতন একখানা রুমাল নিয়ে নেমে চলে এলো।

অরবিন্দ বল্‌ল, হয়েছে, তবে চলো।

কোথায় ?

ভয় নেই স্ট্র্যাণ্ড রোডে নয় আর ট্যাক্সিতেও নয়, মুসলমানপাড়া লেন পর্যন্ত দিব্বি হেটে যেতে পারবে।

বলেছে সব!

নইলে আর বাহাদুরি কি।

তোমাদের বিপ্লবী দলে এরকম লোকও আছে।

আছে নয়, ছিল।

বেশ না হয় ছিলই বললাম।

কেন, সন্তানদলে কি ভবানন্দ গোঁসাই ছিল না ?

তাই তো!

শুভ্রা, বিপ্লবীদের প্রথম লড়াই রিপুর সঙ্গে, সবাই কি জিততে পারে! যারা হেরে যায়, ঘা-খাওয়া নেকড়ের মতো ভীষণ হয়ে ওঠে তারা। তাদেরি একজনের হাতে দুর্ভাগ্যবশতঃ পড়েছিলে তুমি। এখন এসব তত্ত্বকথা থাক।

বাসায় পৌঁছে বল্‌ল, এসো চা খাওয়া যাক।

কিন্তু কি পরামর্শ যে ছিল বললেন!

সেটা চা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, তাতে তার গুরুত্ব কমবে না।

শুভ্রা হেসে উঠ্‌ল। অনেকদিন পরে হাসলো। শুভ্রার হাসি কৃপণের ধন নয়, রাজার ঐশ্বর্য।

চা শেষ হ'লে শচীনের চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বল্‌ল, নাও পড়ো।

খুব বড় চিঠি নয় তবু পড়তে প্রায় আধঘণ্টা লাগলো।

কি, শেষ হ'ল শুভ্রা, তুমি কি বানান করে ক'রে পড়ছিলে ?

পরিহাসের দিক দিয়ে গেল না, ভীত হরিণীর মতো চোখ তুলে তাকিয়ে বল্‌ল, দাদা, অবশেষে তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে!

চোখের কানায় কানায় জল টলমল করছিল—আমার যে আর কেউ নেই, বলবার সঙ্গে সঙ্গে জল ছাপিয়ে গেল কানাকে। দুইহাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগলো, কান্না আজ আর কোন বাধা মানবে না।

দু'জন লোক অনেকক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকলে, বিশেষ সে দু'জন যদি নরনারী হয় তবে বুঝতে হবে সম্মুখে একটা সঙ্কট। অরবিন্দ বুঝলো আর

বেশিক্ষণ এভাবে থাকা উচিত নয়। বল্‌ল, শুভ্রা, তুমি নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে করো কেন, বলবে কি? আমি তোমার ঘরের কথা কিছুই জানিনে, বলতে বাধা আছে কি?

বাধা কিছুই নেই, তবে তুমি শুনে কি করবে।

খুব সম্ভব কিছু করতে পারবো না, তবে কি জানো, অনেক সময় মন খুলে বললে মনটা হাল্কা হয়।

কিছু কিছু মলিনাদিকে বলেছি।

আমি শুনিনি।

তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন কেন আমি বিনা পারিশ্রমিকে অবিনাশবাবুর সেবা করছি। তাঁকে বলেছিলাম, অবিনাশবাবুর মধ্যে লবণ সত্যাগ্রহে সগু নিহত আমার ভাইয়ের সেবা করছি। তার জন্যে যা করতে পারিনি তাই যেন করছিলাম আপনার মাস্টার মশাইয়ের জন্যে।

সেটা আমি বুঝেছিলাম বলেই শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে তোমার সেবার মূল্য চুকিয়ে দিতে চাইনি।

তুমি না বুঝলে আর কে বুঝবে দাদা।

আবার কিছুক্ষণ নীরব শুভ্রা।

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো, তারপরে?

বাপ মা দুই ভাই আর আমি মিলে আমাদের সংসার। বর্ধমান জেলার এক প্রান্তে আমাদের বাড়ী, খাওয়া পরা বেশ সচ্ছলভাবে চলে এমন অবস্থা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন বাবা, দু'তিনবার স্বদেশী কাপড়ের দোকান করলেন। পুলিশের কারসাজিতে প্রত্যেকবার দোকান পুড়ে গিয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল বিষয়সম্পত্তির অনেকটা। অবশেষে বাবাকে কি একটা ছুতোয় জেলে নিয়ে পুরলো, জেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি মারা গেলেন। শেষ সময়ে আমরা কেউ দেখতে পাইনি, অবশ্য দেহ সৎকার করবার অনুমতি দিয়েছিল।

অরবিন্দ বল্‌ল, হাঁ, পুলিশ অনাবশ্যক খরচ করে না। ওটা করবার সুযোগ দেয় আত্মীয়দের।

আমার বড ভাই, আমার চেয়ে অনেক বড়, তাঁকে ছায়ার মতো মনে পড়ে, বাবার মৃত্যুর রাগে বিপ্লবী দলে ঢুকলেন। পর পর এ দুই আঘাত মায়ের সহ্য হ'ল না। তিনি মারা গেলেন। থাকলাম আমরা দুই ভাই বোন। দুজনেই নিতান্ত নাবালক। আমাদের এক মাসি থাকতেন কল্‌কাতায়, ভালো অবস্থা,

তিনি আমাদের নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

আর তোমাদের বাড়ী ঘর ?

অমনি পড়ে রইলো এক পুরানো চাকরের জিম্মায়।

এখন ?

লোকমুখে শুনেছি প্রতিবেশীরা দখল করে নিয়ে ভোগ করছে।

আর যাওনি ?

কার ভরসায় যাবো, আর গিয়েই বা কি লাভ। তারপরে শুনুন। এলো গান্ধী আন্দোলনের যুগ। আমাদের রক্তের মধ্যে ছিল দেশের প্রতি টান। ভাই চলে গেল সোদপুরে সতীশ দাসগুপ্তের আশ্রমে। পাছে আমি আবার ঐ রকম কোথাও যাই, মাসি আমাকে ভর্তি করে দিলেন এক নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে। নার্সিং পাশ করে কাজে ভর্তি হওয়ার পরেই তিনিও গেলেন।

আর তোমার ছোট ভাই ?

সে মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতো। কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহে রওনা হওয়ার আগের দিন দেখা করতে এলো। বললাম—চল বাইরে গিয়ে কিছু খাইগে। তাকে খাওয়ানো সে এক কঠিন ব্যাপার। চা খায় না। বিলিতি চিনি খায় না, কোন খাওয়ার দোকানে ঢুকতে পারিনে, চীনে বাদাম আর চানাচুর কিনে নিয়ে পথে পথে ঘুরে খেলাম দু'জনে। গঙ্গার ঘাটে পাথরের বেঞ্চিতে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলাম।

সে বলল, দিদি, আমি হয়তো আর ফিরবো না।

সে কি কথা অশেষ—ঐ তার নাম, কতলোক সত্যাগ্রহে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে।

কতজন ফিরছে না তার হিসাব কে রাখে।

না ফিরলে সংবাদপত্রে জানা যেতো।

দিদি, সংবাদপত্রের উপরে বেশি ভরসা রেখো না।

না, না, ওসব অলুক্ষণে কথা এখন থাক।

আচ্ছা না হয় থাকুক, কিন্তু দিদি তোমার হাসপাতালে আহত সত্যাগ্রহী এলে সেবা করো, মনে করো যেন আমিই এসেছি।

এই শেষ কথাগুলি বলবার সময়ে তার চোখে জল পড়ছিল।

কিছুক্ষণ সময় দিয়ে অরবিন্দ শুধালো, তোমার বিপ্লবী ভাইয়ের কি হ'ল জানালে না তো।

জানাবার তো কিছু নেই দাদা। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে দেখলাম,

আগের দিন তিনি মারা গিয়েছেন।

হঠাৎ!

হঠাৎ বই কি, গোলদীঘিতে একদিন সকালে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল, বুকে গুলি লেগেছিল।

কতদিন আগেকার কথা?

বোধ হচ্ছে ১৯১৩ কি ১৯১৪ সালের কথা, তখন আমরা শিশু।

উৎকট আগ্রহের সঙ্গে অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো, কি নাম ছিল তাঁর?

রমণী চৌধুরী, রিপন কলেজে পড়তেন।

অরবিন্দ স্বগতঃ ভাবে আবৃত্তি করলো, রমণী চৌধুরী, রিপন কলেজে পড়তেন!

চিনতেন নাকি?

হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে এলো কেন শুভ্রা?

আপনিও তো এক কালে বিপ্লবী দলে ছিলেন তাই।

তারপরে ভেবে বল্‌ল, শুনেছি বিপ্লবীদের মধ্যেও নানান দল, না চিনবারই কথা।

অরবিন্দ শুধু বল্‌ল—না।

এই না শব্দটি যে কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক বোঝা গেল না। তবে শুভ্রার মনে হ'ল দাদাকে অরবিন্দবাবু চিনতেন না।

হঠাৎ অরবিন্দকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখে বিস্মিত শুভ্রা শুধালো, কি হ'ল দাদা?

না এমন কিছু নয়। শোনো শুভ্রা, আমি যদি দিনাজশাহীতে যাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

অধিকতর বিস্মিত শুভ্রা বল্‌ল, সেখানে গিয়ে কি করবো?

সেখানেও সরকারী হাসপাতাল আছে, নার্সের সেখানেও দরকার।

না, সে হয় না দাদা।

কেন হয় না?

এই কেনর উত্তর দিতে গেলে শুভ্রাকে বলতে হয় যে মলিনা রাগ করবে, কেন রাগ করবে নিজে সে জানে কিন্তু অপরকে বলে কি করে? বিশেষ অরবিন্দকে। এইটুকু বল্‌লে যে অনেকখানি বলা হয়ে যায়। শুভ্রা বুঝেছে, মলিনার মনের বিরূপতার আসল কারণ তার ধারণা শুভ্রা অরবিন্দকে ভালোবাসে, আবার হয়তো বা অরবিন্দও তার প্রতি আসক্ত। কিন্তু এ সব কথা কি বলা

চলে অপর পুরুষকে! তাই সেই শুধু বল্‌ল—হয় না বলেই হয় না।

তবে আমারও যাওয়া হয় না।

এবারে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন যাওয়া হয় না।

তোমার উত্তরটাই ফিরিয়ে দেব, হয় না বলেই হয় না। না, আর তর্ক-বিতর্ক করে সময় কাটিয়ে লাভ নেই, চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি, অনেক রাত হ'ল।

হোস্টেলে ফিরে এসে শুভ্রা ভারি একটি স্বস্তি অনুভব করলো, সে একেবারে অসহায় নয়—তাকে দেখবার একজন কেউ আছে। এখনো অবশ্য তার মনে অরবিন্দর প্রতি প্রেমের চৈতন্য জাগেনি, তবু যে তাকে জড়িয়ে ধরেছে এ ঠিক প্রেমালিঙ্গন নয়, এ মজ্জমান ব্যক্তির কাষ্ঠখণ্ডকে জড়িয়ে ধরা। প্রেমের মূল্য যাই হোক প্রাণের মূল্যটাও কম নয়। পেট ভরে খেলো আর আরামে ঘুমালো।

অরবিন্দর অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। কালুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সে খেলো না আর সে রাত্রে ঘুম একেবারেই এলো না তার মশারির কাছে।

সে ভাবছিল অদৃষ্টের কি দুর্মোচ্য নাগপাশ—একটি হত্যাতেই দুজন নারীকে মর্মান্তিক আঘাত করেছে। রমণী চৌধুরী মলিনার প্রণয়ী, আবার রমণী চৌধুরী শুভ্রার অগ্রজ। মলিনার মন তার প্রতি বিকল জানবার ফলে আর শুভ্রার স্নিগ্ধ সেবার পরিণামে নিজের অগোচরে অরবিন্দর মন শুভ্রার প্রতি অনুকূল হয়ে উঠছিল। এমন সময়ে অদৃষ্ট দুর্ভেদ্য যবনিকা নিক্ষেপ করলো তাদের মধ্যে। অদৃষ্টের বাহাদুরি আছে বটে। তার মতো নিপুণ প্রযোজক আর কোথায়।

অবশ্য শুভ্রা এখনো জানে না অরবিন্দ তার ভ্রাতৃহন্তা। কিন্তু নিজে তো জেনেছে, সেটাই কি যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় আর কোন ভাবে তো শুভ্রার সাহায্য করা সম্ভব নয়, আর কিছু না পারে কল্‌কাতায় থেকে তার দেখাশোনা করবার ভার তো নিতে পারে। যে রেখায় সম্ভবের শেষ আর অসম্ভবের আরম্ভ সেই পর্যন্তই মানুষের অধিকার।

ভোরবেলা উঠে শচীনকে চিঠি লিখে জানালো, এখন তার পক্ষে কল্‌কাতা পরিত্যাগ সম্ভব নয়। চিঠিখানা স্বহস্তে ডাকে দিল।

৫০

অবশেষে কথাটা গড়াতে গড়াতে যজ্ঞেশবাবুর কানে গিয়ে পৌছলো। কথাটা লবকুশের বিবাহ সম্বন্ধীয়। শচীন মলিনা ও রুক্মিণীর মধ্যে বাবার কানে কে

তুলবে কথাটা নিয়ে দু'তিন দিন তর্কবিতর্ক হল, প্রত্যেকেই অপরের উপরে দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চায়।

মলিনা বল্‌ল, বউদি তুমি বলো।

বাঃ আমি কেন বলতে যাবো, আমি পরের মেয়ে।

আরে ছেলে দুটো তোমার তো।

রুক্মিণী অপাঙ্গে শচীনের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঁরও তো।

শচীন সরাসরি জানিয়ে দিল, আমি এর মধ্যে নেই, তোমরা যে হয় বলো, না হয় দু'জনেই এক সঙ্গে যাও।

রুক্মিণী বল্‌ল—আমিও এর মধ্যে নেই।

মলিনা বলে উঠ্‌ল, বাঃ বেশ মজা তো। যার ছেলে তারা কেউ এর মধ্যে নেই—আমি চোরের দায় ধরা পড়লাম নাকি ?

সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহ মলিনার, সেটা কেবল পিসিত্বের অধিকারে মনে করলে ভুল হবে। অরবিন্দকে এখানকার কলেজে যোগদানের জন্য চিঠি লিখবার পর থেকে তার মনটা উল্লসিত ছিল, এবারে ঐ ডাইনের হাত থেকে ছাড়া পাবে বোকা লোকটা। শচীনের আহ্বানে সে যে সাড়া দেবে সে বিষয়ে তার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। এই সিদ্ধান্তের উপরে ভর করে একদিন রুক্মিণীকে গিয়ে জানালো, দেখো বউদি, দাদা তো লিখেছিলেন এখানে আসতে অরবিন্দবাবুকে, কিন্তু বলে রাখছি তাঁকে আমাদের বাড়ীতে রাখা চলবে না।

কেন ভাই মলি, তাঁর অপরাধটা কি ?

লোকটি বড় সুবিধার নয়।

তবে তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন মনে প'ড় কি ?

তখন কি জানতাম !

কখন্ জানলে শুনতে পারি কি ?

ও আলোচনা থাক। কিন্তু এখানে রাখা চলবে না।

যাঁর বাড়ী তিনি যদি রাখেন ?

বেশ আমি দাদাকে বলছি।

বাড়ী তোমার দাদারও নয়।

দাদা বাবাকে বলবেন।

আর বাবা রাজি হবেন না।

তবে উপায় ?

নিরুপায়। কিন্তু নবকুশের বিয়ের কথাটা যেন চাপা পড়ে গেল মনে হচ্ছে।

মোটেই চাপা পড়েনি, বাবার কানে তোলবার একটা সহজ পন্থা মনে এসেছে।

কি সেটা ?

চলো আমাদের তিন জনের নাম লিখে লটারি করা যাক।

এ মন্দ প্রস্তাব নয়, তোমার দাদাকে বলো।

শচীন সব শুনে বল্‌ল, এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আমি তিন টুকরো কাগজে তিন জনের নাম লিখছি।

এই বলে তিনখণ্ড কাগজের প্রত্যেকটিতে মলিনার নাম লিখলো, তারপরে সেগুলোকে ভাঁজ করে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে বলল, কে তুলবে ?

মলিনা বল্‌ল, আমরা কেউ তুলবো না, ছোকরাকে ডাকো।

ছোকরা বাড়ীর একজন চাকর, যখন প্রথম এসেছিল বয়সে ও নামে ছিল ছোকরা, এখন যুবক, তবে নামটা এখনো ছোকরা রয়ে গিয়েছে। মানুষের নামটা যে স্থায়ী হয় এটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ছোকরা এসে শচীনের নির্দেশ মতো একটা কাগজ তুল্‌লো, খুলে দেখা গেল, লেখা রয়েছে মলিনা।

যাও মলিনা, এবারে বাবার কাছে।

যাচ্ছি, বউদি, তুমি সেই কথাটা কিন্তু দাদাকে বলতে ভুলো না।

মলিনা চলে গেলে শচীন বাকি দুই খণ্ড কাগজ খুলে রুক্মিণীকে দেখালো।

দুজনে এক সঙ্গে হেসে উঠ্‌লো।

এ যে ভয়ানক জালিয়াতি।

সংসারে থাকতে গেলে জাল ও ভেজালের উপরে নির্ভর না করলে চলে না। কিন্তু কোন্ কথাটা আমাকে জানাতে বলে গেল ?

রুক্মিনী জানালো মলিনার আপত্তি ও বক্তব্য।

হঠাৎ ওর আপত্তি হ'তে গেল কেন ?

মেয়েদের মনস্তত্ত্ব তুমি বুঝবে কি করে ?

মেয়ে যখন নই সত্যিই তো বুঝব কি করে। তুমিই না হয় বলো।

ওর আসল ইচ্ছা অরবিন্দ এখানে থাকে, আপত্তি জানাবার ছলে বিষয়টা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

তবে কি এখনো ওর টান আছে অরবিন্দর উপর ?

মাধ্যাকর্ষণের টান কি কখনো লোপ পায়!

বাঃ বেশ বলেছ। এ ছত্রটা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে থাকলে মানাতো।

কেন, রবীন্দ্রনাথের কি দোষ হ'ল?

এত সংক্ষেপে বলা তাঁর স্বভাব নয়। আচ্ছা এতই যদি টান তবে বিয়ে করতে রাজি হয় না কেন?

ও বলে বিয়ের বয়স চলে গিয়েছে।

তবে আবার টান কেন?

পাছে আর কেউ টান দেয়।

প্রহেলিকা রেখে শাদামাঠা ভাষায় বলো রুক্মি, মনে রেখো আমি ইস্কুল-মাস্টার, নারী মনস্তত্ত্ববিদ্ নই।

তবে অবধান করো—বলে গম্ভীর ভাবে বলতে সুরু করলো, মলিনার কেমন যেন ধারণা হয়েছে শুভ্রা নামে ঐ নার্স'টির টান অরবিন্দর উপরে।

বলো কি, আর অরবিন্দর!

তারও টান আছে মেয়েটার উপরে বলে মলিনার ধারণা।

তা হ'লে শুধু টান নয়—এবারে টানাটানি। কিন্তু এত কথা জানলো কি করে, আমরাও তো ছিলাম কল্‌কাতার বাসায়, কই কিছুই তো টের পাইনি।

যার প্রাণের দায় সে টের পায়।

না, মলিনার ওটা ভুল ধারণা। শুভ্রার উপরে টান সত্য হ'লে এত সহজে এখানে আসতে রাজি হ'তো না।

কেন, চিঠি এসেছে নাকি?

এখনো আসে নি তবে নিশ্চয় আসবে, এমন কি চিঠির বদলে খোদ মানুষটাও চলে আসতে পারে।

বিকাল বেলায় যজ্ঞেশবাবু যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন, মলিনা গিয়ে উপস্থিত হ'ল তাঁর কাছে। আজকাল তাঁকে বাড়ীতে নিরিবিলে পাওয়া প্রায় দুর্ঘট। কংগ্রেস আফিস, জনসভা ও জেল—এই তিনের মধ্যে বিভক্ত তাঁর দিবা রাত্রি। বাড়ীতে যখন থাকেন তখনো লোক-সমাগমে বিব্রত। আজ খুব একলা তাঁকে পাওয়া গেল। মলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। কি খবর মা? সকলে ভালো আছ তো?

মলিনা আদরের মেয়ে কটু কথাও তার মুখে মধুর শোনায়, বল্‌ল, বাবা, তুমি ভারতমাতাকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত, নিজের মার খবর জানবার সময় তোমার কই।

হেসে উঠে বল্‌লেন, এটা বেশ বলেছ, কিন্তু ঐ ভারত-মায়ের মধ্যেই আছে

নিজের মা।

আর নিজের নাতি?

তারাও আছে, সবাই আছে, ঐ যে রবিঠাকুরের গানে আছে না—এক দেহে হ'ল লীন, এ তাই আর কি।

তারপরে পিছনের দিকে একটি ছায়া লক্ষ্য করে বললো—ও কে? বউমা নাকি?

কি আশ্চর্য বুদ্ধি তোমার বাবা, হাঁ বউদিই বটে।

বউমা এসো কাছে এসো, বসো ঐ মোড়াটায়।

রুক্মিণী এগিয়ে এলো, তবে বসলো না।

এবারে বুঝেছি কিছু একটা আরজি আছে, অমনি শুধু শুধু বুড়ো বাপকে দেখতে আসনি।

মলিনা আবার বলল, আশ্চর্য বুদ্ধি শুধু নয় স্মৃতিশক্তিও আশ্চর্য বটে তোমার। তবু ভালো যে নিজের মেয়ে, বউকে চিনতে পারলে।

আবার হেসে উঠলো যজ্ঞেশবাবু, বললেন, দেশের কাজ করতে নামলে আপন লোক পর হয়ে যায়—

সূত্রটা পূরণ করে দিল মলিনা—আর পর হয়ে ওঠে আপন, কি বলো বাবা?

না, না, না, পর পরই থেকে যায়। ক্ষমতার ছিটেফোঁটা যেখানে আছে, মাছির মতো যারা সেখানে এসে জোটে তারা আসে আপন স্বার্থে, দেশের কথা ভুলেও তারা ভাবে না। সত্যি কথা বলতে কি মা, তোমাদের কাছে স্বীকার করেই ফেলি, চল্লিশ বছর ওকালতি করে যত স্বার্থপর শঠ ভণ্ড লোক না দেখেছি চল্লিশ মাস কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। উঁচু উঁচু বাড়ীর মাথায় একটা করে লোহার দণ্ড খাড়া থাকে দেখেছ তো, আমাদের এই কংগ্রেস সৌধের মাথাতেও তেমনি একটি অভ্রভেদী লৌহদণ্ড খাড়া হয়ে আছে, অন্তরীক্ষের ঝড়-ঝঞ্ঝার যত কিছু বিদ্যুৎ সমস্ত শুষে-নিয়ে তিনি চালান করে দেন মাটির মধ্যে, তাতেই বেঁচে যায় কংগ্রেস। কিন্তু ওসব থাক, আরজিটা কি শুনি।

বউদি বলছিল—

রুক্মিণী কটাক্ষে শাসন করলো, সংশোধন করে নিয়ে মলিনা বলল, আমরা সবাই ভাবছিলাম লবকুশের বিয়ের বয়স হ'ল, বিয়ে দেবে না নাকি?

বিয়ের বয়স হয়েছে শুনে তিনি যেন চমকে উঠলেন, বললেন, তাই তো।

তারপরে এমন বিস্ময়ে করুণায় পূর্ণ দৃষ্টিতে মলিনার মুখের দিকে চাইলেন

যার বিস্তারিত মনস্তত্ত্ব লিখতে গেলে একখানা মহাভারত লিখতে হয়। ভাবছিলেন, হায় কি করলাম, এমন স্বর্ণপ্রতিমার বিয়ে দিলাম না, বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় স্বর্ণপ্রতিমা ম্লান হয়ে গেল। স্বর্ণও অযত্নে ম্লান হয়। আবার কি তারই পুনরভিনয় হবে নাতিদের মধ্যে? না, না, না।

শুধালেন, শচীন কোথায়?

দাদা বাড়ীতেই আছেন।

ডাকো তাকে।

শচীন এসে উপস্থিত হলে বললেন, শচীন, লবকুশের জন্ম পাত্রী দেখো, তাদের যোগ্য পাত্রী যেন হয়। যমজ হ'লে সব চেয়ে মানাতো, তা অবশ্য পাওয়া যাবে না, তবে দুই বোন হ'লেও মন্দ মানায় না।

কেন পাওয়া যাবে না। বীরেনবাবুর যমজ মেয়ে আছে, ওদের সঙ্গে বয়সে বেশ মানাবে—কি বলো বউদি?

রুক্মিণী উত্তর দিল না, ভাবে বোঝা গেল তার আপত্তি নাই।

আমাদের বীরেনের যমজ মেয়ে আছে, কই আমি তো কিছুই জানতাম না।

তুমি কি করে জানবে বাবা, জেলে গেলে তবে তোমার নজরে পড়ে লোকটা।

শচীন বল্‌ল, কিন্তু বীরেনবাবু এখন জেলে—

আহা বিয়েটাও তো আজই হচ্ছে না, তুমি একবার ওদের বাড়ীতে গিয়ে প্রস্তাবটা তুলে দেখো না।

আচ্ছা যাবো।

আরজি মঞ্জুর মা, এবারে তো হ'ল?

আপীলে আবার উল্টে না যায়!

না ভয় নেই মলি, ভয় নেই বউমা, এ সব মামলায় কি আপীল চলে!

সকলে ভিতরে চলে আসতেই মলিনা বলে উঠল, নাও বউদি, এবারে কি খাওয়াবে বলো?

আজ সব চেয়ে বেশি আনন্দ মলিনার। ডাইনি ছুঁড়িটার কবল থেকে অরবিন্দর মুক্তি আসন্ন—আবার এদিকে লবকুশের বিয়েটাও আসন্ন। তার সন্তান সম্ভাবনা না থাকায় লবকুশের উপরে তার মাতৃস্নেহ পড়েছিল, যার মাত্রা রুক্মিণীর স্নেহের চেয়ে কম নয়।

হায়, সে যদি জানতো আগামী কল্যের তূণীরে কি বাণ অপেক্ষা করছে তার জন্তে! মানুষের এত নিবিড় অমানুষোচিত আচরণেও বিধাতা যে

তার প্রতি অপ্রসন্ন নন তার একটি প্রধান প্রমাণ অচির আসন্ন দুর্ভাগ্যকেও যতক্ষণ সম্ভব প্রচ্ছন্ন করে রাখেন তিনি।

আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপাত্রী সবচেয়ে নগণ্য অর্থাৎ তাদের কেউ গণনার মধ্যে আনে না। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, লবকুশকে কেউ বিষয়টা জানানো প্রয়োজন মনে করলো না, তাদের ইচ্ছা আছে কিনা, পাত্রী পছন্দ কিনা ইত্যাদি যদিচ তাদের এখন বয়স আটাশ অতিক্রম করেছে, তা ছাড়া নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করবার ফলে বিচার করবার শক্তি তারা অর্জন করেছে। তবু শেষ পর্যন্ত কথাটা তাদের কানে পৌছলো।

তাদের শয়ন কক্ষে প্রশস্ত শয্যার উপরে তারা শয়ান। দু'জনেই নীরব কিন্তু কেউ ঘুমোয়নি। অবশেষে লব বলল কুশকে, দাদাভাই, ঘুমোলে নাকি?

কুশ বলল, না দাদা।

ঐ সম্বোধন দুটো বাল্যকালে বয়স নিয়ে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে মলিনার মধ্যস্থতায় স্থির হয়েছিল, কুশ কয়েক মুহূর্ত পরে জন্মেছে তাই দাদাভাই, আর অগ্রজাত লব হচ্ছে দাদা।

এখন করবে কি বলো?

কুশ বলল, বলির পাঁঠার মতামত কেউ জিজ্ঞাসা করে কি!

তবে কি বলি-প্রদত্ত হবে?

স্বেচ্ছায় কোন পাঁঠা হাড়কাঠে গলা দেয় কি?

লব বলল, তাই যে হ'তে চলল।

উপায় একমাত্র পলায়ন।

কিন্তু পালাবে কোথায়?

একটি মাত্র স্থান আছে ভূভারতে যেখানে পৌছতে পারলে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কোথায় সেই নিরাপদ স্থান?

কুশ বলল, ওয়ার্ধার বাপুজির কাছে।

চৎমকার আইডিয়া, বলে উঠে বসলো লব। কিন্তু বাপুজিকে কি বলবে?

জানো তো দাদা সেখানে কোন তঞ্চকতা চলবে না, সব খুলে বলবো, বলবো আমরা দেশের কাজ করে আসছি তাই করবো, এখন বিয়ে করবো না।

তা ছাড়া সম্মুখে আসছে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন, তার মধ্যে কে বাঁচবে কে মরবে স্থির নেই, এর মধ্যে বিয়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কিন্তু না বলে পালাবে নাকি?

কুশ বলল, দাদা, বলে পালালে আর পালানো হ'ল কই, আর পালাতে

দেবেই বা কেন। মা বাবা পিসিমা দাদু চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, হয়তো তখনি পাত্রী নিয়ে এসে বিয়ে দিয়ে দেবে।

তবে চলো বেরিয়ে পড়ি।

দাদা, আজ নয়, কালকে রাতে নিঃশব্দে চলে যেতে হবে।

একটা চিঠি লিখে জানিয়ে যাবে না।

সর্বনাশ! তাহ'লে তারাও ওয়ার্ধায় গিয়ে হাজির হবে।

তবে মোটেই জানাবে না?

যা জানাবার বাপুজি জানাবেন। কালকের দিনটা এমনভাবে কাটাতে হবে যেন আমরা কিছুই জানি না।

পরামর্শ স্থির হ'লে তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

মলিনা ও রুক্মিণী পাত্রী দেখে ফিরে এসে যজ্ঞেশবাবুকে জানালো, পাত্রী সুন্দরী, বয়সেও মানাবে, বীরেনবাবুর স্ত্রীও রাজি। কেবল একটি বাধা মেয়েদের বাবা এখন জেলে, এ সময়ে বিয়ে দেওয়া কি উচিত।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, সেটা একটা বাধা বটে তবে এমন অলঙ্ঘ্য নয়। বীরেনের কাছে চিঠি লিখে মত আনিয়ে নিলেই হবে।

ওরা জিজ্ঞাসা করলো, লবকুশকে জানানো হবে কি?

না, এখন প্রয়োজন নেই, বীরেনের অনুমতি পাওয়া গেলে জানালেই হবে।

উভয়পক্ষই নীরব রইলো যেন কেউ কিছু জানে না।

সে রাতে সামান্য কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে দু'জনে বাড়ী থেকে বের হ'তে যাবে, এমন সময়ে লব বলল, চরখা দুটি নিলে হ'তো।

চরখা দেখলে পুলিশে এখনি ধরবে আর ওয়ার্ধায় পৌছতে হবে না, তার চেয়ে তকলি দুটো নেওয়া যাক।

দুজনে থলির মধ্যে তকলি ভ'রে নিয়ে গৃহত্যাগ করলো।

পরদিন ভোরে লবকুশকে দেখা গেল না। কথাটা কেউ চিন্তা করেনি, কিন্তু সারাদিনের মধ্যে যখন তাদের দেখা পাওয়া গেল না চিন্তা আরম্ভ হ'ল। পরের দিন চিন্তা দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। রুক্মিণী নীরবে ও মলিনা সশব্দে কান্না জুড়ে দিল।

শচীন বলল, দাও বিয়ে।

যজ্ঞেশবাবু শুনে গম্ভীরভাবে বললেন, তাইতো!

খোঁজ খবর আরম্ভ হ'ল, সম্ভব অসম্ভব কোন স্থানে তাদের সন্ধান মিললো না।

মলিনা বল্‌ল, দাদা পুলিশে খবর দিলে হয় না?

আরে পুলিশেই হয়তো খবর জিজ্ঞাসা করবে—ওটা কাজের কথা নয়।

দুঃখের দিনও যায়, সুখের দিনও যায়—একটা শম্বুক গতি, একটা বিদ্যুৎ-গতি, ঘড়ির মাপে দুটোই চব্বিশ ঘণ্টা।

পঞ্চম দিনে দুপুর বেলা যজ্ঞেশবাবুর নামে একখানা টেলিগ্রাম এলো—খুলে পড়লেন, Lava Kusa arrived. Will stay with me. Cancel marriage. Bapu.

শচীন, ওদের খবর মিলেছে। শচীন ত্বরিতপদে এলে তিনি টেলিগ্রামখানা তার হাতে দিলেন।

শচীন টেলিগ্রামখানা পড়ে বল্‌ল, এর পরে তো আর কথা নেই।

হ্যাঁ একেবারে সুপ্রীম কোর্টের রায়।

ক্রমে মলিনা ও রুক্মিণী টেলিগ্রামের অর্থ শুনলো।

মলিনা মনে মনে বল্‌ল—এসব ঐ ডাইনির কীর্তি।

আগেই খবর এসেছিল যে অরবিন্দ আসতে অসমর্থ। মলিনা ভেবেছিল লবকুশের বিয়ের সংবাদ পেলে নিশ্চয় আসবে, তখন সকলে মিলে ধরেপড়ে তাকে আটকানো সম্ভব হবে। এখন সে আশায় ছাই পড়ায় হতাশ নারীসুলভ যুক্তির বলে সব দায়ে দায়ী করলো শুভ্রাকে। ঐ ছুঁড়িই এর মূলে। মুখ থেকে ব্যাঙটা ছুটে গেলে সাপটা যেখানে সেখানে ছোবল মারতে থাকে। শুভ্রা, অরবিন্দ, দেশের পরিস্থিতি সর্বত্র মলিনার ছোবল পড়তে লাগলো।

আর রুক্মিণী নীরবে গান্ধীজির সম্বন্ধে যা ভাবতে লাগলো তাকে ঠিক অবিনাশবাবুর মেয়ের যোগ্য বলা চলে না।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, শচীন, এখন বীরেনের বাড়ীতে গিয়ে জানিয়ে এসো, এখন বিয়ে বন্ধ রইলো, পরে যা হয় জানাবো।

শচীন স্কুলে যাওয়ার পথে বীরেন চৌধুরীর বাড়ীতে গেল।

৫১

আমাদের কাহিনীটি নিতান্ত ঘরোয়া। দিনাজশাহী শহরের গুটি দুই-তিন পরিবারের নরনারী তাব পাত্রপাত্রী। তাদের যাতায়াতের পরিধি সঙ্কীর্ণ, দিনাজশাহী থেকে কল্‌কাতা অবধি। আরও একটি স্থান আছে জেলখানা,

All roads lead to Rome—তখনকার দেশের পরিস্থিতিতে All roads lead to the Jail।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া কাহিনী আর ঘরের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না। দেশের ইতিহাসে হঠাৎ এক-একটা সঙ্কট মুহূর্ত আসে যখন বাঁধ ভেঙে গিয়ে বন্যার জল প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে, আরাম বিরাম বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা সমস্ত ওলট-পালট করে দেয়। আমাদের ঘটনাকাল তেমনি একটি সাঙ্কটিক মুহূর্ত। এই ঘরোয়া কাহিনীর পিছনে আবর্তিত হচ্ছে ভারত-ভাগ্যচক্র। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে পরিহাস করে লোকে বলছিল গান্ধী এখন দেশময় রাই ছড়াচ্ছেন। কিন্তু রাই কুড়িয়েই বেল। এক দুই তিন করে দশ হাজা'র লোক এখন জেলস্থ, তার মধ্যে নেহরু প্যাটেল প্রভৃতি দিকপাল আছেন, অবশ্য গান্ধী এখনো মুক্ত। লোকের গঞ্জনা, ধিক্কার উৎসাহ অগ্রাহ্য করে তিনি চরখায় সুতো বুনোচ্ছেন, মাকড়শা যেমন নিশ্চল ভাবে কেন্দ্রস্থ থেকে জাল বুনে যায় তেমনি ভাবে। ওদিকে লোকে সকাল বেলায় উঠে সংবাদপত্র খুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যাক্, সুভাষবাবু এখনো ধরা পড়েননি।

গান্ধীবাদীরা বলে যা করবার বাপুজি করবেন, আপাততঃ গোটা দুই মিলিটারি এরোড্রোম করবার কন্ট্রাকট্ পাওয়া গিয়েছে, রেট দশগুণ। সুভাষপন্থীরা বলে, চুপ করে দেখো না, সুভাষবাবু জার্মান ফৌজ নিয়ে এলেন বলে, ইংরেজ দেখবে তখন মজা। আর উভয়পন্থীরা একটি গ্রাম্য ছড়ায় ইঙ্গিতে বলে—কাচ্চা বাচ্চা পাঠাইছ তত্ত্ব লইবারে, সুভাষবাবুকে গান্ধীজিই পাঠিয়েছেন বিদেশে, দুজনে তলে তলে যোগসাজস। আর একদল থলি কাঁধে রুক্ষকেশ ছোকরা চোঙা মুখে দিয়ে হেঁকে বেড়ায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বয়কট করো। আর এই সমস্ত ডামাডোলের মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় গান্ধীজি ভজন গান করেন—"বৈষ্ণব জনো তে কহিয়ে।"

এই ভারত ভাগ্যচক্র আবর্তনের পিছনে আবর্তিত হচ্ছে বিশ্ব ভাগ্যচক্র। ইউরোপের যুদ্ধের মন্দাক্রান্তাছন্দ পরিণত হয়েছে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে। ইউরোপের বারো আনা ভাগ এখন জার্মানীর কুক্ষিগত। ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্কটতম মুহূর্তে উইনস্টন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলেন, কিন্তু তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রান্সে যুদ্ধরত ইংরাজ সৈন্যদল কামান ট্যাঙ্ক ফেলে রেখে ডানকার্ক বন্দর থেকে কোন রকমে পালিয়ে ফিরে এলো ইংলণ্ডে। ইংলণ্ড নিরস্ত্র। শ পাচেক ভাঙা ট্যাঙ্ক, সঙ্গে বিমান বাহিনী অবশ্যই আছে আর আছে তাঁর হাতের দুই আঙুল ফাঁক করে Victory for V মুদ্রা প্রদর্শন করে ইংরাজের মনোবল

অটুট রাখবার চেষ্টা। তাঁর প্রধান অস্ত্র ইংরাজি ভাষা। ঐ বহু গুণী-জ্ঞানী সেবিত ভাষাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে নিয়ত তিনি যুদ্ধে প্রেরণ করছেন। ইংরাজি ভাষা ইংরাজের ভরসা। ঐ অস্ত্রের অভিঘাতে শত্রুরা ক্ষুব্ধ, মিত্ররা উৎসাহিত, মিত্রদের মধ্যে প্রধান আমেরিকা। মিত্রের কাঁধে বন্দুক রেখে, মিত্রের থলি থেকে অর্থ নিয়ে লড়াই করতে ইংরাজের জুড়ি নেই। মিত্রবাহিনীর শেষ সৈন্যটি অবধি, মিত্র তহবিলের শেষ মুদ্রাটি নিঃশেষ না হওয়া অবধি ইংরাজ লড়াই করে এবং জয়লাভ করে। জার্মানীর ছোট শরিক ইটালী গ্রীস আক্রমণ করতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হ'ল—আর উত্তর আফ্রিকায় যে বৃহৎ সৈন্যদল পাঠিয়েছিল তারা অস্ত্রশস্ত্র সহ বন্দী হ'ল। মুসোলিনি ভাঙেন তবু মচকান না, বন্দীর ও অস্ত্রশস্ত্রের দীর্ঘ তালিকা দেখিয়ে বলেন, দেখো কি রকম আয়োজনটা করেছিলাম। বাধ্য হয়ে ইটালীকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে লড়াই করতে হয় জার্মানীকে। হিটলার ইংলণ্ডে পৌছাতে না পেরে চুক্তিসূত্রে মিত্র রাশিয়াকে আক্রমণ করে। চার্চিল আহ্লাদে হাত উঁচু করে তুলে রাশিয়াকে দেখায় V-মুদ্রা। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়া মাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হ'ল, এ দেশের চোঙাধারীর দল চোঙাতে নূতন বাণী ফুঁকতে সুরু করলো, জনযুদ্ধে সকলে যোগ দাও।'

পশ্চিম গোলার্ধে যুদ্ধ চলছে, ওদিকে পূর্ব গোলার্ধে জাপানের হাত নিশপিশ করছে, হাজার বছরের মধ্যে এমন সুযোগ আসবে না। ইংরাজ বিব্রত, আমেরিকা নিশ্চিন্ত, অতএব—প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার বৃহত্তম নৌঘাঁটি আক্রমণ করে বসলো জাপান, আর অজেয় গতিতে ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, মালয় উপদ্বীপ জয় করল। সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটির পতন ঘটিয়ে বর্মায় এসে উপস্থিত হ'ল। এদেশে ইংরাজের ভরসায় কোম্পানীর কাগজ, চাকরিবাকরি, বাড়ীঘর, ব্যাঙ্কে টাকা ও পেনসন প্রভৃতি অক্ষয় ভেবে যারা ভোগ করছিল, বিষম রেগে গেল ইংরাজের উপর। এ রাগ নয়, অনুরাগের বিকার। জাপান যে ভারতে ঢুকলো বলে! দেশের লোক তল্পিতল্পা বগলে করে কোন্ পথে যাব চিন্তা করছে, আর একদল বিশেষ-অজ্ঞ গম্ভীর ভাবে শোনাচ্ছে—সমস্ত চেষ্টা বৃথা, শাস্ত্রে লিখিত আছে কলির শেষে পীত জাতি রাজত্ব করবে এ দেশে। কোন্ শাস্ত্রে কেউ জিজ্ঞাসা করছে না—জিজ্ঞাসার কী আছে! প্রভু ছাড়া গর্দভ কি নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে। মৃণালিনী উপন্যাস লিখবার সময়ই এ দেশকে চিনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সবাই শুধায়, সুভাষবাবু কোথায়, বাপুজি কি করছেন। বাপুজি লিখছেন হরিজন সাপ্তাহিক, আর সুভাষবাবু?

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন লোকে বেতারের কণ্ঠে শুনতে পেলো—"আমি সুভাষ বলছি। এতদিন আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় বলবার সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি আপনারা তা বিশ্বাস করেন না; আমি আমার কাজ করে যাবো, কে কি বলে তাতে আমার কিছুমাত্র আসে যায় না। অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্যে যদি ব্রিটেন আমেরিকার দ্বারস্থ হ'তে লজ্জা না পায়, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অপর কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয়, অপরাধও হ'তে পারে না। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত হ'তে থাকবেন। আমি যে ভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি করেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হব। প্রয়োজনের উপযুক্ত পাথেয় আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই হাজির হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যে সুযোগ আসছে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে যাতে কাজে লাগাতে পারেন তার জন্যে নিজেরা জাতিধর্মনির্ব্বিশেষে অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হোন—চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।" (বাংলায় বিপ্লববাদ)।

৫২

মলি, মলি, আমার ১৪ নম্বর চিঠিখানা পাচ্ছি না কেন, নিশ্চয় তোমরা কেউ আমার ফাইল থেকে নিয়েছ।

পিতার ডাক শুনে মলিনা এসে দাঁড়ালো, বলল, কি হয়েছে বাবা ?

এই তো বল্লাম, আমার চোদ্দ নম্বর চিঠিখানা পাচ্ছি না। এই দেখো বলে ১ ২, ৩, করে তিনি ১৫ পর্যন্ত দেখালেন, মাঝখান থেকে চোদ্দ নম্বর খানা উধাও।

মলিনা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, তাই তো, তোমার একখানা কোম্পানীর কাগজ খোয়া গিয়েছে দেখছি—ইস এখন কী হবে!

আরে, এ চিঠিগুলো কোম্পানীর কাগজের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

বাড়ীতে চোর-ডাকাত তো ঢোকেনি, দেখো এরই মধ্যে কোথাও আছে কিম্বা মনের ভুলে আর কোথাও রেখে দিয়েছ।

মলিনা, কি যে বলিস তার ঠিক নেই। আমার এই ফাইলটাতে সবগুলো চিঠি গুণে গুণে রেখে দি, সব শুদ্ধ সতেরোখানা চিঠি ছিল।

গুণতে ভুল করেছিলে তবে।

না, না, তোরা কেউ নিয়েছিস, তারপরে রাখতে ভুলে গিয়েছিস। আচ্ছা, একবার বউমাকে ডাক তো দেখি।

ডাকবার প্রয়োজন ছিল না, রুক্মিণী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পিতা ও কন্যার কথা শুনছিল, আর মৃদু মৃদু হাসছিল, এবারে সে এগিয়ে এসে বল্‌ল, বাবা আমি পড়তে গিয়েছিলাম, এই নিন চিঠি।

হারানো ধন ফিরে পেলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি ভাবে যজ্ঞেশবাবু বলে উঠলেন, দেখলি মলি, যাবে কোথায় চিঠি, দাও মা।

এই বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে মলিনাকে দেখালেন—এই দেখ্‌, উপরে আমার হাতে নম্বর দেওয়া—এই যে চোদ্দ লেখা।

মলিনা বল্‌ল, নাও, এবার হ'ল তো।

হ'ল বইকি। বউমা, এ ফাইলে তুমি ছাড়া আর কেউ হাত যেন না দেয়, লক্ষ্য রেখো।

বাঃ রে, ওরা না হয় বউদির ছেলে হ'ল। আমাদের বুঝি কেউ নয়।

বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করে চিঠিগুলো নম্বর ওয়ারি আর একবার গুণে সাজিয়ে রাখলেন,,বললেন, আজ বৃহস্পতিবার, আজ চিঠি আসবার দিন, আজকার চিঠি এলে আঠারোখানা হবে।

মলিনা বল্‌ল, বেশ, হারানো রত্ন পেলে তো, চলো এখন স্নান করতে চলো।

তুই যে কি বলিস মলি, এখনই ডাক পিওন আসবে, চিঠি পড়ে তবে স্নান-আহার।

ধরো যদি পিওন আসতে দেরী করে, কিম্বা আজ চিঠি না আসে তবে স্নানাহার বন্ধ রাখবে নাকি ?

ডাকঘরে বলা আছে আমার নামে চিঠি এলে তখনি পাঠিয়ে দেবে। আর চিঠি না আসা! সেটি হওয়ার জো নেই। সেবাগ্রামে মিলিটারি ডিসিপ্লিন। সোমবারে চিঠি লিখে বাপুকে দেখিয়ে ডাকে দিতে হবে।

আচ্ছা, সমস্তই স্বীকার করলাম, এখনো ডাক আসতে দেরী আছে, স্নানটা অন্ততঃ সেরে নাও।

আর চিঠিখানা এলে তুই আগে পড়িস এই তো মতলব। তোরা এখন যা, আমি যাচ্ছি।

ওদিকে তোমার স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাক।

আবার গরম করে দিবি। নে এখন পালা, চিঠি এলো বলে—এই বলে তিনি চেয়ারখানায় আবার জুৎ করে বসলেন।

অগত্যা মলিনাকে ও দরজার অন্তরালবর্তিনী রুক্মিণীকে প্রস্থান করতে হল; তারা দুজনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল শচীনের ঘরে।

দাদা, বাবা কি বলছিল শুনবে ?

শোনাতে হবে না, এখান থেকে সমস্তই শুনতে পেয়েছি। তোরা আর যাই করিস, বাবার ঐ ফাইলটা ঘাটাঘাটি করিসনে।

এবারে রুক্মিণী বল্‌ল, বেশ কথা তোমার, চিঠি পড়বো না।

কেন পড়বে না, বাবা তো পড়া হ'লেই তোমাদের হাতে দেন।

আবার যদি পড়তে ইচ্ছা হয়।

প'ড়ে নম্বর মিলিয়ে রেখে দেবে। দেখলে তো কি রকম তাঁর সতর্কতা. ঐ চিঠিগুলোর মধ্যেই এখন তাঁর প্রাণ।

আর আমার বুঝি কিছু নয়।

শচীন তাকিয়ে দেখ্‌লো রুক্মিণীর চোখে জল, মলিনার চোখেও।

লবকুশ চলে যাওয়ার পর থেকেই এ বাড়ীর সব আলো যেন নিভে গিয়েছে, দিনের বেলাতেও অন্ধকার গাঢ়, রাত্রে গাঢ়তর। যেদিন সেবাগ্রাম থেকে ওদের চিঠি এলো উৎসব পড়ে গেল বাড়ীতে। সবাই অন্ততঃ বার দশেক করে পড়লো, আর যজ্ঞেশবাবু যে কতবার পড়লেন তার সীমা সংখ্যা নেই। শুধু নিজে পড়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাঁর আগ্রহে পাড়ার সকলকেই পড়তে হয়েছে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে, সকলকে পড়িয়ে এসেছেন। বীরেন চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী, নৃপতি, স্কুল ও কলেজের সমস্ত শিক্ষক অধ্যাপককে পড়তে বাধ্য হয়েছে! কেবল সেই প্রথম চিঠিখানা নয়—প্রত্যেক চিঠি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা।

বীরেন ও সুবোধ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল, ভূপতি এখনো বন্দী। বীরেন, সুবোধ প্রভৃতির যোগাযোগ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে। সে আন্দোলনের ছোট বড় সকলেই এখন খালাস পেয়েছে। সরকার এখন যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্তে গান্ধীর সঙ্গে আপোষ করে নিতে চায়—সেই উদ্দেশ্যেই বিলাতের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্রিপস্‌ এসেছিল যদিচ তাকে শূন্যহাতে ফিরে যেতে হয়েছে, তবু বিপন্ন ভারত সরকার এখনো আশা ছাড়েনি। আসন্ন অল্‌ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে কি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অপেক্ষা করছে।

এমন সময়ে বাইরে যজ্ঞেশবাবুর হর্ষধ্বনি শোনা গেল—সবাই বুঝলো লবকুশের চিঠি এসেছে।

শচীন মলি, বৌমা তোমরা সবাই এসো, লবকুশের চিঠি এসেছে। কি মলি, তুই বলছিলি চিঠি আসবে না, ডাকপিওন আসতে দেরী করবে। এই

দেখ্ ঘড়িতে এখন ঠিক সাড়ে এগারোটা, প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ঠিক এই সময়ে চিঠি আসে।

শচীন চিঠিখানা পড়ছিল, মলিনা ও রুক্মিণী তার দুই দিক থেকে উঁকি মেরে যতটা দেখা যায় পড়ছিল।

আরে এ চিঠি বিলি করতে কি দেরী হ'তে পারে। পোস্টমাস্টার থেকে ডাকপিওন অবধি জানে এ চিঠি আসছে সেবাগ্রাম থেকে—সেবাগ্রাম এখন ভারতের রাজধানী। শচীন ঐ শেষের ছত্রটা লক্ষ্য করো, স্বয়ং বাপুজির হস্তাক্ষর।

মলি বল্‌ল, বাবা, তোমার বাপুজির হস্তাক্ষর এমনি দুরন্ত যে খোদ সরকারের গোয়েন্দা অবধি পড়তে পারবে না। •

আরে, এমন অস্পষ্টতা কি—এই তো দেখ না, বলে চিঠিখানা নিলেন শচীনের হাত থেকে—এই তো দেখ—Lava Kusa are doing well. With Love Bapu।

আবার চিঠিখানা শচীনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, লোক কি সাধে বড় হয় আমার মতো অধমকেও এক কলম লিখতে কখনো ভুলে যান না।

মলিনা বল্‌ল, সকলেই ওরকম শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে। ওটা শিষ্টাচার।

সেই কথা বুঝলেই হ'ল। তবে তাঁর শিষ্টাচার সকলের প্রতি সমান, বড়লাটের প্রতিও যেমন, কীটস্য কীট যজ্ঞেশ রায়ের প্রতিও তেমনি। একেই বলে সমদৃষ্টি।

তোমাদের পড়া হ'লে চিঠিখানা দেখিয়ে আনো শৈলেনখুড়োকে।

শৈলেনখুড়ো যজ্ঞেশবাবুর সমবয়স্ক হলেও এখন অশক্তপ্রায়, চলাফেরা বড় করতে পারেন না, প্রায়ই নিজের ঘরে শুয়ে থাকেন।

দাঁড়াও মা, চিঠিখানা একবার দাও তো।

এই বলে চিঠিখানা নিয়ে উপরে এক কোণে ইংরাজিতে 'আঠারো' শব্দটি লিখে দিলেন, বললেন, একটা নম্বর দেওয়া ভালো তাতে হিসাব ঠিক থাকে, বুঝতে পারা যায় কতগুলো চিঠি এলো।

ওরা চিঠিখানা দেখাতে শৈলেনখুড়োর ঘরে গেলে শচীন বল্‌ল, বাবা, এবারে চিঠিতে গুরুতর সংবাদ দেখছি। চিঠিখানা আসুক দেখাচ্ছি।

আরে, চিঠিখানা আসতে যাবে কেন। শীঘ্রই বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হবে, সবাই বলছে এবারে ঐ সভায় ভারত সরকারের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এখান থেকে অনেকেই যাবে, বাপুজি

বলেছেন আমাদেরও যেতে হবে।

চিঠিখানা ইতিমধ্যেই বৃদ্ধের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

আরও শুনবে? বাপুজি বলেছেন সরকার এবারে শুধু কয়েদ করে ক্ষান্ত হবে না—আরও বেশি দূর যাবে। তারপরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ভয় পেলি নাকি! আমরা বল্লাম, ভয় পেতে যাবো কেন? তারপরে কবিগুরুর এক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলাম—"সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে?" বাংলাটা ঠিক বুঝলেন মনে হল না, ইংরেজিতে বর্ণনা করে শুনিয়ে দিতেই খুশী হয়ে উঠলেন, তখনি মহাদেব ভাইকে ডেকে শুনিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তো বাংলা জানো—ওটা তোমার ডায়েরীতে লিখে রাখো। তারপরে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমাদের এই যাত্রায় আশীর্বাদ জানাবার জন্যে গুরুদেব সশরীরে উপস্থিত নেই, কিন্তু প্রতি-মুহূর্তে তাঁর আশীর্বাদ অনুভব করছি।

বিস্মিত শচীন বল্ল, তোমার সবটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে দেখছি।

অধিকতর বিস্মিত যজ্ঞেশবাবু বললেন, হবে না! কার কথা—আর লিখেছে কারা? না এ চিঠির অর্থ তোমরা বুঝবে না, থাকতো ভূপতি বুঝতো।

শচীন বল্ল, তাকে সহজে ছাড়বে মনে হয় না। সুভাষবাবুর সংস্রবে তাকে ধরেছে, সুভাষবাবুকে সরকার ভয় করে।

করবে না ভয়! বীরপুরুষকেই লোকে ভয় করে। দেখো তো কেমন বিদেশে চলে গেলেন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করলেন। তার সেদিনকার বেতার ভাষণ শুনেছিলে?

আজ্ঞে হাঁ শুনেছি।

সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

কেবল আমাদের স্কুলের নূতন পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মশায় ছাড়া।

কেন, কেন?

তার পরদিন আমাকে নিভৃতে পেয়ে বললেন, ও শচীনবাবু, নেতাজী ও কি কথা আবার বললেন?

কেন খারাপটা কি বলেছেন?

খারাপ নয়! তিনি সসৈন্যে আসছেন, আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন, সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলেছেন এসব কি কথা?

আমি বললাম, অন্যায়টা কি?

কি বলছেন শচীনবাবু, অন্যায় নয়? আমরা ভেবেছিলাম লড়াইটা

দেশের বাইরেই ঢুকে যাবে, হাত পা ধুয়ে নেতাজী দেশে আসবেন, আমরা ঘাড়ে তুলে নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দেব।

আর স্বাধীনতাটা আসবে ডাকের চিঠির মতো, কি বলেন কাব্যতীর্থ মশায় ?

এবার যজ্ঞেশবাবু বললেন, স্বাধীনতা ডাকেই আসবে তবে ভি. পি. পোস্টে। বুঝলে না শচীন, ভ্যালু পেয়েবল্, দাম দিয়ে ছাড় করে নিতে হয়।

পিতাপুত্র দুজনেই হেসে উঠলো।

বললাম, কাব্যতীর্থ মশায় শোনেননি জিনিস কিনে মূল্য দিতে হয়, আর স্বাধীনতা সব জিনিসের সেরা তার জন্যে মূল্য দিতে হবে না!

বললেন, মূল্য দেবার জন্য বাপুজি আছেন, নেতাজী আছেন, আমরা যে ছাপোষা মানুষ শচীনবাবু, রোজ আনি রোজ খাই, আমাদের নিয়ে আবার টানাটানি কেন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, বল্লাম, ভয় নেই এখন যান পরে বুঝিয়ে বলবো।

ভালোই করেছ, মরার চেয়ে মরার ভয়টাই বড়। তবে একথা মনে রেখো শচীন, এবারে আন্দোলন আরম্ভ হ'লে কোন পক্ষই রেয়াৎ করবে না, দুপক্ষই মরণ কামড় দেবে।

খুবই সম্ভব। তবে একটা অনুরোধ বাবা, এ বয়সে আর আন্দোলনে নামবেন না।

বলো কি শচীন, এই তো আন্দোলনে নামবার বয়স!

ভালোমন্দ হ'তে কতক্ষণ।

মরার কথা ভাবছ! মরবার এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে! ঐ যে রবিবাবুর গান লবকুশ লিখেছে—"সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে!" তুমি কি ভাবছ এবারে মরবে শুধু তারাই যারা আন্দোলনে নামবে। এমন কথা মনেও ভেবো না। এবারে ঘরে ঢুকে ঢুকে সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। মনে নেই এই সেদিন চার্চিল পার্লামেণ্টে জানিয়েছেন, যে কোন সম্ভাবনার জন্যে ভারত সরকার প্রস্তুত, আর এখন যত সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ভারতে আছে তত কখনো ছিল না। মানেটা বুঝলে তো—অন্য যুদ্ধ স্বয়া মরা আর কি। আরে শচীন, যাও, যাও, চিঠিখানা এনে আমার হাতে দাও, ওরা ছিঁড়েই ফেলে কি হারিয়েই ফেলে।

গান্ধী আন্দোলন সমূহ সুরুতে পরিহাস পরিণামে ইতিহাস। উদাহরণ লবণ সত্যাগ্রহ, আরও প্রমাণ মিল্‌লো আগস্ট আন্দোলনে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে যারা উপহাসের বস্তু মনে করেছিল তারা বুঝতে পারেনি এর উদ্দেশ্য। গান্ধীর বৃহত্তম আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছিল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে। গান্ধী বুঝলেন এবারে অবস্থা পরিণত হয়ে উঠেছে। দেশের লোকেও বুঝলো বৃহৎ একটা কিছু আসন্ন। লোক সকালে উঠে সংবাদপত্র কাড়াকাড়ি করে নিয়ে পড়ে। হরিজন পত্র বেশি লোকে পায় না, পাওয়ার দরকারও নাই, আগুন্ত অন্যান্য সংবাদপত্রে ছাপা হয়। রাজনৈতিক তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। গান্ধীজি পরামর্শ দিচ্ছেন গ্রামে ফিরে যাও, আসন্ন সঙ্কটের মুখে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলো, এবারের আন্দোলনের স্বরূপ হবে সংক্ষিপ্ত ও সত্বর। ক্রমে সবাই জানলো বোম্বাইতে হবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। প্রথম থাকের দোসরা থাকের নেতারা সবাই একে একে দলে দলে জুটেছেন গিয়ে বোম্বাই শহরে। আরম্ভ হয়ে গিয়েছে অধিবেশন। আজাদ, প্যাটেল, নেহেরু, রাজাজি সর্বোপরি গান্ধীজি সবাই উপস্থিত। মূল প্রস্তাবটির নাম আগস্ট প্রস্তাব, মুখ্য প্রণেতা গান্ধী। সেটি উত্থাপিত আলোচিত ও সমর্থিত হবে আটই আগস্ট।

আগামীকল্য আটই আগস্ট।

৫৩

কুইট ইণ্ডিয়া, কুইট ইণ্ডিয়া, কুইট ইণ্ডিয়া, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

নয়ই আগস্ট প্রভাতেই বাণীর অগ্নিময় পক্ষিরাজ ঘোড়া বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর, কল্‌কাতা প্রভৃতি শহরে ছুটে গিয়ে পৌঁছল, তারপরে শহর থেকে শত শত গ্রামগঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সরকার পক্ষ থেকে বলা হ'ল ধ্বংসাত্মক অরাজকতা সৃষ্টি ছিল আগস্ট প্রস্তাবের গুপ্ত অভিসন্ধি। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হল এই শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহকে অশান্তির আকর করে তুলেছে সরকারের হঠকারিতায়। অকস্মাৎ গান্ধী থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কংগ্রেস নেতাকে বন্দী করায় লোকে ক্ষেপে গিয়েছে। নির্দেশ দেবার লোক না থাকায় লোকে এমন করে থাকবে। হয়তো এই ছিল সরকারের অভীষ্ট। লোকে কিছু অতিচার করুক, তাহলে গুলি গোলা চালানো ধরপাকড় করবার পথ সুগম হবে, পৃথিবীর লোককেও বোঝানো সহজ হবে, দেখো তোমাদের জন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করে আমরা লড়াই করছি, কংগ্রেস তাতে বাধা সৃষ্টি করছিল, তাই তোমাদের

উপকারার্থে আমরা ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি, এর জন্য দায়ী কংগ্রেস আর তার সর্বময়কর্তা গান্ধী। বলবে, আগের আমল হলে এই সব রাজদ্রোহীর কোতল করবার হুকুম হতো, এখন যেহেতু আমরা সুসভ্য তাদের নিয়ে বড় বড় প্রাসাদে একটুখানি আটকে রেখেছি এই মাত্র।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। আগস্ট প্রস্তাবের একটি বয়ান ছিল যে কংগ্রেসের দাবী নিয়ে গান্ধী গিয়ে সাক্ষাৎ করবেন বড়লাটের সঙ্গে—দুই পক্ষে আলাপ আলোচনা হবে, মতে না মিললে গান্ধী সত্যাগ্রহের আদেশ দেবেন, সে সত্যাগ্রহ হবে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সে সুযোগ সরকার নিল না, আটই শেষরাত্রে গান্ধী নেহরু, প্যাটেল আজাদ সকলকে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেল। লবকুশের কোন রাজনৈতিক গৌরব ছিল না। কিন্তু যেহেতু তারা গান্ধীর সঙ্গী—তারাও গ্রেপ্তার হয়ে চল্‌ল, কোন্ জেলে কেউ জানতে পারলো না, জানালো না কেউ তাদের অভিভাবককে।

যজ্ঞেশবাবু বৃহস্পতিবার নিয়মিত সময়ে বাইরের ঘরে উপবিষ্ট আছেন, ডাক পিওন খানকতক চিঠি দিয়ে গেল, তার মধ্যে নেই লবকুশের চিঠি। ওদের দু'জনের হস্তাক্ষর এক ছাঁদের। কে লিখেছে খাম না খুললে বোঝা যেতো না, নিয়ম ছিল একবার লিখবে লব, পরের বার লিখবে কুশ।

শচীন, ওদের চিঠি এলো না কেন বলতে পারো ?

শচীন বুঝতে পারে, তবে সব সব কথা খুলে বল্‌লে বৃদ্ধ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়বেন, তাই ব্যাপারটা সে লঘু করে দিয়ে বল্‌ল, হয়তো ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

না, না ডাক বন্ধ হলে এ তিনখানা চিঠি এলো কি করে ?

শচীন শুধু বল্‌ল, তাইতো, হয়তো কালকে আসবে।

সে জানতো কালকে আসবে না, আর কতদিন পরে আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ভোরবেলা ফিরে এসেছে বীরেন চৌধুরী ও সুবোধ। তারা গিয়েছিল বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিতে। তাদের মুখে নয়ই তারিখের খবর পেয়েছে, বোম্বাই তখন সম্পূর্ণ অরাজক। পুলিসের কাঁদানে গ্যাসের পাল্টা জবাব দিচ্ছে লোকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে, নেতাদের গ্রেপ্তারে তারা ক্ষিপ্ত। ফাউণ্টেন নামে এলাকাতেই উভয় পক্ষের জোর তাণ্ডব। তাদের উপরে বরাত ছিল দিনাজশাহী ফিরে গিয়ে কংগ্রেসের নির্দেশ জানাবার, তারা দিনাজশাহী কংগ্রেসের প্রতিনিধি। বোম্বাই থেকে দিনাজশাহী পৌঁছতে পাঁচ-ছ দিন লাগবার কথা নয়। কিন্তু অনেক স্থানে রেলপথ উপড়ে ফেলায় গাড়ী বদল করে করে আসতে

হওয়ার এত বিলম্ব।

শচীন জিজ্ঞাসা করেছিল, কল্‌কাতার খবর কিছু জানো ?

তারা বলেছিল, না, কল্‌কাতায় আর যাওয়ার সাহস হল না, পাছে এদিকের রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়।

সুবোধ বলেছিল, আমাদের ইচ্ছা ছিল দিন দুই অরবিন্দর বাসায় বিশ্রাম করে, কল্‌কাতার অবস্থা লক্ষ্য করে আসবো, তা আর করলাম না, ব্যাণ্ডেল নৈহাটি হয়ে চলে এলাম।

দেশের অবস্থা কি রকম দেখলে ?

যেখানে যেখানে খবর পৌছেছে সম্পূর্ণ অরাজক, রেলপথ বলতে নেই। রেলস্টেশন থানা ডাকঘর, তারঘর হয় দগ্ধ নয় ভগ্ন, অনেক খবরের কাগজ বন্ধ, সবাই আন্দোলনের সামিল হওয়ার জন্তে চলে গিয়েছে, অনেক খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

কলকাতা এখনো শান্ত মনে হচ্ছে !

নিশ্চয় করে বলতে পারি না শচীন। বলেছি তো আমাদের ইচ্ছা ছিল একবার অরবিন্দর খবর নিয়ে যাই, কিন্তু সাহস হ'ল না।

আজ সকালের ডাকেও তো চিঠি এসেছে।

বিকালের ডাকে চিঠিপত্র গেলে বোঝা যাবে কি রকম আছে।

এমন সময়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলো, তার ক্লান্ত চেহারা। জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, আমি শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমার নাম শচীনবাবু, বলুন কি চাই।

তখন সে একখানা খামের চিঠি বের করে শচীনের হাতে দিল।

শচীন খামের উপরকার হাতের লেখা দেখে বল্‌ল, অরবিন্দর হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।

আজ্ঞে হাঁ, তাঁরই লেখা বটে।

আপনি কোথা থেকে পেলেন ?

আজ্ঞে, তাঁরই কাছে থেকে পেয়েছি।

চিঠিখানা না খুলেই শচীন শুধালো, আপনি তা হলে কল্‌কাতা থেকে আসছেন ? ওহে সুধীর, কল্‌কাতায় পথ এখনো খোলা আছে।

সুধীর উত্তর দেবার আগেই আগন্তুক বল্‌ল, যখন আমি রওনা হয়েছিলাম খোলা ছিল।

তার মানে এখন খোলা নেই! কি হয়েছে খুলে বলুন।

আমার বাড়ী অরবিন্দবাবুদের গাঁয়ে, সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, সেই পরিচয়ের সূত্রে কল্‌কাতায় গেলে তাঁর বাসায় উঠি, থাকি নাটোরে বামুনিয়া পট্টিতে, সেখানে সামান্য ব্যবসা আছে।

শচীন তাকে হাতে ধরে করাসের উপরে বসালো, নিন বসুন, কিন্তু ও কি আপনার যে পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো দেখছি।

অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে কি না।

এই বললেন রেলগাড়ীতে রওনা হয়েছিলেন।

রওনা হয়েছিলাম রেলগাড়ীতেই বটে তবে পৌছেছি হেঁটে।

তার মানে মাঝপথে রেল থেমে গিয়েছে। কতদূর কি হয়েছে বলুন।

লোকটি বলতে আরম্ভ করলো, রওনা হওয়ার আগে অরবিন্দবাবু এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল, ধীরেনবাবু, আপনি যখন নাটোর যাচ্ছেন এক কাজ করুন, দিনাজশাহী হয়ে যান, চিঠিখানা যজ্ঞেশবাবুর বাড়ীতে তাঁর ছেলে শচীনদাকে পৌছে দেবেন, ডাকে দিলে পৌছবে কিনা সন্দেহ। ঈশ্বরদি স্টেশন পর্যন্ত গাড়ী বেশ চল্‌ল। তারপরে দিনাজশাহীর ব্রাঞ্চ লাইনে চলতে চলতে আরানী স্টেশনের কাছে থেমে গেল। একজন খালাসী হেঁকে গেল, গাড়ী আর চলবে না, সামনে পুল ভেঙে গিয়েছে। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়লো, আমিও নামলাম, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি ছোট একটি পুল ভেঙে দিয়েছে।

পুল ভাঙল কি করে?

পুলটা ভাঙেনি, তবে তার উপরকার রেল উপড়ে ফেলেছে। সবাই বুঝলো এ পথে রেল আর এগোবে না। তখন অগত্যা হেঁটে রওনা হলাম।

বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, আপনি তাহলে আরানী থেকে হেঁটে আসছেন, সে যে অনেকটা পথ।

অনেকটা পথ বইকি।

সুধীর বল্‌ল, কিন্তু আমরা তো বরাবর রেলে এলাম।

তখনো পথ খোলা ছিল, খালাসীদের মুখে শুনলাম আগের গাড়ীটাও বরাবর চলে গিয়েছে, আমাদেরটাই প্রথম আটকালো।

শচীন ব্যস্ত হয়ে উঠে বল্‌ল, নিন বাকি কথা পরে শুনবো, আপনি ভেতরে চলুন। হাত পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন।

আমি ভাবছি এখনই নাটোর বলে রওনা হয়ে যাই, মোটর বাস এখনো চলছে।

সে-সব পরে হবে, নিন উঠুন।

তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একজন চাকরের জিম্মা করে দিল, বল্‌ল, এঁকে হাত পা ধোয়ার জল দে—আর দিদিমণিকে বলিস আজ ইনি এখানে থাকবেন।

তারপরে ফিরে এসে চিঠিখানা নিয়ে বল্‌ল, বীরেনবাবু এবারে পড়া যাক, কল্‌কাতার খবর পাওয়া যাবে।

বীরেন চৌধুরী বল্‌ল, তুমি জোরে পড়ো আমরা শুনি।

শচীন পড়তে আরম্ভ করলো—

শ্রীচরণেষু, শচীনদা, আমার একজন পরিচিত লোকের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তাকে দিলে যাবে কিনা সন্দেহ। আর মনে হচ্ছে কিছু দিনের মতো এই শেষ চিঠি। আমি ভালো আছি তবে কল্‌কাতার অবস্থা ভালো নয়। এখানে ট্রাম চলাচল বন্ধ। রিপন বঙ্গবাসী বিদ্যাসাগর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ট্রামের দড়ি কেটে দিয়েছে—হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীট সার্কুলার রোড বরাবর ট্রামের পর ট্রাম সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। বাস এখনো চলছে, তবে নিয়মিত পথে নয়, নানা পথে ঘুরে ঘুরে। ছাত্ররা পথগুলোর উপরে ইট কাঠ সাজিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ গাড়ী থেকে নেমে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু তখনি আবার আর একদিকে জঞ্জাল স্তূপীভূত হচ্ছে। শেয়ালদ স্টেশনে সশস্ত্র সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে—কিন্তু যাত্রী নেই বল্‌লেই হয়। হাওড়ার কথা জানি না, শেয়ালদ বাসার কাছে—তাই জানতে পারলাম। শুনলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও হেদোতে গুলি চলেছে, মৃতের সংখ্যা কেউ বলছে পাঁচ জন, কেউ বলছে পঞ্চাশ জন। স্টেটসম্যান ছাড়া অন্য সব খবরের কাগজ বন্ধ তবে লোকের মুখ তো বন্ধ নয়। যার যা খুশি বলছে। বৈঠকখানা বাজার বন্ধ, এ অঞ্চলের অনেক দোকানপাটও বন্ধ। সমস্ত থমথমে ভাব। এ হ'ল দিনের বেলাকার খবর। রাতের খবর আরও ভয়ানক। সাইরেনের উৎকট আওয়াজে ঘুমোবার উপায় নেই। তারপরেই জাপানী বোমা বর্ষণের গুম গুম আওয়াজ—ঠিক কোথায় বোমা পড়ছে বুঝবার উপায় নেই। পরদিন লোকের মুখে শুনতে পাই। কেউ বলে হাতিবাগান বোমা পড়ে ছাতু হয়ে গিয়েছে, কেউ বলে খিদিরপুরে দু'খানা জাহাজ বোমার ঘায়ে ডুবে গিয়েছে, কেউ বলছে রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিকের প্রাচীর ধ্বসে পড়ে গিয়েছে অর্থাৎ যার যেমন কল্পনার দৌড় তেমনি ঘোড়া ছোটাচ্ছে। এইমাত্র কালু কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে ফিরে এসে বল্‌ল, মাছ আড়াই টাকা সের। পটোল দশ আনা, আলু আট—অর্থাৎ দেশোদ্ধারে একমাত্র লাভবান আমার পুরাতন

ভৃত্য কালু সামন্ত। এ রকম চললে কালু ও তার মতো সব ভৃত্য বাদে গেরস্ত না খেয়ে মরবে। এখন বুঝতে পারছি, কেন গান্ধীজি বলেছিলেন শহর ছেড়ে সবাই গাঁয়ে যাও।

কালকে এক ফাঁকে শুভ্রার খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখলাম খুব ব্যস্ত। ঘনঘন অ্যাম্বুলেন্স বোঝাই আহত নিহত আসছে, গায়ে পায়ে গুলির দাগ। জিজ্ঞাসা করলাম, এদের গুলি লাগলো কি করে? সে বল্ল, জাপানী বোমার আঘাত। আমি বললাম, আরে এ যে স্পষ্ট রাইফেলের গুলির দাগ। ও একটু হেসে বল্ল, ও কথা মুখে আনবেন না দাদা, সরকার থেকে বলে দিয়েছে জাপানী বোমার আঘাত। বল্লাম তা হ'লে আর ভুল নেই, বোঝা যাচ্ছে জাপানীরা উড়ো জাহাজ থেকে রাইফেল চালাতে সুরু করেছে। ও হাসলো। জিজ্ঞাসা করলো, এর মধ্যে বাড়ী থেকে বের হ'তে গেলেন কেন? বললাম, তোমার খবর নেবার জন্তে। উত্তর পেলাম, আমরা নিরাপদে আছি, জাপানীরা ভদ্রলোক হাসপাতালের উপরে গুলি মানে বোমা ছোঁড়ে না। তবে আপনাদের উপরে তেমন ভদ্রতার দৃষ্টি না হ'তেও পারে। বাড়ীতে বালুর বস্তা রেখেছেন তো? আর হাতে নাম লেখা কবচ রেখেছেন তো?

কি রাম নাম নাকি?

না, না, নিজের নাম।

যাক তুমি একটু সাবধানে থেকো।

হাসপাতালের চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কোথায়। কিন্তু আপনি ভাবিয়ে তুললেন যে।

কেন?

এই ডামাডোলের মাঝে অপরের খবর নিতে বের হয়েছেন। ওরকম আর করবেন না।

এদিকে পথ ঘাটের ময়লা সাফ হচ্ছে না, বাড়ীর অবস্থাও তথৈবচ, ধাঙড়, মেথর জমাদার সবাই পালিয়েছে। অফিসের চাপরাশি আর্দালিদেরও অধিকাংশ পলাতক। কালু অবশ্যই পালাবে না, কারণ মাছ ও তরি-তরকারির দাম আরও চড়বার আশা। সোজা কথায় কল্‌কাতা এখন অরাজক প্রায়—অপরং কিং ভবিষ্যতি কেউ জানে না। ধীরেনবাবু অর্থাৎ এই পত্রবাহক রওনা হবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁকে নিয়ে শেয়ালদ স্টেশনে গিয়ে দেখলাম মিলিটারির পাহারায় দার্জিলিং মেল ছাড়ছে। বেজায় ভিড়। কোন রকমে তাঁকে তুলে দিলাম। তিনি ঈশ্বরদি স্টেশনে গাড়ি বদলে দিনাজপুরের গাড়ী

ধরবেন। কতদূর কি হবে ভগবান জানেন। আশা করি আপনাদের কুশল। লবকুশের সংবাদ না পেলে চিন্তিত হবেন না, কারণ অনেক সময়ে অসংবাদ সুসংবাদ।

প্রণামান্তে

অরবিন্দ।

পুনঃ আমাকে চিঠি লিখতে চেষ্টা করবেন না, ডাকমাশুল বৃথা খোয়া যাবে।

চিঠিপড়া শেষ হ'লে অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকলো, সবাই বোধ করি কল্‌কাতার অবস্থা মনশ্চক্ষে দেখবার চেষ্টা করছিল।

সর্বপ্রথম শচীন কথা বল্‌ল—বীরেনদা, কল্‌কাতা হয়ে আসবার চেষ্টা না করে ভালই করেছেন।

এখন তাই তো দেখছি।

সুধীর বল্‌ল, ভালো করেছি কি মন্দ করেছি জানি না।

কেন?

এ রকম অরাজক অবস্থা তো সচরাচর দেখবার সুযোগ হয় না।

অনেক সুযোগ পাবে সুধীর, এ তো সবে কলির সন্ধ্যা।

পরদিন প্রাতে আগন্তুক লোকটিকে শচীন বিদায় দিল, বল্‌ল, নাটোর পর্যন্ত এখনো বাস চলাচল করছে আপনি নির্ভয়ে চলে যান।

বৃদ্ধ যজ্ঞেশরায়ের সময় আর কাটে না, প্রত্যেক দিন ডাক আসবার সময়ে বাইরের ঘরে বসে থাকেন, কোনদিন পিওন একখানা চিঠি দিয়ে যায়, কোনদিন আদৌ আসে না, অবশেষে একদিন লাঠি হাতে করে, এখন লাঠি অবলম্বন ছাড়া তাঁর চলতে কষ্ট হয়, ডাকঘরে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন ডাকঘরটি ভস্মীভূত, জিনিসপত্র লুন্ঠিত। তিনি সেখানেই একখানা ভাঙা তক্তপোষের উপরে বসে পড়লেন, বুঝলেন ডাকে চিঠি পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে তিনি লাঠিতে ভর করে শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, তাঁর সময় আর কাটে না।

শচীন বলে, বাবা আপনি চিন্তিত হবেন না, ওরা সুস্থ আছে।

যজ্ঞেশবাবু ম্লান হেসে বলে না, না, চিন্তা কিসের, ওরা বাপুর কাছে নিরাপদে আছে।

মন্দিনা সান্ত্বনা দেয়, বাবা, ওদের জন্যে চিন্তা করে আপনার শরীর যে গেল।

যজ্ঞেশবাবু বলেন, শরীর যাবে কেন, স্বরাজ না দেখে মরছি না।

রুক্মিণী চোখের জল মুছে এসে বলে, বাবা আপনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে

দিলেন যে!

বউমা, খাওয়া ছাড়বো কেন, দেশের অধিকাংশ লোকের চেয়ে ভালো খাচ্ছি পরছি।

রাতের বেলায় ঘুম নেই তাঁর চোখে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ভোর হয়ে যায়। চিঠি আসবে আশ্বাসে উঠে পড়েন, তখনি মনে পড়ে ডাকঘরটি পুড়ে গিয়েছে। একদিন খবর পেলেন রেলগাড়ী যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, চিঠির বদলে হয়তো তারা সশরীরে ফিরে আসতে পারে, সে পথটাও বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমেই অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে।

ওদিকে খবরের কাগজ আসা বন্ধ, সরকার সমস্ত খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে। সঙ্কটকালে খবরের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া নির্বুদ্ধিতার চরম। খবরের কাগজের এক লোকের মুখে মুখে দশ হয়ে প্রচারিত হয়। পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের মুখ বন্ধ করবার উপায় কি। খবরের কাগজ বন্ধ হ'ল বটে খবর বন্ধ হ'ল না। কংগ্রেসের বুলেটিন নিয়মিত এসে পৌঁছায়, কে দিয়ে যায়, কখন দিয়ে যায় কেউ জানতে পায় না। সকালে উঠে সকলে দেখতে পায় বাইরের দরজায় কিম্বা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে সাইক্লোস্টাইল করা চার পৃষ্ঠার কাগজ। নীচে লিখিত থাকে "পড়ে প্রতিবেশীকে দিন।" যথা সময়ে নৃপতি, রমেন প্রভৃতি বন্ধুরা এসে নিয়ে যায়। বীরেন চৌধুরী, সুধীর চৌধুরীর বাড়ীতেও বুলেটিন আসে, দেখা হ'লে সকলে মিলে আলোচনা করতে থাকে।

একদিন শচীনরা স্কুলে কলেজে গিয়ে দেখতে পেলো দরজায় নোটিশ লটকানো, স্কুল কলেজ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বন্ধ, নীচে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর। ফল হ'ল এই যে শত শত ছাত্র গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে খবর ছড়াতে লাগলো। খবর? যার যা মনে আসে, তাই নিশ্চিত খবর। খবরের সত্যতা নির্ভর করে লোকের বিশ্বাসের উপর। একদিনকার বুলেটিন বল্‌ল, আড়াই লক্ষ কাবুলি সৈন্য আফগানিস্থান থেকে রওনা হয়ে সিন্ধু নদীর তীরে এসে পৌঁছেছে। তারা আসছে মহাত্মাজীর ইঙ্গিতে। আর একদিনের খবর বল্‌ল, নেতাজী বহুলক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে বর্মা হয়ে ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। পরদিনকার খবর হ'ল কাবুলি ফৌজ আর নেতাজীর ফৌজ দিল্লীতে এসে মিলিত হবে। ইংরাজ ভারত রক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে এখন মহাত্মাজীর সঙ্গে আপোষ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত কিন্তু মহাত্মাজী মুখ খুলছেন না, কারণ তিনি একমাস ব্যাপী মৌন অবলম্বন করেছেন—পাঠকগণ এর অর্থ অনুমান করে

নিন। সকলেই অনুমান করলো, মহাত্মাজীর ডিপ্লোমাসি অভ্রান্ত।

একদিন সন্ধ্যায় শচীন ও নৃপতি বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করছে, তারা শুনেছিল বেতারে নাকি স্বাধীন ভারতের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ চাবি ঘোরাবার পরে হঠাৎ কানে এলো, আমরা স্বাধীন ভারত কেন্দ্র থেকে বলছি, আমাদের অবস্থিতি ভারতের কোন স্থানে। আজকার বিশেষ খবর হচ্ছে এ পর্যন্ত পাঁচলক্ষ সত্যাগ্রহী বন্দী হয়েছেন। নেহরু প্যাটেল আজাদ আচার্য কৃপালনি প্রভৃতিকে দিনে একবার মাত্র খেতে দেওয়া হয়—তাও শুধু চাপাটি আর ডাল, তাঁদের ওজন যথাক্রমে দশ, পনেরো, পাঁচ ও সাত পাউণ্ড কমে গিয়েছে। আজ এই পর্যন্ত। আপনারা প্রত্যহ এই মাত্রায় আমাদের কণ্ঠ পাবেন না, কারণ সরকার এটা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টায় আছেন, চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করবেন, অন্য মাত্রায় নিশ্চয় পাবেন। পরদিন সন্ধ্যায় আবার—নমস্কার স্বাধীন ভারত বেতারকেন্দ্র থেকে বলছি, আমাদের অবস্থান ভারতের কোন স্থান—শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের ফলে এ পর্যন্ত তিনহাজার রেল স্টেশন, সাতহাজার ডাকঘর, বারোহাজার থানা তিনহাজার মাইল রেল পথ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ চলাচল একদম বন্ধ, বিদেশী সৈন্য ভারতে ঢুকে পড়লে বাধা দেবার উপায় নেই সরকারের। তার পরদিনে ভারত হাত ছাড়া হবে বুঝতে পেরে ইতিমধ্যেই ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজগণ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বন্দরে এসে জমায়েত হয়েছে। তবে তারা নিরুপদ্রবে যাবে না, যাওয়ার আগে কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির, দিল্লীতে জুমা মসজিদ, আগ্রাতে তাজমহল প্রভৃতি বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যাবে।

প্রত্যহ এইরূপ চাঞ্চল্যকর সংবাদ, লোকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ক্রমেই বাড়ছে। পথে পথে ঘটনা, ঘরে ঘরে আলোচনা তবে সমস্তই চাপা স্বরে। কারণ সম্প্রতি যে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব এসেছে তাদের মতো নৃশংস (সরকারের মতে কর্তব্যপরায়ণ) কর্মচারী বিরল। ম্যাজিস্ট্রেট জুভাস, পুলিশ সাহেব হেভিরড। সরকারের বিচারে দিনাজশাহী 'গাণ্ডিবাডিভের' প্রধান আড্ডা আর এর নাটের গুরু যজ্ঞেশ রায়।

একদিন যজ্ঞেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শচীন, বেতারে ও বুলেটিনে যে সব খবর আসে তার মধ্যে কতটা সত্য কতটা মিথ্যা বুঝতে পারিনে।

সে চেষ্টা করবেন না বাবা।

কেন বল তো?

মানুষের উদ্দীপনা জীইয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ওসব প্রচারিত হয়।

কিন্তু কিছু কিছু তো সত্য, ধরো যেমন আমাদের ডাকঘর আর রেলস্টেশন তো সত্যই নষ্ট হয়ে গিয়েছে নইলে এতদিনে ওদের চিঠি নিশ্চয় আসতো। হয়তো বা ওরাই ফিরে আসতো।

বাবা, ওসব বেতার ও বুলেটিনে এক ছটাক দুধের সঙ্গে একসের জল মেশানো হয়ে থাকে।

আরে, তবেই তো স্বীকার করলে অন্ততঃ এক ছটাক দুধ তো আছে।

তা আছে বটে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরাও বুলেটিন প্রচার করেছি তবে দুধে জলে আধাআধি, সত্যাগ্রহীদের জলের হাত দরাজ।

শচীন, ওই তোমার মস্ত দোষ, সত্যাগ্রহের মহিমা তুমি কখনো বুঝতে পারলে না।

শচীন চুপ করে থাকে।

৫৪

দেশের দুঃখের ভরা এখনো পূর্ণ হয়নি। পরাধীনতার পাপের ঋণ চক্রবৃদ্ধির হারে সুদে বাড়ে, পুরুষানুক্রমিক শোধ করতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত শোধ হ'তে চায় না।

জাপানী বোমার ভয়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক স্ত্রীপুত্র কন্যার হাত ধরে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল, বিহারে উড়িষ্যায় পূর্ববঙ্গে। গিয়ে দেখলো সেখানেও বিপদ কম নয়, খাদ্য নেই, কারণ রোজগারের পথ নেই, আশ্রয় নেই, কারণ বাড়ী ঘর দেশী বিদেশী ফৌজে অধিকার করে নিয়েছে, খোলা জায়গা যা ছিল এরোড্রোম করবার জন্যে সরকার দখল করে নিয়েছে। জাপানী বোমা অনিশ্চিত, আর স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব নিশ্চিত।

এদিকে জনশূন্যপ্রায় কলকাতা সহরে সন্ধ্যা না হ'তেই রাসবিহারী এভিনুয়ে শিয়াল ডাকতে সুরু করলো, আর দিনে রাতে অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে উঠতে লাগলো সাইরেনের উৎকট ধ্বনি। আর মার্কিন সাঁজোয়া গাড়ীগুলো মত্ত বেগে ছুটতে সুরু করলো কলকাতার পথে, গুঁড়িয়ে গেল নিরীহ পথিকের হাড়গোড়। খবরের কাগজ আবার বের হ'তে সুরু করল। তাদের কণ্ঠ শাসন-সংযত, ইংরেজের সম্বন্ধে কুণ্ঠিত কণ্ঠে দু'একটা কথা বলা সম্ভব হ'লেও মার্কিনীদের বিরুদ্ধে

টু' শব্দটি করা চলবে না। তারা এখন বড় শরিক।

ভালোর মধ্যে এই যে রেলগাড়ী আবার চলতে আরম্ভ করেছে, ডাকঘর-গুলোও খুলেছে আর গান্ধীজি একুশদিনের অনশন ব্রত কাটিয়ে উঠেছেন। অবস্থা এক সময়ে এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল যে বন্দীনিবাসের চারদিকে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ও সাঁজোয়া গাড়ী আমদানি করেছিল, সেই সঙ্গে শেষকৃত্যের জন্য চন্দনকাষ্ঠ। সিমলায় থ্রি পাইনস ক্লাবে ছোট প্রভুরা ঘগল বাজিয়ে নাচতে সুরু করেছিল বুড়ো এবার টাঁসবে। তাহলেই আরো একশ বছরের জন্য কায়েম হবে ইংরাজের রাজত্ব। শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা পেলে ছোট প্রভুর দল বল্ল, বুড়ো মহাধড়িবাজ, কিছুতেই মরতে চায় না।

কল্‌কাতা আবার যখন জনপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, পড়তে সুরু করলো জাপানী বোমা, লোকে হতাহত হ'লে ছাপবার উপায় নাই—ভারতরক্ষা আইন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দণ্ডায়মান। কিন্তু বিপদের এখানেই শেষ নয়, ১৯৪৩ সালে আরম্ভ হ'ল মহা মন্বন্তর যার তুলনায় "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" শিশু। গাঁয়ের লোক ছুটে এলো শহরে, তারপরে গাঁয়ের লোক মফঃস্বল শহরের লোক সকলেই ছুটে এলো কল্‌কাতায়—সবাই খাদ্যপ্রার্থী। সরকারের একটা কিছু জবাব দেওয়া আবশ্যক, তারা বল্ল, মাঝে মাঝে এমন অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে, জটিল পরিসংখ্যান বের ক'রে তারা দেখালো। সাধারণ লোকে পরস্পরের মধ্যে চাপাস্বরে বলাবলি করলো, জাপানী সৈন্য ভারতে ঢুকে পড়লে পাছে তাদের হাতে ধান চাল পড়ে তাই সে-সব হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আর সেই সঙ্গে নৌকা গোরুর গাড়ী সমস্ত দখল করে নিয়ে ধান চাল চলাচলের পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। দেশের কাগজে এসম্বন্ধে আলোচনা ও ছবি ছাপা নিষিদ্ধ কিন্তু বিদেশের কাগজকে ঠেকাবে কে? মার্কিন সাংবাদিকগণ ছবি তুললো, কাগজে ও সিনেমায় সে সব প্রকাশ পেলো। ভারত সরকারের চাপে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি বিস্তর লঙ্গরখানা খুলে দিল—খাদ্য জগাখিচুড়ি, চাল ডাল কাঁকর পাথরের টুকরো প্রভৃতি উপাদান-যোগে তৈরি। ঐ পদার্থ যারা খেলো আর না খেলো সবাই মরলো, কল্‌কাতার পথে পথে বুভুক্ষাকীর্ণ শত শত মৃতদেহ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সুযোগে চালের মুনাফাবাজি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে ভুল হ'ল না—এর নাম "অনেস্ট টু পাইস।"

এ কি শচীনদা, আপনি হঠাৎ?

হাঁ ভাই, নিতান্তই হঠাৎ এসে পড়লাম।

বাড়ীর সব ভালো তো?

হাঁ, ভালো দেখেই তো রওনা দিয়েছি।

আমাকে জানালেন না কেন, স্টেশনে যেতাম।

কেন, আমি কি তোমার বাসার পথ চিনিনে?

না, তা নয়, দিন কাল ভালো নয়।

সেটা তো ভাই উভয়তঃ।

বসুন, চা আনতে বলি, তারপরে সব শুনছি।

অরবিন্দ চায়ের ফরমাস করলো।

তোমার বাইরের রোয়াকে দুটো লোককে ঘুমোতে দেখলাম, ওরা কে?

জানি না, তবে ওদের ঘুম আর ভাঙবে না।

তার মানে?

তার মানে সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে চিরনিদ্রা।

বলো কি!

কিছুই বলিনে, আগে বলতাম, ভাবতাম, মনে মনে রাগ করতাম, এখন ওসব পেরিয়ে গিয়েছি।

কোত্থেকে এলো?

জানি না, প্রায়ই এমন ভোরবেলা দেখতে পাই, শুধু আমার রোয়াকে নয়, সর্বত্র। আর একটু আলো হোক দেখতে পাবেন, পথে ঘাটে মৃতদেহের ছড়াছড়ি।

এ যে দেখছি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ব্যাপার।

তখন কি হয়েছিল জানি না, তবে তখন কলকাতায় অর্থাৎ রাজধানীতে এমন ঘটেনি।

ধাঙড়দের খবর দাও।

না, দাদা, ওদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। পাছে মার্কিনি সাংবাদিকদের চোখে পড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুশাসনে গ্লানি ঘটে, তাই মিলিটারি লরি এসে ওদের তুলে নিয়ে যায়।

কোথায়?

যেখানে নিয়ে গেলে মার্কিনি চোখ অন্ততঃ দেখতে পায় না। নিন চা খান। এবারে বলুন হঠাৎ এসে পড়বার কারণ কি।

সেই যে লবকুশ গান্ধীজির সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিল কুইট ইণ্ডিয়া অধিবেশনে

তারপর থেকে তারা বেপাত্তা।

চিঠিপত্র আসে না?

ডাকঘর পুড়ে গিয়েছিল, রেলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আসবে কি করে?

এখন নিশ্চয় ডাকঘর ও রেলপথ খুলেছে।

তা খুলেছে বটে তাতেই আবার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছে। যতদিন ও সব বন্ধ ছিল এক রকম করে বুঝিয়েছিলাম, চিঠি আসবে কি করে? তিনি বলেন, এখন তবে আসে না কেন? বললেন তুমি কলকাতায় যাও, বড় জায়গা, কেউ না কেউ ওদের খবর নিশ্চয় দিতে পারবে। যদিও জানি তা সম্ভব নয় তবু তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আসতে হ'ল।

বউদি কি বলেন?

তিনি তো অবিনাশবাবুর মেয়ে—চোখের জল বুকের ভেতরে জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সারাদিন যন্ত্রের মতো কাজ করে যায় মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই।

আর মলিনা?

বাবার মতে সায় দেয় সে, হাঁ দাদা, কল্‌কাতায় যাও, ওখানে কেউ জানলে জানতেও পারে। অরবিন্দবাবুর বাসায় দু'দশদিন থেকে খোঁজ করোগে। কংগ্রেস দলের কারো পক্ষে জানা অসম্ভব নয়।

এখন মলিনার মনের কথা আলাদা। লবকুশের খবরের জন্যে সেও ব্যস্ত, তবে জানে কলকাতায় তাদের খবর পাওয়ার বিশেষ কারণ নেই। তবে শচীনকে পাঠাবার আগ্রহের আসল কারণ শচীন অরবিন্দের বাসায় গেলে, দু'দশ দিন থাকলে জানতে পারা যাবে শুভ্রার সঙ্গে অরবিন্দর ঘনিষ্ঠতার মাত্রা। তার ভাবনা বেহায়া ছুঁড়িটা নিশ্চয় প্রতিদিন এখানে আসে, এসে তার যেমন অভ্যাস গৃহিণীপনা করে। হয়তো বা ওখানেই বাস করে, ওসব মেয়ের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। ব্যাপারটা কতদূর কি গড়িয়েছে সরেজমিনে দেখবার জন্যে পীড়াপীড়ি সুরু করে দিল শচীনের উপরে।

দুজনে নীরবে চা পান করছিল—হঠাৎ অরবিন্দ বলে উঠল, বউদি বুদ্ধিমতী, ঘটনার ধারা বুঝবেন, মলিনারও না বুঝবার কথা নয়—আমার চিন্তা রায় মশায়ের জন্যে। কত বয়স হ'ল দাদা ওঁর?

তা আশী পেরিয়ে গিয়েছে।

অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন, সুশীল গেল, মাসিমা গেলেন আর চোখের মণি ছিল লবকুশ, তারাও বেপাত্তা।

বুঝলে অরবিন্দ, এই শেষেরটাই সবচেয়ে বেশি বিঁধেছে।

তারপরে একটু থেমে বলল, দেখো বাবার জীবনটা যখন একাকী মনে মনে আলোচনা করি মনে হয় যেন একটা এপিক (Epic) পাঠ করছি। কোথায় ছিলেন এক নম্বর দরবারী রায়বাহাদুর, সরকারী উকীল, এমনকি শ্বেতাঙ্গ-তোষণের উদ্দেশ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করলেন—আরও কি ঘটতো কে জানে, তখন অদৃষ্ট এসে ঘটনার হাল ধরলো জেল জরিমানা রায়বাহাদুর পদবী খারিজ থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত আজ কংগ্রেসের একনম্বর দরবারী !

এ তো গেল বাইরের ঘটনা, আরম্ভ করলো অরবিন্দ, ভিতরকার মানুষটা আরও মহৎ। এমন উদার দয়ালু সর্বমানবিক হৃদয় আমার চোখে পড়েনি। দিনাজশাহী জেলায়, আর শুধু সেখানেই বা কেন সমস্ত উত্তরবঙ্গে এমন সর্ব-শ্রেণীর প্রিয় মানুষ দুর্লভ। আর দেশের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান পৌত্র দুটি, দুজনে দুটি রত্ন।

কিন্তু এখন মুষড়ে পড়েছেন তাদের সন্ধান না পাওয়ায়।

তা না হ'লে তো অমানুষী ব্যাপার বলতাম। ঐ একটু খুঁত আছে বলেই মানুষ মনে হচ্ছে।

সবই বুঝলাম শচীন, এখন কি করা যায় বলো, শূন্য হাতে ফিরতে পারবো না।

এমন সময় দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো শুভ্রা।

আরে শুভ্রা যে ?

দাদা কখন্ এলেন ? বলে পদধূলি গ্রহণ করলো।

এই তো এসে পৌচেছি !

হঠাৎ !

তোমাদের কল্‌কাতা শহরটা দেখতে।

দেখে যান নরক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেও দেখতে হয়েছিল। সকালবেলায় রোয়াকে কিছু দেখেছিলেন ?

কেমন করে জানলে ?

রোজ দেখতে পাই তবে শুধু এখানে নয়—যত্রতত্র সর্বত্র। হাসপাতালের বেডে (Bed) যত ধরবার তার চেয়ে অনেক বেশি।

রোয়াকের দু'জন এখনো আছে নাকি ?

সেটি হওয়ার জো নেই দাদা, ভোরের আলো হওয়ার আগেই মিলিটারি

গাড়ী এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায়, বড় শরিক মার্কিনীদের চোখে পড়লে বড় লজ্জার কথা, হয়তো তারা বুঝে ফেলবে ভারতশাসনের মধ্যে তবে সত্যই বোধ করি গলদ আছে। ওসব কথা এখন থাক। আজকে আপনাদের দুজনকে রেঁধে খাওয়াবো এই আমার আরজি।

শচীন গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—মঞ্জুর।

তোমার ডিউটি নেই ?

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না দাদা, আজ আমার সাপ্তাহিক ছুটি।

অরবিন্দ, আজ তাহলে তোমার কালুর ছুটি।

শুধু ছুটি নয় এতক্ষণে সে ছুটে গিয়েছে বাজারে, আজ মাছ আর তরি-তরকারির দাম দ্বিগুণ না হয়ে যায় না।

শুভ্রা, তুমি রোজ একবার করে এসে অরবিন্দকে দেখে গেলেই পারো।

ইচ্ছা তো হয় তবে আজকাল কাজের চাপ বেশি। তা ছাড়া অন্য বাধাও আছে—এই বলে সে রান্নাঘরের দিকে গেল।

আর কি বাধা ?

মার্কিন ফৌজি গাড়ীর জিঘাংসা আর গোরাফৌজি লোকের রিরংসা। এখানে স্ত্রীপুরুষের প্রাণ বাঁচিয়ে চলা কঠিন। ভারি ফৌজি গাড়ীতে চাপা পড়া মানুষকে দুর্ভিক্ষের শিকার বলে চালিয়ে দেয় কিন্তু মুস্কিল বাধে মর্দিত যুবতীদের দেহগুলো নিয়ে। পশু, পশু, দাদা নির্মম পশু।

না ভাই ওরা তোমার আমার মতোই মানুষ, তবে সকলেরই মধ্যে ঘুমন্ত আদিম পশু অবশ্য আছে, তাকে খুঁচিয়ে খাঁচিয়ে বের করেছে এই যুদ্ধটা যা যে কোন মুহূর্তে ওকে গ্রাস করতে পারে। তাই পানপাত্রটা উজাড় করে শেষ চুমুকের গোগ্রাসে পান।

এই নিন বেগুনী আর পাঁপড় ভাজা, হালুয়া আসছে।

কিন্তু শুভ্রা, তুমি কি শুধু পরমাত্মার মতো দেখেই সন্তুষ্ট থাকবে।

না, জীবাত্মার মতোই ভোগ করবো তবে আড়ালে।

দেখো অরবিন্দ, পর্দাপ্রথা এক ভাবে না একভাবে থেকেই যাবে। তারপরে বল্‌ল, অরবিন্দ আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার আছে আর শুভ্রারও ছুটির দিন, দুপুরে খাওয়ার পরে আজ চিড়িয়াখানায় বেড়িয়ে আসা যাক।

শচীনের প্রস্তাব শুনে দুজনে হেসে উঠ্‌ল, আর প্রায় একসঙ্গে বল্‌ল, দাদা এত জায়গা থাকতে চিড়িয়াখানায় কেন ?

এ তো সহজ কথা, মানুষের কাণ্ডকারখানা যতই দেখছি জন্তু-জানোয়ারের

উপরে ততই ভক্তি বাড়ছে। তাছাড়া বনের পশু ধরে এনে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা নিষ্ঠুরতার চরম।

শুভ্রা বল্‌ল, ও সব শিক্ষার জন্যে, জুয়োলজি শাস্ত্রটার সুরু এখান থেকে।

কথাটা এক হিসাবে সত্য, পশুর কাছে থেকে মানুষের অনেক শিক্ষার আছে। ওরা চুরি করে না, ডাকাতি করে না, রাজ্যরক্ষার জন্য লড়াই করে না, মিথ্যা, শঠতা, তঞ্চকতা পরশ্রীকাতরতা এদের মধ্যে নেই।

কি বলছেন দাদা, কুকুরের মতো স্বজাতি বিদ্বেষ আর কার, বিড়ালের মতো চুরি বিদ্যায় পটুতা আর কার?

ভুলে যাচ্ছ অরবিন্দ, ও দুটোই হচ্ছে মানুষের গৃহপালিত জীব, প্রভুর কাছে থেকে এসব বিদ্যা শিখেছে।

শুভ্রা বল্‌ল, স্বীকার করলাম দাদা, যদি যাওয়াই স্থির তবে এখন স্নানাহার করে তৈরি হ'য়ে নিন, যাতায়াতে অনেকটা সময় যাবে, ঘুরে দেখতেও সময়ের দরকার, তারপরে সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরা আবশ্যক। সন্ধ্যা না হ'তেই সাইরেনগুলো কঁকিয়ে ওঠে, আর ফৌজি গাড়ীগুলোর চলাচল যায় বেড়ে।

হাঁ দাদা, শুভ্রার কথা ঠিক, একটা রাত কল্‌কাতায় কাটিয়ে দেখুন কি অভিজ্ঞতা হয়।

একখানা ট্যাক্সি করে সার্কুলার রোড বরাবর চলে বাঁয়ে পি. জি হাসপাতাল রেখে বাঁয়ে বেঁকে জিরাট ব্রিজ পার হয়ে এসে পৌছলো ওরা চিড়িয়াখানায়। পথে চলবার সময়ে শচীন জিজ্ঞাসা করলো, হাঁ অরবিন্দ, কল্‌কাতার এমন লক্ষীছাড়ার মতো অবস্থা কেন?

তবু তো এদিকটা অনেক ভালো, এদিকে ফৌজিপাড়া, উত্তর কল্‌কাতায় গেলে দেখতে পেতেন লক্ষী অনেক দিন ছেড়ে গিয়েছে, রাস্তায় ঝাঁট পড়ে না, জল দেওয়া হয় না, সপ্তাহের ময়লা জমে থাকে, আর গাড়ী চাপা পড়া কুকুর বেড়াল যে কত তার ঠিক নেই।

বুঝেছি, ইংরেজ এখন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসেছে তাই মুণ্ডের ছড়াছড়ি শ্মশানে।

যথার্থ বলেছেন দাদা, সাম্রাজ্য পত্তনের চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা অনেক বেশি কঠিন।

তাই তো দেখছি।

এ কি, খাঁচাগুলো খালি কেন?

ওরা চিড়িয়াখানার ভিতরে ঢুকেছে।

বাস্তবিক অনেক খাঁচা খালি। শ্বেত ভালুক, সিংহ, সাইবেরিয়ার বাঘ, পুমা প্রভৃতি কুলীন জন্তু একটাও নেই।

ব্যাপার কি হে শচীন?

কেমন করে বলবো দাদা, অনেককাল এখানে আসিনি।

আমার মনে হয় কি জানো দুষ্প্রাপ্য জন্তুগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অসম্ভব নয়।

একটা ঘটনা মনে পড়লো শচীন। মাস দুই আগে মিত্রবাহিনী যখন প্রথম পদার্পণ করে ইটালীতে, শত্রুপক্ষ বাধা দেয়নি, কেবল গোটা দুই পুমা এসে আক্রমণ করেছিল।

ভারি মজার ব্যাপার, এমন ঘটলো কি করে?

আরে শহরে ছিল একটা চিড়িয়াখানা, কামানের গোলায় খাঁচাগুলো ভেঙে-চুরে যাওয়ায় পশুরা ছাড়া পেয়েছিল, গোটা দুই পুমা বোধকরি প্রভুর অন্নঋণ শোধ করবার ইচ্ছায় মিত্রবাহিনীকে আক্রমণ করে বসেছিল। পাছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাই সরিয়ে থাকবে।

বানরগুলো ঠিক আছে—আর ঐ দেখুন গোটা দুই উট নিতান্ত উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে, হাতী দুটোকে সরায়নি দেখছি।

পুকুরগুলো খালি, পাখী সব গেল কোথায়?

এখন পাখীর সময় নয় দাদা, তাছাড়া সাইরেনের উৎকট আওয়াজে ওরা বুঝেছে হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে।

থাক, তবু কিছু ফুল আছে। চলো অরবিন্দ দেখা যাক চায়ের দোকানে চা পাওয়া যায় কিনা।

দর্শক বলতে নেই, চা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, চলুন তবু দেখা যাক।

এমন সময়ে দেখতে পেলো একটা মোটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে দুজন ব্যক্তি তন্ময়ভাবে গল্প করছে, একজন প্রায় বিগত যৌবন যুবক আর একজন যৌবননদীর মধ্যবর্তিনী যুবতী। শুভ্রা ও অরবিন্দ পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো, শচীন দেখল না বা বুঝলো না সে দৃষ্টির অর্থ—আর ওরা তখন জগৎবিস্মৃত। লক্ষ্য করলো না এদের।

চা পান শেষ করে তিনজনে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল, ট্যাক্সিটা ওরা ছাড়েনি। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের কাছে ট্যাক্সি দাঁড়ালে শচীন বলল, দাদা, আপনি গাড়ীতে একটু বসুন শুভ্রাকে আমি পৌছে দিয়ে আসি।

কিছু দূরে আসতেই শুভ্রা বলল, আমার ফাঁড়া বোধহয় কাটলো।

এমন কথা মনেও ভেবো না। রবিনটা শিকারী প্রকৃতির, শিকারী একটা জন্তু মেরেই ক্ষান্ত থাকে না, ফস্কে যাওয়া জন্তুর উপরে এদের লোভ আরও দুর্বার। তুমি খুব সাবধানে থাকবে।

হাঁ সাবধানেই আছি। কিন্তু দাদা আমি মেয়েটিকে চিনি। আমরা একসঙ্গে নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছিলাম, তারপরে শুনেছিলাম সে মোটা টাকা পাওয়ার আশায় ফৌজি শিবিরে নার্সের কাজ করছে।

তাই বলো।

হঠাৎ এমন বললেন কেন?

মেয়েটাও খেলোয়াড়, হঠাৎ মারা পড়বে না। যাইহোক তুমি সাবধানে থেকো, আর দরকার হ'লে পাশের বাড়ীতে আমাকে টেলিফোন করতে ভুলো না—নম্বর মনে আছে তো।

সারাদিন শচীন ও অরবিন্দ সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র লবকুশের সংবাদ পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করে বেড়ায়। কংগ্রেস অফিসগুলো সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে. তবে কংগ্রেসীরা বাড়ীতে আছে, অনেকে আছে আত্মগোপন করে। না, তারা লবকুশ বলে কোন যমজ যুবকের সন্ধান রাখে না। যারা গিয়েছিল বোম্বাইতে নিখিলভারত কংগ্রেসকমিটির অধিবেশনে, তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বাস করছে, যারা ফিরছে তাদের ভাবে চিনবার উপায় নেই। শচীন প্রতিদিন একখানা করে চিঠি লিখে পূর্বদিনের অনুসন্ধানের ফল জানায় যজ্ঞেশবাবুকে—এই রকম হুকুম ছিল তার উপরে।

আশী বছর বয়সেও যজ্ঞেশবাবুর শরীর শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ ছিল, ছিল তাতে যৌবনের তেজ উৎসাহ, চব্বিশঘণ্টার যে কোন সময়ে তিনি দেশের কাজের জন্য প্রস্তুত।

লোকে আড়ালে বলতো, বুড়ো হাড়ের তেজ দেখো।

যে শুনতো; বলতো আরে দধীচি মুনিও বুড়ো ছিলো, বজ্র তৈরি করতে দরকার হয় বুড়োর শক্ত হাড়ের।

সেই শরীর ভেঙে পড়েছে। লবকুশ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে। অনেকদিন পর্যন্ত ডাকের সময়ে অপেক্ষা করে থাকতেন, এখন সে আশা গিয়েছে, আশার সঙ্গে গিয়েছে শক্তি।

বাবা, এতবেলায় কোথায় চললেন ?

না, না, দূরে কোথাও যাইনি, এখুনি ঘুরে আসছি।

বুঝতে পারলে বউদি কোথায় যাচ্ছেন ?

রেলস্টেশনে ভাই, নাতিরা ফিরে আসতে পারে।

একদিন মলিনা বলল, বাবা, এখন তো শহরে জলের কল হয়েছে, এই পাতালপ্রমান পুরানো ইঁদারাটা রেখে লাভ কি ? বুজিয়ে দিলেই হয়।

না, না, এর জল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মিষ্টি, ওদের জল ভালো লাগে।

এখন লবকুশ নামের বদলে সর্বনাম ব্যবহার করেন, ব্যক্তিনাম ব্যক্তির শূন্যতা মনে করিয়ে দেয়, সর্বনাম নৈর্ব্যক্তিক, বিশেষ কাউকে মনে করায় না।

পিতামহর যখন এই অবস্থা মা আর পিসিমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এমন সময়ে একদিন সকালে যখন যজ্ঞেশবাবু বাইরে ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন প্রবেশ করলো একজন অপরিচিত আগন্তুক।

এটা কি যজ্ঞেশ রায় মহাশয়ের বাড়ী ?

আজ্ঞে হাঁ, আপনি কাকে চান ?

স্বয়ং যজ্ঞেশবাবুকে।

আমি যজ্ঞেশ রায়, মহাশয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে ?

আমেদাবাদ।

আমেদাবাদ! সে যে অনেক দূরে, গুজরাটে।

আজ্ঞে হাঁ, কিছু দূরে বইকি।

সেখানে কি করা হয় ?

সেখানে কিছুই করা হয় না, সেখানকার জেলে বন্দী ছিলাম, সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছি।

আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষ্যে। বসুন, বসুন, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ বসতে বলা হয়নি।

সেটা আর এমন দোষের কি। মশায়ের কাছে নিরন্তন কতলোক আসছে।

এমন আর কেউ আসে না, সবাই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে। জুডাস আর হেভিরড বলে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেবের অত্যাচারে সবাই অস্থির। তা মশায়ের কি মনে করে!

মনে করে আর কি, মশায়ের মতো কংগ্রেস ভক্তকে একবার দেখতে এলাম, নিবাস কল্‌কাতায়।

উত্তম করেছেন, স্নানাহার করে এখানে দু' চারদিন থাকুন, সরেজমিনে দেখুন জুডাস আর হেভিরডের কীর্তি।

স্নানাহার অবশ্যই হবে, তার আগে একটা কাজ আছে।

কি কাজ।

একখানা চিঠি আছে।

আমেদাবাদ থেকে, সেখানে তো আমাকে কেউ চেনে না।

এবারে আগন্তুক হেসে বল্‌ল, খুবই চেনে, আমি একই জেলে ছিলাম আপনার নাতি লবকুশের সঙ্গে।

যেন বক্তব্য বোধগম্য হয় নি এইভাবে যজ্ঞেশবাবু বার দুই বললেন, আমার নাতি, আমার নাতি, হাঁ তাই তো লবকুশ আমার নাতিই বটে তো। কই দেখি চিঠি।

আগন্তুক চিঠিখানা এগিয়ে দিতেই তিনি প্রায় কেড়ে নিলেন হাত থেকে—হাঁ এ তো লবকুশেরই হস্তাক্ষর, লবকুশেরই হস্তাক্ষর, আরও বার দুই ঐ কথা উচ্চারণ করে চিঠিখানা পাছে কেউ ছিনিয়ে নেয় মনে করে জোরে চিঠিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন আর তারপরে তাকিয়ার উপরে মাথা নুয়ে পড়লো। যজ্ঞেশবাবু মূর্ছিত।

হতবুদ্ধি আগন্তুক চীৎকার করে উঠলো, এই কে আছে?

মলিনা ও রুক্মিণী ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

৫৫

বউমা, দেখো তো চিঠি খানা পড়তে পারছি না কেন, চোখে কি হঠাৎ ছানি পড়লো নাকি।

রুক্মিণী ডাক শুনে ঘরে এসে শ্বশুরের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল দুই চোখ কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ। চোখের জল চোখের দৃষ্টির বাধা।

ইতিমধ্যে মলিনাও ঘরে এসেছে। সে বল্‌ল, বাবা, কাল থেকে চিঠিখানা অন্ততঃ পঞ্চাশবার পড়েছেন, মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, না, না, তুই বুঝবিনে, বুড়ো মানুষ কোথাও কিছু বাদ গিয়েছে কিনা তাই দেখছি। তারপরে শুধালেন, শচীনকে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হয়েছে তো? কল্‌কাতায় সে খোঁজ পায়নি জানিয়েছিল, এবার ফিরে এসে দেখুক আমরা এখানে বসে খোঁজ পেয়েছি।

হাঁ বাবা, দাদাকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, খুব সম্ভব আজকেই এসে পৌঁছবেন।

রুক্মিণী মা, তুমি একবার চিঠিখানা পড়ো। আমি শুনি, চোখে আর তেমন তেজ নাই।

রুক্মিণী চিঠিখানা পড়তে সুরু করলো, তাদেরও প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

"দাদু, অনেক দিন পরে তোমাদের চিঠি লিখবার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের চিঠিপত্র লিখবার হুকুম নেই—তাই এই চিঠিখানা এক ভদ্রলোকের হাতে পাঠাচ্ছি। এখানে চিঠি যাতায়াত এই ভাবেই হয়ে থাকে। নূতন কেউ গ্রেপ্তার হয়ে এলো, তার হাতে আত্মীয়-স্বজন চিঠি দেয়, আবার কারো খালাসের হুকুম হ'ল তার হাতে আমরা চিঠি দিয়ে থাকি। বের হয়ে যাওয়ার সময়ে খানা-তল্লাশ করবার নিয়ম, কিন্তু ওয়ার্ডারেরা এ সব দেখেও দেখে না, চোখ বুজে থাকে। এই আমেদাবাদ জেলে প্রায় সব প্রদেশের আসামী আছে, এই প্রথম একজন বাঙালী খালাস হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের চিঠিপত্র থাকলে আমার হাতে দিতে পারো। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন? বললেন, কল্‌কাতায়। বললাম, আমার বাড়ী যে দিনাজশাহী শহরে। তোমার নাম শুনে বললেন তাঁর নাম শুনেছি তবে কখনো দেখিনি, আর দিনাজশাহীতেও কখনো যাইনি। তা হোক আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দেব—তুমি চিন্তা করো না। ভদ্রলোক গেলে তাঁকে একটু যত্ন করো, আর ভালো করে খাইও, এখানে অনেক কাল কেউ সুখাদ্য খায়নি। এখানেই কুশ আছে তবে অন্য ওয়ার্ডে। দেখাশোনা হয় না, তবে ওয়ার্ডারদের মুখে খবর পাই, খবর দিই। সে চিঠি দেবার সুযোগ পেলো না, আমার চিঠিখানাকে দুজনের চিঠি বলে মনে করো। এবার গোড়া থেকে সুরু করি। প্রায় দেড়বছর হ'তে চলল, খবর অনেক আছে। ভবিষ্যতে আবার কবে লিখবার সুযোগ আসবে জানিনা। কানাঘুষায় শুনতে পাই যে মহাত্মাজীকে নাকি শীঘ্রই ছেড়ে দেবে, হয়তো বা দিয়েছে, তবে তিনি আছেন পুনায়, নিশ্চয় করে জানবার উপায় নাই। ভাবগতিকে মনে হচ্ছে আমরাও শীঘ্র ছাড়া পাবো, তবে সেটাও অনিশ্চয়, ওয়ার্ডারদের মুখের সংবাদ বই তো নয়।

"আটই আগস্ট শেষ রাতে মহাত্মাজী, নেহরু, প্যাটেল, আচার্য কৃপালনি, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে, তাদের কোথায় নিয়ে যায় জানতে পারিনে। অনেক পরে জেনেছি মহাত্মাজী আছেন পুনায় আর অন্যরা সব আছে আমেদনগর নামে এক জায়গায়। তারপরে আমাদের পালা। ভোরবেলা

উঠে তাঁদের গ্রেপ্তারের সংবাদে সমস্ত বোম্বাইয়ের লোক ক্ষেপে উঠ্‌ল। মহাত্মাজীকা জয় বলে প্রসেশন আরম্ভ করতেই সুরু হ'ল কাঁদানে গ্যাসের গুলি ছোঁড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চালানো। চোখে কিছু দেখতে পাইনে, এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করি, ফাউন্টেন নামে অঞ্চলেই এসব কাণ্ড বেশি। একদিকে সাঁজোয়া গাড়ী, আর একদিকে পুলিশের লরি আর বন্দীদের জন্য বড় বড় ভ্যান। আমি আর কুশ তখন পর্যন্ত একত্র ছিলাম, এক সঙ্গেই গ্রেপ্তার করে ভ্যানে পুরলো। যারা বন্দী গাড়ীতে উঠতে আপত্তি করছিল তাদের পিঠে মাথায় লাঠি পড়তে সুরু করলো, যাকে ধরে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় গাড়ীর মধ্যে যেন আলুর বস্তা। গাড়ী ভরে উঠতেই ছুটে রওনা হয়ে যায়।"

রুক্মিণীর পক্ষেও আর পড়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সে বল্‌ল, মলিনা ভাই তুমি প'ড়ে শোনাও। এই বলে তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে ঘরে গেল, কিছুক্ষণ কাঁদবার পরে সাময়িক ভাবে চোখ শুকোলে মুখ ধুয়ে আবার ফিরে এলো, তখনো মলিনা পড়ে চলেছে—আর যজ্ঞেশবাবু চোখ মুছছেন।

"ভিকটোরিয়া টার্মিনস বলে একটা বড় স্টেশনে একখানা রেলগাড়ী দাঁড়িয়েছিল আমাদের ভরে দিল সেই গাড়ীতে, দেখতে দেখতে সমস্ত গাড়ীখানার কামরাগুলো ভর্তি হয়ে গেল। বন্দীদের বয়স ষোল সতেরো থেকে ষাট সত্তর, সমস্ত প্রদেশের লোক, বাঙালীও অনেক। নানাভাষায় কথা আরম্ভ হয়ে গেল। অনেকের হাতে পায়ে পিঠে মাথায় আঘাতের চিহ্ন, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, খাদ্য ও জলেরও। গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে দুপুর পেরিয়ে গেল। একজনের মাথার চোট গুরুতর হয়েছিল, রক্ত পড়েছিল, কোথায় বা ডাক্তার কোথায় বা ওষুধ পত্র। একজন বল্‌ল, শিকল টানো। দেখা গেল সমস্ত এলার্ম শিকল কেটে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের কামরায় একজন ডাক্তার ছিলেন, বয়স চল্লিশের কাছে, লোকটি বেশ রসিক, বললেন, দেখো সরকার কি সদাশয়, বিনা পয়সায় ডাক্তারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি বাথরুম থেকে জল এনে লোকটির মাথা ধুয়ে নিজের ধুতি ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। কথাবার্ত্তা ইংরাজিতে হচ্ছিল। এমন সময়ে কামরার অন্য প্রান্ত থেকে মোটা গলায় একজন গান গেয়ে উঠ্‌ল, "মোটি মোটি ডাল রোটি, ছোটী ছোটী চানা, হরদম চিবানা ভাইয়া হরদম চিবানা। জেলমে যানা, হাওয়া খানা", আর একজন পদপূরণ করে গেয়ে উঠ্‌ল, তা না না না না না। খুব হাসির হররা উঠ্‌ল। ক্রমে বিকাল হল, সন্ধ্যা হ'ল, অবশেষে রাত। গাড়ী কোন স্টেশনে থামছে না।

অনেকেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কে একজন বল্‌ল, শীঘ্রই আনন্দ বলে একটা বড় স্টেশন আসছে, যেখানে দানাপানি মিলবে। আর একজন উত্তর দিল, আরে স্টেশনের নামটাতেই যা আনন্দ, তার বেশি কিছু মিলবে না। মাঝখানে বোধ করি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে যেতে দেখি মস্ত একটা স্টেশন, প্লাটফরমের ওদিকে আর একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে। সকলেই জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখছি দানাপানি আসছে কিনা। সেখানেও প্লাটফর্মে সত্যাগ্রহী বন্দী, তাদের ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের গাড়ীখানায়। তারা আপত্তি করলো আর জায়গা কোথায়। অমনি পুলিশের লাঠি চল্‌ল, তাদের ধারনা লাঠি চললেই জায়গা হয়। এমন সময়ে অপরদিকের ট্রেন-খানা থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে পড়লেন পুলিশের ওপরে—Why are you beating our boys! আমাদের ছেলেদের মারছ কেন। পুলিশটা লাঠি তুললো তার মাথা লক্ষ্য করে, অমনি আর একজন পুলিশ তার লাঠি চেপে ধরে বল্‌ল, আরে দেখতা নেহি পণ্ডিতজী হ্যায়। তখন আমাদের সম্বিৎ হল, পণ্ডিত নেহরুই তো বটে। আমাদের সমস্ত গাড়ী একসঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌ল—পণ্ডিতজীকা জয়। পাছে একটা হাঙ্গামা হয় ভয়ে আমাদের গাড়ীখানা দ্রুত ছেড়ে দিল। কোথায় দানা কোথায় পানি। একজন বলে উঠ্‌ল ভাই দানাপানি যখন মিলল না, তার বদলে তোমার ঐ গানটাই না হয় আর একবার গাও। লোকটা গান শুরু করতে সমস্ত কামরার লোকে এক কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌ল, "মোটি মোটি ডাল রোটি, ছোটি ছোটি চানা, হরদম চিবানা ভাই হরদম চিবানা, জেলমে যানা, হাওয়া খানা—তা না না না না না।" কুশকে বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কুশ কি ভাবছ? সে বল্‌ল, পিসিমার রাঁধা লাউখণ্টের কথা। পিসিমার অনুরোধ সত্ত্বেও কতদিন পাতে ফেলে উঠে এসেছি, এখন পেলে চেটেপুটে সব শেষ করে দি।"

মলিনা আর পড়তে পারলো না, চিঠিখানা ফেলে রেখে চোখে আঁচল দিয়ে ছুটে পালালো। একে একে রুক্মিণী ও মলিনা দুজনেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। যজ্ঞেশবাবু নিজে পড়তে আরম্ভ করলেন, তবে মনে মনে নয়, মনে মনে পড়া অর্ধেকটা মাত্র পড়া, কান বেচারা বঞ্চিত হয়ে। তাই তিনি পড়ছেন কানের শ্রুতিগম্য কণ্ঠে।

"আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, দাদু জেলে এসে পৌছে দেখলাম, সব জেল, সব জেলের খাদ্য, পোষাক, আচার ও আবহাওয়া এক ছাঁচে ঢালা, এক রসে ভাজা, এক ভিয়েনে পাক করা, এই বয়সে কম জেল তো ঘুরিনি। তুমিও

য়েছে কাজেই বাকিটুকু কল্পনা করে নিয়ো। একটা কথা তবু জানানো
প্রয়োজন আবশ্যক। ইদানীং কুশের মনোভাব আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। ইদানীং
সরকার থেকে অনেক সুলভমূল্যের (মূল্য আমাদের দিতে হয় না, তবু উপরে
মুদ্রিত থাকে বলে উল্লেখ করলাম) চটি বই আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে
থাকে। তাদের ভাষাটা ইংরাজি, ভাবটা বুঝি না, তবে ইশারা ইঙ্গিতে মনে হয়
লেখক (কারা ?) বলতে চায় গান্ধীবাদ আর পুঁজিবাদ অভিন্ন, গান্ধী হচ্ছেন
প্রচ্ছন্নভাবে পুঁজিবাদীদের দালাল। লেখকের মতে সোভিয়েট গণতন্ত্র যাকে
নিন্দুকেরা কমুনিজম বলে অভিহিত করে সেটাই হচ্ছে ভারতের মুক্তির একমাত্র
পথ। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে সোভিয়েট রাজ্য কেমন বীরত্বের সঙ্গে
জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়ছে, জার্মানী ও ইটালী তো হারতে চলেছে। ভাবলাম
এসব কথা আমাদের বলে কি লাভ। লেখকের যদি তাই আদর্শ হয়, আর
সরকারেরও নিশ্চয় নতুবা এসব কেন আমাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করছে
তবে ইংলণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশ কেন সোভিয়েট গণতন্ত্র পন্থা গ্রহণ করে না। এই
জাতীয় অনেক কথা যা কাঁচা মাথায় সহজে ঢুকে বাসা বাঁধে—আছে বই-
গুলোতে। আমাদের কোন কোন যুবক ইতিমধ্যেই ঐ রসে বেশ মজছে
তারা বলে এসব কথা আগে জানলে গান্ধীপন্থা অবলম্বন করতাম না, জেল থেকে
ছাড়া পেলেই সোজা গিয়ে উঠবে জনযুদ্ধওয়ালাদের অফিসে। এদের জন্যে
ভাবি না, তবে একদিন কুশ ওয়ার্ডারের হাতে ছোট্ট একখানা চিরকুট পাঠালো,
তাতে লেখা ছিল গান্ধীবাদের নূতন মূল্যায়ন করা আবশ্যক, এ-ও একরকম
পুঁজিবাদ। সোভিয়েৎ গণতন্ত্রই মানুষের শোষণ মুক্তির একমাত্র পথ। দাদু
শান একবার কথা। তবে আশা আছে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার হাওয়ায়
পৌঁছলে এ ভূত ওর মাথা থেকে নেমে পালাবে। আজ এই পর্যন্ত, আশা
আছে শীঘ্রই তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারবো। বাবা মা পিসিমাকে প্রণাম
জানিয়ো, ইতি তোমার স্নেহের লব।

পুঃ পত্রবাহক ভদ্রলোককে উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা খাওয়াতে ভুলো না।"

কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে গান্ধী বললেন—কুইট ইণ্ডিয়া, ভারত থেকে ভাগো।
উত্তরে মুসলিমলীগের মুখপাত্ররূপে জিন্না বললেন—ডিভাইড এণ্ড কুইট, ভাগ করে
দিয়ে ভাগো। ইংরেজ ভাবলো—বাহা বাহা, ১৯০৬ সালে হিন্দুমুসলমান ভেদের
বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই বৃক্ষে এতদিনে ফল ফলেছে এখন পেড়ে নেওয়ার
অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু এই যথেষ্ট নয় আরও কিছু চাই। রাষ্ট্রদেহে কমুনিজমের

বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া আবশ্যক, বেটারা স্বাধীনতার মজাটা বুঝুক। তাই তারা জেলে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মধ্যে সহজবোধ্য কমুনিজম তত্ত্বের বই বিনামূল্যে ছড়াতে লাগলো। এসব তত্ত্ব কাঁচা মাথায় সহজে প্রবেশ করে, তারা নিজেদের মধ্যে কমুনিজমের তত্ত্ব কপচাতে লাগলো। কুশ তার এক শিকার। ইংরেজ বড় বিচিত্র জাত। কোথায় যে তাদের আন্তরিকতার শেষ আর নষ্টামির সূত্রপাত কেউ বুঝতে পারে না, এখন তারাও বোঝে কিনা সন্দেহ। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো এই দ্বৈতভাব তাদের মজ্জাগত।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, ওরে মলিনা, ও বউমা, লবকুশ শীঘ্রই এসে পড়বে, তাদের ঘরটা সাফ করে রাখিস। আর ওদিকে শচীন কল্‌কাতায় করছে কি, দশ পনেরো দিন হয়ে গেল আসবার নাম নেই। হাঁরে, টেলিগ্রামটা এক্সপ্রেস করে দিয়েছিস তো, যুদ্ধের বাজারে অর্ডিনারি টেলিগ্রাম চিঠির বাড়া।

মলিনা বল্‌ল, দাদাকে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, এলো বলে।

এদিকে শুভ্রাকে নিয়ে এক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠ্‌ল। পরদিন পাশের বাড়ীর টেলিফোনে অরবিন্দর ডাক পড়লো। অরবিন্দ গিয়ে টেলিফোন ধরলো—হ্যালো।

শুভ্রার কণ্ঠে সে শুনতে পেলো, দাদা আমি শুভ্রা।

এত সকালে কি খবর?

শুভ্রা বলছে—দাদা, আমার টেলিফোন ঘরটা নির্জন, আমি সব খুলে বলছি, আপনার ঘর হয় তো নির্জন নয়—খোলসা উত্তর দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ, আপনি হুঁ হাঁ করে যাবেন যাতে আমি বুঝতে পারি আপনি শুনছেন।

আচ্ছা।

কালকে সন্ধ্যায় চিড়িয়াখানায় রবিনবাবুর সঙ্গে দেখা সেই মেয়েটি, তপতী তার নাম, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল আপনাকে বলেছিলাম।

মনে আছে।

সেই মেয়েটি বল্‌ল, শুভ্রা, তোমার সঙ্গে রবিনবাবুর পরিচয় আছে তাঁর মুখে শুনেছি।

হাঁ আছে।

কেমন লোক।

মোটেও ভালো নয়।

তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন, দুদিনের জন্য স্টীমারে করে বেড়িয়ে আসবার কথা। ভাবলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করি।

আমি বললাম, এমন কাজ কখনো করবে না, সারাজীবন অনুতাপ করতে হবে।

তবে সেই কথাই জানিয়ে দিই—আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

দাদা, শুনছেন তো ?

হাঁ বলো, তারপরে কি হ'ল।

তপতী তাই বলেছিল, খুব সম্ভব অসাবধানে আমার নামটাও প্রকাশ করে ফেলেছিল।

তারপরে ;

তারপরে মাঝরাতে আমার ঘরে প্রবেশ রবিনবাবুর।

ঢুকলো কি করে ?

দোতালা বলে আমরা জানলা খুলে শুই, বড় জানলা, জানলায় শিক নেই, তার উপরে ব্ল্যাক আউটের রাত, ঢুকতে কোন অসুবিধা নেই।

স্কাউড্রেল! তারপরে।

ঘরে লোক ঢুকেছে বুঝতে পেরে জেগে উঠে আলো জালালাম—বললাম, একি, আপনি, কেন এসেছেন!

বললেন, তোমাকে চিঠি লিখলে উত্তর দাও না, দেখা করতে এলে দেখা করো না, তাই রাতের বেলায় এই উপায় অবলম্বন করতে হ'ল।

বললাম, এখন যদি ঘরের বেল টিপে দি ?

তাতে তোমার কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়বে। তারপরে যা বললেন, টেলিফোনে জানাতেও লজ্জা বোধ করছে।.

তখন কি করলো বলো।

বলল, তপতীকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে নিষেধ করেছ ?

হাঁ করেছি।

কেন ?

আমার অভিজ্ঞতা থেকে।

ওরে আমার সতীরে। নার্সদের আবার সতীত্ব!

অনেক হয়েছে আপনি যে পথে এসেছেন সেই পথে বেরিয়ে যান, এখনি—

যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই।

বেলে হাত দিলাম।

বল্‌ল, কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরকম অনেকেই দেয়। (শুভ্রার কণ্ঠস্বর ভারি।)

বল্‌ল, যাও, এখন তোমার অরবিন্দদার কাছে, সে লোকটিও বড় সুবিধার নয় দেখ্‌তে পাবে। এই বলে আপনাকে আমাকে জড়িয়ে অনেক কুকথা বল্‌ল।

বললাম, এখনি যান।

তারপরে জানলার উপরে উঠে বসে বল্‌ল, একথা যদি প্রকাশ পায় তবে তোমাকে খুন করবে, আমরা অনেক খুন করেছি মনে থাকে যেন।

শুনছেন ?

হ্যাঁ, বলে যাও।

তারপরে পাইপ বেয়ে নেমে গেল। আমি জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম, ঘুম এলো না, স্থির করলাম, ভোর হ'লেই গিয়ে আপনাকে বলবো। তারপরে মনে হ'ল এসব কথা আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলতে পারবো না। তখন মনে হল টেলিফোনে জানাই, টেলিফোনে তো চক্ষুলজ্জা নেই। এবারে বলুন দাদা কি করবো ?

তোমার ছুটি পাওনা আছে ?

অনেকদিন পাওনা আছে।

তবে এখনি একটা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়ে সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখনি আমার বাসায় চলে এসো। আর শোনো ট্যাক্সি করে আসবে, ভুল যেন না হয়।

আচ্ছা।

আসছ তো ?

নিশ্চয় যাচ্ছি—আর কার কাছে যাবো। আপনি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই দাদা।

অরবিন্দ বল্‌ল, কখন পৌছবে ?

দশটার মধ্যেই।

আচ্ছা।

এসে রাঁধবে, মনে থাকে যেন।

ছেড়ে দিলাম।

আচ্ছা।

অরবিন্দ চিন্তিত মনে বাসায় ফিরে এলো।

শুভ্রা এসে পৌঁছলে বিস্মিত হয়ে শচীন বলল, হঠাৎ তুমি ?

অরবিন্দ বলল, দাদা আমিই ওকে ফোন করে আনিয়ে নিয়েছি। এখানে ওর শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছিল না, আমার ইচ্ছা আপনি ওকে সঙ্গে নিয়ে যান দিনাজশাহীতে, সেখানে কিছুদিন থেকে শরীরটা সারিয়ে নিয়ে আসুক।

শচীন ও শুভ্রা দুজনেই বিস্মিত হ'ল, একজন কম, একজন বেশি।

তা বেশ তো, চলুক না, আমি কল্‌কাতায় নরক দর্শন করলাম, ও স্বর্গ দর্শন করুন দিনাজশাহীতে। কিন্তু আমি তো কালকেই ভোরের ট্রেনে রওনা হচ্ছি।

বেশ ও কালকেই যাবে, রাতটা এখানেই থাকুক।

অরবিন্দকে আড়ালে পেয়ে শুভ্রা বল্‌ল, দাদা, একি করলেন, বলা নেই কওয়া নেই, পরের বাড়ীতে যাবো।

শচীনদার সঙ্গে তো যাচ্ছো—আর ওঁরা যদি পর তবে আপন কে ?

এই আশ্বাস সত্ত্বেও শুভ্রার মনে খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো, মলিনা যে তার উপরে খুশী নয়। কিন্তু আর ফিরবার উপায় নেই, বিশেষ এখানে মূর্তিমান বিঘ্ন রবিন।

শচীন ও শুভ্রা সন্ধ্যার আগেই পৌঁছালো বাড়ীতে। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামবামাত্র তাদের দেখতে পেলো লব—চীৎকার করে উঠল, পিসিমা, মা, দেখে যাও কারা এসেছে।—বলে সে প্রণামটা সেরে নিল।

আরে তোরা কবে এলি।

কালকে এই রকম সময়ে।

লবের ডাক শুনে মলিনা ও রুক্মিণী এসে উপস্থিত হ'ল।

দেখো কাকে নিয়ে এসেছি।

বেশ করেছ দাদা, যুদ্ধের সময়ে কল কল্‌কাতায় থাকে !

মলিনা সত্যই খুশী হয়েছে। কারণটা আভাসে শুভ্রাও বুঝলো।

সে দু'জনকেই প্রণাম করলো।

রুক্মিণী তার হাত ধরে বল্‌ল, চলো ভাই, ভিতরে চলো।

আরে বাবা কোথায় ?

তিনি পাড়ায় পাড়ায় নাতিদের শুভাগমন সংবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর আর একটি নাতি কোথায় ?

সেও বেরিয়েছে।

কোথায় ?

মলিনা বল্‌ল, ভগবান জানেন।

১৯৪৪ সাল। গান্ধীজি কারামুক্ত।

বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যবাহিনী দুর্বার গতিতে প্যারিস ও রাইন নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। ইউরোপের যুদ্ধজয় সম্বন্ধে আর কারো মনে সন্দেহ নেই। এদেশে ইংরেজ আবার মাথা উঁচু করে হাঁটতে শুরু করে করেছে, তাদের পায়ের জুতোতে মস্‌মস্‌ শব্দ আবার জোরে ধ্বনিত। তাদের মুখে আবার সপ্রতিভভাব তবু তারি মধ্যে এক কোণে বিষাদের আভাস। তাদের মধ্যে যারা বোদ্ধা তারা বুঝতে পেরেছে যুদ্ধে জয় হলেও ভারতসাম্রাজ্য তাদের হাত ছাড়া হবে। তবে ভরসার মধ্যে উইনস্টন চার্চিল, তিনি প্রধান মন্ত্রী থাকতে আশঙ্কা নেই। এমন সময়ে পূব দিকের বেতারকণ্ঠ ঘোষণা করে, "প্রাণ দাও, স্বাধীনতা দেব, দিল্লী চলো, জয় হিন্দ"। বন্ধ করে দেয় বেতার যন্ত্রটা। ঐ উদাত্ত কণ্ঠ যে পরিমাণে ভারতীয়দের মনে আশা উৎসাহ জাগ্রত করে সেই পরিমাণে শঙ্কা জাগায় ইংরাজের মনে। জাপানীবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়বাহিনী নাকি ভারতে প্রবেশ করেছে।

সিমলার থ্রি পাইনস ক্লাবে করফিল্ড, অ্যাবেল, মরডাণ্ট প্রভৃতি দুর্মর সাম্রাজ্যবাদীগণ কড়া হুইস্কি গলাধঃকরণ করে, ফিরে পায় আবার উদ্দীপনা ও উৎসাহ। ভরসা ভারতের নূতন বড়লাট ওয়াভেল আর ইংরাজের পূর্বাঞ্চল বাহিনীর সেনাপতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু সর্বোপরি ভরসা মুসলিম লীগের কর্তা মিঃ জিন্না, সে কখনো পাকিস্তানের দাবী ছাড়বে না, কাজেই ইংরাজকেও ছাড়তে হবে না ভারতের আধিপত্য, পাঁচ কোটি অসহায় মুসলমানকে প্রবল হিন্দু কংগ্রেসের মুখে ছেড়ে দিয়ে গেলে ইংরাজ যে ধর্মে পতিত হবে। নিজের স্বার্থকে পরার্থরূপে সাজাতে ইংরেজের তুলনা নেই।

ওহে অ্যাবেল, সেই ক্ষুদে বামনটা, that little man বড়লাটকে যে চিঠি দিয়েছে তা দেখেছ কি ?

কে মিঃ গ্যাণ্ডি ?

আবার কে ?

লিখেছে কি ?

করফিল্ড বল্‌ল, লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে ওর দোসর নেই।

সে কথা ঠিক, কিন্তু লিখেছে কি ?

কি আবার লিখবে—চিং বাজনা বাজাচ্ছে, বলছে সত্যাগ্রহীর কখনো

পরাজয় হয় না। লিখেছে দেশব্যাপী অরাজকতার দায়িত্ব সরকারের, সত্যাগ্রহীরা ধোয়া তুলসী পাতা।

আর এক চুমুক কড়া হুইস্কি গিলে অ্যাবেল বলল, বাদশাহী আমল হ'লে লোকটাকে কোতল করতো, আমরা সভ্যজাতি বলেই ওকে সযত্নে বন্দী ক'রে রেখেছিলাম। আবার মুক্তি দিয়েছি।

এইচ ই, His Excellency বলছিল লোকটার চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, বুঝতে পারি না কোন্ কথার কি অর্থ। চেপে ধরলেই বলে বসে আজ আমার মৌন দিবস, নয় তো বলে আমার ইনার ভয়েস, পরম পুরুষের আজ্ঞা। বড়লাট বলছিল লোকটা এক নম্বর Hypocrite, ভণ্ড। একেই কিনা দেশের লোক বলে Saint, সাধু-পুরুষ।

মরডাণ্ট একটু নরম মেজাজের লোক, সরকারী কাজে দু' তিনবার সাক্ষাৎ করেছে গান্ধীর সঙ্গে—সে বলল, না হে, মধ্যযুগে জন্মালে লোকটাকে সবাই সাধু সন্ত বলে স্বীকার করে নিতো।

তবে মধ্যযুগে যাক না।

তা যখন সম্ভব নয়, সভ্যযুগে জন্মে সভ্যের মতো আচরণ করুক, ভণ্ডামি কেন ?

তোমরা তো লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করনি, আমাকে করতে হয়েছে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় না।

ওহে করফিল্ড, দাও তো বেচারা মরডাণ্টকে একটা stiff কড়া হুইস্কি, গান্ধীর জাদু দূর হোক ওর মন থেকে।

কড়া হুইস্কি পান করেও বিশেষ উপকার হ'ল মনে হয় না। মরডাণ্ট বর্ণনা করে চল্‌ল গান্ধীর সৌজন্য, সরল ব্যবহার ও সর্বজনে সমদর্শিতা।

ওহে মরডাণ্ট, তুমি দেখছি ইংরাজ সমাজের কলঙ্ক।

অ্যাবেল ফোঁস করে উঠ্‌ল, বল্‌ল, আর একটা কলঙ্ক ঐ উল্টো কথার ব্যাপারী বুড়ো বার্ণাড শ—বুড়োটা বলেছিল রাজার উচিত বিনাশর্তে অবিলম্বে গান্ধীকে মুক্তিদান আর বুড়ো হাবড়া মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

করফিল্ড ও অ্যাবেল একসঙ্গে বলে উঠল, থামো থামো তবে রক্ষা এই যে বুড়োটা ইংলেজ নয় আইরিশম্যান।

মরডাণ্ট বল্‌ল, তবু তো ইরেজরা ওকে নিয়ে গর্ব করে থাকে।

সেটা ইংরেজদের উদারতা।

উদারতা নয় নির্বুদ্ধিতা।

গান্ধীর দাবী অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা আর সংবিধান রচনার জন্যে একটি সভা।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, আগে জিন্নাকে রাজি করাক। সে বাবা সহজ পাত্র নয়। আজ ক'দিন ধরে বোম্বাইতে দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

করফিল্ড আর অ্যাবেলের মতামত এক রকম। একজন ধুয়ো ধরলে আর একজন দোহারকি করে।

একদিকে হিন্দু কংগ্রেস—আর অন্য পক্ষে মুসলিম লীগ, সমস্ত রাজন্যগণ, তপশিলী জাতি, শিখ, খ্রীস্টান আর ইউরোপীয় বণিকগণ। একা হিন্দু কংগ্রেস কোণ ঠাসা হয়ে পড়বে। তাছাড়া হিন্দুরাও সকলে স্বীকার করে না গান্ধীর আধিপত্য, হিন্দু মহাসভা তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে। দেখা যাক বুড়োটা কি করে ?

পিছলে বেরিয়ে যাবে, যেমন বারে বারে গিয়েছে, বলল করফিল্ড।

আরে অতশত ছেড়ে দাও, আগে জিন্নাকে রাজি করাক তো, সে বড শক্ত ঠাঁই।

এমন সময়ে বেয়ারা এসে একখানা সংবাদপত্র দিয়ে গেল। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কল্‌কাতা, করাচি প্রভৃতি শহরের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র এখানে আসে, সবগুলো এক সময়ে নয়, যেমন পৌঁছয় সেইভাবে।

করফিল্ড কাগজখানা তুলে নিয়ে বল্‌ল, এই যে বোম্বাইয়ের খবর—**Jinnah Gandhi Talks Fail,** গান্ধী জিন্নার আলোচনা নিষ্ফল। কেমন বলেছিলাম কিনা জিন্নাকে রাজি করাতে পারবে না, সে বড় শক্ত ঠাঁই। দেখো দেখো গান্ধীর প্রস্তাব, ভারত খণ্ডন করবার বদলে জিন্না সমস্ত ভারতের শাসনভার গ্রহণ করুন।

মরডাণ্ট বলল, এ তো অতি উদার প্রস্তাব।

উদার! তবেই বুঝেছ। গান্ধী মহা ঘুঘু, জানেন জিন্নার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

করফিল্ড কাগজ পড়তে পড়তে মন্তব্য করতে লাগলো—এই দেখো জিন্না অস্বীকার করেছে। আরও দেখো গান্ধীর প্রস্তাব শুনে হিন্দু মহাসভার দল গান্ধীর গাড়ীতে ইঁট পাটকেল ছুঁড়েছে। একদিন লোকটা মরবে ওদের হাতে।

এমন সময়ে আর একখানা কাগজ এলো।

এ যে করাচির কাগজ, দেখি কি আছে। বাহা, বাহা, করাচিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেখলে তো হিন্দু মুসলমানে আদায় কাঁচকলায়। দেখো মরডাণ্ট আমাদের যদি কখনো ভারত ছেড়ে যেতে হয় তবে হিন্দু, মুসলমান,

তপশিলী জাত, শিখ, খ্রীষ্টান, সামন্ত রাজ্য প্রভৃতির মধ্যে এ দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে বিদায় নেবো—যেমন হাজার টুকরো পেয়েছিলাম তেমনি হাজার টুকরো করে দিয়ে চলে যাবো।

করফিল্ড, দুশো বছর শাসনের পরে এভাবে যাওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের হবে না।

কেন হবে না! ঐ নেংটি পরা ফকিরের কাছে নতি স্বীকার করবো?

এতক্ষণ অ্যাবেল নীরবে শুনছিল, তার সম্পূর্ণ সহানুভূতি করফিল্ডের দিকে। এমন সময়ে তার পি, এ. (P. A) এসে বল্‌ল, আপনাকে ফোনে ডাকছেন এইচ. ই-র প্রাইভেট সেক্রেটারি।

আবার কি হ'ল! হয়তো বুড়ো ঘুঘুটা লম্বা চিঠি লিখে বসেছে এইচ-ইকে। তিনি ওর চিঠির ভাবগতিক বুঝতে পারেন না, বলেন দেখো তো কিছু বুঝতে পারো কিনা। বলেন, লোকটার আন্তরিকতা ও ভণ্ডামি এমন সমান সমান মিশল যে কোথায় ধরবো, কি বুঝব ঠিক করতে পারি না। যাবার আগে একটা সতর্কবাণী বলে যাই, মরডাণ্ট, যদি কখনো দেশত্যাগ করতে হয় তবে কখনো যেন হিন্দু কংগ্রেসের রাজত্বে বাস করো না। এরা প্রথম দিনেই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মেরে ফেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

আমি বিশ্বাস করি না।

তবে থাকো আর মরো, কিন্তু স্ত্রী ও কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে দেশে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না।

তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না। আমি চললাম।

কোথায়?

মিঃ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

জানো এ সময় তার সঙ্গে দেখা করার কি অর্থ?

তোমার চাকুরী যেতে পারে।

গেলে যাবে।

তবে যাও কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখাও গিয়ে—ওদের দলবল হাঁকবে মহাত্মা মরডাণ্টকি জয়।

তারা কি করবে জানি না, তবে এরকম শয়তানী চক্রের মধ্যে আমার পক্ষে বাস অসম্ভব। বলে টুপি তুলে নিয়ে সবেগে প্রস্থান করলো।

অ্যাবেল বল্‌ল, যাই, কথাটা এইচ-ই-র কানে পৌছে দিই।

অ্যাবেলের প্রস্থান।

করফিল্ড বেল টিপতেই বেয়ারা এলো, শোনো আমার পি-একে এখনি পাঠিয়ে দাও।

পি-এ প্রবেশ করলে বল্‌ল, দেখো, দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে সব গোপনীয় দলিলপত্র আছে, আমার লিখিত আদেশ ছাড়া সেগুলোতে কেউ যেন হাত না দিতে পারে।

'যে-আজ্ঞা' বলে লোকটা চলে গেলে উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্কটে শেষ সান্ত্বনা স্কচের বোতল একটা কাছে টেনে নিল।

পাঁচ-সাতদিন পরে বোম্বাইতে গিয়ে মরডাণ্ট সাক্ষাৎ পেলো গান্ধীর। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো যে তাঁর সঙ্গে কাজ করবে বলে চাকুরি ছেড়ে এসেছে।

একেবারে ছেড়ে এসেছেন?

হাঁ, দোমনা হলে এ কাজ করা যায় না।

একথা আপনার খুব ঠিক।

আপনার কোন কাজে লাগিয়ে দিন আমাকে।

কাজের কি আমার অন্ত আছে, তবে একটি কাজ আপনার বিশেষ যোগ্য। আপনাকে মাঝে মাঝে দৌত্য করতে পাঠাব বড়লাটের সঙ্গে, তেমন প্রয়োজন বোধ করলে ইংলণ্ডে।

আমি যথাসাধ্য করবো।

তার বেশি কে পারে।

তখন গান্ধীজির নির্দেশে তাঁর সেক্রেটারি পিয়ারীলাল এসে মরডাণ্টের ভার নিলেন। গান্ধীজি বললেন, এঁকে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করো—তবে প্রথমটায় বেশি চাপ দিয়ো না।

গান্ধীজিকে নমস্কার করে মরডাণ্ট বের হয়ে গেল।

৫৭

দোতলায় পাশাপাশি তিনখানি শয়ন-ঘর, একপাশে শচীন ও রুক্মিণীর, তারপর মলিনার, এখন সেখানে দুজনে শোয় মলিনা ও শুভ্রা, আর শেষ দিকের খানায় লব ও কুশ।

আজ এক মাসের উপর শুভ্রা এসেছে। শত চেষ্টা করেও মলিনা তার পেট থেকে আসবার প্রকৃত কারণ আদায় করতে পারেনি। শুভ্রা বলেছিল আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তার উপরে যুদ্ধের কলকাতায় যেমন ভিড় তেমন নোংরা।

দাদা বললেন শচীনদার সঙ্গে যাও, শরীর ভালো হয়ে যাবে—শচীনদা রাজি হলেন, চলে এলাম, বলা বাহুল্য কথাটা আদৌ বিশ্বাস করেনি মলিনা। তবু ভাবলো মন্দর ভালো, দুজনে আপাততঃ ছাড়াছাড়ি। সারাদিন অভিজ্ঞ উকীলের মেয়ের যোগ্য জেরায় অরবিন্দর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা, অরবিন্দর বাড়ীতে তার আনাগোনা সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করে, শুভ্রা এড়িয়ে যায়। আসার সময়ে অরবিন্দ নিষেধ করে দিয়েছিল ববিন সম্বন্ধে কোন কথা যেন প্রকাশ না করে, লোকের ভুল বুঝবার সম্ভাবনা। ওই নিষেধ না থাকলে এতদিনে হয়তো রাবনের ব্যবহার প্রকাশ করলেও করতে পারতো। রাত্রের বেলাতেই কথা-প্রসঙ্গে মলিনার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু শুভ্রার অভ্যাস এই যে বালিশে মাথা দিতেই ঘুমিয়ে পড়ে, গোটাকয়েক প্রশ্ন করে অবশেষে হতাশ হয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ে। আজ এত সহজে ঘুম এলো না, তার কানে আসছিল লবকুশের কথার শব্দ। সাধারণ কথা তর্কে পৌঁছলে স্বভাবতই উচ্চগ্রাম অবলম্বন করে।

কুশ বলছিল, দেখো লব, গান্ধীর গ্রামোদ্যোগ অর্থাৎ চরখা কাটা, ঘানিতে তেল ভাঙা, ধামাকুলো ধুচুনি বোনা এসব দিয়ে দেশের উন্নতি হবে না।

এসব যুক্তি তোমার মুখে নূতন।

নূতন হলেই মিথ্যা হয় না।

তা হয় না বটে তবু তো একটা কারণ থাকা আবশ্যক।

কারণের অভাব কি, বললে কুশ, যতদিন দেশ দরিদ্র আছে এই সব পন্থায় কিছু উপকার হলেও হতে পারে। কিন্তু দেশ যখন ধনশালী হয়ে উঠবে কে পুঁছবে তোমার খদ্দরের কাপড় আর ঘানিতে ভাঙা তেল।

লব বললে, বেশ তো, দেশ ধনশালী হয়ে উঠুক তখন না হয় সব পরিত্যাগ করলেই হবে।

কিন্তু বাধা এই যে চরখা চালিয়ে ঘানিতে তেল ভেঙে দেশকে কখনো ধনী করা যাবে না।

তবে উপায় ?

এই সব সেকেলে চরখা, তাঁত, ঘানির বদলে হেভি মেশিন, বড় বড় যন্ত্রের আমদানি করতে হবে, যেমন করেছে রাশিয়া।

ওগুলো তো রাশিয়ার আবিষ্কার নয়, তারা মার্কিন দেশ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান থেকে আমদানি করেছে।

তাতেই রাশিয়ার লোকে এত বিত্তশালী।

বলো না স্টেট বিত্তশালী, সাধারণ লোকে নয়।

এটা মস্ত ভুল, ওখানে স্টেট আর সাধারণ লোক এক।

কি রকম এক জানো, যেমন বাঘের পেটে মানুষটা গেলে বাঘের সঙ্গে এক হয়।

এ সব তোমার সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে থেকে ধার করে নেওয়া যুক্তি।

যুক্তিটা যদি ঠিক হয় তবে তা কার কাছে থেকে নেওয়া তাতে কি আসে যায়। তাছাড়া এসব যুক্তি গান্ধীজির হিন্দ্ স্বরাজ গ্রন্থে আছে যখন তোমার সোভিয়েট তন্ত্রের মোটেই উদ্ভব হয় নি।

ভাই লব, তন্ত্রটা সোভিয়েটের নয় স্বয়ং মার্ক্সের।

মার্ক্সের গ্রন্থ যে সেকেলে হয়ে পড়েছে পণ্ডিতজী কতবার বলেছেন।

তার মানে পণ্ডিতজী কালের সঙ্গে চলতে পারেননি। দেখো না রাশিয়া ধনশালী বলেই তো জার্মানীকে পরাজিত করতে পারলো।

একটা বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো ভুল বললে। ধনশালী আর বিত্তশালী এক নয়, আর একা রাশিয়া জার্মানীকে হারায়নি, হারিয়েছে সকলে মিলে, তাও মার্কিন লীজ লেণ্ড (Lease-lend) এর কৃপায়। আরও দেখো, এই প্রথম রাশিয়া আততায়ীকে পরাজিত করেনি, বরাবর করেছে। যে-রুশ সম্রাটদের তোমরা অত্যাচারীর চরম বলো তাদের সময়ে নেপোলিয়ান পরাজিত হয়েছিল।

সেবারে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের আসল কারণ রাশিয়ার নিদারুণ শীত, এবার কমুনিস্ট জনগণের অভ্যুত্থান।

রুশ, কমুনিজম চর্চা করবার পর থেকে তোমার যুক্তিশাস্ত্রটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আবার একটা বাক্যে দুটো ভুল করলে। এবারেও জার্মানীর পরাজয়ের একটা কারণ রাশিয়ার নিদারুণ শীত। আর একটা কারণ অবশ্যই জনগণের অভ্যুত্থান তবে তার সঙ্গে কমুনিজমের সম্বন্ধ নেই।

কি রকম?

যতক্ষণ কমুনিজমের দামামা পেটানো হচ্ছিল রুশ সৈন্যবাহিনী পিছু হটছিল, অবশেষে বেগতিক দেখে স্টালিন জনগণকে আহ্বান করলেন মাদার রাশিয়াকে বাঁচাও। ঐ মাতৃভূমি রক্ষার প্রেরণায় জনগণ অভ্যুত্থিত হয়ে উঠল। তোমার মুখেই অনেকবার শুনেছি কমুনিস্টদের মাতৃভূমি বলে কিছু নাই, বিশ্বভূমিই তার আশ্রয়। কিন্তু সঙ্কটে দেখা গেল বিশ্বভূমির শূন্যতায় পা রাখবার জায়গা নেই, শেষ পর্যন্ত সেই মাতৃভূমি আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করতে হ'ল।

তুমি কি ভাবো তোমরা অহিংস পন্থায় ইংরাজকে তাড়াতে পারবে?

ইংরাজকে তো আমরা তাড়াতে চাই না।

তবে কুইট ইণ্ডিয়ার অর্থ কি?

অর্থ অতিশয় সরল, ইংরাজের শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমান সমান হয়ে চার কোটি ইংবাজ যদি এদেশে বসবাস করে আমাদের আপত্তি নেই।

ঐ দেশকে তোমরা বিশ্বাস করো?

সত্যাগ্রহী কোন দেশকে অবিশ্বাস করে না, এমন কি রাশিয়াকেও নয়। মনে করে দেখো গান্ধীজি কতবার রাশিয়া ও চীনকে সাহায্য করবার কথা বলেছেন।

সে তর্কটা সকাল পর্যন্ত না হয় মুলতুবি থাকুক। আমাদের কি ঘুমোতে দিবি না! তর্কের মাত্রা আর একটু উচ্চে উঠলে নীচে বাবার ঘুমটাও ভেঙে যাবে।

দরজার বাইরে শচীনের কণ্ঠস্বর।

শচীন ঘরে এসে শুলে রুক্মিণী বলল, শুনলে তো কুশের কথাবার্তা, এবার বুঝে নাও ওর মতিগতি।

কি করবো বলো রুক্মি।

বেশি কিছু নয় ওদের বিয়ে দিয়ে দাও, বীরেন চৌধুরীর মেয়ে দুটোর এখনও বিয়ে হয়নি।

সেটাও না হয় কালকে পর্যন্ত মুলতুবি থাকুক, এখন ঘুমোতে দাও—এই বলে পাশ ফিরে শুলো।

একবার শোনই না, ঘুমের জন্য সারারাত তো আছেই।

কোথায় আর থাকলো, অর্ধেক রাত গেল তোমার পুত্রদের রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনে, এখন বাকি রাত যাবে তোমার বক্তব্যে।

এমন কিছু নয়, একবার বাবার সঙ্গে ওদের সম্বন্ধে আলোচনা করো।

তুমি কি ভাবো করিনি। আবার না হয় করবো।

বেশ খুশি হলাম, এবারে ঘুমোও।

শচীন কাৎ ফিরে শুয়েছিল কিন্তু ঘুম কৃপা করলো না। তার মনে পড়ে গেল তাদের সংসারের গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাস, সেই যেদিন মহারাণীর শ্রাদ্ধের আসর থেকে সে পালিয়েছিল। সেদিন থেকে অদৃষ্ট ভার নিলে তাদের সংসারকে গড়ে পিটে বদল করবার! বাবা ছিলেন ঘোরতর ইংরাজ-ভক্ত, অদৃষ্টের লীলায় তিনি জেল খাটলেন, ক্রমে ক্রমে এখন ঘোরতর কংগ্রেসী ও গান্ধীভক্ত। শচীন নিজে কেমন করে ঢুকে পড়লো সুরেন বাঁড়ুজ্যের দলে, স্বদেশী আন্দোলনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল, জেল খাটলো। আর সুশীল কখন গোপনে দীক্ষিত হল বিপ্লবীমন্ত্রে, শেষ পর্যন্ত প্রাণটা দিল। মলিনাও বাদ গেল না, তার ভাগ্যেও সাত দিন জেলের মেয়াদ হল। তারপর এলো লব কুশ। দেশবন্ধুর পরামর্শে বাল্যকালেই

তারা প্রেরিত হল হুগলির গান্ধীআশ্রমে। তারপর থেকে কতবার তারা জেল খাটলো সে এক সূক্ষ্ম হিসাবের ব্যাপার। গান্ধীজির সঙ্গ লাভ করে লোকে ধন্য মনে করে, তাঁর আকর্ষণ দুর্বার, ধীরে ধীরে দেখা গেল তারা দুটি ক্ষুদ্র উপগ্রহে পরিণত হয়েছে গান্ধীসূর্যের। এ সমস্তই এক রকম স্বভাবের নিয়মানুসারে হয়েছে, কিন্তু কুশের এ পরিবর্তন তো সে নিয়মের মধ্যে পড়ে না—শচীন ভেবে পায় না এ পরিবর্তন ঘটলো কেমন করে।

সে জানতো যুদ্ধের সময় সরকারী প্রশ্রয়ে কমুনিস্ট দল প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঐ দলটির সম্বন্ধে তার শঙ্কা ও সংশয়ের অন্ত ছিল না। আর শেষে কিনা তার নিজের ছেলে ঢুকলো সেই দলে। দেশে যত রকম রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল আছে সমস্তই প্রতিফলিত তাদের পরিবারে। অদৃষ্টের বিচিত্র লীলা। বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে তার আলোচনা হয়েছে। শচীনের শঙ্কা তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন ও কিছু নয়, ছোট ছেলেদের গায়ে হাম বের হয় এ সেই রকম, বড় হলেই সেরে যাবে। শচীন বুঝলো তিনি কমুনিজমের ইতিহাস জানেন না, আরও বুঝলো তাঁকে বোঝানো যাবে না।

তবু পরদিন প্রাতে একবার প্রসঙ্গটা তুলল বাবার কাছে, তিনি বেশি আমল দিলেন না, অনেক প্রবীণ ব্যক্তির মতো জেদের বশে বললেন, দেখো ও বিদেশী গাছ এদেশের মাটিতে অংকুরিত হলেও শেষ পর্যন্ত টিকবে না।

শচীন বলল, ওদের বিয়ের কথা ভাবছেন কি? বীরেন চৌধুরীর সেই মেয়ে দুটির এখনো বিয়ে হয়নি।

না, না, ওকথা এখন তুলো না, আবার পালাবে, আগে দেশটা স্বাধীন হোক তারপরে বিয়ের কথা ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

অচিরে দেশ স্বাধীন হবে এমন বিশ্বাস ছিল না শচীনের মনে, শুধালো কতো দিনে স্বাধীন হবে কে জানে, চোখে দেখতে পাবো বলে ভরসা হয় না।

বলো কি শচীন, তুমি তো দেখবেই, আমিও দেখবো, বেঁচে আছি তো ঐ আশাতেই—আর বড় জোর দু' তিন বছর।

এ প্রসঙ্গ আর কত দূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময়ে পিওন এসে একখানা টেলিগ্রাম দিল শচীনের হাতে।

কে টেলিগ্রাম করলো হে?

অরবিন্দ লিখেছে, come immediately,—শীঘ্র এসো।

কি হ'ল আবার, আশা করি অসুখ-বিসুখ নয়, তবে লিখেছে যখন যাও।

অরবিন্দর টেলিগ্রামের মর্ম শুনে শুভ্রা কেঁদে ফেলল, বলল, নিশ্চয় তাঁর গুরুতর অসুখ-বিসুখ হয়েছে, সামান্য কারণে টেলিগ্রাম করবার লোক তিনি নন। আমাকে নিয়ে চলো দাদা।

মলিনাও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা নয় যে শুভ্রা যায়। বলল, তোমাকে তো নিয়ে যেতে লেখেন নি।

নিষেধও করেন নি।

নিষেধ করেন নি তবে উল্লেখও করেন নি।

না, আমি যাবোই।

তবে আমাকেও নিয়ে চলো বড়দা।

তোমাদের কারো গিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা শারীরিক নয়, খুব সম্ভব রাজনৈতিক কিছু। আর গিয়ে দেখি যদি তোমাদের যাওয়ার প্রয়োজন আছে তবে জানালে শুভ্রা ও তুমি যেয়ো।

মোট কথা শচীনের সিদ্ধান্তে কেউ খুশী হ'ল না। শুভ্রা শোবার ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। আর মলিনা দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করলো শুভ্রাকে আটকানো গিয়েছে। নারীর কাছে প্রণয়ীর মৃত্যুর চেয়েও বেশি দুঃখের সে যদি অপর প্রণয়িনীর হস্তগত হয়। মলিনা কুটিল নয়, প্রেমের স্বভাবটাই কুটিল।

অরবিন্দর বাসায় পৌঁছে শচীন দেখতে পেলো ক্লিষ্ট অরবিন্দ শয্যায় শয়ান, কলেজের কয়েকজন ছাত্র সেবায় নিযুক্ত, একজন তার মাথায় বরফের থলি চেপে ধরে আছে।

ডাক্তার বের হয়ে যাচ্ছিল, শচীনকে সমাগত আত্মীয় মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি এসেছেন ভালো হ'ল, ছেলেরা যথেষ্ট করছে, একজন প্রবীণ ব্যক্তি থাকা ভালো।

কেমন আছে ?

বিপদ কেটে গিয়েছে, তবু দু চার দিন এখন সাবধানে থাকা ভালো, আজ বেশি কথা বলবেন না ওঁর সঙ্গে, কাছে গিয়ে বসতে বাধা নেই। আমি কাল সকালে আবার আসবো—আচ্ছা।

ডাক্তার চলে গেলে একটি ছাত্র শচীনের আগমন বার্তা বলতে যাচ্ছিল রুগীকে, শচীন ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে নিষেধ করলো।

বলো কি, এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে ! আগে জানাও নি কেন

শচীনদা, ভেবেছিলুম একেবারেই জানাবো না, কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত না বাঁচতেও পারি, তখন মনে পড়লো আপনার কথা, টেলিগ্রাম করতে বলে দিলাম।

খুব ভালো করেছিলে ভাই, তবে আমার অনুযোগ এই গোড়াতেই জানানো উচিত ছিল।

শচীন ও অরবিন্দর মধ্যে কথা হচ্ছিল, বিছানার উপরে তিন-চারটে বালিশ ঠেস দিয়ে অরবিন্দ উপবিষ্ট, পাশে বসে ছিল শচীন। ডাক্তারে বলেছে মাথার আঘাতে আর ভয় নেই, এখন উঠে বসে কথা বলতে পারে, ঘরের মধ্যে দু'চার পা হাঁটতেও পারে, তবে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো।

তোমার অবস্থা এমন সঙ্কটজনক জানলে শুভ্রাকে সঙ্গে আনতাম, তোমার নার্সিং দরকার, সেবা শুশ্রূষা করতে ওর জুড়ি নেই। জানালে না কেন ?

আমি চাইনি যে শুভ্রা আসে। আর সেবা-শুশ্রূষা, তা কলেজের ছেলেরা ভালই করছে।

তা করছে বটে তবে শুভ্রা **trained nurse,** তার সঙ্গে ছেলেদের তুলনা হয় না। তাকে না জানাবার কারণ বুঝতে পারলাম না।

যেটুকু বলেছি তাতে বুঝতে পারবেন না। আমি চাইনি যে আমাকে সঙ্কট থেকে বাঁচাতে গিয়ে ও সঙ্কটে পড়ে।

ভাই অরবিন্দ, তোমার কথা ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে. খুলে বলো।

খুলে বলবো বলেই আপনাকেই আনিয়েছি, রবিন সেনকে মনে আছে ?

হাঁ হাঁ খুব মনে আছে, তোমার বাসায় অনেকদিন দেখেছি। এক সময়ে বিপ্লবী দলে ছিল না ?

ছিল তবে সে এখন দলছুট।

কেন ?

বিপ্লবী দলে ফিরে গিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলো না, অধিনায়কের কাছে বিদায় চাইলো। তারা আপত্তি করলো না, বিপ্লবী দলে থাকবার সময় ওর রেকর্ড ভালো ছিল না, আর তার পর যে কয়দিন শপথমুক্ত ছিল ওর আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হয়ে উঠেছিল, কর্তারা সমস্ত জানতেন।

আচরণ বলতে কি বোঝায় ?

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আচরণ। ঐ রিপুটি দমন করতে পারেনি সে।

তোমাদের দলে ঐ রিপুদমন শিক্ষা তো প্রধান বিষয়।

হ্যাঁ, সে ব্যর্থ হয়েছিল, দলে থাকবার সময়েও ঐ রিপুর শিকার হয়েছে, আর দল ছেড়ে আসবার পরে বশ্যতা স্বীকার করেছিল ঐ রিপুর কাছে।

তারপরে স্বগত ভাবে বলল, এত যোগ, এত প্রাণায়াম জপতপ ব্রহ্মচর্য তবু কেন এমন হয় জানি না। অনেক উদাহরণ জানি, ঐ রিপুদমন করতে গিয়ে ব্যর্থতার ফলে মানুষ নারী-মাংসের তৈমুরলঙ হয়ে উঠেছে।

কেন হয় আমিই কি জানি। তবে মনে হয় কি জানো, বন্দুকের গুলিতে বাঘ নিহত হ'ল তো উত্তম, আহত হলে শিকারীর আর রক্ষা নাই। শুধু আদিম রিপু সম্বন্ধে নয়, বাকি পাঁচটা রিপুর সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য অরবিন্দ, অধিকাংশ সাধক ঐ আদিম রিপুর আঘাতে ঘায়েল হয়ে মারা পড়ে। এসব তত্ত্ব কথা যাক গে, রবিন সম্বন্ধে তার প্রযোজ্যতা কোথায় ?

সে যে দল ছেড়ে এসে নারীভুক হয়ে উঠেছিল জানতাম, অবশেষে তার দৃষ্টি পড়লো শুভ্রার উপরে।

বলো কি !

হাঁ শুনুন। আমার বাসাতে তাকে অনেক উপলক্ষ্যে দেখেছে, দেখে তাকে আর দশটা মেয়ের মতো মনে করেছে। ও যে আলাদা স্বভাবের যখন বুঝলো তখন রবিনের রোখ আরও বেড়ে উঠলো শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে শুভ্রার হোস্টেলে বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমাকে এসে সমস্ত বিবরণ দিল, কি আর বলি, বলতাম সাবধান হয়ে থেকো, পারত পক্ষে হোস্টেলের বাইরে এসো না।

অরবিন্দ তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকো তবে এখন না হয় থাক, পরে আবার বলো।

না এখনই বলি, তবে সংক্ষেপে সারবো।

এই বলে চিড়িয়াখানার ঘটনা, তপতীর প্রতি শুভ্রার নিষেধ বাক্য, রাত্রে শুভ্রার ঘরে রবিনের প্রবেশ ও শাসন সমস্ত বললো। তখন ওকে বাঁচাবার আর কোন উপায় না দেখে শরীর খারাপের অজুহাতে আপনার সঙ্গে দিনাজশাহীতে পাঠিয়ে দিলাম।

বেশ করেছিলে, কিন্তু হঠাৎ মাথায় এমন গুরুতর আঘাত পেলে কি করে।

শিকার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে বুঝতে পেরে রাগটা এসে পড়লো আমার উপরে।

তার মানে এ রবিনের কাজ ?

স্বকৃত নয়, গুণ্ডা লাগিয়েছিল, ভাগ্যে সেটা ঘটেছিল আমার বাসার কাছে, পাড়ার লোকেরা চিনতে পেরে বাড়ীতে নিয়ে আসে, খবর পেয়ে কলেজ থেকে আসে ছাত্র ও সহকর্মীরা, তার পরে ডাক্তার, তারপরে আপনি, তারপরে দুজনে এই কথাবার্তা।

শচীন বললো, এখনকার মতো যথেষ্ট হয়েছে। এখন থাকুক, পরে আবার শুনবো, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে তখন বলবো।

বস্তুতঃ তখন আর এসব গোপন বিষয় আলোচনার উপায় ছিল না, কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কয়েকজন এসে উপস্থিত হল।

শচীন বললো, আজকার খবর কি বলুন।

ইতিহাসের অধ্যাপক তারকবাবু বললেন, খবরের কাগজেই তো দেখেছেন।

তার বাইরে যদি কিছু থাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তারকবাবু বললেন, আছে বইকি, বেতারে জিন্নাসাহেবের পরিকল্পনার দাবী প্রচারিত হয়েছে।

কি তাঁর দাবী ?

তা মন্দ নয়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ আর এদিকে বাংলাদেশ ও আসাম।

অরবিন্দ বলল, তা মাঝখানে আর এই সামান্য অংশটুকুই বা থাকে কেন ?

সেটুকুও বাকি থাকবে না, ক্রমে ক্রমে গ্রাস করবেন। আরও বলেছেন তাঁর দাবী স্বীকার না করলে তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে যোগ দেবেন না।

বাস্ রে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—বললেন বাংলার অধ্যাপক শ্যামাপদবাবু।

ওহে শ্যামাপদ, কেবল ইডিয়ম কপচালে কাজ হবে না, ওরা নেবেই। এখনই পাড়ার মুসলমান ছোকরার দল হাঁকতে শুরু করেছে—কানমে বিড়ি, মুহমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!

ওরা যে কত বড় লড়িয়ে তা তো সবাই দেখলো, তিন-তিনটা আন্দোলন গেল ওরা হাত গুটিয়ে বসে থাকলো।

তবে হাত গুটিয়ে বসে থেকেই যদি সিংহভাগ আদায় করা যায় তবে আর লড়াই কেন!

আর পেলেও রাখতে পারবে না, এক সময় তামাম দেশটাই তো ওদের ছিল তবে গেল কেন ?

ওসব পুরানো ইতিহাসের কথা ছেড়ে দাও, এখন কাল বদলেছে।

এদিকে গান্ধী বলেছেন যে দেশভাগের কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

আরে তিনি তো কালে কালে কত কথাই বললেন। এখনো ইংরেজে ইনকামট্যাক্স আদায় করছে।

তুমি কি ভাবছ দেশ স্বাধীন হ'লে কোন ট্যাক্স দিতে হবে না।

তখন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি বাংলা প্রভৃতি অধ্যাপকদের মধ্যে তুমুল বাক্‌-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

অগত্যা শচীন হাঁক দিয়ে বল্‌ল, বাবা কালু, শীগ্‌গির কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে এসো, নইলে বাবুদের মুখ বন্ধ করবার উপায় তো দেখি না।

সকলে হেসে উঠ্‌ল।

তারকবাবু বললেন, হাসির কথা নয়, দেখো ওরা পাকিস্থান আদায় না করে ছাড়বে না।

রাত্রে আহারান্তে পাশাপাশি শয়ন করলো শচীন ও অরবিন্দ।

শচীন বললো, অরবিন্দ, আজ সারাদিন শুভ্রার কথা ভেবেছি। ওর কি কলকাতায় থাকা একান্তই অসম্ভব?

যতদিন রবিন আছে একেবারেই অসম্ভব।

তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও না কেন?

সেখানে দেশ আছে আর কিছু নেই, একটা পোড়ো বাড়া থাকলেও থাকতে পারে। অসহায় একটি মেয়ের পক্ষে একাকী সেখানে থাকা চলে না।

বাপ মা ভাই বোন কেউ নেই না কি।

না কেউ নেই।

এ যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

কেন আপনি কি কিছু জানতেন না?

না, কেউ কিছু বলেনি।

তবে সংক্ষেপে শুনুন। ওর বাবা স্বদেশী আমলের লোক। স্বদেশী জিনিস প্রচারের ইচ্ছায় একাধিকবার দোকান খুলে নিঃস্ব হলেন। তারপরে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে জেলে পুরে দেয়, সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তারপর?

শুভ্রার বড় ভাই সেই রাগে ঢোকে বিপ্লবী দলে। স্বামীর মৃত্যু আর জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহত্যাগের আঘাত সইতে না পেরে মা মারা যান। তখন শুভ্রার মাসি

শুভ্রাকে আর তার ছোট ভাইকে কল্‌কাতায় নিজের কাছে এনে রাখেন। শুভ্রাকে নার্সিং ট্রেনিং কলেজে ভর্তি করে দেন, ছোট ভাইকে দেন স্কুলে ভর্তি করে। শুনছেন দাদা ?

হাঁ, বলে যাও।

শুভ্রা নার্সিং পাশ করে হাসপাতালে কাজ পায়, সেটাও অনেকটা তার মাসির হস্তক্ষেপের ফলে।

আর ছোট ভাইটি ?

সে তখন কলেজে ঢুকেছে। এমন সময় লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়ে যায়—সত্যাগ্রহী দলের সঙ্গে কাঁথিতে গিয়ে পুলিশের লাঠির ঘায়ে ছোট ভাইটি মারা যায়, চিকিৎসার সুযোগ পায় নি।

শচীন বল্‌ল, অনেকটা অবিনাশবাবুর মতো।

তিনি তবু তো চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার বুঝতে পারছেন শুভ্রা কেন এত আন্তরিকভাবে তাঁর সেবা করেছিল, অনেকবার আমাকে বলেছে, দাদা যে-সেবা আমি ভাইকে করতে পারিনি সেই সেবা করছি অবিনাশবাবুর মধ্যে।

তাই বলো, পয়সার বদলে এমন সেবা কখনো করতে দেখিনি !

ও একটি পয়সাও নেয়নি, না অবিনাশবাবুর সেবায়, না আমার মায়ের সেবায়।

শচীন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আশ্চর্য মেয়ে এই শুভ্রা। কিন্তু তার বিপ্লবী বড ভাই তার ভার নিক এখন।

সে অনেক কাল হ'ল মারা গিয়েছে।

কিসে ?

দলের নির্দেশ ভঙ্গ করবার অপরাধে পিস্তলের গুলিতে।

এমন যে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে জানতো শচীন তাই মোটেই বিস্মিত হ'ল না। শুধালো আর মাসি ?

তাঁর বয়স হয়েছিল, তিনি গত হয়েছেন।

তাইতো, এ যে দেখছি চারদিক ফরসা।

সত্যি তাই।

এখন ঐ নিঃসঙ্গ নিঃসহায় মেয়েটির কি হবে।

আমি তো ভেবে পাই না দাদা।

শচীন বল্‌ল, আমি ভেবেছি এবং পেয়েছি।

আগ্রহের সঙ্গে অরবিন্দ শুধালো, কি ?

তোমার উচিত ওকে বিয়ে করা।

সত্য কথা বলতে কি দাদা, আমি যে এমন কখনো ভাবিনি তা নয়। তবে তা হওয়ার নয়।

কেন? ওর অমত আছে?

না, দাদা। একথা কখনো আমি উচ্চারণ করিনি ওর কাছে।

তবে?

যে অপরাধে মলিনা আমার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেছিলেন এখানেও সেই বাধা।

তার মানে?

দলের নির্দেশে তার দাদাকে হত্যা করতে হয়েছিল আমাকে।

উৎকট আগ্রহে শচীন জিজ্ঞাসা করলো, কি তার নাম?

রমণী চৌধুরী।

রমণী চৌধুরী! আবৃত্তি করলো শচীন।

আপনি কি তাকে জানতেন দাদা?

জানতাম। জানতাম বই কি। সে আমার রিপন কলেজের ছাত্র ছিল, মৃণালের সহপাঠী ছিল। আমাদের কলকাতার বাসাতে তার খুব যাতায়াত ছিল।

কিছুক্ষণ দু'জনে নিস্তব্ধ হয়ে থাকলো, তারপরে শচীন বলে উঠ্‌ল, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট এক আঘাতে দু দিকের পথ বন্ধ করে দিল। তুমি কি শুভ্রার কাছে প্রকাশ করেছ রমণীকে হত্যার রহস্য?

না।

তবে নাই বল্‌লে ভাই।

তাই যদি সম্ভব হবে তবে মলিনার কাছেই বা প্রকাশ করতে গেলাম কেন! না, দাদা তা হয় না। অদৃষ্ট যখন ফাঁস নিক্ষেপ করে এমনি করেই বেড়াজালে নিক্ষেপ করে।

তারপরে দু জনের মধ্যে আর কোন কথা হয় না, দু জনে দু দিকে পাশ ফিরে শুলো।

বন্ধনহীন প্রেমানুভূতি খাঁচার দরজা খোলা পাওয়া বাঘের মতো দুর্বার। এই প্রথম অরবিন্দ অপরের কাছে স্বীকার করলো শুভ্রা সম্বন্ধে তার প্রকৃত মনোভাব, অপরের কাছে স্বীকার করতে গিয়েই নিজের কাছেও সত্য হয়ে উঠলো। ভাষাহীন ভাব অর্ধসত্য।

প্রথম দিনে শুভ্রাকে দেখবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে যে-সব চিন্তা করেছে, যে-সব ঘটনা ঘটেছে, যে-সব কথা বলেছে একে একে মনে পড়তে লাগলো। বুঝলো ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে শুভ্রা তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

শুভ্রাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারে না, শুভ্রাহীন জীবন উপচ্ছায়া মাত্র।

অরবিন্দ জানে প্রস্তাব করলেই শুভ্রা বিবাহে রাজি হবে, দয়ায় পড়ে নয় আন্তরিক টানে। কিন্তু ভ্রাতৃহন্তা হয়ে কেমন করে এ প্রস্তাব সে করে? সমস্ত ঘটনা লুকিয়ে? তাহলে তো মলিনাকেই বিবাহ করতে পারতো। তার কাছে যদি লুকিয়ে না থাকে তবে শুভ্রার কাছেই বা লুকোবে কেন? রমণীর সঙ্গে মলিনার কোন সম্বন্ধ ছিল না, দু জনের পরিচয় মাত্র কটি দিন। আব শুভ্রার সঙ্গে যে রক্তের যোগ। দু'জনের মিলনের অসম্ভবতার নীচে অদৃষ্ট একটি গভীর লাল দাগ টেনে দিয়েছে। রক্তচক্ষু পাকিয়ে সে নিষেধ করছে—না, না, এ রক্তের পরিখা ডিঙানো চলবে না। ঐ লোহিত সমুদ্র মাঝখানে রেখে দু পারে দুজন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে চিরতৃষিত মরুভূখণ্ডের মতো। না, এ কথা বলা চলবে না শুভ্রাকে, কাজেই বিবাহ অসম্ভব, খুব সম্ভব উল্টো ফল ফলবে। ভ্রাতৃহন্তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে শুভ্রা। তার চেয়ে যেমন চলছে চলুক, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে যায়।

অরবিন্দর চিন্তার সমান্তরালে আর একটি চিন্তার স্রোত চলছিল শচীনের মনে। স্বদেশীর বীজ যে পরিবারে গিয়ে পড়েছে অশত্থ বৃক্ষ গজিয়েছে সেখানে আর কালক্রমে-সুদৃঢ় অট্টালিকাকে শিকড়ের নিষ্পেষে শিথিলগ্রন্থি করে দিয়েছে। এ বীজ যেমন দুর্জয় তেমনি অক্ষয় আর তেমনি সর্বব্যাপক। কোথা থেকে এসে পড়ে এ বীজ, পাখীর মুখে, ঝড়ের হাওয়ায় কোথা থেকে! যেখান থেকেই আসুক, যেমন ভাবেই আসুক তার শক্তিমত্তা বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই, তার জুড়ি নেই পারিবারিক দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিতে। মনে পড়লো তার নিজেদের পরিবারের ইতিহাস, এখনি অবগত হ'ল শুভ্রাদের পরিবারের কাহিনী আর চোখের উপরে দেখছে রাধাদের জীবনের ঘটনা। এ সব তো নগণ্য দৃষ্টান্ত। অভাব নেই বহুগণ্য দৃষ্টান্তের—সব শুদ্ধ মিলিয়ে অগণ্য। জাতীয় পাপের মুক্তি জাতির রক্তক্ষালনে।

হাঁরে লব, তুই কখন এলি!

এই মাত্র আসছি স্টেশন থেকে।

আরে আরে লব যে!

হাঁ অরবিন্দদা, তুমি আছ কেমন?

বোস্ বোস্।

লবের কণ্ঠস্বর শুনে অরবিন্দ ও শচীনের ঘুম ভেঙে গিয়েছে, ভোর রাতের গাড়ীতে এসে পৌঁচেছে লব।

কুশ কোথায় রে?

তাকেই তো খুঁজতে বেরিয়েছি।

তার মানে?

অরবিন্দ ও শচীন উঠে বসলো।

তার মানে আজ তিন দিন হ'ল সে বেপাত্তা।

শচীন শুধালো, আবার কি বিয়ের কথা উঠেছিল নাকি?

না, সে সব কিছু নয়।

তবে?

শহরের মুসলমানরা পাকিস্থানের দাবী জানিয়ে একটা মিছিল বের করেছিল। একমাত্র হিন্দু কুশ তাতে যোগ দেওয়ায় পাড়ার ছেলেরা তার নাম দিয়েছিল কুশি মিঞা। খুব সম্ভব সেই অপমানেই সে পালিয়েছে।

আবার দু'দিন পরেই ফিরে আসবে।

তাই তো সবাই ভেবেছিল বাবা, কিন্তু তিনদিন গেল এলো না। শেষে তো খোকাদাদু অল্পে চিন্তিত হয়ে পড়েন, বললো, লব, তুই কলকাতায় যা। খুব সম্ভব সে গিয়েছে অরবিন্দর বাসায়।

তা বেশ করেছিস এসেছিস, বলল অরবিন্দ।

শোনই না, কলকাতায় আসবো শুনে শুভ্রাদি ধরলো আসবেই। তোমার অসুখের সংবাদ পেয়ে অবধি সে আসবার জন্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করেছিল। ওদিকে পিসিমা কিছুতেই তাকে আসতে দেবে না, বলে সে তো এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে খবর এসেছে, আর সে না লিখলে তুমি যাবেই বা কেমন করে। অনেক কষ্টে তার আসা বন্ধ করা হ'ল।

সে না হয় হ'ল, কিন্তু এখানে তো কুশ আসে নি!

তাহ'লে কি হবে বলো? ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে লব।

অরবিন্দ বলল, যা হয় হবে, এখন হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। আচ্ছা দাদা, তুমি তো বলেছিলে জেল থেকে ফিরে আসবার পরে ও যেন কম্যুনিস্ট দলভুক্ত হয়ে পড়েছে?

বোলচাল শুনে তাই তো মনে হয়েছিল।

আচ্ছা আমি কলেজে গিয়ে খোঁজ করবো, ওখানে কিছু কম্যুনিস্ট ছাত্র আছে, কমরেডের খবর তারা রাখলেও রাখতে পারে।

দিন তিনেক নানাসূত্রে বিভিন্ন স্থানে কুশের সন্ধান করা হ'ল—না, কোথাও সে নেই। না, কেউ তাকে চেনে না। তখন শচীন বল্‌ল, এখানে বসে থেকে আর ফল নেই, বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক—অরবিন্দ তুমিও চলো।

সে দু'একবার শুধু আপত্তি করলো, তবে শেষ পর্যন্ত সম্মত হ'ল।

লব বল্‌ল, বাবা, কুশকে যে পাওয়া গেল না।

যাবে কোথায়, ঠিক ঘুরে আসবে।

শচীনরা তিনজনে ভোরবেলা গাড়ী থেকে বাড়ীর দরজায় নামবার সময়ে দেখতে পেলো, নির্বিকার চিত্তে সেখানে দাঁড়িয়ে কুশ যথাবিহিতভাবে দন্ত-ধাবন করছে, বল্‌ল, তোমাদের ফিরতে বিলম্ব দেখে ভাবছিলাম আমি আবার তোমাদের সন্ধানে বের হব নাকি।

সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিলি, গিয়েছিলি কোথায়!

মাঝে মাঝে ডুব দিতে অভ্যাস করছি।

তাতে ক্ষতি নেই, শেষ পর্যন্ত ভেসে উঠলেই হ'ল।

তখন লব আর কুশ ধরাধরি করে জিনিসপত্রগুলো ভিতরে নিয়ে চলল।

বাবা কোথায় রে?

দাদু বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আর সকলে ভালো তো?

হাঁ, সবাই ভালো আছে।

উপরের জানলায় তিন জোড়া চোখ।

৫৯

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বিজিত দুই পক্ষই দেখল তাদের অবস্থা সমান, সর্বব্যাপী ধ্বংস ও অবসাদ। এ যুদ্ধ নাকি মতবাদ নিয়ে, দেখা গেল মতবাদ ছাড়া আর সমস্তই বিধ্বস্ত। বৃটেনে সরকার বদল হ'ল। রক্ষণশীল দলের বদলে শ্রমিক দল, চার্চিলের বদলে মিঃ এটলী। শ্রমিক দল ঘোষণা করলো ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে কুইট ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত পরিত্যাগ করে ইংরেজ চলে আসবে।

এ দেশেও ১৯৪৪ সালের পর থেকে চলছে অবসাদ। শ্রমিক দলের ঘোষণার পরে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্য পর্যন্ত বৎসর কালকে বলা চলে কমিটি-কনফারেন্সের সময়। ভারতের বড়-

লাট এখন লর্ড ওয়াভেল, দক্ষ সেনাপতি তবে অদক্ষ রাজনীতিক, গোলাকার গর্তে চতুষ্কোণ কীলক। আরম্ভ হ'ল কমিটি ও কনফারেন্স। দিল্লী, সিমলা কখনো বা ওয়ার্ধা, আর প্রধান ভূমিকায় একপক্ষে গান্ধী, আজাদ, নেহরু, প্যাটেল, অন্যপক্ষে জিন্না, লিয়াকৎ আলি, মধ্যস্থ ওয়াভেল, পক্ষগণ কেউ কারো বক্তব্য বোঝে না, মধ্যস্থ বোঝে না কোন পক্ষের বক্তব্য।

জিন্নার দাবী পাকিস্তান, কংগ্রেসের দাবী অখণ্ড ভারত; জিন্না বলেন হিন্দু মুসলমান ভিন্ন জাতি, কংগ্রেস বলে তারা অভিন্ন, দুর্মোচ্য সমস্যা। রাজাজি আপোষমূলক পরিকল্পনা দিল, কোন পক্ষের পছন্দ হ'ল না। কিন্তু দুর্মোচ্য সমস্যাকে দুর্মোচ্যতর করে তুলল দেশের সামন্ত রাজন্যগণ আর শিখ সম্প্রদায়, একদল চায় সামন্তস্থান, আর একদল খালিস্থান। ওদিকে বি... পাইনস ক্লাবের বড় সাহেবরা বগল বাজায়, হুইস্কি টানে আর বলাবলি করে, নে বেটারা এবার স্বাধীনতা। দেশের লোকেরা একবার এদিকে চায় আর একবার ওদিকে চায়—এবার ভাবে নেতাজী এসে পড়লে বাঁচা যায়। ওয়াভেল বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না দেখে শ্রমিক সরকার 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে 'উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন' তিনজন সদস্যের একটি কমিটিকে এদেশে প্রেরণ করলো, তখন ১৯৪৬ সালের প্রথম।

আবার দ্বিগুণিত তেজে আরম্ভ হল কমিটি আর কনফারেন্স। অনেক দর কষাকষি ও জলঘোলা করবার পরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মেনে নিল তাদের পরিকল্পনাটি; তারা বিজয়ীর হাসি হেসে দেশে ফিরে চলল। এই পরিকল্পনার মূল সূত্র অখণ্ড ভারতের মধ্যে পাকিস্তান। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ দেশে পৌছতে না পৌছতেই পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে গোল বেধে উঠল। জিন্না ভাবলেন আর পরিকল্পনার ফাঁদে পা দেওয়া নয়—তিনি দাবী করলেন ভারতবহির্ভূত নির্ভেজাল পাকিস্তান—পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলাদেশ ও আসাম। মুসলমান যে ভিন্ন জাতি, হিন্দুর সঙ্গে কিছুতেই তার বাস করা সম্ভব নয়, পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের দিল্ আর কলিজা। এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬ই আগস্ট তারিখটা মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বলে ঘোষিত হ'ল। এদিকে দিল্লীতে মধ্যবর্তী সরকার (অর্থাৎ পরাধীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যবর্তী) স্থাপনের উদ্যোগ চলছে; আর ওদিকে বাংলাদেশে গত দশ বছর ধরে চলেছে মুসলীম লীগের শাসন, বর্তমানে তার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব।

আমরা ইতিহাস বা রাজনীতি লিখতে বসিনি, তবু যে অতি সংক্ষেপে এই

কথাগুলি বললাম, তার কারণ আমাদের কাহিনীর পক্ষে এ সব বড় প্রয়োজনের। যুগধর্মে আদার ব্যবসায়ীকেও জাহাজের খবর রাখতে হয়। আরও এককথা, ১৯৪৫, ১৯৪৬ আর ১৯৪৭ সালের ঘটনাজাল যেমন ব্যাপক, তেমনি সূক্ষ্ম, আর যেমন জটিল তেমনি কুটিল, যেমন প্রকাশ্য তেমনি গোপন, কখনো তার সুষ্ঠু, সম্যক ও সন্তোষজনক বিশ্লেষণ হবে কিনা সন্দেহ, তবে আমাদের কাহিনীর পক্ষে তার প্রয়োজন আছে মনে হয় না। আমাদের প্রয়োজন ১৬ই আগস্ট তারিখের আগামী কাল ১৬ই আগস্ট। মুসলিম লীগ সরকার ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করলো।

চিন্তা পীড়িতের মাথায় অনাবশ্যক বোঝা। এই বোঝার ভার আর চিন্তায় অরবিন্দর সারারাত ঘুম এলো না। অনেকদিন সে ভেবেছে এই বোঝাটা শুভ্রার কাছে নামাবে, স্বীকার করবে দলের নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে সে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল শুভ্রার সে ভাই। তখন কিছুই জানতো না, না জানতো শুভ্রাকে না জানতো রমণী চৌধুরীর পরিচয়, কেবল জানতো দলের নির্দেশে তাকে হত্যা করতে সে বাধ্য। আজ এতকাল পরে সেই হত্যা যে এমন দুরপনেয় বাধা হয়ে উপস্থিত হবে তাদের মধ্যে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা ছাড়া এ আর কিছু নয়।

প্রথম যেদিন শুভ্রার মুখে তাদের সংসারের সব খবর জানলো, তখনই চমকে উঠেছিল, বুঝেছিল দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তারপরে কতদিন শুভ্রার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সুখ-দুঃখের কথা হয়েছে, শুভ্রা বারে বারে বলেছে অরবিন্দ ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই তার, সর্বদা মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ছায়া। সেই ছায়ার আড়ালে শুভ্রা আবছায়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়েছে। বেচারা যত কাছে আসতে চেষ্টা করেছে বাধা দিয়েছে সেই ছায়া। ভেবেছে সব কথা খুলে বলা উচিত কি না, সাহস পায়নি। অরবিন্দ মুখে স্বীকার না করলেও মনে জানতো তারও একমাত্র আশ্রয় শুভ্রা, একমাত্র আপন জন। ঐ ছায়ার প্ররোচনাতেই মলিনার কাছে যাওয়ার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন বুঝলে শুভ্রার কাছে যাওয়ার পথটাও বন্ধ।

পথ বন্ধ হ'লেই যে মনের গতি বন্ধ হয় এমন নয়। বাধা আছে বলেই আগ্রহ আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। পাথরের বাধা পেয়েই উচ্ছলতর হয়ে ওঠে জলের স্রোত। শুভ্রাকে অনেক দিন থেকে সে ভালোবেসেছে—তখন সে প্রেম ছিল অন্তঃশীলা। শচীনের কাছে সব কথা স্বীকার করবার পরে, শচীনের মুখে শুভ্রাকে বিবাহ করবার প্ররোচনা লাভের পরে ফল্গু নদীতে বান ডাকলো। শচীন পরামর্শ

দিয়েছিল একথা স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই, এতকাল যদি গোপন থাকে এখনো না হয় গোপন থাকলো, বুঝিয়ে দিল মনে করো না কেন ও তোমার আর এক জন্মের কথা, যে জন্মের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছ।

অরবিন্দ বলেছিল, গান্ধীজির নির্দেশ।

শচীন উত্তর দিয়েছিল, নির্দেশ নয় পরামর্শ।

ও দু-ই এক, কেবল শব্দের মাত্র ভেদ।

মহাপুরুষদের সব পরামর্শ কি আমরা মেনে চলি। তাহলে তো পৃথিবী স্বর্গ হ'তো।

আর না মেনে চলবার ফলেই পৃথিবী আজ নরক।

অরবিন্দ ভাই, পৃথিবী পৃথিবীই, স্বর্গও নয়, নরকও নয়। দেখো সংসারে শুভ্রা নিরাশ্রয়, তোমারও আশ্রয় নেই। এমন স্থলে তোমাদের মিলনে দুজনেরই কল্যাণ।

সে কি করে হবে দাদা, মাঝখানে রক্তের স্রোত।

অরবিন্দ, এই রকম স্রোতকেই শাস্ত্রে বৈতরণী বলেছে।

তাহলে মলিনা কি দোষ করলো।

দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তার পক্ষে, তুমি তো তাকে প্রত্যাখ্যান করনি, করেছে সে।

শুভ্রাও তো করতে পারে।

যদি জানতে পারে, সেইজন্যই বলছি তাকে জানিয়ো না।

যে কথা শচীনকে বলতে পারেনি মনের মধ্যে অনুভব করেছে, ভ্রাতৃহন্তা হয়ে কি করে ভগ্নীকে বুকের মধ্যে টেনে নেবে।

অনিদ্র সারা রাত্রি চিন্তার স্রোতে যুক্তির জাল ফেলে চললো, মীমাংসা হল কই! জালের ফাঁক দিয়ে নদীর প্রবাহ আপন মনে বয়ে চলল। কেবল ঐ চিন্তার প্রবাহে একটিমাত্র ধ্রুববিন্দু স্রোতের উপরে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো—শুভ্রাকে ভালোবাসে। যে ভালোবাসার কাছে মলিনাও মলিন। মলিনার সংসারে আর পাঁচ জন আছে, শুভ্রা নিঃসঙ্গ, সে-ও তাই। দু'জনের নিবিড় নিঃসঙ্গতা একান্ত মধুর। কিন্তু তখনি মনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সংশয়ের উপলখণ্ড নিক্ষিপ্ত হ'ল--শুভ্রা কি তাকে ভালোবাসে? তার মন বলল হাঁ, তখনি আবার মনে হ'ল তার মন তো তার দিকে সাক্ষ্য দেবেই, তাকে বিশ্বাস কি।

কখনো তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয়নি। আর জিজ্ঞাসা করলেই বা কি। কখনো কি কোন মেয়ে এ প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দিয়েছে। এরকম অবস্থায়

শব্দের প্রচলিত অর্থ অর্থহীন। হাঁ মানে না, না মানে হাঁ। ঐটুকু বিশ্ব-অবিধান-সঙ্কলনকর্তার রঙ্গ।

শচীন একটা কাজ করে দিয়েছে। তাদেব মাঝখানকার পর্দাখানা টেনে খুলে দিয়ে গিয়েছে, দুজনের বিবাহ যে এমন কিছু অসম্ভব নয় সেই প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছে অরবিন্দের মনে। তার প্রেম আজ দুর্জয় দুর্বার, জগৎ তার কাছে আজ শুভ্রাময়। তার বয়স পঞ্চাশের কাছে, শুভ্রার ত্রিশের দু'চাব বছর উপবে। সংসারে এটা ঠিক একান্ত প্রেমের বয়স নয়। তবু কেন এমন অনুভূতি অরবিন্দের। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, যৌবনের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে গোধূলির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায় চরাচর, তখন সম্ভব অসম্ভবের সীমা যায় বিলীন হয়ে, পানপাত্রের শেষ বিন্দু সুধা গলাধঃকরণ করবার জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় মবীযা ওঠে, মরীয়া হয়ে ওঠে সমস্ত দেহমন একটি তরুণীর দেহকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে গতপ্রায় তারুণ্যকে শেষবারের মতো অনুভব করতে। অরবিন্দর আজ সেই বয়স, সেই অবস্থা। শুভ্রাকে তার চাই-ই চাই। তখনও তার মনে এটুকু সম্বিৎ ছিল যে ফাঁকির বিনিময়ে শুভ্রাকে গ্রহণ করে চলবে না। বলবে সব খুলে তাকে। হাঁ বলবেই। তারপরে হয় সমস্ত তার করায়ত্ত নয় সমস্ত নিঃশেষ। হাঁ, কালকেই তাকে সমস্ত কথা খুলে বলবে আর বিলম্ব নয়, তাবপরে যা হওয়ার হবে। মরীয়া হয়ে উঠে জুয়াড়ী যেভাবে চরম দান নিক্ষেপ করে সেইভাবে নিক্ষেপ করবে হাতের পাশা। মনের মধ্যে গীতার একটি শ্লোকাংশ ঝলক মেরে উঠে সমর্থন জানালো—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।'

অনেক কাল পরে বীর্যের সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই নিদ্রিত হয়ে পড়লো সে। সিদ্ধান্ত নিদ্রার সুখশয্যা।

বাবু বাবু ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল--কিবে কালু চা নাকি? এত বেলা হ'ল কেন?

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে কালু বলল, চা খেয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখুন কি কাণ্ড হচ্ছে, তবে বড় রাস্তায় যাবেন না, গলির মোড়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন।

কি আবার হ'ল, বলে কোন রকমে চা পান করে বেরিয়ে পড়লো অরবিন্দ।

গলির মোড়ে এসে হ্যারিসন রোডে পড়তে যাবে এমন সময়ে পিছন দিক থেকে টেনে বাধা দিল—বলি যাচ্ছেন কোথায়?

অরবিন্দ বলল--দেখছেন না লোকটা মরবে।

আপনি গেলে একজনের স্থানে দু'জনে মরবে।

তাই বলে কি একটা গুণ্ডার ভয়ে—

গুণ্ডা একটা হলে ভয় ছিল না, সমস্ত শহর আজ গুণ্ডার দখলে আর সকলের উপরে শাহীগুণ্ডা।

কি বলছেন বুঝতে পারছি না, বলে অরবিন্দ ঘুরে দাঁড়ালো, বক্তার মুখোমুখী হ'লে দেখলো একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি, তার চেয়েও বয়স বেশি, বেশ মোটা-সোটা ফরসা, মস্ত এক জোড়া গোঁফ, মুখে পান।

আবার শুধালো, কি হচ্ছে বলুন তো ?

কি হচ্ছে দেখতে চান তো যান একবার গোলদীঘির দিকে। একটা হিন্দুর দোকান আস্ত নেই, মালপত্তর লুট করে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ নেই ?

অবশ্যই আছে।

তবে ?

তবে আবার কি, তারা দেখছে কেউ যাতে বাধা না দেয়।

সন্দেহের সুরে অরবিন্দ বলল, এ আপনার শোনা কথা।

কতক শোনা, তবে চোখেও কিছু দেখেছি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনিও দেখতে পাবেন। ঐ দেখুন, ঐ দেখুন।

একটা রিকসাওয়ালার উপরে এসে পড়লো দুটো গুণ্ডা একজনে লোহার শাবল দিয়ে মারলো তার মাথায় বাড়ি; সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্ত বের হল, আঘাত এমন প্রচণ্ড যে মাথা ফাটাবার শব্দটা অবধি অরবিন্দর কানে এসে পৌছলো। অন্য-জন খানিকটা পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দিল রিক্সাখানা আর দুই জন সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

নাঃ এ অসহ্য।

ভদ্রলোকটি বলল, এখনি কি হয়েছে এ তো সব কলির সন্ধ্যা। ঐ আবার দেখুন।

একটা বুড়িকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে এলো দুজন লোক। তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে এক নিতান্ত বালকের হাতে একখানা ছোরা দিয়ে বলল, বা'জান হিন্দু মাগিটার গলা কেটে গাজী হ এমন সুযোগ আর পাবিনে।

ছেলেটি ইতস্তত করছে দেখে লোকটা ছোরাখানা নিয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে লাগলো—এই রকম করে, নে, যা গাজী হয়ে যা।

ঐ যে ছবিঘরের সম্মুখে পুলিশটা দাঁড়িয়ে আছে, বাধা দেয় না কেন!

আরে পারলে ও-ও গাজী হয়।

শহরে কি আইনের রাজত্ব লোপ পেয়েছে ?

ভদ্রলোকটি সংক্ষেপে বল্‌ল, একদম।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মশায়।

কাছেই আমার বাড়ী, বসবেন চলুন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তারা ফিরে রওনা হ'তে যাচ্ছে এমন সময়ে একখানা ১১ নম্বর বাস এসে পড়লো, একদল গুণ্ডা অমনি বাসখানার উপরে এসে পড়তেই ড্রাইভার কণ্ডাকটার নেমে পালালো, আর গুণ্ডারা পেট্রল ট্যাঙ্কে দিল আগুন ধরিয়ে, সশব্দে জ্বলে উঠ্‌ল বাসখানা আর বিজয়ীর দল শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে পরণের লুঙ্গি তুলে উৎকট আনন্দে নাচতে নাচতে আওয়াজ তুললো, পাকিস্থান জিন্দাবাদ।

আসুন, আর এখানে নিরাপদ নয়—বলে অরবিন্দকে এক রকম টেনে নিয়ে দুজনে বাড়িতে এসে প্রবেশ করলো।

দাঁড়ান, আগে দরজাটা বন্ধ করে দি।

যে রকম দেখলাম দরজা ভেঙে ঢুকতে কতক্ষণ।

বেশিক্ষণ নয়, তবে আজকে সে প্রোগ্রাম ওদের নয়, এটা কাল পরশুর জন্যে রাখা আছে। আজকের প্রোগ্রাম রাহাজানি, লুটপাট, আর অসহায় হিন্দুদের গলা কেটে গাজী হওয়া।

এত কথা জানলেন কি করে ?

সব বলছি মশায সব বলছি। চা চলে ? বেশ।

আমার মাস্‌তুতো ভাই পুলিশের ইন্সপেকটার, কালকে সন্ধ্যায় এসে সব কথা জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছে।

কি বিষয়ে সাবধান ?

এক নম্বর—এখনি রাতারাতি মেয়েদের কল্‌কাতার বাইরে পাঠিয়ে দিন, দুই নম্বর—বাড়ীর বাইরে যাবেন না, আর তিন নম্বর—চার-পাঁচ দিনের মতো বাজার করে রাখুন।

তারপরে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলো, মশায়ের বাড়ীতে মেয়েরা কেউ আছেন ? নেই, তবে তো আপনি নিশ্চিন্তি। আমি মশায় কালকে তখনই সাড়ে আটটার ট্রেনে স্ত্রী আর মেয়ে দুটিকে পাঠিয়ে দিলাম নৈহাটিতে আমার শালার বাড়ীতে।

তবে তো দেখছি শহরে হিন্দু পুলিশ ইন্সপেকটার আছে, আবার নিশ্চয় তার উপরের থাকেও অনেকে আছেন—তাঁরা কি করছেন ?

এত ছটফট করবেন না। সব শুনতে পাবেন, ধরুন আগে পুলিশের কথাই

হোক, কল্‌কাতা শহরে এখন মুসলমান পুলিশ শতকরা আশি জন, বাকি হিন্দু, হিন্দু পুলিশ আজ বারাকে বন্ধ, বের হওয়ার হুকুম নেই তাদের।

আর ইন্সপেকটারের দল ?

তাদের আজ ছুটি, তবে সেই সঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কোয়ার্টার থেকে বের না হওয়াই ভালো। যাই হোক, তারা রাতের বেলায় ঘুরে ঘুরে আত্মীয় স্বজন পরিচিত ব্যক্তিদের সাবধান করে দিয়েছে।

তার মানে তারা সবাই plan-টা জানতো !

Plan-টা তো সবাই জানে—এ হচ্ছে জিন্না সাহেবের 'ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন ডে'—প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিন। তার উপরে আবার এখানে চীফ মিনিস্টার সুরা-বর্দি। তার ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই—হিন্দু মুসলমান ছোট বড় পুলিশ কর্ম-চারীদের সব কথা খুলে বলে দিয়েছে—আর সেই সঙ্গে বলে দিয়েছে, মনে থাকে যেন নোকরি আর বকরি।

বকরি আবার কি ?

অবাধ্যতা করলে বকরির মতো গলাটি কাটা যাবে—এর চেয়ে সহজ আর কি ?

বড সর্বনেশে লোক মশায়।

এই সর্বনেশে লোকেরাই হয় সর্বশক্তিমান। সেদিন স্টেটসম্যান কাগজে কি লিখেছিল জানেন, রক্তপাত আর অরাজকতা সব সময় নিন্দার নয়—যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। মুসলমানের পক্ষে পাকিস্থান কায়েমের চেয়ে আর সৎ কি ? কি পড়েন নি ?

না, কদিন কাগজ দেখবার সুযোগ পাইনি।

তবে আর একদিনের তার বক্তৃতার বিষয়টা শুনুন—কয়েকদিন আগে দিল্লীতে এক বক্তৃতায় বলেছিল, হিন্দু কংগ্রেস যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থাপন করতে উদ্যত হয় তবে তারা যেন মনে রাখে সুবেবাংলা থেকে এক পয়সা রাজস্ব আসবে না দিল্লীতে, আর সুবেবাংলাতে স্থাপিত হবে স্বাধীন স্বতন্ত্র সরকার।

এত কাণ্ড হয়ে গেল আর কিছুই জানতাম না !

সেই জন্যেই এক বেটা মুসলমান গুণ্ডাকে গাজী বানাবার উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হ্যারিসন রোডে।

অরবিন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল—কথা না বলতে ইঙ্গিতে জানালো ভদ্রলোকটি।

হ্যালো, হ্যালো কে ? ও মন্তা ! হাঁ আমি তোমার রমেশদা, তারপর কি খবর বলো ?

হাঁ শুনছি।

হাঁ হাঁ, কালকে সাড়ে আটটার ট্রেনে তাদের নিজে নিয়ে গিয়ে নৈহাটিতে আমার শালার বাড়ীতে রেখে এসেছি। সেখানে ভয় নেই তো?

আচ্ছা, ভাই তা হ'লেই হ'ল। এবার শহরের খবর বলো।

হ্যালো, বলো কি একেবারে হাজার দুই!

অ্যাঁ, বেশি ছাড়া কম নয়, কি সর্বনাশ, মরলো কারা?

চিরকাল যারা মরে আসছে।

সে তো, বুঝলাম, তবু মুখে বলো।

হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি, ভিক্ষুক, ফিরিঅলা রিকসাঅলা, ঝাঁকা মুটে—এই তো।

মারছে কি দিয়ে?

বলো কি, সকালবেলাতেই বন্দুকের দোকান সব লুট হয়ে গিয়েছে!

বুঝেছি, বুঝেছি। শোনো মন্তা, আমার পাশে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, এই পাড়াতেই থাকেন, তাঁকে তোমার কথাগুলো repeat করে শোনাই, নয় তো একসঙ্গে বলতে গিয়ে অনেক কথা ভুলে যাব।

না, না, সে ভয় নেই, নিতান্ত সজ্জন, আর যাকে তোমরা ইংরেজ্যানরা বলে থাকো আদর্শবাদী তাই।

কেমন করে জানলাম? সহজে? হ্যারিসন রোডে গুণ্ডারা একটা রিক্শা-ওয়ালাকে খুন করছিল উনি যাচ্ছিলেন তাকে বাঁচাতে অর্থাৎ মরতে, কোন রকমে হাত ধরে টেনে রেখে রক্ষা করি। শুনতে পাচ্ছ তো?

রাজি তো? বাঁচালে ভাই, বুড়ো হয়েছি সব কথা মনে থাকতে চায় না, শুনতে শুনতে ভুলে যাই। আচ্ছা এবারে বলো।

এবারে ভদ্রলোকটি অরবিন্দের দিকে চেয়ে বললেন, যা শুনলেন মনে রাখবেন —কিন্তু খবরদার ঐ পর্যন্ত, মুখ ব্যাদান করবেন না, জানাজানি হলে বেচারার চাকুরিটি যাবে।

হ্যালো, মন্তা এবারে বলো, ভদ্রলোককে সাবধান করে দিয়েছি।

হ্যালো, হ্যালো, হাঁ হাঁ শুনছি, বলে যাও, না, না ওসব দিকে যাবো না। একটু ধরো ভাই, ভদ্রলোককে শুনিয়ে দি।

শুনুন মশাই, মন্তা সতর্ক করে দিল যেন কলুটোলা, কলাবাগান, রাজাবাজার ওয়েলেসলি, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে না যাই।

হ্যালো, তারপরে।

হাঁ হাঁ শুনতে পাচ্ছি। দাঁড়াও ভাই সুসমাচারটা ভদ্রলোককে শুনিয়ে দি।

মস্তা বলছে, আজ বেলা দুটোর সময়ে ময়দানে মুসলীম লীগের এক জমায়েৎ হবে, বক্তৃতা করবে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি, আর তারপরেই নাকি বাঘের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে, যার কাছে এসব কিছুই নয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডিও আছে। অবশ্য তখন ঠিক থাকলে হয়। শুনবো বই কি।

মশায়, বাড়ীতে রেডিও আছে? তবে আর কি, বেলা দুটোয় শুনবেন।

হ্যালো, মস্তা, বেটারা এত পেট্রল পাচ্ছে কোথায়?

কি সর্বনাশ, এ যে নাদিরশাহী কাণ্ড!

অরবিন্দ শুধালো—কি বললেন?

বলবেন আর কি, মুসলীম লীগের পাণ্ডারা দখল করে নিয়েছে পেট্রল পাম্পগুলো, পেট্রলের অভাব হবে কেন?

হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি, কি ভয়ানক কথা!

আবার কি বললো?

বললো যে রাতের বেলায় শুরু হয়ে যাবে লঙ্কাকাণ্ড।

হ্যালো, বলো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ সাবধানেই থাকবো।

হ্যালো, ছেড়ে দিলে নাকি। এখনই ছেড়ে দিলে! কেন? তা বটে, তবে যখন আবার পাবে বলো ভাই, তোমার ভরসাতেই আছি। আচ্ছা।

কি হল মশাই?

হল এই যে টেলিফোন ছেড়ে দিল, tapping হচ্ছে।

তার আগে কি বললেন?

বললেন যে রাতের বেলায় যেন বাড়ীর বাইরে না যাই। আরও বললেন যে আমাদের পাড়াটাও খুব নিরাপদ নয়, তবে হিন্দু মুসলমানে মিশল পাড়া, এখানে তেমন ভয়ের কারণ নেই। চলুন একবার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে। তবে কি জানেন, আপনাদের মতো আদর্শবাদীদের নিয়েই ভয়, ছুটে গিয়ে কাউকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন দুর্বলের পরোপকারে অধিকার নেই। আরও একটা কথা মনে রাখবেন, কোথায় সাধ্যের সীমা আর কোথায় অসম্ভবের সূত্রপাত আদর্শবাদীরা বুঝতে পারে না।

গলির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো হঠাৎ রব উঠলো, ধর, ধর, ঐ বামনটাকে ধর। এতক্ষণ গরীব গুর্বো মেরে গাজী হয়েছি এবারে বামুন বেটাকে দোজখে পাঠানো যাক।

চটি পায়ে নামাবলী কাঁধে নধরকান্তি এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

কি চাই বাবারা? মারবে, তা মারো।

ওরে, বামুনটা যে ভয় পায় না।

দাঁড়া, দাঁড়া, ভয় পায় কিনা দেখছি, বলে সে একটা ধর্মের ষাঁড় নিয়ে এসে বলল, বাবাজি এটাকে কোর্বানী করো তো তাহলে সোজা বেহস্তে যাবে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি শান্তভাবে উত্তর দিল, কোর্বানী তো করবো, কিন্তু হাতিয়ার কই ?

এই নাও ঠাকুর, বলে একজন জুগিয়ে দিল ধারালো একখানা রামদা।

ব্রাহ্মণ বেশ করে তার ধার পরীক্ষা করে হঠাৎ এক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসলো, সেই সুতীক্ষ্ণ রাম-দা খানা নিজের কণ্ঠায় সজোরে বসিয়ে দিল, লুটিয়ে পড়লো তার দেহ।

আরে, বামনা তো বড্ড ফাঁকি দিল। মার মার মার।

দমাদম পড়তে লাগলো তার মৃতপ্রায় শরীরের উপরে ডজন খানেক কাঁচা বাঁশের লাঠি।

একটি বুড়ো মুসলমান অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল, লোকটা কাফের, তবে সাচ্চা আদমি।

তার প্রশংসায় কেউ খুশী হ'ল না দেখে লোকটি আবার বললো, আরে, তোরা ক'জনে এমনভাবে মরতে পারিস ? তোদের সাহস মারবার, মরবার সাহস নেই তোদের।

কয়েকজন বলে উঠল, যাও যাও মিঞা, ওসব কথা গান্ধী বুড়োকে শোনাও গিয়ে, শিরোপা মিলবে।

দেখলেন তো, এবারে বাড়ীতে ফিরে চলুন।

মশাই, সাতশ বছর আমরা বাদশাহী অত্যাচার সয়ে বেঁচে আছি কিসের জোরে দেখলেন তো! একেই বলে ব্রহ্মতেজ। ঠিক ছুটোর সময়ে আসবেন আমার বাড়ীতে। শোনা যাবে রেডিও।

অরবিন্দ বলল, না তখন আর আসবো না তবে সন্ধ্যাবেলায় একবার আসতে চেষ্টা করবো।

রেডিওর চাবি খুলে দিতেই এমন একটা উৎকট আওয়াজ অরবিন্দর কানে প্রবেশ করলো যার একমাত্র তুলনা হয় জাহাজের খোলের ভিতর থেকে যে মিশ্র শব্দ প্রবেশ করেছিল শ্রীকান্তর কানে তার। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, সুবে বাঙ্গাল কি মুলুক-ই-মালিক সুরাবর্দি সাহাব আ রহা হ্যায়।

বুঝলো পাকিস্তান কায়েম হওয়ার আগেই পাকিস্থানী রাষ্ট্রভাষা কায়েম হয়ে গিয়েছে, অবশ্য বাঙালী মুসলমানের মুখে যে রকম উর্দু বের হয়।

চটপটাপট বিকট করতালি।

ভাই বেরাদার পাকিস্থান কায়েম হো গিয়া। তামাম বাঙ্গাল মুলুক ঔর আসাম পূরব পাকিস্থান, ঔর পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান পছিম পাকিস্থান।

পাকিস্থান জিন্দাবাদ। কায়েদে আজাম জিন্দাবাদ। নবাব সুরাবর্দি সাহেব জিন্দাবাদ।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কর্তা দুয়ে যে হাজাক মাইল ফারাক, যাইমু ক্যামনে?

চুপ রও উল্লু, আসমান সে জায়েগা।

তারপরে নবাব সুরাবর্দির কণ্ঠস্বরে—কাফেরের হাতসে পাকিস্থান ছিনকে লিয়া হ্যায়, আভি তুম লোক ইসকো মালিক—

পাকিস্থান জিন্দাবাদ।

সুরাবর্দি উর্দু ভাষণ সুরু করলো।

কর্তা, বাঙ্গাল বোলিসে বোলিয়ে।

বাঙ্গাল বোলি কাফেরকা ভাষা—উর্দু শুনিয়ে।

পাকিস্থানকা বাস্তে জান দেনা, ঔর জানভি লেনা, লোহু দেনা ঔর লোহুভি লেনা। কংগ্রেস মুরদাবাদ।

অরবিন্দ শুনতে লাগলো, এমন উত্তেজক ভাষণ কখনো শোনেনি সে, ভাবলো এই যদি পাকিস্থানের ফার্মান হয় তবে তো হিন্দুর এদেশে থাকা অসম্ভব হবে।

মাঝে মাঝে সেই উৎকট আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগলো বন্দুকের আওয়াজ, এইভাবে চল্‌ল আধ ঘণ্টাকাল।

তারপরে মুলুক-ই-মালিক আম হুকুম দিল—যাও, ছিনকে লেও, লুটকে লেও, এ-সব হি তুমহারা হো গিয়া।

জনতার উল্লাসধ্বনি আর সশব্দ ছোটাছুটি বেশ বুঝতে পারলো। তখন আর রেডিওর প্রয়োজন ছিল না, জমায়েতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাবি দিল বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় ঘা পড়লো, অরবিন্দ উঁকি মেরে দেখল সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি। দরজা খুলে দিল।

কি, শুনলেন তো?

হ্যাঁ।

কেমন মনে হ'ল?

মনে হল রাজনীতি মনুষ্যত্বের আঁস্তাকুড়। আর মনে হ'ল গোটা কল্‌কাতা শহরটাতেই এখন গুণ্ডাশাহী কায়েম।

তবে বাকিটা এবার আমার কাছে শুনুন। আমার সেই মাস্তুতো ভাই টেলিফোনে অনেক কথা জানিয়েছে। বাবা, ওরা চলে ডালে ডালে আমরা চলি পাতায় পাতায়। এ না হলে সাতশ বছর বেঁচে থাকতাম।

কি শুনলেন বলুন।

এরই মধ্যে চার হাজার লোক মারা গিয়েছে, আর জখম যে কত তার হিসাব কে রাখে। রাস্তার ম্যানহোলগুলো মৃতদেহে ভর্তি আর শহরের হাসপাতালে একটুও জায়গা নেই—এখন সব বাইরে পড়ে আছে।

কি ভীষণ অবস্থা।

এখনি কি হয়েছে, আজকে রাতটা কাটলে হয়, খুব সাবধানে থাকবেন। রাতের মতো চাল ডাল আছে তো? না থাকলে আমার বাড়ী থেকে—

না, না, সব আছে, আমরা তো মাত্র ৬জন লোক।

বেশ এখন চললাম, বেঁচে থাকলে কালকে সকালে আবার দেখা হবে।

সে রাতে অরবিন্দ আর কালু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ক্ষিদে বড় ছিল না, তবু খেতে হয়।

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো বন্দুকের আওয়াজ, তার আর শেষ নেই। কখনো মনে হয় কাছে, কখনো দূরে।

হঠাৎ কালু ঘরে ঢুকে বল্‌ল, বাবু একবার ছাদের উপরে চলুন।

কি হয়েছে রে!

চলুন দেখবেন।

অরবিন্দ ছাদে উঠে দেখল আগুন জ্বলছে, উত্তরে পূবে দক্ষিণে জ্বলছে বাড়ীগুলো, সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ, আর আল্লাহো আকবর, পাকিস্থান জিন্দাবাদ।

ছাদের রেলিঙের উপর ভর দিয়ে অরবিন্দ ভাবছিল এ কোন্ যুগে বাস করছে, একি ইংরেজ আমল না নাদির শাহী আমল, একি বিংশ শতাব্দী না কোন এক বর্বর যুগ, একি হিন্দুস্থানের চিতা, না পাকিস্থানের কটাহ। একি স্বাধীনতার পূর্বস্বাদ না পরাধীনতার শেষভস্ম!

অনেক রাতে বন্দুকের আওয়াজ কমে এলো তবে আগুনের শিখা সমান সতেজ।

পর দিনে এই তাণ্ডবে পালা বদল হ'ল। পাশার দান গেল উল্টে। অতর্কিতে

আক্রান্ত হয়ে হিন্দুরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল এসব গুণ্ডাদের কাজ, পুলিস এসে পড়বে, না হয় ফৌজ। যখন বুঝলো এর মূলে সামান্য কয়েক জন গুণ্ডা নয়—খোদ সরকারী ফার্মান, তখন তারা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হল। অস্ত্র কোথায়? নিরস্ত্রের অস্ত্র কলকাতার পার্কগুলোর লোহার রেলিঙের ডাণ্ডা। দেখতে দেখতে কলেজ স্কোয়ারের ডাণ্ডা অস্ত্রে পরিণত হ'ল আর তার ফলে যা একতরফা ছিল, পরিণত হল সিভিলওয়ার বা গৃহযুদ্ধে।

শহরে যখন দারুণ গৃহযুদ্ধ চলছিল অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রান্ত হিন্দু ও শিখ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারী সমর্থনে বলীয়ান মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের প্রতিহত করছিল তখন কয়েকজন উচ্চমেধাসম্পন্ন ইনটেলেকচুয়াল অত্যুচ্চ অট্টালিকার নিরাপত্তায় বসে চা পান করছিল। একজন বলে উঠল, আরে ছ্যা ছ্যা, অবশেষে হিন্দু ছেলেরা গুণ্ডামি শুরু করলো, কি লজ্জা, কি লজ্জা!

আর একজন বল্‌ল, দেশ স্বাধীন হ'লে এদের দিয়ে কি কাজ হবে! হিন্দু ছেলের হাতে লাঠি।

তৃতীয় ব্যক্তি শুধালো, তোমার চা-টির ভারি একটি মিষ্টি গন্ধ, কোথায় পেলে?

হাঁ হাঁ, এ তোমার দার্জিলিং আসাম নয়, খাঁটি নীলগিরির চা।

তাই বলো।

ভারতের যুগান্তকারী একটি ঘটনা চাপা পড়ে গিয়ে গুরুত্ব হারালো নীলগিরির চায়ের সুগন্ধির কাছে।

উচ্চমেধা চিরকালই নিম্নগা।

ও কর্তা ওরা যে মারে—বলে শত শত মুসলমান এসে কেঁদে পড়লো সুবে বাংলার মালিকের পায়। তখন সুরাবর্দির হুঁশ হল ওরাও মারতে পারে, মনে হ'ল এবারে ফৌজ নামানো দরকার, নতুবা পাকিস্তান ভোগ করবার লোক থাকবে না। গেল বাংলার লাটের কাছে। বাংলার লাট তখন স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বলে একটা লোক। এক সময় সে রেলের pointsman না গার্ড সাহেব ছিল, তার পরে রাজনৈতিক দলের চক্রাবর্তের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে এখন বাংলার লাট। বাংলার লাটের মসনদে এমন অপদার্থ লোক আগে কখনো বসেনি।

কলকাতার পথে গুর্খা ফৌজ নামলো। তাদের প্রথম কাজ হ'ল বড় রাস্তাগুলো বাধামুক্ত করা। ভস্মীভূত ট্রাম, বাস, লরি, মোটরগাড়ীর কঙ্কালগুলো সরিয়ে ফেল্‌ল, ইট পাথর সাজিয়ে তৈরি বাধা সরিয়ে দিল, পথে ছড়ানো মৃতদেহগুলো গাড়ীতে তুলে রওনা করে দিল। তারপর চালালো লাঠি, প্রয়োজন স্থলে

বন্দুক। বন্দুকের গুলি হিন্দু মুসলমান ভেদ করে না—মুহূর্ত মধ্যে বড় বড় রাস্তা-গুলো নির্জন ও নিরুপদ্রব হয়ে গেল। দেখা দিল শান্তি—তবে সে জনপদের শান্তি নয়, শ্মশানের। বিকালের মধ্যে শহর শান্ত হয়ে এলো, তবে গলি-ঘুঁজিতে তখনো চলতে লাগলো চোরা-গোফতা ছোরাছুরি।

দুদিনের অশান্তিতে ক্লান্ত হয়ে অরবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিকাল বেলায় জেগে উঠে হঠাৎ মনটা বিকল হয়ে গেল। বুঝলো এই বিকলতার কারণ দুদিন শুভ্রার খোঁজ না নেওয়া। আগেও শুভ্রার কথা মনে পড়েছে, তবে জানতো সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে আছে সে। হাসপাতালের চেয়ে আজ আর নিরাপদ স্থান কোথায়।

ভাবলো এখন তো বড় রাস্তাগুলো নিরাপদ, একবার তার খোঁজ নিয়ে আসা যাক। মনে হওয়া মাত্র হ্যারিসন রোড, সার্কুলার রোড বরাবর চল্‌ল ক্যাম্বেল হাসপাতালের দিকে।

৬০

হাসপাতালে পৌঁছতেই দেখা হ'ল হাসপাতালের দারোয়ান রামযশের সঙ্গে।

সে বল্‌ল, বাবু, এই হাঙ্গামার মধ্যে এলেন!

বড রাস্তাগুলো এখন ঠাণ্ডা। শুভ্রা কোথায়?

দিদি তো কিছুক্ষণ আগে গেলেন।

গেলেন, কি বলছ, কোথায় গেলেন?

কেমন করে বলবো বাবু, আমি বল্‌লাম এই 'গোলমালের মধ্যে নাই গেলেন। দিদি বললেন, পথঘাট এখন ঠাণ্ডা।

কোথায় গেলো বলে যায়নি!

আপনার বাড়িতেই হয়তো গিয়েছেন, আর কোথাও তো বড একটা যান না।

এ সম্ভাবনা অরবিন্দর মাথাতেও এসেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ফিরে রওনা হ'ল, বলে গেল, শুভ্রা ফিরলে জানিয়ো আমি তার খোঁজ নিতে এসেছিলাম, সে যেন একা পথে বের না হয়, আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাবো।

অরবিন্দ ছুটে চল্‌ল কি উড়ে চল্‌ল খেয়াল ছিল না। তার দৃঢ় ধারণা হ'ল শুভ্রা তার বাড়ীতেই গিয়েছে, রবিনের সেই ঘটনার পরে তার বাড়ী ছাড়া পথে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তখনি মনে হল তার বাড়ী পৌঁছতে হলে খানিকটা

পথ গলি দিয়ে যেতে হয়, সে গলিগুলোও তেমন ভালো নয়।

শিয়ালদার মোড়ে এসে পৌঁছে হ্যারিসন রোড ধরলো, তার আর তর সচ্ছিল না, পথ খাটো করবার আশায় হায়েৎ খাঁ লেনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দুদিকের বাড়ীগুলো প্রায় সব খালি। মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুরা পালিয়েছে, আর হিন্দুদের আত্মরক্ষার ঠেলায় মুসলমানরা পালিয়েছে, শূন্যতার একপ্রকার ভয়াবহতা আছে। সেই গলি দিয়ে চলবার সময় অরবিন্দর গা ছমছম করছিল। এমন সময়ে একটা আর্ত কণ্ঠস্বর তার কানে প্রবেশ করলো। প্রথমটা সে খেয়াল করেনি, বাড়ী পৌঁছবার তাড়া ছিল, এমন সময়ে আবার সেই কণ্ঠস্বর—ভীত ও আর্ত। এবারে বুঝলো কণ্ঠস্বর নারীর, সে থমকে দাঁড়ালো। অনুমান করতে চেষ্টা করলো কোন্ বাড়ী থেকে শব্দটা আসছে। বুঝলো ডানদিকের দোতালা বাড়ীর একতালা সেই কণ্ঠস্বরের উৎস। সে ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলো। অরবিন্দ নিতান্ত দুর্বল নয়। তার আঘাতে দরজার খিল খুলে গেল।

সেই আলো আঁধারের মধ্যে অরবিন্দর চোখে পড়লো ঘরের এক কোণে একজন মেয়েছেলে দণ্ডায়মান, এক হাতে কোমরের শাড়ী চেপে রয়েছে—আর এক হাত দিয়ে আঘাত করছে আততায়ীকে। দেখল দুর্বৃত্তটা টানছে তার আঁচল ধরে।

মেয়েটি যখন সব আশা ছেড়ে দিয়ে সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে ও কে প্রবেশ করলো ঘরে! আততায়ীর সাকরেদ নাকি? মেয়েটির মনে হ'ল—না, ভগবান আছেন, এতক্ষণ মনে মনে ভগবানের আশা ছেড়ে দিয়ে ছিল। অরবিন্দ মেয়েটিকে চিনবার আগেই মেয়েটি চিনলো অরবিন্দকে—বলে উঠল, দাদা, আমি শুভ্রা।

ভয় নেই শুভ্রা।

সেই মুহূর্তে আততায়ী বুঝলো মেয়েটির আশা ছাড়তে হ'ল। পালিয়ে যাওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্যে ঝলক মেরে উঠল একখানা ছোরা, সেখানা বিঁধলো গিয়ে অরবিন্দের তলপেটে।

আততায়ীর চাপদাড়ি ও পরনের লুঙ্গি সত্ত্বেও তার পরিচয় ধরা পড়লো অরবিন্দর চোখে—বলল, ও!

দাদা চেনো নাকি?

কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবার আগেই চমকে উঠল, এ কি এ যে রক্তের স্রোত!

হাঁ, ছোরা বসিয়ে দিয়েছে!

শুভ্রার অভ্যস্ত চোখ বুঝলো আঘাত গুরুতর, এখনি বন্ধ করা অত্যাবশক।

শাড়ীর খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

আঘাত যে কত গুরুতর অরবিন্দর সহ্যশক্তি বুঝতে দিল না।

শুভ্রা তুমি হঠাৎ এখানে ?

তোমার খোঁজ নিতে যাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে ঢুকেছিলাম গলিটায়।

তুমি এখানে এলে কি করে ? হোস্টেলে তোমার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, না পেয়ে ভাবলাম আমার বাসাতে নিশ্চয় গিয়েছ।···কিন্তু শুভ্রা আমি তো আর বসে থাকতে পারছি না।

আগেই একখানা তক্তাপোশের উপরে বসে পড়েছিল সে।

এখানে শুয়ে পড়ো—বলে তাকে শুইয়ে দিল।

আঘাতের গভীরতা, প্রসার ও রক্তস্রাব দেখে তার মারাত্মকতা সম্বন্ধে শুভ্রার সন্দেহ ছিল না।

শুভ্রা আমি বাঁচবো না, লোকটা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

না, না, এমন কিছু নয়, তুমি দু'চার মিনিট একা থাকো, দেখি একখানা ট্যাক্সি বা রিক্সা পাওয়া যায় কি না।

কোন লাভ হবে না শুভ্রা, তার চেয়ে দু'চার মিনিট আমার কাছে বসো।··· আমার সময় হয়ে এসেছে।

রুগীর মুখ ও স্বর শুনে বুঝলো সত্যি তার শেষ হয়ে এসেছে—বল্‌ল, দাদা, অমূল্য প্রাণটা এই অভাগিনীব জন্যে দিয়ে তাকে ঋণী করে গেলে।

না শুভ্রা ঋণ শোধ করে গেলাম। ক্ষীণতর কণ্ঠে বল্‌ল, যা বলবার বলে নিই।

এখন থাক দাদা।

না ভাই, এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না। বিপ্লবী দলে ছিলাম, তাদের নির্দেশে যাকে হত্যা করেছিলাম এই সেদিন মাত্র তোমার মুখেই জানতে পেরেছি সে ছিল তোমার দাদা—রমণী চৌধুরী।

কথাগুলি ধীরে ধীরে ক্ষীণতর কণ্ঠে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে জানালো অরবিন্দ।

অসহায়ভাবে, ব্যাকুলভাবে শুভ্রা চীৎকার করে উঠ্‌ল—কেন এ কথা দাদা এমন সময় জানাতে গেলে—কেন, কেন ?

এ কথা না জানিয়ে মরলে শান্তি পেতাম না ভাই।

ভগবান এমন কেন হয়, কেন এমন হয়, কেন !

শুভ্রা, আমি চললাম, সব কথা জানিয়ে শচীনদাকে চিঠি লিখে দিয়ো।

কে তোমাকে যেতে দিচ্ছে—বলে বল সংগ্রহ করে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো, তার

কানে এসেছে একটা রিক্‌শার টুং টুং শব্দ।

দাঁড়াও এখনি আসছি।

বাইরে এসে দেখল সত্যি একটা খালি রিকশা।

মেয়েছেলে দেখে রিকশা দাঁড়ালো।

একটা জখম মানুষ নিয়ে যেতে হবে; সঙ্গে এস, দুজনে ধরে তাকে তুলতে হবে।

আবার কেন এত হাঙ্গামা করছ শুভ্রা?

শুভ্রা কোন উত্তর দিল না, দুজনে ধরাধরি করে অরবিন্দকে রিকশায় তুলে পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরলো, বল্‌ল, ক্যাম্বেল হাসপাতাল।

যে দিন কাল পড়েছে পথে জখমি মানুষ দেখলে লোকে বিস্মিত হতো না, বরঞ্চ বিস্মিত হতো একটা গোটা আস্ত মানুষ দেখলে।

হাসপাতালে জখমি ওয়ার্ডের কাছে রিক্‌শা দাঁড়াতেই স্ট্রেচার নিয়ে লোক এসে রুগীকে নিয়ে গেল। পয়সার থলি বের করতেই রিক্‌শাওলা জিভ কেটে বল্‌ল, নেহি নেহি মাইজি—বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে রিক্‌শা নিয়ে প্রস্থান করলো।

শুভ্রার দাদা পরিচয়ে আলাদা কেবিন, নার্স, ডাক্তার সব মুহূর্ত মধ্যে জুটে গেল। অরবিন্দ তখন আচ্ছন্নপ্রায়, কি ঘটছে ভালো করে জানতেও পারলো না।

মেজর ধর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে একবার ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে তাকালো শুভ্রার দিকে। শুভ্রা মুখ নীচু করলো।

যাই হোক, চিকিৎসার ত্রুটি হ'ল না—তৎসত্ত্বেও রুগীর রক্তে ভাটার টান ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগলো।

চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন, শুভ্রা তুমি আছ?

এই যে আমি দাদা, বলে তাঁর হাত ধরলো।

ঘরে আর কে আছে?

আর কেউ নয় শুধু তুমি আর আমি। কিছু বলবে?

হাঁ, আর একটা কথা না জানিয়ে যেতে পারছি না।

কি কথা দাদা?

আমি তোমাকে ভালবাসতাম। দাদার মতো নয়, ভাইয়ের মতো নয়, আরও আরও বেশি।

নির্দয় বিধাতা তখন দমাদ্দম শুভ্রার হৃৎপিণ্ডের উপরে হাতুড়ি পিটিয়ে পরীক্ষা করছে সহ্যগুণ।

আমি তা জানতাম দাদা।

কি বলছ শুনতে পারছি না, মুখ কাছে নিয়ে এসে বলো।

আমি অনেকদিন তোমার মনের ভাব জানতাম।

আমি তো জানতে পারলাম না তোমার মনের ভাব।

বিধাতা মেয়েদের মন দিয়েছেন মুখ দেননি।

তার মানে ভালোবাসতে আমাকে, ভালোবাসতে!

এই প্রবল অনুভূতির প্রচণ্ড আবেগ সহ্য করবার শক্তি ছিল না দুর্বল দেহের, আপাদমস্তক ঝাঁকুনি দিয়ে বার দুই কেঁপে উঠ্ল। শুভ্রা বুঝল এ অন্তিমলক্ষণ।

জল, জল।

ফিডিং কাপ থেকে সন্তর্পণে জল দিল রুগীর মুখে। জল গলা দিয়ে গলল না। মুখ বেয়ে পড়ে গেল।

একবার রুগীর ঠোঁট নড়ে উঠল। কি বল্ল শোনা গেল না, তবে ঠোঁট নাড়বার ভঙ্গী লক্ষ্য করে বুঝলো 'শুভ্রা' উচ্চারণ করবার ইচ্ছা।

রুগীর মাথা শুভ্রার কোলের উপরে, অনেকক্ষণ আগে মাথা কোলে তুলে নিতে অনুরোধ করেছিল।

আবার ঠোঁট নড়ে উঠল; তারপরেই কয়েকবার প্রবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। মাথাও পড়লো বেঁকে।

এতক্ষণ দুর্জয় মনোবলে যে অশুভ অশ্রু-ধারা শুভ্রা বন্ধ করে রেখেছিল, এবারে বাঁধ ভাঙলো, আর বন্ধ করে রাখবার প্রয়োজন ছিল না।

যে শুভ্রাকে জীবনে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি, এখন সদ্য-মৃতের বুকের উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, বলতে লাগলো,—অরবিন্দ, অরবিন্দ।

কয়েকদিন পরে শচীন একখানা খামের পত্র পেলো, খুলে দেখল শুভ্রার চিঠি। শুভ্রা লিখেছে—

শ্রীচরণেষু দাদা,

কয়েকদিন আগে এই অভাগিনীকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে অরবিন্দবাবু অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ডাক্তার ঔষধ পথ্যে যা সম্ভব কিছুতেই কিছু হয়নি, শেষ পর্যন্ত তিনি এই অভাগিনীর কোলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন।

আপনাদের সকলের পায়ে কোটি কোটি প্রণাম। ইতি অভাগিনী শুভ্রা।

পুঃ দয়া করে আমার সন্ধান করবার চেষ্টা করবেন না।

শচীনের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়লো রুক্মিণী, তার হাত থেকে নিয়ে পড়লো মলিনা।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বারে বারে অনতি-উচ্চস্বরে মলিনা বল্‌ল, ওরে শুভ্রা, তুই যদি অভাগিনী তবে সৌভাগ্যবতী কে। আমার হার, হার, সর্বপ্রকারে হার; জন্মে মরণে আমি দেউলে, দেউলে, দেউলে।

৬১

যুদ্ধ ব্যাপারটা যতই বীরত্বব্যঞ্জক শব্দে ভূষিত করা যাক মূলতঃ কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শত্রুপক্ষ যখন প্রবল সরে পড়ো, শত্রুপক্ষ দুর্বল করো আক্রমণ। এ নিছক কাপুরুষতা। কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এমনি একটি উদাহরণ। সরকারের বলে বলীয়ান মুসলিম লীগ অমুসলমানদের আক্রমণ করলো, কিন্তু যখনি অপরপক্ষ রুখে দাঁড়ালো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপ্রত্যক্ষ হয়ে গেল, কিন্তু শেষ হল না। নোয়াখালি জেলায় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ, আক্রমণের স্থান হ'ল সেখানে। তারপরে কল্‌কাতা ও নোয়াখালির বদ্‌লা চল্‌ল বিহারে যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু। কল্‌কাতা, নোয়াখালি, বিহার বদলার শিকার। ওদিকে পাঞ্জাব অগ্নিগর্ভ।

এহেন অবস্থায় সাতাত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধ মাকুর মতো ছুটোছুটি আরম্ভ করলেন, দিল্লী, কল্‌কাতা, নোয়াখালি, বিহার।

গান্ধীজি কল্‌কাতায় এসে পৌঁছে মুসলিম লীগ সরকারকে জানালেন শান্তি-স্থাপন উদ্দেশ্যে যেতে যান নোয়াখালিতে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক টালবাহানা করে ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্গী হল অল্প কিছু বিশ্বস্ত অনুচর, দোভাষী, টাইপিস্ট প্রভৃতি, আর লব। গান্ধীজির চিঠি পেয়ে সে এসে জুটেছে সোদপুরের খাদি আশ্রমে যেখানে গান্ধীজির অবস্থান।

লবকে দেখে খুশী হয়ে তিনি শুধালেন, কুশীদাদা কোথায়?

লব বল্‌ল, সে আসবে না, কমুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

খবরটা শুনে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, তা সে দলে থেকেও ভালো কাজ করবার পথ আছে।

যারা শুনলো খুশী হ'ল না।

গান্ধীজি অবশেষে সদল বলে নোয়াখালির পথে চাঁদপুরে নামলেন স্টীমার থেকে, এবারে যাত্রা রেলপথে। নোয়াখালিতে কি হয়েছে? কি হয় নি। মারামারি কাটাকাটি ঘর জ্বালানো, লুটপাট নরহত্যা, নারীহরণ নারীধর্ষণ, বলে ধর্মান্তঃকরণ ও বলপূর্বক বিবাহ—অবশ্য সমস্তই এক-তরফা।

লাকশাম স্টেশনে নেমে গান্ধী জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, কখনো গাড়িতে, কখনো নৌকায়, কখনো পদব্রজে। যা শুনেছিলেন, পড়েছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চারদিকে। একটার পরে একটা বিধ্বস্ত জনশূন্য গ্রাম, চারদিকে আগুনে ঝলসানো সুপারি গাছের বন। ভয়ে তাঁর কাছে কেউ আসে না, প্রার্থনা সভা জনশূন্য। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ পাহারা দিতে চাইলো, গান্ধীজি বললেন দরকার নেই। ক্রমে জনসঞ্চার সুরু হ'ল, হিন্দু মুসলমান দু-ই। গান্ধীজির দাবী সামান্য, তিনি চান একজন সৎ হিন্দু, একজন সৎ মুসলমান, যারা গাঁয়ের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নেবে। তাঁর দাবী পূরণ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে তিনি নীবব।

গান্ধীজি বললেন, হিন্দুদের এখানেই থাকতে হবে, মরতে হ'লেও ভিটেমাটি ছাড়া চলবে না; নতুবা প্রমাণ হয়ে যাবে পাকিস্থানের দাবী সত্য।

মুসলমানেরা বল্ল, এখানে কেন বিহারে যান, মুসলমান সেখানে জানে প্রাণে শেষ হয়ে গেল।

গান্ধী বললেন. বিহারের কাজ তিনি নোয়াখালিতে করছেন আর তাছাড়া বিহার সরকার আছেন। আছেন নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

ক্রমে হিন্দু মুসলমান সকলেই বুঝলো এ লোকটি কিছু অন্যরকম, তখন গ্রামে গ্রামে প্রাণসঞ্চার আরম্ভ হয়ে গেল, শ্মশানে শিবের আবির্ভাব।

গান্ধীজি বুঝলেন এরকম করে কিছু হবে না। তিনি সকলকে ডেকে বললেন, এখন থেকে আমি একলা যাত্রা করবো, কেবল সঙ্গে থাকবে দোভাষী আর টাইপিস্ট।

লব বলে উঠ্‌ল, আর আমি?

তোমার ভয় করবে না?

তবে এতদিনে আপনার কাছে থেকে কি শিখলাম!

মনে হ'ল তিনি খুশী হয়েছেন, বললেন, আচ্ছা তুমিও যাবে।

রাত কাটাবো মুসলমানের বাড়ীতে যে স্বেচ্ছায় আশ্রয় দেবে।

আরম্ভ হল নিঃসঙ্গ যাত্রা। দাসপাড়া, সেনপাড়া, দীঘির পাড়, কাজলাপুর, শ্রীরামপুর, অখ্যাত সব গ্রাম খবরের কাগজের শিরোনামায় স্থান পেতে লাগলো।

আসে দেশ-বিদেশের রিপোর্টারগণ, আসে অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের প্রধান ব্যক্তিগণ, আর আসে স্থানীয় মুসলমান মুরুব্বিরা, বলে, কর্তা, এহানে কি করতাছেন বিহার যান, সেখানে মুসলমানের নাম লোপ পাইলো।

তোমরা দায়িত্ব নাও এখানে শান্তি রক্ষিত হবে, আমি এখনি যাচ্ছি।

কেউ সে দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

এমন সময় তাঁকে বিহারে রওনা হ'তে হল, এমন একজন ঘনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুর কাছে থেকে চিঠি পেয়েছেন যার পরে তাঁর যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কি লব, এখানে থাকবে না আমার সঙ্গে বিহারে যাবে?

যেমন বলেন।

এখানে থাকো।

থাকবো।

ভয় পেয়ে পালাবে না?

না।

আমার সেই তিনটি সূত্র মনে আছে?

আছে।

বলো তো শুনি।

বীরের মতো অহিংস পন্থায় প্রতিরোধ, বীরের মতো সহিংস পন্থায় সংগ্রাম; কাপুরুষতা কখনো নয়।

ঠিক আছে, তুমি পারবে। এই গ্রামে থেকে নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান ছেলে মেয়েদের হাতে খড়ি দাও। আর সকাল সন্ধ্যা রামধুন আর ভজন গাইবে। এই গাঁয়ের ভার তোমার উপর দিয়ে গেলাম।

লব প্রণাম করলে, গান্ধী তাঁর দোভাষী আর টাইপিস্টকে নিয়ে একখানা ডিঙি নৌকায় চড়লেন, কচুরি পানার চাপ ঠেলে লগির জোরে নৌকা চল্‌ল— যতক্ষণ দেখা গেল সেইদিকে তাকিয়ে রইলো লব, অবশেষে সন্ধ্যার ঘোরে আর কুয়াশায় মিলিয়ে গেল সেই দৃশ্য।

গান্ধীর শান্তি পরিক্রমা আরম্ভ হ'ল বিহারে, সেখানেও নোয়াখালির ঘটনার অনুরূপ, ঘর জ্বালানো, বাড়ী লুট, হত্যা কিছুই বাদ যায়নি। সারাদিন তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন আর সন্ধ্যাবেলায় করেন প্রার্থনা সভা, পরদিন আবার গ্রাম থেকে গ্রামে পরিভ্রমণ। মাঝে মাঝে দিল্লী থেকে মন্ত্রীরা এসে খবর দিয়ে যায়, তা ছাড়া নিয়মিত চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম তো আছেই। তাঁর মনের খবর এক অন্তর্যামী

ছাড়া আর কেউ জানতে পায় না। খবর আসে নোয়াখালি এখনো শান্ত হয়নি; কলকাতায় ঝটিকাপূর্ব নিস্তব্ধতা, আর পাঞ্জাব অগ্নিগর্ভ। ত্রিশ বৎসরের অহিংস সত্যাগ্রহের এই পরিণাম।

এদিকে দিল্লীর কর্মচক্র যথারীতি চলছে। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা যথাসাধ্য চলেছে, আর মন্ত্রীসভার মুসলীমলীগের প্রতিনিধিগণ যথাসাধ্য বাধা দিতে সচেষ্ট। একদিন তিনি প্রার্থনা সভায় জানালেন নূতন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পরদিনে তিনি দিল্লী যাত্রা করবেন, কিন্তু সে দু-তিন দিনের জন্য মাত্র। আবার ফিরে আসবেন বিহারে, প্রয়োজন হলে নোয়াখালিতে, জানালেন ভারতের অগ্নিপরীক্ষা চলছে বিহারে ও নোয়াখালিতে।

এদিকে দিনাজশাহীতে যজ্ঞেশ রায়ের পরিবারে দুশ্চিন্তার অবধি নাই। বাড়ীর দুই ছেলের মধ্যে কুশ নিখোঁজ, সে যে কোথায় কি করছে কেউ জানে না; তবে লবের সংবাদ মাঝে মাঝে পত্রযোগে পাওয়া যায়। কাজ চলছে, আমি ভালো আছি—এর চেয়ে বেশি কিছু থাকে না সে-সব পত্রে। কিন্তু আজ কদিন সে পত্রও বন্ধ।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, শচীন লবকে একটা টেলিগ্রাম করো না কেন?

কোথায় করবো বাবা?

কেন, ছিদামপুরে যেখানে লবের শিবির।

সেখানে ডাকঘর আছে কিনা ঠিক নেই, টেলিগ্রাম পৌঁছবে কি করে?

তবে একবার গিয়ে দেখে এসো না কেন?

মলিনা বল্‌ল, না, সেখানে দাদার যাওয়া হবে না।

তবে আমাকেই যেতে হবে। একটা ব্যাগে আমার কাপড জামা গামছা গুছিয়ে দাও।

সে কি, আপনি যাবেন কেন বাবা? বল্‌ল শচীন।

তবে চলো দুজনেই যাই।

মলিনা বল্‌ল—হাঁ তোমরা সবাই যাও, আর আমরা একা থাকি।

সে কথা সত্য, তা হ'লে শচীন থাকগে, প্রাতে আমি একাই রওনা হই, বুড়ো মানুষকে কেউ কিছু বলবে না।

মলিনা বলে ওঠে, যারা খুন করছে তারা কি আগে বয়স জিজ্ঞাসা করে?

মলিনা মা, গান্ধীজির বয়স তো কম নয়।

বাবা, গান্ধীজির গায়ে হাত তোলা মানে ভারতবর্ষের গায়ে হাত তোলা,

মুসলমান একগুঁয়ে বটে তবে নির্বোধ নয়।

সেদিন এই পর্যন্ত হয়ে রইলো। পরদিনে যখন যজ্ঞেশবাবুর যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত, তখন হঠাৎ বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো একখানা ঘোড়ার গাড়ী।

কে এলো, কে এলো, বলে সকলে বাইরে এসে দাঁড়ালো, দেখতে পেলো গাড়ী থেকে নামছে লব, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আর একটি বর্ষীয়সী মহিলা।

লব প্রণাম করলো সকলকে, তার দৃষ্টান্তে মেয়েটিও প্রণাম করলো সকলকে।

লব বল্‌ল—দাদু, এর নাম আসেমা খাতুন, আমার পিসি।

এসো মা এসো, বলে আহ্বান করলেন যজ্ঞেশবাবু।

এঁর জন্যই আমি প্রাণে রক্ষা পেয়েছি।

বাড়িয়ে বলো না লব, আমাকে রক্ষা করতে গিয়েই মাথা ফাটিয়েছ।

তুমিও কম মার খাওনি পিসি!

কে কাকে রক্ষা করেছে সে হিসাব না হয় পরে শুনবো। এখন ভিতরে চলো— মলিনা তাদের দু'জনকে নিয়ে অন্দর মহলে চলে গেল।

যজ্ঞেশবাবু অনেকটা আপন মনেই যেন বল্‌লেন, মেয়েটি নোয়াখালির মুসলমান, হিন্দুকে বাঁচাতে গিয়ে মার খেলেন। কই, তেমন ভয়ানক তো কিছুই দেখতে পেলাম না।

একক মানুষ দেবতা, দলবদ্ধ হলেই পিশাচ।

৬২

বউ ঠাকরুণ, তোমার এই বড় ছেলেটি রত্ন।

রুক্মিণী উত্তর দেবার আগেই মলিনা বল্‌ল, ভাই রতনেই রতন চেনে, তাই না তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আসেমা বল্‌ল, দিদি, এখন তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় বুঝলাম এমন বাড়ীতে ছেলে রত্ন না হয়ে যায় না। রায় মশায়কে দেখলাম, শচীন দাদাকে দেখলাম, দেখলাম তোমাকে আর বউ ঠাকরুণকে।

তবু তো দেখনি আমার ছোট ভাইপো কুশকে, সেটিও একটি রত্ন।

নিশ্চয়, তার কথা সর্বদা বলে লব, কেবল তার দুঃখ এই যে সে ঢুকলো কিনা অবশেষে কমুনিস্ট পার্টিতে। আমি বলি যে সে দলে থেকে কি দেশের কাজ করা যায় না? বলে, তুমি জানো না পিসি তাদের তাই এমন কথা বলছ। বলি,

কেন রে তুই তো একদিন বলেছিলে বাপুজিও ঐ কথা বলেছিলেন। বলে বাপুজির কথা ছেড়ে দাও, তিনি কারো মন্দ দেখতে পান না। তখন বলি, পান রে পান, তবে সব সময়ে মুখে বলেন না। হাঁ বউঠাকরুণ, তোমরা দেখেছ তাঁকে ?

না ভাই, সে সৌভাগ্য আর হল কই !

মলিনা বলে, বউদিদি কি বলে জানো ভাই, মহাত্মাজীর দর্শন পেলাম না বটে তবে তাঁর পায়ে দর্শনী হিসাবে দিয়েছি আমার বড় ছেলেটিকে।

বাড়িয়ে বলো না মলিনা।

কমিয়ে বলছি বউদি, আমাদের সমস্ত পরিবারটাই তাঁর পায়ে সমর্পিত। মনে করে দেখো, মহারানীর শ্রাদ্ধ থেকে স্থরু করে আজকের দিন পর্যন্ত কি বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে আমাদের বাড়ীতে, সে সমস্তই তাঁর যষ্টির ইঙ্গিতে।

লবের মুখে এ বাড়ীর পরিবর্তনের ইতিহাস আসেমা শুনেছে। এমন তো দেশের ঘরে ঘরে হয়েছে কে তার হিসাব রাখবে, এর পরে যখন এই যুগের ইতিহাস লিখিত হবে ফুটনোটের ক্ষুদে অক্ষরেও এরা স্থান পাবে না। তবু নিজের বড় ছেলেটিকে দর্শনী হিসাবে দিয়েছে এই লঘু উক্তিটির মধ্যে কি গভীর বেদনা উঁকি মারছে।

সংসারবেদনার গভীরতা যেমন অতলস্পর্শ তেমনি অপ্রত্যাশিত, অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেললেও অকস্মাৎ তলিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আসেমা কেবল জানলো মায়ের দুঃখটাই—অথচ অরবিন্দর মৃত্যুতে মলিনার দুঃখের বিন্দুবিসর্গও টের পেলো না। দৃষ্টান্ত খুঁজবার জন্যে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শীতের দুপুর বেলার রোদে ছাদের উপরে বসে স্বচ্ছভাবে আলাপ করতে করতে হঠাৎ পথটা এসে থমকে দাঁড়ালো এমন একটা অতলের মুখে, যেখানে মায়ের দুঃখ, প্রণয়িনীর ব্যথা। মলিনাই মোড় ঘুরিয়ে দিল।

বলল, ভাই সবই তো আমাদের কথা শুনলে, এবারে তোমার ঘরের কথা বলো।

ঘর কি আর আছে দিদি, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমরা জানি পুড়েছে হিন্দুদের ঘর !

মিথ্যা শোননি, তবে কি জানো নগরে লাগিলে অগ্নি দেবালয় বাঁচে না।

ওরা বুঝলো মেয়েটির বাংলা কলমের লেখাপড়া ভালো জানা আছে।

নিজের কুঁড়ে ঘরকে দেবালয় বললাম শুনে মনে মনে নিশ্চয় হাসছো। হাসবার যোগ্য কথাই। কিন্তু ভাই গরীবের কুঁড়েও মাঝে মাঝে দেবালয় হয়ে ওঠে,

আমার ঘরও হয়ে উঠল, যেদিন বাপুজি এসে পদার্পণ করলেন।

বলো ভাই শুনি, বলল রুক্মিণী।

তখন তিনি নিঃসঙ্গভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছেন, সন্ধ্যাবেলা আশ্রয় নেন কোন মুসলমানের বাড়ীতে। সেদিন বিকালবেলায়, শীতের বিকাল সন্ধ্যা ছাড়া আর কি, তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার কুঁড়ের সামনে, বহিন, আজকে রাতে আমাকে আশ্রয় দেবে কি? আমি কি উত্তর দেবো দিদি, সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুখে কথা বলবার শক্তি নেই, আমার মুখের হয়ে চোখ কথা বলল জলের ধারা নামিয়ে। তিনি বুঝলেন আমার নিঃশব্দ উত্তরের সম্মতি। তক্তপোশখানার উপরে রাখলেন কাঁধের থলিটা। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে এক ডেকচি জল গরম করে আনলাম, দিলাম ধুইয়ে তাঁর পা, তিনি মৃদু হাসলেন, আপত্তি করলেন না।

আসেমা বলে যায়, ওরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শোনে, গান্ধীজির এমন সত্য বর্ণনা আগে শোনেনি। লব মুখে অনেক কথা বলেছে বটে তবে সেসব এমন জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

আসেমা বলে, বউঠাকরুণ, মানুষ যত বড়ই হোক একদিন না একদিন তাঁকে চলে যেতে হবে, গান্ধীজীও যাবেন কিন্তু দুঃখ এই যে সেই সঙ্গে যাবে তাঁর হাসি।

মলিনা শুধায়, সে হাসি বুঝি খুব মিষ্টি?

না, না, দিদি ওসব লৌকিক বিশেষণে তার বর্ণনা হয় না, ও যেন আদি-কালের প্রথম উষার আলো, ও যেন কোন মানুষের হাসি নয়, জগতের শৈশবের প্রথম হাসি। সে হাসি দেখলে মনে সাহস হয়, মনে হয় কিছুই অসাধ্য নয়।

তারপরে সে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এতক্ষণ যেন স্বগত ভাষণ করছিল, দিদি, তোমরা আমার মুখে এসব বর্ণনা শুনে নিশ্চয় ভাবছ, একটা গাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ের মুখে এমন কথা এলো কোথা থেকে। তোমাদের তুলনায় আমি অশিক্ষিত হলেও একেবারে অজ্ঞান নই, নোয়াখালির মেয়েদের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলাম।

কলেজে পড়লে না কেন?

আসল কারণ তখন ওদিকে মেয়েদের, বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের কলেজে পড়বার রেওয়াজ হয়নি, ইস্কুলে ঢুকতেই অনেকে বারণ করেছিল। তাছাড়া তারপরে বিয়ে হয়ে গেল, এলাম ছিদামপুরে স্বামীর ঘর করতে।

মলিনা শুধালো, তোমার স্বামী!

তিনি তো রইলেন না। অল্প-দিনের মধ্যেই চলে গেলেন। সে অনেকদিনের কথা।

তখন তোমার বয়স নিশ্চয় অল্প ছিল, আবার বিয়ে করলে না কেন, তোমাদের সমাজে তো নিয়ম আছে।

আছে, তবে আর ইচ্ছা হল না। তোমরা যেমন ভাবো ঠিক তেমন নয়, আমাদের মধ্যে অল্প মেয়েই আবার বিয়ে করে। তিনি চলে গেলেন, তাঁর বাড়ী, পুকুর, বাগান, খেত-খামার আঁকড়ে পড়ে রইলাম, অবশেষে একদিন গরীবের কুঁড়ে দেবালয় হয়ে উঠল। ভোরবেলা যখন তিনি যাত্রা করছেন, আমি পায়ের উপরে প্রণাম করতে গিয়ে আর উঠতে পারি না। তিনি হাত ধরে তুললেন, বললেন, বহিন, আমি তো এক রাতের বেশি কোথাও না থাকবার শপথ করেছি, তবে আমার বদলে রইলো আমার নাতি। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছে লব।

তিনি বললেন, লব দাদা অন্য গাঁয়ে রাত কাটিয়েছে, ভোরবেলা এসে আমাকে ধরবে কথা ছিল, এসেছে, ও রইলো।

বললাম, অশান্তির সময়ে এই মুসলমান গাঁয়ে ওকে কার ভরসায় রেখে চললেন?

তোমার ভরসায়।

আমার বাড়ীতে আপনার নাতি থাকবে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কি হ'তে পারে, কিন্তু ওকে আশ্রয় দিলে আমি থাকবো কার ভরসায়!

ওর ভরসায়।

তাঁর এসব কথা নয়, যেন মন্ত্র, শুনবামাত্র মনে হয় আর কাউকে ভয় নেই আমার। তিনি চলে গেলেন, হাতে লাঠি, কাঁধে থলি, বয়সের ভারে ঈষৎ নত; যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে রইলাম, অবশেষে মিলিয়ে গেলেন সুপুরি বনের আলো-আঁধারের মধ্যে।

পিছনে ফিরে দেখি লব কাঁধ থেকে নামিয়েছে একটা থলি, বলল, আজ থেকে তুমি আমার পিসি।

পিসি কেন?

বাপুর বহিন পিসি ছাড়া আর কি হবে!

দুজনেই হেসে উঠলাম।

খাবে কোথায় লব?

কেন, তুমি রাঁধবে আমি খাবো।

আর আমি যখন পারবো না তুমি রাঁধবে। কি বলো?

খুব রাঁধবো তবে তুমি খেতে পারবে না।

কেন?

বাড়ীতে একদিন খিচুড়ি রেঁধেছিলাম। মা মুখে দিয়ে বলেছিলেন ভূতে খেতে পারে না তোর রান্না। ভূতে পারে না, তবে পেত্নীতে হয় তো পারে।

ও কি, পিসিকে পেত্নী বললে, কি শহবৎ হয়েছে! ডাকবো নাকি বাপুকে, এখনো বেশি দূরে যাননি।

বলল, বাপু শুনলে হাসবেন, আমার কথা শুনে প্রায়ই হেসে ওঠেন। বাপু খুব ছেলেমানুষ।

কিন্তু যখন রাগেন?

রাগ তো করেন না, মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যান।

তখন?

তখন আর কি। সর্দার প্যাটেল অবধি তাকিয়ে দেখে অন্য দিকে চলে যান।

তুমি দেখেছ নাকি তাঁকে?

কেন দেখবো না।

আর কাকে দেখেছ?

কাকে দেখিনি পিসি, পণ্ডিত নেহেরু—ঐ আর এক ছেলেমানুষ, বাজাজি, মৌলানা আজাদ, আচার্য কৃপালনি, সরোজিনী নাইডু।

বলো কি, খবরের কাগজের নামগুলোকে চোখে দেখেছ!

না দেখে উপায় কি, সবাই ওয়ার্ধায় আসে বাবুর কাছে, টিকি বাঁধা যে।

সে আবার কি?

বুদ্ধি, বুদ্ধি, যখন আর হালে পানি পান না তখন এসে গান শুরু করেন—'অকূলের কাণ্ডারী গো, পার কি দেখা যায়।'

বা রে, তারা বাংলা জানবে কি করে?

আরে তারা কি সত্যি গান করে—ওটা আখর জুড়ে দিলাম।

শীতের রোদ কমজোরি হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠতে হবে, তাই রুক্মিণী বলল, ঠাকুরঝি এবারে বলো তোমার রত্নটি সারাদিন কি করে কাটাতো?

ওর কি কাজের অভাব আছে, ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজে ঠাসা ওর সময়। এই ধরো ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম করে স্নান সেরে নেয়—তারপরে ভজন গায়—

একাই গায়?

গায় একা তবে আমিও গিয়ে দাঁড়াই, এই নিয়ে তো প্রথম গোল বাধলো। যাক সে কথা পরে হবে, তারপরে জল খায়।

কি খায়?

রাতে ছোলা মুগ ভিজিয়ে রাখি তাই গুড় দিয়ে খায়, আর সঙ্গে থাকে মুড়ি কি দুধ চিঁড়ে।

এ সবের খরচ তুমি যোগাও ?

এবারে হাসালে বউঠাকরুণ, ক' পয়সা ওর দাম। আমিই বা যোগাবার কে, উনি যা রেখে গিয়েছেন তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। পাঁচ শো সুপুরির গাছ আছে, মানে হাজার টাকা।

আচ্ছা তার পরে ?

তারপর ও ওষুধ নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে বের হয়।

মলিনা বিস্ময়ে হেসে ওঠে, ও আবার ডাক্তারি শিখলো কবে ?

ওটুকু ডাক্তারি সবাই জানে, তুমি, বউঠাকরুণ সবাই জানো।

শুনি, দেখি জানি কিনা।

ওষুধের মধ্যে তিনটি—ক্যাস্টর অয়েল, কুইনাইন, আর ঘা-পাঁচড়ার মলম—কি জানো কিনা।

এ তো আমরা হামেশা বাড়ীতে দিয়ে থাকি।

তবে আর কি। বাপু কি এমন ওষুধ দিয়ে যাবেন যা ওর অসাধ্য। ওটুকু ওষুধেও তিনি খুব রাজি নন, নিজে তো পেটে মাটির পলাস্তরা লাগিয়ে শুয়ে থাকেন। লোকদের বোঝান মাটি দিয়ে তৈরি এই শরীরের সমস্ত রোগের ওষুধ আছে মাটির মধ্যে। তারপরে কোথা থেকে ফিরে এসে খায়—আমি রেঁধে রাখি, ডাল ভাত একটা তরকারি, আর বিকালে দিই আধসের দুধ।

এই পর্যন্ত বলে হেসে তাকালো রুক্মিণীর দিকে, বউঠাকরুন ভাবছেন মুসলমানের হাতের ভাত খেয়ে ছেলেটার জাত গেলো।

ভাই, ছেড়ে যাঁকে দিয়েছি জাতটাও দিয়েছি তাঁকে।

তা দেখলাম তো, আমার সঙ্গে একই ঘরের মধ্যে বসে তোমরা দুজনে খেলে তো।

শুধু আমরা কেন, রাতের বেলায় দেখবে বাবা আর দাদাও খাবেন।

আসেমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাই তো ভাবি দিদি, তবে হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া কেন।

ভাই আমি যতটা বুঝি বলছি, ঝগড়া ধর্ম নিয়ে নয়, ধানের ক্ষেত নিয়ে।

মলিনার কথায় ওরা দুজনে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, ধানের ক্ষেত ! সে আবার কি রকম ?

এ তো সরল ব্যাপার। ধানের ক্ষেতের মালিকানা নিয়ে দুজন হিন্দু-মুসলমানে

মারামারি হ'ল, তাকে কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলবে, এর মধ্যে ধর্ম কোথায়? এসব মারামারি তো হিন্দুতে হিন্দুতে নিত্য হচ্ছে। তবে কিনা লোককে তাতিয়ে তোলবার জন্যে ধর্ম শব্দটা ব্যবহার করতে হয়। এসব কচকচি থাক। রত্নটি বিকালে সন্ধ্যায় কি করে বলো?

বিকালে পাড়ার ছেলেমেয়েদের যোগাড় করে নিয়ে উঠোনের মধ্যে বসে লেখাপড়া শেখায়। মাটির উপরে কাঠি দিয়ে ক, খ লেখে; পড়ুয়ারা তাই দেখে কাঠি দিয়ে ক খ লিখতে চেষ্টা করে। তারপরে আবার ভজন।

ভজন নিয়ে গোল বাধলো বললে, সে কি করে হ'ল বলো।

একদিন কয়েকজন পাড়ার মুরুব্বি এসে বলল, ওরে আসেমা, ওসব কি গান করিস, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। ও যে মুসলমানদের পক্ষে গুণাহ্।

আমি বললাম, কেন তারপরেই তো আছে ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।

আরে ঐখানেই তো গান্ধীর কারসাজি, আল্লাকে সমান করে দিল রামের সঙ্গে, রাম যে মানুষ।

আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে রাম সে-ই আল্লা, সে-ই গড্।

এই রে, গান্ধীতে ছুঁড়িটার মাথা খেয়ে দিয়েছে। না, না, ওসব এখানে গান করা চলবে না।

তা তোমরা একথা গান্ধীজীকে বললে না কেন, এখানে তো ছিলেন এক রাত।

বলবো বলেই তো এসেছিলাম, কিন্তু কথা বলে দেখলাম লোকটা জাদু জানে, কথাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। শোন্ আসেমা, নিজের হিত বোঝ, ঐ কাফেরটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দে।

আমি বললাম, ভাই সাহেব, বাড়ীটা তো আমার, তোমরা হুকুম করবার কে।

দেখি তোর বাড়ী কি করে থাকে। বলে শাসিয়ে চলে গেল।

ওরা রুদ্ধশ্বাসে শুধায়, তারপরে?

তারপরে আর কি! রাতের বেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি চালে আগুন। লবের হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে এলাম। সে বলে, পিসি নেভাই, আমি বললাম, আর বীরত্বে কাজ নেই, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

তোমাদের চোখের সামনে বাড়ী পুড়ে গেল!

শুধু আমাদের চোখের সামনে নয়, তাকিয়ে দেখি আশে-পাশে অনেকগুলি লোক, তাদের সকলের চোখের সামনে।

কিরে ছুঁড়ি, এবারে বল বাড়ী কার?

যারা পোড়ায় তাদের, বলে উঠল লব।

একজন বলল, মার হারামজাদা বেটাকে।

আর একজন বলল, ঘরের মধ্যে বেগুনপোড়া হলেই আপদ চুকে যেতো।

তাতে তোমাদের কি লাভ হতো ?

একটা কাফের কমতো।

মেরে কত কমাবে মিঞাসাহেব, আমরা মার খেতে ভয় পাই না।

আরে, সেই কথাই তো বলছি সবাইকে, মাটির দোষেই হিঁদুরা ভীরু।

আমি চেষ্টা করি লবকে থামাতে, থামে না।

আরে সাহেব, তোমরাও তো এই মাটির মানুষ।

একজন মোল্লা বলে উঠল, আরে ছোঁড়াটা বলে কি, আমরা এই দেশের মানুষ ! আমরা তো আরব থনে আইছি।

ওদের দাবী শুনে লব হো হো করে হেসে উঠল।

হাস দিস যে বড় ?

তোমার কথা শুনে বুঝলাম সত্যি তোমরা আরব থনে আসছ।

এই বিদ্রূপে বিষম ঝগড়া বেধে গেল—যদিচ একতরফা।

কেউ বলে, ছোঁড়াটাকে নিকেশ করে ফেল, কেউ বলে ছুঁড়িকে মার। এমন সময়ে একজন বলে উঠল, ঐ ছুঁড়িটাই যত নষ্টের মূল। ওটার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আজ রাতেই নিকে করে ফেলি—বলে একটা তাগড়া জোযান লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো।

সাবধান—বলে লব এগিয়ে এসে দাঁড়ালো আমাকে আড়াল করে।

পথ ছাড়ো।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে লব।

মার ছুঁড়িটাকে।

না, না, ওটাকে জখম কবো না, ওটাকে আমি নিকে করবো।

তবে মার ছোঁড়াটাকে।

একসঙ্গে দু-তিন খানা লাঠি এসে পড়লো লবের মাথায়, আমি আগলাতে গেলে আমার মাথাতেও খান দুই লাঠি।

রুদ্ধশ্বাসে ওরা শুনে যায়।

তারপরে কি হল মনে নেই, লব আর আমি দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

তারপর, তারপর ?

যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম চৌমহানির হাসপাতালে পাশাপাশি তুখানা তক্তপোশে শুয়ে আছি। তুদিন আমরা নাকি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। ক্রমে সব শুনলাম—দাঙ্গাবাজরা আমাদের মৃত মনে করে ভয়ে পালিয়েছিল, ওদেরই মধ্যে কে একজন গিয়ে মহকুমা হাকিমকে খববটা পৌঁছে দিল। যখন তারা শুনলো যে লব গান্ধীজির লোক, অমনি হাকিম, পুলিশ সাহেব এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের নিয়ে এলো হাসপাতালে।

রুক্মিণী মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছলো।

বড়ি গুলো উল্টে দি—বলে উঠে গেল মলিনা, আড়ালে গিয়ে কেঁদে হাল্কা হয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ফিরে এলো। মানুষের সভ্যতাব বনিয়াদ গাঁথুনিতে পুরুষে বেশি বুকের রক্ত ঢেলেছে কি মেয়েছেলে বেশি চোখের জল ফেলেছে কে বলতে পাবে।

কদিন বাদে আমরা যখন সুস্থ হয়ে উঠেছি একদিন এলো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, লোকটা ইংরেজ, আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, তোমার বাড়ী মেরামত করে দেওয়া হয়েছে ফিরে যেতে পারো। তারপরে লবের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, ডাক্তারে বলছে দীর্ঘ বিশ্রাম দরকার, তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি, কি বলো।

লব বল্‌ল, আমি বাপুজির হুকুম ছাড়া এ জায়গা ছাড়তে পারি না।

তিনি তো জানতেন না যে এমন বিপদ ঘটবে।

তাহলে কি হয়—হুকুম হচ্ছে হুকুম।

বেশ তিনি অনুমতি দিলে যাবে?

হাঁ।

তিনদিন পবে ম্যাজিস্ট্রেট একখানা টেলিগ্রাফ হাতে করে এসে উপস্থিত, লবকে বল্‌ল—এই নাও ছাড়পত্র।

কি লিখেছেন তিনি?

টেলিগ্রামের ভাষাটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে—পাটনা থেকে লিখছেন **Passed with credit. Go home. Take rest. Await further instruction.**

Bapu.

তখন রত্নটি আর এক আপত্তি তুলল, পিসি, তোমাকে এখানে একা ছেড়ে যাবো না।

সে কি, ঘরদোর ফেলে যাবো কি!

একবার পুড়িয়ে ছিল আর একবার না হয় পুড়িয়ে দেবে।

আরে সে কথা ভাবছি নে, চেনা পরিচয় নেই হুট করে যাওয়া কি ভালো।

এমন মন্দই বা কি। গেলেই চেনা পরিচয় হবে, তোমার সঙ্গেও কি কদিন আগে চেনাপরিচয় ছিল! ছাড়লো না, নিয়ে এলো। সত্যি বউঠাকরুণ, তোমার পুত্রটি রত্ন।

এমন সময়ে মলিনা বলে উঠ্‌ল, ঐ নাও, তোমার রত্নটি এসেছে ভাই।

নীচে লবের কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছে।

কি রে লব, এতক্ষণে পাড়া বেড়ানো শেষ হ'ল ?

শুধু পাড়া বেড়ানো শেষ নয় পিসি, সমস্ত পাড়াটাই শেষ।

সে আবার কি !

এক কথায় বলা যায় না, তোমরা নীচে এসো, খেতে দাও, ধীরে সুস্থে সব বলছি। আমার নোয়াখালির পিসি কই ?

আছে রে আছে, খোয়া যায়নি।

তবে শীগ্‌গির নীচে এসে খেতে দাও, জোর খিদে লেগেছে।

সিঁড়িতে অনেকগুলি অবতরণমুখী পায়ের শব্দ।

৬৩

বাবা কি পড়ছেন ? বলে শচীন ঘরে ঢুকলো। সে তখনই স্কুল থেকে ফিরেছে।

এই যে শচীন এসেছ, বলে যজ্ঞেশবাবু চশমা জোড়া কপাল থেকে নামিয়ে নাকের উপরে যথাস্থানে রাখলেন।

কি কাগজ ওটা ?

সোনার দেশ সাপ্তাহিক, খুব জোর সম্পাদকীয় আজ লিখেছে, বসো শোনো। এ সব জোরালো প্রবন্ধ জোরে না পড়লে পুরোপুরি গুরুত্ব অনুভব করা যায় না, নাও শোনো।

শচীন বসলো, যজ্ঞেশবাবু আরম্ভ করলেন—"প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য পরোক্ষে সফল হয়েছে। কলকাতায় যদিচ মুসলমান সংখ্যালঘু তবে মুসলিম লীগ সরকারের বলে সংখ্যাগুরুর মতো বলীয়ান মনে করে হিন্দুদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু অপ্রস্তুত হিন্দুসমাজ প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা মার খেয়ে যখন রুখে দাঁড়ালো, পল্টনের সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল মুসলীম লীগের গুণ্ডাদের। তারা বুঝলো কলকাতায় সুবিধা হবে না, ফৌজ তলব করলেই সমস্ত দেশের দৃষ্টি পড়ে, তাই তারা বাংলাদেশের এক কোণে এমন একটি জেলা বেছে নিল মুসলমানের

তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সকলেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আমরা নোয়াখালি জেলার পৈশাচিক কীর্তির বিষয় বলছি। সেখানে মাসখানেক ধরে যে কাণ্ড চলল, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ, নাদির শা প্রভৃতিও তাতে লজ্জা পেতো। এমন সময় গান্ধীজি গিয়ে পড়াতে পিশাচের দাপাদাপি সাময়িক ভাবে শান্ত হল, কিন্তু এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তাতেই মুসলীমলীগের কর্তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হল পাকিস্তান হোক বা না হোক হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে নিরাপদে বাস করতে পারবে না কিম্বা এই কথাটাকেই অন্য ভাষায় বলা যায় পাকিস্তান না হতেই যদি এমন হয় পাকিস্তান হলে না জানি কি হবে। হিন্দুরা এখন পূর্ববঙ্গত্যাগে সঙ্কল্পিত, ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে যারা পারছে দেশত্যাগ করছে। অবশ্য মুখে কেউ এমন কথা বলছে না যে চিরকালের জন্য বিদায় হলাম, কেউ বলছে তীর্থ দর্শনে যাচ্ছি, কেউ বলছে অনেক কাল কলকাতার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হয় নি যাচ্ছি। তবে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষই গূঢ়ার্থ বুঝতে পারছে। উপরন্তু মুসলমানেরা বলছে, ভাই আবার ফিরেই যখন আসবে এত জিনিষপত্র নিয়ে গিয়ে কি লাভ—বলে যার যা ইচ্ছা কেড়ে রেখে দিচ্ছে, ফিরে এলে ফিরিয়ে দেব। আবার কেউ কেউ বলছে, তোমার বাড়ী ঘর আগলে রাখছি, অরক্ষিত ফেলে রাখলে বদমাইশেরা দখল করে নেবে। ধর্ম ও প্রাণরক্ষার্থে যারা গৃহত্যাগে উদ্যত সমস্ত কথাই মৌখিক অর্থে স্বীকার করে নিচ্ছে। এভাবে চললে গ্রীষ্মকালের আগেই পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য হবে—তখন আইনত পাকিস্তান হওয়া না হওয়া সমান। হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা বোদ্ধা ও সম্পন্ন তারাও হিন্দুদের দেশত্যাগের সমর্থক। প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে কুমিল্লা বার এসোসিয়ান প্রস্তাব গ্রহণ করে জানিয়েছে যে এমন অবস্থায় দেশ ভাগাভাগি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমরা গোড়াতেই বলেছিলাম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য পরোক্ষে সফল হয়েছে।"

পড়া শেষ করে চশমাজোড়া আবার নাকের উপর স্থাপন করলেন, পড়বার সময়ে চশমা কপালে উঠেছিল। দৃষ্টি বিজ্ঞানের এ এক অদ্ভুত নিয়ম, পঞ্চাশে চশমা ছাড়া যে ব্যক্তি পড়তে পারে না, আশীর কাছে গিয়ে পড়বার জন্যে তার চশমার প্রয়োজন হয় না। বোধহয় তখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় বলেই এমন ঘটে থাকে।

শুনলে তো, কেমন লাগলো?

শচীন বললো, কথাটা সবাই মনে মনে অনুভব করছে তবে কেউ ছাপার অক্ষরে এমন স্পষ্ট করে বলেনি। এই প্রথম।

শুধু নোয়াখালি জেলায় নয় শচীন, রেলস্টেশনে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাই কিনা গাড়ী বোঝাই হিন্দু চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর এ শহর থেকেও দেশত্যাগীর সংখ্যা কম নয়, দেখছি সব, তবে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি গতি, বিশেষ মেয়েরা জানলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। কিন্তু আজকে শ্রীমান্ লব পাড়া বেড়িয়ে এসে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে, তার মা আর পিসিমাকে বলেছে পিণ্টু, পটল, রন্তা, শম্ভু সকলের বাড়ী খালি, আরও অনেকে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে আছে। মেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তোমাদের স্কুলের অবস্থা কি রকম?

শহরের অবস্থাই স্কুলে প্রতিফলিত, রোজ আট-দশখানা করে T. C. নেবার দরখাস্ত পড়েছে।

তোমাদের স্কুল ভেঙে যাবে বাবা, এত কষ্টের প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে পারবে না, তবে প্রশ্ন হচ্ছে কবে।

শচীন বলল, নূতন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন নাকি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গুটোবার ফার্মান নিয়ে এসেছেন।

সদাশয় লোক, আমের শাঁসটুকু শুষে নিয়ে এখন বলছেন, তোমরা তোমাদের জিনিস নাও।

কেন বাবা, ঐ আঁটি থেকে তো নূতন গাছ হতে পারে।

পারে বই কি, তবে ইংরাজে চুষে যখন ফেলে দেয় তখন নূতন অঙ্কুর গজাবার শক্তিটুকুও আর থাকে না। দেখো শচীন, বেশি দিন আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না, পুরানো কলেজে লিখে দেখো কোন চাকরি খালি আছে কিনা।

রিপন কলেজে চাকুরি পাওয়ার বিশেষ বাধা হবে না। বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল রবিবাবু আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তবে আর কি, তবু একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে রেখো।

আচ্ছা।

আর দেখো একটা বাসারও সন্ধান রেখো, ক্রমেই ভিড় বাড়ছে।

অরবিন্দর বাসাটা তো ছাড়িনি, মাসে মাসে ভাড়া গুণে যাচ্ছি।

বেশি দিন ফাঁকা রেখো না, ফাঁকা স্থান পূরণ করে তোলবার দিকে প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। যাও এখন গিয়ে কাপড় বদলাও। শোনো বউমাকে বলো, আসেমা মেয়েটির যেন আদর-যত্নের অভাব না হয়। ওকে নিয়ে একসঙ্গে ওরা খেয়েছে শুনে যার পর নাই খুশী হয়েছি, মলিনাকে বলো তাকে যেন রাত্রে কাছে শোয়ায়।

আচ্ছা বাবা, ঐ সমাজে এমন মেয়ে হয় কি করে ?

কেন হবে না বাবা, ও তো রাজনীতিক নয়।

তাতে কি !

রাজনীতিতে মনের বিকার ঘটায়।

কিন্তু গান্ধীজী ?

তিনি রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। আর আসেমার মতো মেয়ে পুরুষ অসংখ্য আছে। মুসলমান সমাজ যদি শুধু গুণ্ডার সমাজ হতো তবে এতকাল কি টিকতে পারতো। তবে যারা রাজনীতি করে তাদের জাত আলাদা—রাজনীতি মনুষ্যত্বের আস্তাকুঁড়।

শচীন বলল, দেখা যাক নূতন বডলাট কি বলে।

যজ্ঞেশবাবু হেসে বললেন, তোমার এখনো দেখছি লাটবেলাটের উপরে ভরসা আছে। সুরেন্দ্রবাবুর রাজনীতির দিন চলে গিয়েছে।

সে কথা সত্য, তবে শুনছি নূতন বড়লাট এসেছেন ভাবতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে।

কথাটা মিথ্যা নয়, তবে সেই ব্রহ্মদৈত্যের গল্প জানো তো, গাছটা ছেড়ে যেতে যখন বাধ্য হয় একটা ডাল ভেঙে দিয়ে চিহ্ন রেখে যায়। আমি বেশ বুঝতে পারছি ভারতের এই প্রাচীন অশথ গাছের একটা ডাল ভেঙে দিয়ে পাকিস্থান কায়েম করে যাবে।

সে দাবী তো উঠেছে জিন্না সাহেবের দিক থেকে।

আরে দাবী করাতে জানলেই দাবী ওঠে। আচ্ছা এখন ভিতরে যাও, কাপড়-চোপড ছাড়ো গিয়ে।

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে হঠাৎ একদিন কুশ এসে কাঁধের থলিটা মেঝেতে রেখে উচ্চস্বরে বল্‌ল, শুনলাম দাদা (সন্ধির শর্তানুযায়ী অপরের সম্মুখে দাদা) এসেছে।

মলিনা, রুক্মিণী প্রভৃতি সবাই ছুটে এলো। কুশ সবলকে প্রণাম করলো।

রুক্মিণী শুধালে, কোন্ শ্যাওড়া গাছ থেকে হঠাৎ নেমে এলে ?

মলিনা বল্‌ল, শ্যাওড়া গাছে যারা বাস করে তাদের রঙটাও এত কালো হয় না।

কুশ সগৌরবে বল্‌ল, কয়লাখনি অঞ্চলে কাজ করছিলাম।

কি কাজ রে ! কয়লা কাটিস নাকি ?

সে তোমরা বুঝবে না।

তার মা বল্‌ল, আমাদের বুঝে কাজ নেই, এখন চল্ কাপড় ছাড়বি।

ছাড়বো এখন, তবে দাদাটা কোথায় ?

আছে কোথাও, আসবে এখনি।

কুশ গলার স্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মা ঐ মহিলাটি কে ?

ওঁর বাড়ী নোয়াখালি জেলায়—এই বলে সংক্ষেপে তার পরিচয় দিয়ে বল্‌ল, লব ওকে পিসি বলে, তুইও বলবি। ওখানকার সমস্ত খবর লবের মুখেই শুনতে পাবি। যা এখন দাদুকে প্রণাম করে আয়।

বাবা ?

তিনি তো স্কুলে গিয়েছেন।

আহারান্তে লবের সঙ্গে কুশের বিষম তর্ক বেধে গেল।

মলিনা বল্‌ল, অনেক দিন পরে আবার লব-কুশের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, সহজে থামছে না।

কুশ বলছিল, দাদা এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনো ক্ষান্ত হবে না।

আরে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হয়ে গেল আর এইসব সামান্য ব্যাপারে থামবে না !

থামবে না এই জন্যে যে তোমাদের সমাজ বুর্জোয়া-ক্যাপিটালিস্ট-কলোনিয়াল সোসাইটি, ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা এর নিত্য লক্ষণ।

ভাই কুশ, তোমরা ফরমুলায় মনোভাব প্রকাশ করে থাকো তাই আমাদের মতো অজ্ঞদের পক্ষে বুঝে ওঠা সহজ হয় না।

হয় না এই কারণে যে তোমরা বৈজ্ঞানিক-বস্তুবাদ পড়োনি।

আবার ফরমুলা।

আচ্ছা নাও, এবার তোমাদের বোধগম্য ভাষাতেই বলছি, থিসিস, এন্টিথিসিস, সিন্থিসিস—এই তিন হচ্ছে ইতিহাসের চিরন্তন নিয়ম।

কুশ, তোমার বিশ্বাস এগুলো সাধারণের বোধগম্য ভাষা ?

দাদা এসব জটিল বিষয় এর চেয়ে সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এক কাজ করো মার্ক্সের দি ক্যাপিটাল বইখানা পড়ো।

তুমি পড়েছ ?

তুমি কি বেদ পড়েছ ?

পড়িনি তবে ঘন ঘন বেদের দোহাই দিইনে।

তবু তো বেদ অভ্রান্ত মনে করে মেনে চলো।

বুঝেছি কুশ, তোমাদেরও সেই অবস্থা। এখন বেদও থাক, দি ক্যাপিটালও থাক। তার চেয়ে চলো একবার পাড়াটা ঘুরে আসি। পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বোধকরি তোমাদের পার্টির অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

লবের কথা শুনে কুশ হো হো করে হেসে উঠল।

নাঃ, এখনো তোমার অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গিয়ে পড়েনি।

তার মানে ?

তার মানে তোমার হাসিটা 'মধ্যবিত্ত হাসি।'

হাসিরও কি শ্রেণীভেদ আছে নাকি !

আছে বই কি, সে তত্ত্ব না হয় যেতে যেতে আলোচনা করা যাবে।

কয়েক দিন পরে কুশ থলিটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে সকলকে সংক্ষিপ্ত প্রণাম সেরে রওনা হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছিস প্রশ্নের উত্তরে জানালো আপাতত পার্টি অফিসে, তারপরে যেখানে হুকুম হয়। আর বেশি প্রশ্ন কেউ করলো না, তাদের অভিজ্ঞতা এই যে উত্তর পাওয়া যায় না।

কুশ বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আসেমা বলল, বউ-ঠাকরুণ, বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাকলো না, আমি বাইরের লোক আর কতকাল বসে থাকবো ?

কাছেই বসেছিল মলিনা, বলল, ভাই জমানা বদল গিয়া, যুগান্তর যখন উপস্থিত হয় ঘরে বাইরে উপরে নীচে তখন ওলট-পালট হয়ে যায়, ঘরের ছেলে হয়ে যায় পর, পরের ছেলে হয়ে যায় আপন। নইলে আর বিপ্লব বলেছে কেন ?

রুক্মিণী বলল, ভাই ঠাকুরঝি, আমার দুঃখ কেউ বোঝে না, একটি ছেলে দিলাম গান্ধীকে, আর একটি ছেলে দিলাম পার্টিকে।

আসেমা বলল, বউ ঠাকরুন দুঃখের রীতিই এই, প্রত্যেকেই ভাবে তার দুঃখ কেউ বুঝলো না, কিন্তু ভেবে দেখে না যে সব দুঃখই এক, তার ছোট বড় নেই। এক ফোঁটা বিষ আর এক ছটাক বিষে পরিণামে তফাৎ আছে কি।

বউদি, কতবার বলেছি তোমাদের ওদের বিয়ে দাও, বিয়ে দাও তখন শুনলে না এখন দেখো।

মলিনা ভাই, এদের বিয়ে দিলে লাভের মধ্যে হতো যে বউ দুটোও আমাদের সঙ্গে এখানে বসে চোখের জল ফেলতো।

যা বলেছ ভাই বউদি, দেশমাতৃকা যখন তেমন করে ডাক দেন, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন বাপ মা স্ত্রী পুত্র কাউকে আর মনে পড়ে না।

মলিনার উক্তিটা ব্যঙ্গ না স্বাঙ্গ কেউ জানতে পারলো না।

আসেমা বল্‌ল, কিন্তু বাপুজি তো স্ত্রী পরিত্যাগ করেন নি।

তার চেয়ে বলো স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেননি, জেলে জেলে ঘুরে ঘুরে অবশেষে জেলেই দেহরক্ষা করেছেন। গান্ধীজিকে মহাত্মা হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।

শচীনের কাছে ওরা শুনতে পায় স্কুলটি প্রায় ভেঙে যাওয়ার মুখে, শহর থেকেও লোকে পালাচ্ছে তবে মন্দর ভালো এই যে যত হিন্দু যাচ্ছে তত মুসলমান আসছে না। একদিন কথা প্রসঙ্গে শচীন জানালো, রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাকে চাকুরি নেবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

রুক্মিণী শুধালো, কি উত্তর দিলে ?

আপত্তি করিনি, তবে জানিয়েছি কিছুদিন দেরী হবে।

দেরীতে আপত্তি নেই, তবে হাতছাড়া না হয়।

না সে ভয় নেই।

সেই ভালো দাদা, চলো আমরা সকলে কল্‌কাতা চলে যাই, এখানে আর কার আশায় থাকা।

কেন লব কুশ ? বল্‌ল আসেমা, তার সামনেই কথা হচ্ছিল।

মলিনা বল্‌ল, তারা আর এখানে আসছে না, আর এলেও কলকাতাতেই আসবে।

মলিনা জানতো অরবিন্দর বাসাতেই তারা গিয়ে থাকবে। তার আনন্দের সেটা আসল কারণ। পাখী উড়ে গেলেও দু'একটা পালক তো পড়ে থাকে কুলায়ে।

এমন সময়ে যজ্ঞেশবাবু একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন, লব কোথায় রে ?

লব গৃহান্তরে ছিল, এই যে দাদু আমি।

এই নাও পরোয়ানা এসেছে—Meet me at Sodepur Asram. Bring Asema. Shall have to go Noakhali. Bapu.

নাও, আর কি পোটলাপুটলি বাঁধো গিয়ে।

এ পরোয়ানার উপরে আর কথা নেই।

পরদিন প্রাতে মা ও পিসিমাকে কাঁদিয়ে নিজে ও আসেমা কেঁদে (একজন প্রকাশ্যে একজন আড়ালে) কল্‌কাতার গাড়িতে লব ও আসেমা রওনা হয়ে গেল। যজ্ঞেশবাবু স্বয়ং স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলেন।

সেদিন রায়-বাড়ীতে বিজয়ার ছায়া।

ভারতের বড়লাট লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন প্রধান মন্ত্রী এটিলির কাছে থেকে ঢালাও ফার্মান নিয়ে এসেছেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বৃটিশরাজ্য গুটিয়ে ফেলতে হবে। ব্যক্তিগত কারণে বড়লাটের মতে সময়টা কিছু দীর্ঘ হল। তখন চুপ করে থাকলো, সেনাপতি মানুষ ঝোপ বুঝে কোপ মারতে অভ্যস্ত। মাউণ্টব্যাটেনের তখন একাদশে বৃহস্পতি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিজয়ের মালা তখনো কণ্ঠে শিশিরসিক্ত, তিনি ইংলণ্ডের রাজবংশের আত্মীয়; সুপুরুষ, মিষ্টহাসি, শিষ্টভাষী, অসামান্য কর্মকুশলী, এবং ফেরেপবাজ। এই শেষোক্ত গুণটা অন্যান্য গুণে ঢাপা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু সেটা চাপা-পড়া আগুন, তার চেয়ে কমও নয় আবার বেশিও নয়; এই গুণটি যেখানে কম বেশি সমান-সমান মিশন তার কখনো পরাজয় ঘটে না, মাউণ্টব্যাটেনেরও ঘটলো না। তিনি দেখলেন ১৯৪৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে নৌসেনানী মধ্যে তাঁর সিনিয়রিটি seniority খোয়া যায়—ফার্স্ট সী লর্ড First Sea Lord, নৌ সেনানীর সর্বোচ্চ পদ, পিতৃপরিত্যক্ত এই পদে অধিষ্ঠান হতে পারলেই তাঁর সমস্ত ঐহিক কামনা সিদ্ধি হয়। বিষয়টা কিছু বিস্তারিত ভাবে বলতে হল, কারণ এই জন্যেই ১৯৪৮কে ১৯৪৭-এ এগিয়ে আনা, পাকিস্তান কায়েম, এক বছর বিলম্ব হ'লে পাকিস্তান না হ'তেও পারতো; তাড়াতাড়ি র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক রোয়েদাদ দান; সে যেমন বিচিত্র তেমনি করুণ, কারো রান্নাঘর পাকিস্তানে তো বৈঠকখানা হিন্দুস্থানে, কারো পুকুরের পূবদিকের ঘাট পাকিস্তানে তো পশ্চিম দিকের ঘাট হিন্দুস্থানে, আর এই জন্যেই পাঞ্জাবে মুসলমান আর শিখে হিন্দুতে মিলে ছয়লক্ষ লোকের অকারণে নৃশংস ভাবে নিধন। এই সমস্তর মূলে ঐ এক বৎসরে সিনিয়রিটি হারাবার আশঙ্কা। কিন্তু উপায় কি? উপায় ভারত খণ্ডন বা পাকিস্তান কায়েম, তাছাড়া মুসলীমলীগ সন্তুষ্ট ও রাজি হবে না। এদিকে "হিন্দু কংগ্রেস" পাকিস্তান বিরোধী। জিন্না চান ষোল আনা পাকিস্তান। সেনাপতি হিসাবে বড়লাটের অভিজ্ঞতা এই যে ষোল আনা চাইলেও শেষে আট আনাতেই রাজি হয়। হ'লও তাই, শেষ পর্যন্ত পোকায় খাওয়া পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন জিন্না। কিন্তু হিন্দু কংগ্রেসের ভাবগতিক ভালো নয়, তারা দেশখণ্ডনকে অপরাধ ও পাপ বলে। অপরাধ বলে নেহরু প্যাটেলের দল, পাপ বলেন গান্ধী। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে তার ভয় ছিল, তিনি গররাজি তো সবাই গররাজি। সাক্ষাৎ করলেন গান্ধীর সঙ্গে, টিপে দেখলেন উপরটা বেশ নরম, তবে ভিতরে গ্রানিটস্তরের কাঠিন্য। না এঁকে দিয়ে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ইনি যত সম্ভব সত্বর দিল্লী ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল, তখন নেহরু প্যাটেলদের হাত করা সহজ হবে। এ দুজনকে টিপে দেখলো উপরে কঠিন ভিতরে বেশ নরম। তখন ঐ আন্তরিক কোমলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মুসলমান শিখে দেশব্যাপী হানাহানি, রক্তপাত গৃহদাহ নারীহরণ প্রভৃতির এমন উজ্জ্বল চিত্র আঁকলেন যা একমাত্র সর্বঘাতী সেনাপতির পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য এ নিবারণের জন্যে মৃদু অস্ত্রচিকিৎসা আবশ্যক, তবে তা যত দ্রুত সেরে ফেলা যায় ততই মঙ্গল, তখন আর বিবাদের কারণ থাকবে না, তখন হিন্দু মুসলমান শিখে আগ্রহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে; অবশেষে করলোও তাই, তবে সকলেরই হাতে ছোরা। "হিন্দু কংগ্রেস" রক্তপাতের চিত্র দেখে ভীত হ'ল। তখন তাদের মৌন সম্মতি আর জিন্নার সোচ্চার সম্মতি নিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে রাজি করাবার উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে রওনা হলেন। সেখানেও ঐ একই সূত্রে একই চিত্রে ১৯৪৮এর জুনকে ১৯৪৭এর আগস্টে এগিয়ে আনতে এটলিকে রাজি করিয়ে ফেললেন। চার্চিল অবশ্য ঘোরতর আপত্তি করলো, তবে তখন ক্ষমতায় আসীন নন, অক্ষমের আপত্তিতে কেউ কর্ণপাত করে না। বড়লাট ফিরে এসে পক্ষগণকে সুসমাচার জানালো, জিন্নার শিবিরে আনন্দ ধ্বনি উঠলো; হিন্দু-কংগ্রেস ভারতখণ্ডন অন্যায় অনুচিত অপরাধ গর্হিত, তবে কিনা অবস্থাগতিকে ইত্যাদি। ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে গান্ধীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলো না, কিম্বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো প্রযোজন মনে করলো না। "যদি কুল পাই তরণীগরব রাখিতে না চাহি কিছু।" কিছুকাল পরে পত্রযোগে খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছলো, ক্ষণকাল নীরব থেকে তিনি শুধু বললেন, তবতো হাম খতম হো গিয়া। ছায়া পূর্বগামিনী। দোসরা জুন বড়লাট বেতার মারফৎ জাতির উদ্দেশ্যে সুসমাচার জ্ঞাপন করলেন: পনেরোই আগস্ট ভারতে বৃটিশ রাজ্য শেষ হবে, আর সেই দিন থেকেই ভারতবর্ষে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম হবে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। এজন্য সামান্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হবে পাঞ্জাবে ও বাংলায়, আসামে নামমাত্র, আর কোথাও ছুরির ছোঁয়াটুকু লাগবে না। ঠিক কোন্ অংশ পাকিস্তানে পড়বে এখনো স্থির হয়নি, ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে যাবে, মাভৈঃ।

এ পর্যন্ত ইতিহাসের কথা কিছু বিস্তারিত ভাবে বলতে হল, আর এই ইতিহাস যার জন্যে বর্তমান আকার ধারণ করলো, সেই মাউন্টব্যাটেনের চরিত্রও কিছু সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করতে হ'ল। না করে উপায় ছিল না, কারণ আমাদের উপাখ্যানের নাম পনেরোই আগস্ট; ১৯৪৮ সালের জুন মাসে মূল ঘটনার তারিখ হ'লে

উপন্যাসের নাম অন্য কিছু হ'তো, হয়তো হ'তো তেইশে জুলাই।

বড়লাটের অমৃতময়ী মাভৈঃ বাণী শুনে পূর্ববঙ্গের যে-সব হিন্দু এতদিনে ক্ষীণ ধারায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসছিল এবারে তাদের ধারা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। দিনাজশাহীর রায় পরিবারও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো, লব অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে সোদপুরে গান্ধীর কাছে।

৬৫

রায়বাড়ীতে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হতে সুরু করেছে, ইতিমধ্যেই ভারি মালগুলো পুরানো বিশ্বাসী চাকর তিলকধারীর সঙ্গে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো অরবিন্দর বাসায় তার বিশ্বাসী চাকর কালুর জিম্মা করে দিয়ে সে যেন চলে আসে। কালুকে বিদায় করে দেয়নি শচীন, অরবিন্দর বাড়ী তার জিম্মা। এদিকে মলিনা, রুক্মিণী আর ঝি চাকরে মিলে বাঁধাছাদা চলতে লাগলো, দুপুরুষে অর্জিত সমস্ত জিনিস তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আর প্রয়োজনই বা কি, সকলের মনে বিশ্বাস ছিল দু'চার মাস পরে বড় জোর বছর খানেক হতে পারে আবার ফিরে আসবে, এ যেন লম্বা মাপের পূজোর ছুটিতে দেওঘরে যাত্রা, সেখানে যজ্ঞেশবাবুদের একটা বাড়ী ছিল। তবু তাদের মনে কোন আনন্দ ছিল না, অনেক কারণে।

ছেলেদুটো এই ওলট-পালটের বাজারে কোথায় রইলো কেউ জানে না, বড় জন সম্বন্ধে তবু খানিকটা নৈশ্চিন্ত্য আছে, গান্ধীজির কাছে থাকবে সে। ছোট জন বলেছিল যাবে কয়লাখনি অঞ্চলে, অঞ্চল বলতে ঠিক কোথায় বোঝায় বুঝতে পারেনি বাড়ীর লোক। তারপরে চিরকালের বাড়ী ত্যাগ করে যাওয়া, যদিচ খুব সম্ভব ক্ষণ-কালের জন্যে, তবু মনে কাঁটা বিঁধতে থাকে। চিরকালের সঙ্গে ক্ষণকালের নিত্য রেষারেষি। তারপরে শহরের যারা যেতে পারলো না তাদের শঙ্কিত দৃষ্টি, বিমর্ষ মুখ, অকথিত অনুরোধ, যাবেন না আমাদের ফেলে—মলিনাদের বুঝতে বাকি থাকে না। সব শুদ্ধ মিলে সম্মুখে একটা দুঃখের কুয়াশা। যারা যেতে পারলো না তাদের ভাবটা এই যে ইঁহা লোকে যাচ্ছে বটে কিন্তু যতক্ষণ রায়মশায় আছেন আমাদের ভাবনা নেই, তিনিই এখন আমাদের কর্তা।

একদিন সকালবেলা যজ্ঞেশবাবু শচীনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের স্বদেশী স্কুল আর কলেজটার কি ব্যবস্থা হল ?

শচীন জবাব দিল—বেশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হল না, স্কুলের শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্র চলে গিয়েছে, আছে মুসলমান আর কিছু হিন্দু।

আর শিক্ষকদের মধ্যে ?

সেখানেও সমস্যা হাল্কা। নৃপতি, রমেন, পণ্ডিত মশায় তুইজন সবাই ছ'মাসের ছুটি নিয়ে কল্‌কাতা চলে গিয়েছেন।

তারপরে ফিরে এলে ?

আপনিও যেমন—তারা আর ফিরছে না।

এত লোক গেলে চাকুরি যোগাবে কে ?

সে জন্য ভাববেন না বাবা, পশ্চিমবঙ্গের স্কুল থেকে মুসলমান শিক্ষক মৌলভি সাহেবরা চলে এসে এদের জায়গা করে দিয়েছে।

এ একরকম বদলাবদলি, কি বলো ?

রকম অনেকটা তাই।

কিন্তু স্কুলের ভার একজনকে দিয়ে যেতে হবে তো ?

হবে বইকি, ভূপতি এখন হেডমাস্টার আর কলেজের অধ্যক্ষ।

তুটো কাজ চালাতে পারবে কি ?

তুটো কাজ চালাতে হবে না বলেই ভার নিয়েছে, কলেজে বাড়ীটা ছাড়া আর কিছু নেই, না অধ্যাপক না ছাত্র।

হঠাৎ এমন হতে গেল যেন ?

ওদের ধারণা হয়েছে ১৫ই আগস্টের পরে পাকিস্থানী সরকার কায়েম হওয়া মাত্র আগে গ্রেপ্তার করবে বয়স্ক মধ্যবিত্ত হিন্দু ছাত্রদের। ওরাই ইংরাজকে তাড়িয়েছে আবার ছাড়া থাকলে ওদের তাড়াবে!

এতে ইংরাজের রাগ হতে পারে কিন্তু মুসলীমলীগের তো রাগবার কারন নেই, হিন্দুরা মরলো, লাঠি খেলো, জেলে গেল আর ওরা গোঁফে তা দিয়ে মুফতে পাকিস্থান আদায় করে নিল।

ওটা ঠিক ওদের মনোগত ইচ্ছা ছিল না।

ওটা মানে কোন্‌টা ?

ইংরেজবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা।

তবে কি চায় ওরা ?

ওরা চায় অধীনে স্বাধীন হতে।

শচীনের কথায় যজ্ঞেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, বেশ বলেছ।

হাসবেন না বাবা, আমাদেরও অনেকের অনুরূপ মনোগত ইচ্ছা।

তাহলে ভূপতি যাচ্ছে না, হাঁ ও চিরকালের ডাকাবুকো।

ও বলে এদেশ অনেক রকম রাজগী তো দেখলাম, আরব, আফগান, পাঠান, তুর্ক, ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, বৃটিশরাজ, তবু তো আমরা টিকে আছি, দেখা যাক না মুসলীমলীগ কতদূর কি করতে পারে।

হাঁ ও সইতে পারবে, বিয়ে থা করেনি, একা মানুষ। কিন্তু শচীন, আমাদের বাড়ীতে থেকে যে দশটি ছেলে স্কুলে পড়তো তাদের কি ব্যবস্থা করলে?

অনেকটা ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করেছে, কালকে পাঁচজনে টি, সি'র (T.C.) জন্য দরখাস্ত করেছে,—

কাজেই এখন হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে রইলো বাকি পাঁচ।

তাদের থাকবার খাওয়ার ব্যবস্থা স্কুলের হস্টেলে করে দেব, খরচটা আমরাই দেবো।

আর একটা খরচ চালাবার ভারও তোমার উপর রইলো, শৈলেন খুড়ো তো মাস দুই হল কাশীবাস করবার জন্যে গিয়েছেন। তাঁর মাসিক খরচ যেন নিয়মিত যায়। আমার অভাব হলেও যেন বন্ধ না হয়। দেখো শচীন, আমার বয়স হল আতাশি বছর, এতদিন তো বেঁচে থাকবার কথা নয়—যাক তবু আছি। এক দুশ্চিন্তা রইলো মলিনার জন্যে, মেয়েটি যেমন ভালো, তেমনি মায়ালু আর তেমনি দুঃখী।

আচ্ছা বাবা, ভালো লোকেরাই দুঃখী হয় কেন।

তারা হয়তো সত্যই দুঃখী নয়, যদিচ আমরা বাইরে থেকে সেইরকম মনে করি।

কিন্তু সংসারটাই কি দুঃখময় নয়?

দুঃখময় বইকি, তবে কি জানো মৌমাছির চাকটা মৌমাছিময়, একটার কামড়ে মানুষ অস্থির হয়, সবগুলোতে কামড়ালে মৃত্যু নিশ্চিত তবু মধুয়াল চাক থেকে মধু যোগাড় করে কি করে?

শচীন প্রতিধ্বনিতে বল্‌ল, কি করে?

কৌশলে।

ভগবান দুঃখের চাক সৃষ্টি করে মধুতে ভরে দিয়েছেন, যে কৌশল জানো যোগাড় করে নাও মধু।

এ তাঁর খামখেয়াল।

তুমি যাকে খামখেয়াল বলছ ভক্তরা তাকে বলে লীলা, জ্ঞানীরা তাকে বলে মায়া।

আর কর্মীরা ?

সব উত্তরই কি আমার জানা থাকবে! তারা হয়তো বলে বাধা। হিমালয়ের বাধালঙ্ঘন করে তবেই তো ধর্মরাজকে পৌঁছতে হয়েছে স্বর্গে।

পিতাপুত্রে এ আলোচনা আরও কতক্ষণ চলতো, জানি না এমন সময়ে রাস্তা থেকে বহুকণ্ঠের ধ্বনি ভেসে এসে ঘরে ঢুকলো—ভারত-মাতা কি জয়।

ও আবাব কারা ?

এ অঞ্চলের হিন্দু পুলিসের দল পশ্চিমবঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে চলেছে।

আর মুসলমান পুলিশ আসছে না ?

আসছে বইকি। তারা এ দেশে পৌঁছে হাঁক দিচ্ছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। আর শুধু পুলিশ নয়, অফিসারদের মধ্যেও অদলবদল হচ্ছে আর—

আরও আছে নাকি!

আছে বইকি। পাকিস্তানী কর্তাদের বাঙালী মুসলমান পুলিশের উপর পুরো আস্থা নেই, মুসলমান হ'লেও বাঙালী বটে তো, হিন্দু-মুসলমান এক ভাষাতেই কথা বলে—তাই কিছু কিছু পাঠান ফৌজ আর পাঠান পুলিশ আনিয়ে নিচ্ছে, তবে কাজটা গোপনে চলছে, পাছে বাঙালী মুসলমান পুলিশে ভাবে তাদের অবিশ্বাস করা হচ্ছে।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, মনে হচ্ছে বেশ কায়েমী রকম ব্যাপার।

কায়েমী বইকি বাবা, জিন্না সাহেবের ভাষায় পোকায় কাটা পাকিস্তান হলেও পাকিস্তান বটে তো।

পিতাপুত্রে এ রাজনৈতিক আলোচনা কতক্ষণ চলতো ঠিক নেই। এমন সময়ে মলিনা ঘরে প্রবেশ করে বলল, বাবা, তোমার কি কি জিনিসপত্র যাবে বলে দাও, গুছিয়ে দিই।

বসো মা বসো, এত তাড়া কিসের।

তাড়া নয়। কাল যাবে আর একটা দিন মাত্র, পরশু এতক্ষণ তো ট্রেনে।

তোমাদের তাড়া অবশ্যই আছে কিন্তু আমার তাড়া নেই।

সে তো বুঝতেই পারছি। খালি হাতে পায়ে কলকাতা পৌঁছে বলবে, মলি আমার ও বইখানা কোথায়, আমার নোট-বইগুলো ফেলে এসেছিস—সে হবে না। এখনি বলে দাও, কি কি যাবে তোমার সঙ্গে।

কিছুই যাবে না।

তবে।

তবে এই যে আমি যাবো না।

না বাবা, এখন ঠাট্টার সময় নয়।

নিশ্চয় নয়।

তবে বলে ফেলো সঙ্গে কি নিতে হবে।

কিছুই নয়—কেবল, আমি যাবো না, এখানে থাকবো।

তাঁর কথা শুনে শচীন, মলিনা, দরজার কাছে দণ্ডায়মান রুক্মিণী একসঙ্গে বলে উঠল—সে কি কথা!

না শচীন, আমার যাওয়া হবে না।

কেন?

এই জন্যে যে শহরে হিন্দু যারা থাকলো আমার ভরসাতেই তারা আছে।

সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, তোমার উপরে ভরসা রাখবে এমন হিন্দু থাকবে না।

বলো কি!

যথার্থ বলছি, সব পাড়াতে আমার যাতায়াত, আমার ছাত্ররা বিভিন্ন পাড়া থেকে আসে। তোমার চেয়ে বেশি খবর আমাকে রাখতে হয়।

তুমি কি বলতে চাও শহর হিন্দু-শূন্য হয়ে যাবে! কেন?

ভয়ে।

কেন, কায়েদেআজম তো সকলকে অর্থাৎ সংখ্যালঘু হিন্দুদের অভয় দিয়েছেন।

কিন্তু তাতে যদি তারা অভয় না পায়।

পিতাপুত্র যখন কথা বলছিল মলিনা রুক্মিণী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। প্রথম কথা বল্‌ল মলিনা, বলল, হিন্দুশূন্য শহরে কাকে ভরসা দেবার জন্যে তুমি থাকবে শুনি!

যদি একজন হিন্দুও না থাকে তবু আমাকে থাকতে হবে।

তার মানে?

তার মানে এই যে পাকিস্তান যে শেষ পর্যন্ত হল আমিও সে জন্য দায়ী।

মলিনার তর্কের রোখ চেপে গিয়েছিল, কেন তুমি কি নেহরু, না সর্দার প্যাটেল, না রাজেন্দ্রবাবু?

বিবেচনা করলে বুঝতে পারবে তাঁদের চেয়েও আমার দায়িত্ব বেশি।

মলিনা বলে উঠল, তুমি হাসালে বাবা।

সমস্তটা শুনলে হাসি না পেয়ে আমার জন্যে কান্না পাবে।

তবে না হয় সমস্তটা শোনাও।

গান্ধীজি সরাসরি পাকিস্তান অস্বীকার করলে বড়লাট ধরলো নেহরু, প্যাটেল,

রাজেন্দ্রবাবুকে, জানে যে এরাই এখন দেশের কর্ণধার। অনেক টানা-হ্যাঁচড়া করে ভারতখণ্ডন অত্যন্ত গর্হিত, পাপ বল্লেই চলে প্রভৃতি প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান তাঁরা স্বীকার করে নিলেন। কই আমি তো সামান্যতম প্রতিবাদটুকুও করিনি।

তুমি তো ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নও।

নই কিন্তু একটা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, কংগ্রেসের প্রত্যঙ্গ বটে তো। কাজেই পাকিস্তান হওয়ার দায়িত্ব আমার উপরেও অর্শেছে। কই আমি তো আচার্য কৃপালনির মতো পদত্যাগ করিনি, জয়প্রকাশের মতো দলবল নিয়ে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বের হয়ে আসিনি। এখন দায়ী নয় বললে চলবে কেন ?

এবারে শচীন আরম্ভ করলো, জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের যদি দায়িত্ব থাকতো তবে অনেক জেলার প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতো। কেউ তো করেনি। কংগ্রেসের নীতি-নির্ধারণের ভার তোমার উপরে নয়—তাদের নীতি পালন কববার দায়িত্ব তোমার উপরে, আইনত তুমি নির্দোষ।

তোমাব কথা সত্য শচীন, আইনত আমি দায়ী নই কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব এড়াই কি করে ?

নৈতিক দায়িত্বের তর্ক যদি তোলো তবে গান্ধীজিরও নৈতিক দায়িত্ব আছে।

হয়তো আছে কারণ নেহরু প্যাটেল রাজেন্দ্রবাবু তাঁর হাতে তৈরি। তবে তাঁর দায়িত্ব তিনি কি ভাবে পালন করবেন বিচার করবার ভার আমার উপরে নেই। তাই যে পাকিস্তান কায়েমে আমার নৈতিক দায়িত্ব আছে, সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অধিকার আমার নেই।

কিন্তু এখানে থাকবার বিপদ আছে জেনো, বাবা।

সেই জন্যেই তো শচীন আরও বেশি করে থাকা আবশ্যক। যাও বউমা, তোমরা গোছগাছ করে নাও গে। পাকিস্তান কায়েমের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে আমিও হয়তো গিয়ে জুটবো, ভয় পেয়ো না।

পুত্রের অনুরোধ-উপরোধ, অনুনয়-বিনয়, পুত্রবধূ ও কন্যার কান্নাকাটি কিছুতেই বৃদ্ধের সঙ্কল্পকে টলাতে পারলো না। প্রাচীনকালের অট্টালিকার মতোই প্রাচীন বয়সের সঙ্কল্প অটল।

তখন আর এক সঙ্কট উপস্থিত হ'ল, মলিনা বেঁকে বসলো, বলল, তবে আমারও যাওয়া হবে না। বাবাকে একলা ফেলে গেলে কে দেখবে তাঁকে।

দেখবার লোকের অভাব কি মলিনা, আমার পুরাতন ভৃত্য শম্ভু আছে,

সাধুচরণ ঠাকুর আছে—একজনকে দেখবার পক্ষে দু'জন কি যথেষ্ট নয় ?

চমৎকার কথা বললে বাবা, লোকে কি বলবে ভেবে দেখলে না। বুড়ো বাবাকে ফেলে ছেলে-মেয়ে-বউ সব পালালো, প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হবে কি বলো !

লোকের কথা কানে তুলিস নে মা।

আমাদের বেলায় কানে তুলিস নে, নিজে তো লোকাপবাদের ভয়েই দেশে ছাড়তে নারাজ।

লোকাপবাদের ভয়ে নয়, নৈতিক দায়িত্বের ভয়ে।

আমাদের পক্ষে ও দুটো একই কথা।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই যে মলিনাকেও সঙ্কল্প থেকে টলানো সম্ভব হ'ল না। লতা নমনীয় বলেই ভঙ্গুর নয়।

শচীন বল্ল, বাড়ীর চারজন লোকের মধ্যে দু'জন যদি থাকলো, তবে আর দুই জনের গিয়ে কি লাভ। তার চেয়ে আসুন বাবা চারজনেই থেকে যাই।

এ কাজের কথা নয় শচীন, তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব নেই, আর তুমি এ রাজনৈতিক ভাবের লোকও নও, কেন তোমরা থাকতে যাবে !

তোমরা যাবে না বলে।

আমরা কখনো যাবো না এমন বলিনি, পাকিস্তান একটু থিতোলে যাবো, তোমাদের ছেড়ে শেষ জীবনে আলাদা থাকবো এমন হ'তেই পারে না।

সারাটা দিন সমস্যাটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া, বিচার-বিশ্লেষণ চলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হ'ল না, কিম্বা মীমাংসা হ'ল এই যে পিতা ও কন্যা থাকবেন, পুত্র ও পুত্রবধূ যাবেন। শচীনের যাবার একটা অতিরিক্ত কারণ জীবিকা অর্জন।

যজ্ঞেশবাবু শহর পরিত্যাগ করছেন না শুনে দুঃস্থ ও শহর পরিত্যাগে অশক্ত হিন্দুরা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, কর্তা, আর আমাদের ভয় নাই, এখন আপনি আমাদের মালিক।

একজন হিন্দু কুশীদজীবীর মনের ইচ্ছা ছিল যজ্ঞেশবাবু হিন্দুস্থানে চলে গেলে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ীটা দখল করে নেবে, আরও কয়েকটা হিন্দুর বাড়ী তার লক্ষ্য ছিল। নবনিযুক্ত মুসলমান কর্তাদের যথাযোগ্য ভেট যুগিয়ে এক রকম হাত করে ফেলেছিল। দুই শ্রেণীর হিন্দু পাকিস্তানে রয়ে গেল, অশক্ত আর অনুপস্থিত হিন্দুর সম্পত্তিলোভী। হিন্দুর শত্রু হিন্দু। যজ্ঞেশবাবুর মতো আদর্শবাদীর সংখ্যা নগণ্য, তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম।

যাত্রার আগের দিন রাতটা মলিনা ও রুক্মিণী পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কাটালো। মলিনা ভাবছিল তার মতো হতভাগিনী আর হয় না, অরবিন্দর বাসাতে গিয়ে বাস করাও তার ভাগ্যে নেই ; রুক্মিণীর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধ শ্বশুরকে ফেলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

পরদিন বেলা দশটার ট্রেনে শচীন ও রুক্মিণী রওনা হয়ে গেল। চোখের জলের ঝালরে মলিনা ও রুক্মিণী পরস্পরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলো না। শচীন ও যজ্ঞেশবাবু অটল ও নিস্পন্দ। পুরুষের চোখের জল ফল্গুর মতো অন্তর্লীন, নারীর চোখের জল বালু নদীর বন্যা।

৬৬

আমি বলছি দেখো শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না।

বলো কি হে গোবিন্দ, মাঝখানে আর মাসখানেক বাকি, পাকিস্তান হিন্দুস্থান ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু এসে পৌঁছচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান অফিসার পুলিশ বদলা-বদলি হচ্ছে তবু বলছ দেশ স্বাধীন হবে না!

হ্যাঁ, তবু বলছি দেশ স্বাধীন হবে না।

এ কেবল তোমার গায়ের জোরের কথা।

ভাই বিমল, গায়ের জোর আমার নয় ইংরেজের, না, ভুল বললাম, বুদ্ধির জোর।

আমাদের বুদ্ধির জোর ততটা প্রখর নয়, বুঝিয়ে বলো।

এর মধ্যে আবার বোঝাবার কি আছে, ডিভাইড এণ্ড রুল, যা বলতেন আমাদের স্থরেন বাঁড়ুজ্জে।

দেখো, স্থরেন বাঁড়ুজ্জের রাজনীতির পরে পঞ্চাশ বছর কেটে গিয়েছে, এর মধ্যে ঘটে গিয়েছে বিপ্লববাদ, এখন গান্ধী রাজনীতির যুগ।

হাসালে বিমল হাসালে, হাতী ঘোড়া গেল তল শিয়াল বলে কত জল। স্থরেন বাঁড়ুজ্জে অরবিন্দ যতীন মুখুজ্জে যা পারলো না, তা করবে কি না ঐ বেনের ছেলে গান্ধী।

সাবধান গোবিন্দ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতে শেখো নইলে দেখছ তো—এই বলে পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে মাংসপেশী দেখালো।

ও আবার কি, তোমরা না অহিংসাবাদী!

সময় বুঝে।

বিমলের উক্তিতে সকলে হেসে উঠল।

এমন সময়ে শচীনের পিছু পিছু কালু পাঁপড়ভাজা ও চা নিয়ে ঢুকলো।

একজন বলল, আবার কেন, এই তো হয়ে গেল শচীন।

গেল বটে, তবে দেখলাম বিমল আর গোবিন্দর মুখ বন্ধ করবার জন্যে এ দুটোর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন যে ছিল আব তা সিদ্ধ হয়েছে তার প্রমাণ মিলতে বিলম্ব হ'ল না, পাঁপড়ভাজার সুশ্রাব্য শব্দ ছাড়া ঘবে আর কোন শব্দ শ্রুত হচ্ছিল না। যতক্ষণ চা-পাঁপড়ভাজার সম্পূর্ণ সৎকার না হয় স্থানকালপাত্রের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। স্থান শচীনের মুসলমানপাড়া লেনের সেই বাসা। পালাক্রমে যা শচীন ও অরবিন্দের অধীনে আছে। কাল ১৯৪৭ সালের জুন মাসেব শেষ ভাগ। আর পাত্রগণ সকলেই নিকটবর্তী রিপন ও বঙ্গবাসী কলেজের প্রবীণ অপ্রবীণ অধ্যাপকগণ। যথার্থ অধ্যাপকের লক্ষণ নিজের অধ্যাপনার বিষয়টি ছাড়া আব সকল বিষয়েই তাঁদের পাণ্ডিত্য অগাধ।

অধ্যাপকগণ সকলেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচিত, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে কার কাছ থেকে কত টাকা হাওলাত পাওয়া যাবে তাঁরা জানেন। শচীনের মতো প্রবীণগণ একসময়ে সুরেন বাঁড়ুজ্জের চেলা ছিলেন, কখনো কখনো দু'চার মাস বেশ জেল খেটেছেন। তাদের সঙ্গেই ধরা উচিত বারীন ঘোষের বোমার দলের লোকদের, অবশ্য, আন্দামান দেখবার সৌভাগ্য তাদের হয়নি, তবে ইলিশিয়াম রো-তে স্পেশাল ব্রাঞ্চের আতিথ্য ভোগ করেছেন অনেকে, আরও পরবর্তী কালের যতীন মুখুজ্জের দলেরও দু'চারজন আছেন, আর অপ্রবীণদের অনেকেই গান্ধীবাদী, জেল খেটেছেন, এবং মৃদু যষ্টিতাড়িত হয়েছেন। যে দুইজনের মধ্যে এতক্ষণ ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে' বিতণ্ডা চলছিল সেই গোবিন্দ ও বিমল যথাক্রমে সুরেন বাঁড়ুজ্জের চেলা ও গান্ধীবাদী। কলকাতার প্রাইভেট কলেজগুলি চিহ্নিত স্বদেশীওয়ালাদের শেষ আশ্রয়, এ সব কলেজ না থাকলে এদের অনেকেই অনাহারে মারা যেতো।

কিন্তু স্বদেশীওয়ালাদের প্রশস্ততম ও নিরাপত্তম আশ্রয় দাঁড়ালো শেষে কলকাতা কর্পোরেশন। প্রাইভেট কলেজের জন্য তবু একটা এম-এ ডিগ্রির দরকার হয়, এখানে চাকরির জন্য সে-সব বালাই দরকার হয় না। জেল খেটেছি এবং জেল খাটতে রাজি আছি, এই গুণাগুণই এখানে চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট তবে ঠিক মতো দাদা ধরা একান্ত অপরিহার্য, 'ভুল দাদা' ধরলেই অতলে গেলে— কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'দাদা-পন্থা' আজও সচল আছে। ইতিমধ্যে

কত সরকারের পরিবর্তন ঘটলো, পরিবর্তন ঘটল না 'দাদা-নীতির'। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো এই নীতি কর্পোরেশনে সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান। এ নীতির পরিবর্তন যে ঘটাতে পারবে এখনো সে মাতৃগর্ভে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছি, এ নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না লজ্জাতেই ইংরাজ এ দেশ পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

দেখো বিমল, এক বিঘা জমির স্বত্ব নিয়ে মামলা করে কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে আর তুমি বলতে চাও ইংরেজ অমনি ভারত ছাড়ো ঠুনকো হুঙ্কারে এদেশ ছেড়ে চলে যাবে!

বক্তাদের মুখ খোলাতে বোঝা গেল চা ও পাঁপড ভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর যুক্তি কিনা, হে ইংরেজ, তোমার কল্যাণের জন্যই তোমার এ দেশ ছেড়ে যাওয়া উচিত। ইংরেজ তোমার ওয়ার্ধার চেলা কিনা।

বিমল এবারে জুৎ করে বসে নিয়ে বলল, ভবেশদা, কথাটার গূঢ়ার্থ বুঝে দেখো। সুরেন বাঁড়ুজ্জের গম্ভীর ইংরাজি বক্তৃতাকে ইংরাজ গ্রাহ্য করে না, ওসব তাদের কাছে থেকেই শেখা, তোমাদের বোমা-বন্দুকেরও পরোয়া করে না, ও সমস্তও হয় ওদের ল্যাবোরেটারি থেকে শেখা নয় ওদের দোকান থেকে কেনা। আবার এদেশের কল্যাণের জন্যই দেশ ছেড়ে যাওয়া উচিত এমন কথাও শুনেছে উদারপন্থী রাজনীতিকদের কাছে, কিন্তু তোমার কল্যাণের জন্যই ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত এমন কথা এই প্রথম শুনলো, আর এহেন কথার উত্তর লেখা নেই ওদের ইতিহাসে।

—আহা, তাই ওরা হতবুদ্ধি হয়ে লজ্জায় দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যেমন বুদ্ধি তোমার গান্ধী বাবার, তেমনি তাঁর পুত্রগুলির।

তখন বিভিন্ন দল নিজ নিজ যুক্তিবাণ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলো, কার গায়ে লাগছে জানা অনাবশ্যক, বাগস্ত্র প্রয়োগটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। আজ রবিবার, কলেজে বক্তৃতা নেই, এখানে সেই কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে।

এমন প্রতি রবিবারে হয়ে থাকে, মীমাংসায় পৌছয় না, মীমাংসায় পৌছবার জন্যে কেউ কদাচিৎ তর্ক করে।

সভাপর্ব শেষ হ'লে শচীন যখন বাড়ীর ভিতরে গেল তখন বেলা একটা, এমন প্রত্যেক রবিবারে হয়ে থাকে।

রুক্মিণী বলল, তবু ভালো যে এসেছ, আমি তো ভাবছিলাম ভাত ঢেকে রেখে দিয়ে ঘুমোতে যাবো।

এমন তো প্রত্যেক রবিবারেই হয়ে থাকে, নতুন কিছু তো নয়।

ওটা তো অজুহাত হ'ল, যুক্তি হ'ল না।

কি করবো বলো, সবাই এসে পড়ে, কলেজের কাছে বাসা কিনা।

তবে চলো বাসা বদলাই, বালিগঞ্জের দিকে যাই চলো।

সেদিকেও তর্ক করবার লোকের অভাব নেই, তা ছাড়া আজকের দিনে কলকাতা শহরে বাসা ভাড়া যে রকম বেড়েছে বাসা ভাড়া দিয়ে খাওয়ার পয়সা আর থাকবে না।

রুক্মিণী বল্‌ল, আমি তো ভেবে পাইনে কেন আমরা আসতে গেলাম, বাবা ঠাকুরঝি তো বেশ আছেন।

হাঁ তাদের এখনো বিপদ হয়নি, তবে বিপদের আশঙ্কা না থাকলে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক চলে আসতো না। সেদিন শেয়ালদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখেছিলে তো, পা ফেলবার জায়গা নেই, ছেলেমেয়ে বাক্সবিছানা হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সবাই পড়ে রয়েছে।

হাঁ গো, ওরা কি সত্যি বিপদে পড়ে চলে এসেছে ?

সবাই যে বিপদে পড়ে চলে এসেছে তা নয়, তবে বিপদের চেয়ে বিপদের আশঙ্কাতেই মানুষ ভয় পায় বেশি।

ওরা থাকবে কোথায় ?

তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তার চেয়ে খেতে দাও।

খাওয়া শেষ হ'লে রুক্মিণী বল্‌ল, তুমি তো কলেজ আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দাও, আমার কথা একবার ভাবো না। একা বাড়ীর মধ্যে পড়ে থাকি একটা কথা বলবো এমন লোক নাই।

কি করবো বলো, শেষ মুহূর্তে মলিনা আসতে অসম্মত হ'ল।

সম্মত হলে কি ভালো হ'তো, বুড়ো বাপ একলা পড়ে থাকতেন।

তারপরে একটু ভেবে বল্‌ল, দেখো আমার বিশ্বাস তোমরা অকারণে তাড়াহুড়ো করে চলে এলে।

কি যে বলছ, অকারণেই কি হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে! শেয়ালদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দৃশ্য কি ভুলে গেলে ?

তারাও অকারণ ভয়ের আসামী। কালকেও তো ঠাকুরঝির চিঠি পেয়েছি, ওখানে সমস্ত স্বাভাবিক।

তার কারণ এখনো পনেরোই আগস্ট আসেনি।

পনেরোই আগস্ট তো শুধু ওখানে আসবে না, এখানেও আসবে।

আসবে বইকি।

তবে এখানেও অশান্তি হবে মনে করো?

আমার মনে করবার উপরে কি শান্তি-অশান্তি নির্ভর করে। কলেজের ছাত্রদের কথাবার্তা যদি শুনতে।

কি বলে তারা?

বলবে আবার কি, বলে গত ষোলই আগস্টের বদলা নেব এবারে পনেরোই আগস্ট।

তার মানে খুনোখুনি।

আর কি মানে হয় জানি না।

সেবারে তো হিন্দু বেশি মরেছিল, এবারেও যদি বেশি মরে তবে এমন বদলাতে কি লাভ?

এবারে বেশি মরবে না, কারণ পিছনে থাকবে কংগ্রেস সরকার, সেবারে মুসলমানের পিছনে যেমন ছিল মুসলিম লীগ সরকার।

বদলার ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে যায় রুক্মিণী, সব চেয়ে স্বাভাবিক কথাটাই মনে আসে আগে—এই ডামাডোলের বাজারে আমার লবকুশ কোথায় থাকলো!

তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করো না, লব আছে গান্ধীজির সঙ্গে, তবে তিনি যে এখন কোথায় বিহারে না দিল্লীতে জানি না, যেখানেই থাকুন লব নিরাপদ থাকবে।

আর কুশ?

সে যে দলে মিশেছে সে দলে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হয় না।

তবে তো তাদেরই ভালো বলতে হয়।

আগে আমার কথাটা শেষ হোক তারপরে যা বলবার বলো। ওদের দলে মারামারি ধনীকে শ্রমিকে, মনিবে মজুরে। একদলের মারামারি ধর্ম নিয়ে আর একদলের কর্ম নিয়ে।

তবে তো দেখছি কুশের বিপদ আছে।

আছে আবার নেই, ও যদি পাণ্ডাদের মধ্যে ঢুকে থাকে তবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এ আবার কেমন কথা!

খুব সহজ কথা। এই যে এত বড় যুদ্ধটা গেল কোন সেনাপতি মরেছে শুনেছ, মরতে মরেছে ষোল টাকার সেকেন্দার শার দল।

তারা আবার কারা?

সাধারণ সৈন্য।

এমন সময়ে কালু এসে একখানা খামের চিঠি দিয়ে গেল শচীনের হাতে।

বাবার চিঠি দেখছি।

দেখো না কি লিখেছেন।

শচীন চিঠিখানা পড়ে জানালো, নূতনের মধ্যে লাহোর থেকে একদল পাঠান সিপাই আমদানি হয়েছে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী মুসলমান পুলিশ আর সিপাইর উপরে কর্তাদের খুব বেশি বিশ্বাস নেই যদিচ মুসলমান তবু বাঙালী তো। প্রয়োজনকালে হিন্দুকে তেমন করে ঠেঙাতে পারবে বলে মনে হয় না। আর ভাষাটা যে এক ; তাই উর্দুভাষীর আমদানি। নাও পড়ো। বলে চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিল।

পত্রে মনোযোগ করবার আগে বল্‌ল, নাও একটু গড়িয়ে নাও, এখনি তো আবার বন্ধুর দল এসে জুটবে। ছোকরা প্রোফেসাররা চীৎকার করে জানাবে, বউদি আমরা এসেছি।

এখন থেকে বিকালে আর তারা আসবে না, কাজেই তোমার ভয় নেই।

হঠাৎ তাদের এ সুবুদ্ধি হ'তে গেল কেন ?

সে বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, পরে না হয় শুনো, এখন একটু ঘুমোতে দাও।

৬৭

কলকাতা শহরের এখন লক্ষ্মীছাড়া চেহারা। মানবতা সভ্যতা ও স্বাধীনতা রক্ষা দায়িত্বের সিংহভাগ পড়েছে এই পরাধীন দেশের উপরে। পরাধীন না হ'লে অপরের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব বহন করা সহজ নয়। দেশ-বিদেশের নানা শ্রেণীর সৈন্যসামন্ত সমাবেশে কলকাতা সামরিক শিবিরে পরিণত। প্রথমে ছিল ইংরাজ সৈন্য, তারপরে এসে জুটলো মার্কিন সৈন্য, মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে এলো নানা আকারের শাঁজোয়া শকট। সেই সব আসুরিক আকারের গাড়ীগুলো আসুরিক বেগে ধাবমান, নিরীহ পথিক তাদের চাপে নিত্যানিয়ত হতাহত ; অবশ্য তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও অপসারণের দায়িত্ব ভারতীয়দের উপরে। দায়িত্বের মধ্যে মৃতদেহ অপসারণ। আহতের সংখ্যা অল্প, কারণ আধুনিক গাড়ীর নিষ্পেষণে আহত বড় হয় না, একেবারেই নিহত হয়। তবে সেই সব মৃতদেহ সরিয়ে ফেলবার কাজটা যে দ্রুত হয় তার কারণ ছবিগুলো মার্কিন কাগজে প্রকাশিত হ'লে ইংরাজের বড় অপমান, অর্থে ও সৈন্যসংখ্যায় মার্কিন এখন বড় শরিক। সে দেশের লোক ছবিগুলো দেখে ধিক্কার দেয়, ছি-ছি, ইংরাজ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান শহরের

পথগুলো এমন সঙ্কীর্ণ! ইংরাজের কান লাল হয়ে ওঠে। এরূপে বছর দুই চলবার পরে এলো ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। দেশের লোক না খেয়ে মরতে লাগলো। ইংরাজ ভাবে এসব মৃত্যু যুদ্ধে মরার সামিল। তবে গাঁয়ের মধ্যে মার্কিন সৈন্যের চোখের আড়ালে মরলেই আপদ চুকে যায়। কিন্তু লোকেরা অবুঝ, খাদ্যের অন্বেষণে ক্ষুধার তাড়নায় আসে কলকাতায়, তবে বেশিদিন শহরকে বিস্মিত করবার সুযোগ পায় না, শীর্ণ কঙ্কালগুলো পথে পথে মরে পড়ে থাকে। কলকাতাবাসীর চোখ মৃত্যুতে ও মৃতদেহে অভ্যস্ত। তারপর আছে জাপানী বোমার সঙ্কেতজনক সাইরেনের উৎকট আওয়াজ। কলকাতাবাসীরা স্ত্রী-পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যাদের ঘর নেই তাদের জন্য পরিখা খনন করা হয়েছে, তার মধ্যে আত্মগোপন করলে নাকি নিরাপদ। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। এমন অবস্থায় শহরের শ্রী যদি বিনষ্ট হয় তবে দোষ অবশ্য শহরবাসীর। অবশেষে মহাযুদ্ধও শেষ হয়ে গেল, বোধ হয় মারক অস্ত্রের অভাবে। বিশ্ব স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ দায়িত্ব পালন করবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী নিজেদের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করলো! ইংরাজ ভাবলো মানুষে এমন অবুঝও হয়। বিশ্বস্বাধীনতার মধ্যেই কি তাদের স্বাধীনতা অন্তর্গত নয়? আবার আলাদা করে কেন! ইংরাজ বল্‌ল, দাঁড়াও স্বাধীনতা দিচ্ছি—তাদের উস্কানিতে হিন্দু-মুসলমানে বিষম দাঙ্গা বেধে গেল—আবার মৃতদেহে কলকাতার পথ-ঘাট আকীর্ণ হল। তবে এবার আর মৃতদেহ অপসারণের ব্যস্ততা নেই, মার্কিন সৈন্য দেশে চলে গিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ইংরাজি নাম গ্রেট ক্যালকাটা কীলিং—**Great Calcutta Killing**। এমন ব্যবস্থা সত্ত্বেও স্বাধীনতার দাবী থামলো না, তবে এবার আলাদা। "হিন্দু কংগ্রেস" তুল্‌ল সেই পুরাতন ধ্বনি কুইট ইণ্ডিয়া, মুসলিম লীগ তুল্‌ল ডিভাইড এণ্ড কুইট। ইংরাজ বল্‌ল, আহা আমরা গেলে যে তোমরা মারামারি করে মরবে, "হিন্দু কংগ্রেস" বল্‌ল **Leave India to chaos**—আমরা জাহান্নামে যাই সেও ভালো তবু তোমরা যাও। মুসলিম লীগ বল্‌ল, বাপধন, যাওয়ার আগে হিন্দু-মুসলমানে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে যাও।

১৯৪৬ সালের ষোলই আগস্ট কলকাতার হিন্দুসমাজ ভুলতে পারেনি, তারপরে যখন আবার নোয়াখালি জেলায় হিন্দু নির্যাতন হয়ে গেল দৃঢ়তর হল হিন্দু সমাজের সঙ্কল্প, তবে সেবারে মার খেয়ে শিখেছে যুদ্ধপর্বের আগে উদ্যোগপর্ব। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গেল, যুগপৎ মনে ও অস্ত্রে শান দেওয়া শুরু হল; অপেক্ষা কেবল ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্টের, যখন প্রশাসনিক যন্ত্রটা "হিন্দু কংগ্রেস"-এর করায়ত্ত হবে। ষোলই আগস্টে সেটা ছিল

মুসলীম লীগের হাতে, আজ সেদিন আসন্ন, মাঝখানে দিন পনেরো মাত্র বাকি।

প্রতিদিন রেলগাড়ীতে, নৌকায়, বাসে, গোযানে, পদব্রজে হাজার হাজার হিন্দু কলকাতায় এসে পৌছচ্ছে। বিপন্ন স্বধর্মীকে স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতার হিন্দুরা। বাড়ীভাড়া চড চড় করে বেড়ে যাচ্ছে, চার গুণ পাঁচ গুণ দশ গুণ, বাড়ীর কোণে কয়লা রাখবার ঘরটাও ভাড়া হয়ে যাচ্ছে, বিপন্ন হোক স্বধর্মী হোক, অর্থনীতি শাস্ত্রের ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই নীতি মাধ্যাকর্ষণের মতোই অমোঘ ও সর্বব্যাপী। অস্ত্রধারণে অক্ষম অশক্ত বৃদ্ধের দল শস্ত্রোন্মুখ যুবকদের টাকা যোগাচ্ছে, বলছে—বাবা তোমরাই কল্কি অবতার, তোমাদের ভরসাতেই আছি, দেখো যেন ধনে-প্রাণে মারা না যাই। একজন ধনীর বস্তি বহুকাল হল মুসললমানদের দখলে, বিস্তর মামলা-মকর্দমা করেও তোলা যায়নি, সে ব্যক্তি উদারভাবে উপুড হস্ত হযে বল্‌ল, বাপসকল, পাড়ার মধ্যে ওদের রাখা আর ঘরের মধ্যে কেউটে সাপ বাখা সমান। এই মওকায় ওদের সাফ করে দাও। দারোগা পুলিশ আমার হাতের মুঠোয়, আর মুসলমান পুলিশ তো সাধের পাকিস্তানে চলে গিয়েছে এখন সবাই হিন্দু, বুঝলে তো? ধনী ব্যক্তিটি যা বোঝাতে চেয়েছিল কল্কি অবতার ছেলের দল তার চেয়ে বেশি বুঝলো, প্রতিদিন এসে নূতন নূতন অজুহাতে টাকা আদায় করে নিয়ে যেতে লাগলো। শহরের যাবতীয় আবগারি দোকানের মালিকরা স্বর্ণযুগের সূচনা দেখল।

শহরের মুসলমানরা দেখল ভালো আপদ, এখন তারা যায় কোথায়! কলকাতায় পূর্ববঙ্গের মুসলমান অল্প, সকলেই দেশে চাষ-বাস করে, জনমজুর খাটে; অধিকাংশ মুসলমান বিহারের ও যুক্ত প্রদেশের। সে সব স্থানে তাদের ভিটেটুকু পর্যন্ত নাই, পাঁচ সাত পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা তারা। আর ভিটে থাকলেই বা কি, সেখানে তো যাওয়ার উপায় নেই, সে সব অঞ্চল হিন্দুপ্রধান। গেলেই বিহারের ঘটনার পুনরভিনয় হবে। তখন পাড়ার মুসলমানেরা পরামর্শ করে গিয়ে ধরলো মোকাজান মিঞাকে, বল্‌ল, বড় মিঞা, এবার করি কি?

মোকাজান মিঞা মহল্লার মুসলমানগণের প্রধান সহায়, বড় ধার্মিক ও পাণ্ডিত, ফার্সিতে যাকে বলে বুজরুগ। হাতে ফটিকের মালা, মুখে সাদা দাড়ি, হিন্দুদের মন্ত্রতন্ত্র, মুসলমানদের তুকতাক, সরকারের পুলিশ আদালত সমস্ত তার করায়ত্ত। ষোলই আগস্টের মহাহত্যার সময়ে তার দোয়ার ফলেই মহল্লার মুসলমানগণ প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বলে সকলের বিশ্বাস। কাজেই আসন্ন বিপদের সম্মুখে তারা যে মোকাজান মিঞার শরণাপন্ন সেটা এমন কিছু বিস্ময়ের নয়। সকলে বল্‌ল, বড় মিঞা, এবার তো সরকার হবে হিঁদুদের, বদলা নেবে তার শলা-পরামর্শ চলছে পাড়ায় পাড়ায়, এখন যাতে জান আর জরু বাঁচে তার উপায়

বাতলাও, সামনে মাত্র কয়েকদিন বাকি।

মোকাজান মিঞা এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে আগে পড়েনি, কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ঘন ঘন মনে তসবি জপতে লাগলো। গত হত্যা-কাণ্ডের সময়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় যে-ব্যক্তি অভ্রান্ত-বুদ্ধি ছিল এখন আর তার বুদ্ধি যোগায় না, অবশেষে স্বীকার করেই ফেল্‌ল—মোদের নসিব বড় বুরা, মোরা একেবারে মেটি হলুম, ফিকির কিছু বেরোয় না। মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে। বলে কপালে করাঘাত করতে লাগলো।

হতাশ ছোকরার দল যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল, মোরা মরলে তুমিও জিন্দা থাকবে না বড মিঞা।

পরদিন মোকাজান মিঞা ছোকরাদের ডেকে পাঠালো। তারা এসে দেখলো বড় মিঞা একখানা উর্দু দৈনিক পত্রিকা সামনে খুলে বসে আছে, বল্‌ল, আয়রে আয়, মতলব মিলেছে, এই দেখ্।

দেখবো আবার কি, তুমিই বলো না।

তবে শোন্, নোয়াখালি যাওয়ার পথে গান্ধী আসছে কলকাতায়, তাকে আটক কর গিয়ে—

দেখো মিঞা ঐ মতলব ছাড়ো, গান্ধীর গায়ে হাত তুললে দেশে মুসলমানের বংশ থাকবে না।

আরে বেয়াকুব তাই কি বলেছি, মতলব হচ্ছে তার পায়ে গিয়ে পড, বল্ গিয়ে বা'জান নোয়াখালি যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়ো, পনেরোই আগস্ট তুমি কলকাতায় না থাকলে মুসলমানের বংশ লোপ পাবে।

আর গান্ধী আমাদের কথা শুনবে! আর সে শুনলেও হিন্দুরা শুনবে কেন?

বলিস কি। গান্ধী হিন্দুদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বুজরুগ, আমাদের মধ্যে যেমন জিন্না সাহেব। যা, যা, সবাই মিলে যা।

তোমাকেও যেতে হবে মিঞা।

আরে আমি তো যাবই, আমি না গেলে তার সঙ্গে উর্দুতে বাতচিৎ করবে কে? সে তো আর বাংলা বুলি জানে না।

ছোকরার দল গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলো। আসন্ন মৃত্যুর মুখে মুমুর্ষুর মনে পড়লো দেশে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে একটি লোক আছে।

•

দিন দুই ধরে শচীন যে সব বিষয় রুক্মিণীকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো এখানে

আমরা সেই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি একত্রে বিবৃত করলাম। ঐতিহাসিক উপন্যাসের তল্পীবাহক ইতিহাস, যদিচ সে ভৃত্য মাত্র, তবু তাকে না হ'লে চলে না। ভৃত্য ছাড়া প্রভু অচল।

৬৮

মাঝখানে আর মাত্র চার-পাঁচটি দিন, তারপরেই ১৫ই আগস্টের সুপ্রভাতে দেশব্যাপী পরাধীনতার যবনিকা অপসারিত হবে। সেই সঙ্গে অখণ্ড বাংলাদেশ খণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করবে। স্বভাবতই হিন্দুরা খুশী নয়—যদিচ অখণ্ড বাংলার বিধান সভার হিন্দু সদস্যগণ দেশবিভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। গত দশ বছরের মুসলীম লীগের শাসন, কলকাতার হত্যাকাণ্ড, নোয়াখালির নির্যাতন তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ। পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মন্ত্রীমণ্ডলী এখন থেকেই কর্ণধারের পদে আসীন। কিন্তু ঠিক কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে, কি তাদের করণীয় বুঝে উঠতে পারছে না। বহু কাম্য স্বাধীনতা দ্বারস্থ হলে কি ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করতে হয় সে ব্যবস্থা তাদের অনবগত। ওদিকে দিল্লীতে কংগ্রেসী-মহলেও প্রায় সেই অবস্থা। এদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে নিত্য আগত উদ্বাস্তুগণে কলকাতা শহরের পথঘাট আচ্ছন্ন, বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হয় দুর্মূল্য নয় দুষ্প্রাপ্য। এহেন অবস্থায় আশ্চর্য নয় যে লোকে বিশ্বাস করতে পারে না যে স্বাধীনতা সত্যই আসন্ন। খাঁচার পাখী দরজা খোলা দেখলেও বিশ্বাস করতে পারে না মুক্তির পথ উন্মুক্ত।

একদল বলছে, আরে রাখো, একে কি স্বাধীনতা বলে, যুদ্ধ নেই, রক্তক্ষয় নেই, বিনা নোটিশে স্বাধীনতা এসে পড়লো। এ কি ডাকের চিঠি ! তাতেও তো পিওন এসে কড়া নেড়ে সাড়া দেয়।

আর একদল বলছে দেশের লোককে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ গান্ধীর চেলাদের চালাকি। আসুক না পনেরোই আগস্ট, দেখতে পাবে আগের মতোই ফোর্ট উইলিয়ামের ধ্বজায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে, গোরা সৈন্য তেমনি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর গভর্নমেন্ট হাউসের গেটে তেমনি লালমুখের পাহারা। এ স্বাধীনতা অশ্বত্থামার দুগ্ধপান।

আবার অনেকে বলছে, স্বাধীনতা যদি এলোই তবে এখনো কেন রেলে-ট্রামে টিকিট কিনতে হচ্ছে, বাজারে আগের মতোই কেনা-কাটা কেন ?

তবে খবরের কাগজগুলো কেন মোটা মোটা অক্ষরে স্বাধীনতা আসন্ন বলে ঘোষণা করছে !

এ আর বুঝলে না, নইলে খবরের কাগজ বিকোবে কেন ? এরাও গান্ধীর দলে।

গিয়ে দেখে এসো না একবার, বড়বাজারে হাজার হাজার স্বাধীন ভারতের পতাকা বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসা, ব্যবসা।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এমন সন্দেহবাদীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়র অধিক নয়। অধিকাংশ লোকের মনে একটা আগ্রহ ঔৎসুক্যের ভাব, সত্যই একটা ওলট-পালট হতে চলেছে। তবে সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম স্বার্থও যে না আছে তা নয়। বুড়ো ভাবছে নাতিটি চাকুরি পাবে, যুবক ভাবছে বেতন বাড়বে, বেকার ভাবছে চাকরি মিলবে, ছাত্ররা ভাবছে অন্ততঃ দশ-পনেরো দিন ছুটি নিশ্চয় পাওয়া যাবে, পরীক্ষার্থীরা বলাবলি করছে উপর থেকে হুকুম এসেছে এবারে শতকরা দশ নম্বর খয়রাতি মার্ক দিতে হবে। ব্যবসায়ীরা ভাবছে জয় বজরঙ্গবলী, এই মওকায় পালে জোর বাতাস লাগাও, এক মাহিনায় দশ বরষের নাফা যেন জুট যায়।

কারো দোষ নয়—স্বার্থের সূক্ষ্ম সুতোতেই স্বাধীনতার নিশান বোনা। তবু ওই সব বিপরীত চিন্তার এলোমেলো হাওয়া ছাপিয়ে ধ্বনি উঠছে, বন্দে মাতরম, জয়হিন্দ, আজাদ ভারত জিন্দাবাদ, জয়তু নেতাজী, গান্ধীজী কি জয়! এই ডামাডোলের মধ্যে একটি ধ্রুববিন্দু নিশ্চল, সোদপুর খাদি আশ্রমে একমনে চরকা কেটে চলেছেন গান্ধীজী।

এমন সময়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো লব।

গান্ধী চরখা চালাতে চালাতে শুধালেন, কি খবর ?

একটি ডেপুটেশনের দল এসেছে দেখা করতে।

পিয়ারীলালের কাছে থেকে জেনে এসো, আজ কখন সময় আছে আমার।

এক লহমা পরে ফিরে এসে লব জানালো, প্রার্থনার আগে আধ ঘণ্টা।

তবে সেই কথা জানিয়ে দাও ডেপুটেশনকে।

যথাসময়ে ডেপুটেশনটি পুনরায় এসে উপস্থিত হল। মাঝপথ থেকে মোকাজান মিঞা স'রে পড়েছে, যে-উর্দু সে বলে থাকে তা কোন উর্দুভাষীর কাছে না বাচ্য না বোধ্য।

গান্ধী তাদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। আগেই একখানা শতরঞ্চি পেতে রাখা হয়েছিল। পাশেই একদিকে দাঁড়িয়ে লব, গান্ধীজির কাছে উপবিষ্ট পিয়ারীলাল,

হাতে নোট বই।

কি চাই ?

ডেপুটেশনের মুখপাত্র ছকু মিঞা দাঙ্গার সময়ে ইংরাজি স্কুলের অনেকগুলো শিক্ষককে খুন করেছিল। কাজেই ইংরাজিটার উপরে তার কিছু দখল আছে, সে আরজি পেশ করলো।

নোয়াখালিতে না গিয়ে কলকাতায় থাকতে অনুরোধ করছ আমাকে কেন ?

হুজুর কলকাতায় না থাকলে তামাম মুসলমান খতম হয়ে যাবে।

কি করে জানলে ?

ছকু মিঞা বলতে পারতো নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছি। এ অবস্থায় আমরা যা করতাম হিন্দুরা তা না করবে কেন ? তবে সে কথাটা তো স্পষ্ট করে বলা যায় না—তাই বলল, সবাই এই রকম বলাবলি করছে।

আর যদি আমি নোয়াখালিতে না যাই তবে সেখানে ?

এ প্রশ্নের তো উত্তর তাদের জানা নেই। তারা চুপ করে থাকলো।

তখন গান্ধীই পূর্বপক্ষ করলেন, কলকাতার মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তোমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারো কিনা আমি নোয়াখালিতে না গেলে সেখানে অশান্তি হবে না !

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার তাদের নেই, তারা এই ক'জন কলকাতার মুসলমান সমাজের কে ? তবু প্রাণের দায়ে বলে ফেলল, আজ্ঞে তা দেব বই কি।

যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় তবে আমাকে আমৃত্যু অনশন করতে হবে মনে থাকে যেন।

এমন ভয়াবহ পরিণাম যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত ভাবতে পারল না তারা, কাজেই চুপ করে রইলো।

আর তাছাড়া তোমাদের কাউকে তো চিনি না।

আজ্ঞে আমাদের মধ্যে যারা মুরুব্বি যেমন নাজিমুদ্দিন সাহেব, ফজলুল হক সাহেব সব তো পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন।

আর সুরাবর্দি সাহেব ?

হুজুর তিনি যে কোথায় ছিপকে আছেন, কেউ বলছে লণ্ডনে, কেউ বলছে মার্কিন মুলুকে, কেউ বলছে করাচিতে আমরা কেউ জানি না।

তবে তোমাদের হয়ে প্রতিশ্রুতি দেবেন কে ?

ঠিক সেই মুহূর্তে জনাব সুরাবর্দির প্রবেশ।

তাকে দেখে মুসলমানেরা অকূলে কূল পেলো।

স্থরাবর্দি করাচিতে গিয়েছিল কোন মনসবদারি জুটে যায় কিনা দেখতে। না, সেখানে কোন আশা নেই। জিন্নার বিশ্বাস তার জন্মেই পোকায়-কাটা পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হল, কলকাতার হত্যাকাণ্ড না ঘটালে তামাম বাংলাদেশে পাকিস্তান কায়েম হতো।

ডেপুটেশনের অমুরোধ ও তার শর্ত বুঝিয়ে দিলেন গান্ধী স্থরাবর্দিকে।

স্থরাবর্দি বল্‌ল, তা ওদের হয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

স্থরাবর্দির ধারণা গান্ধীর আশীর্বাদ পেলে তার পক্ষে কলকাতায় থেকে যাওয়া সম্ভব হবে। কলকাতা তার কাছে স্বর্গ। কলকাতার হল্লাগুল্লা, নাচগান, কাফে ক্যাবারে, বস্তিগুণ্ডা, এমন আর কোথায় আছে! ছুনিয়াতে যদি কোথাও বেহস্ত থাকে তবে তা এইখানেই, ওয়া হমীনস্ত, হমীনস্ত, হমীনস্ত।

তা হলে যে আপনাকে আমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে হবে!

স্থরাবর্দি ভাবলো, আহা কি সৌভাগ্য। সে তো ঠিক এই জিনিসটিই চায়; যেন তেন প্রকারেণ কলকাতায় থাকা, এমন কি তার জন্মে গান্ধীর সঙ্গে থাকতেও রাজি আছে।

অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকবো।

আপনি বোধহয় আমার কথার মর্ম বুঝতে পাবেননি। আমার সঙ্গে মানে আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে, এমন কি এক ঘরে।

সত্যই বুঝতে পারেনি স্থরাবর্দি।

বেলেঘাটার এক বস্তির মধ্যে পরিত্যক্ত এক ভাড়াবাড়ীতে আমি থাকবো স্থির করেছি। পুলিশ-পাহারা কিছু থাকবে না। সমস্ত কাজ আপনাদের নিজেদের করতে হবে; হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষ থেকেই আক্রমণ হতে পাবে, বাধা দেওয়া চলবে না। কেমন রাজি?

প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য শুনে স্থরাবর্দির পাষাণকঠিন হৃদয়টাও সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

না, এখনি আপনাকে উত্তর দিতে হবে না, ভেবেচিন্তে কালকে উত্তর দিলেই চলবে।

স্থরাবর্দি ভেবে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল। ডেপুটেশনের দল পিছন থেকে ডাকলো, হুজুর! সে ডাক হুজুরের কানে প্রবেশ করলো না, তখন তার মনে প্রস্তাবের বিশ্লেষণ চলছে। বেলেঘাটার বস্তিটাতে হল্লাগুল্লা, বস্তিগুণ্ডা অবশ্যই আছে, কিন্তু বাকিগুলো?

ছকু মিঞা সঙ্গীকে বল্‌ল, লক্ষ্য করেছিলে ভাই লোকটার চোখের দিকে, তাকিয়ে কথা বলা যায় না।

সে কথা সত্যি। এই তো সেদিন ডিক্রি ডিসমিসের মালিক ছিলেন, যাঁর একটা কথায় ফাঁসি, আধখানা কথায় পুলিপোলাও।

আহা আমি কি তার কথা বলেছি!

তবে কার?

ঐ যে গান্ধীর।

ও লোকটা তো হিন্দুদের পীর।

ছকু মিঞা বল্‌ল, শুধু হিন্দুদেরই, তবে আমরা এসেছিলাম কেন?

৬৯

মা বেলেঘাটার খবর আর কত বলবো, রোজ সন্ধ্যায় তো বেতারে শুনতে পাও, তার চেয়ে আমাকে বলো দাদু আর পিসিমার খবর, দিনাজশাহীতে তারা কি করছে কিছুই জানি না।

এই তো সেদিন এসে শুনে গেলি।

তারপরেও তো কয়েকদিন হ'ল, আর কি চিঠিপত্র আসেনি?

এসেছে তবে খবর সেই আগের মতোই। পাড়ায় হিন্দু বলতে নেই, থাকবার মধ্যে আছেন ভূপতিবাবু আর বীরেন চৌধুরী।

আচ্ছা মা, দাদুদের কেন নিয়ে এলে না!

চেষ্টা তো কম করিনি, তোমার দাদু, তোমার বাবা, আর তোমরা দুটি সবাই সমান একগুঁয়ে।

অন্ততঃ পিসিমাকে আনা উচিত ছিল।

সে আবার তোমাদের উপরে এক কাঠি। আরে সবাই তো এক সঙ্গে চলে আসবো স্থির ছিল। প্রথমে বেঁকে বসলেন দাদু, তাই শুনে বেঁকে বসলো মলিনা, বাবাকে একলা রেখে যাবো না।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়, দাদু বুড়ো মানুষ একলা কি করে থাকবে!

তবেই দেখো।

আচ্ছা মা, পাড়ার হিন্দুদের বাড়ীগুলো খালি পড়ে আছে?

পাগল নাকি, সব বাড়ীতে মুসলমান বসে গিয়েছে, অবশ্য মুখে বলছে ভাড়া দেব, মনে বলছে এসো একবার ভাড়া নিতে। তোর বাবা বল্‌লো, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাক, তারপরে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবো।

বেশ, সেই সঙ্গে আমিও যাবো, আমাকে না বলতে পারবে না দাদু।

শুনলি তো, এবারে বেলেঘাটার খবর বল্।

কি আর বলবো, যেমন নোংরা বস্তি, তেমনি ভাঙা একটা বাড়ী, আর সারা-দিন হিন্দু মুসলমান মন্ত্রী রাজনীতিকদের মেলা বসে আছে, নেই কেবল পুলিস।

ওসব তো বেতারে শুনতে পাই। সেই যে বলেছিলি যে সুরাবর্দি সাহেব গান্ধীজির সঙ্গে থাকবে তারপর কি হ'লো বল্।

ধন্যি সাহস লোকটার, পরদিন বিকাল বেলা দেখি সত্যি এসেছে, আমরা ভেবেছিলাম ঐ যে সরে পড়লো আর আসবে না।

তোরা বাবা তবে ঠিক কথাই বলেছিল, দেখো নিশ্চয় আসবে, আজ গান্ধীজির কাছে ছাড়া আর কোথাও ওর আশ্রয় নেই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন?

কেন আর কি। জিন্না ওর উপরে রেগে গিয়েছেন, করাচিতে সুবিধা হ'ল না, এরপরে মুসলমানেরা রেগে উঠবে যখন বুঝবে যে কলকাতায় দাঙ্গা না ঘটলে সমস্ত বাংলাদেশটাই পাকিস্তান হয়ে যেতো, তাহ'লে তাদের আর ঠাঁইনড়া হ'তে হতো না। আর হিন্দুরা তো তৈরি হয়েই আছে। তাই না এলেন গান্ধীর কাছে, গিয়ে দেহিপদপল্লবমুদারম্।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ঐ হাড়বদমাশ লোকটাকে কেন লাই দেন গান্ধীজি?

গান্ধীজি বলেই দেন। বল্লেন, রুক্মিণী, যত উঁচুতে উঠবে তত দেখবে নীচের উঁচু নীচু সব ক্রমে সমান হয়ে যাচ্ছে, অবশেষে খুব উঁচুতে উঠ্লে হিমালয় পাহাড় আর উইয়ের ঢিবিতে ভেদ বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

লব বিস্মিত হয়ে বল্ল, বাবা যে বাপুজিকে এত ভক্তি করেন তা জানতাম না।

আরে এ ঠিক ভক্তি নয়, একে বলে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা। অন্ধভক্তের চেয়ে বুঝমান ভক্তের মূল্য বেশি যদিচ তারা সংখ্যায় অনেক কম। এসব কচকচি থাক, এখন বল সুরাবর্দি সাহেব এসে কি করলো।

ধন্যি বটে সাহস লোকটার। বেলা তিনটার সময়ে এসে উপস্থিত হল, দেরী দেখে আমরা তো ভেবেছিলাম ঐ যে কেটে পড়লো আর আসবে না। তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র হিন্দুরা ক্ষেপে উঠ্ল, ঘেরাও করে ফেল্ল তার গাড়ী, মনে হ'ল এখনি একটা কাণ্ড হবে। গোলমাল শুনে বাপুজি গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

মহাত্মাজী, ঐ খুনে লোকটা এখানে কেন? ওকে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমার সম্বন্ধেও তো বহু লোকে ঐ কথা বলে থাকে।

আপনার কথা আলাদা।

সমস্ত লোকের কথাই আলাদা।

একদলের সঙ্গে বাপুজির কথা চলছে আর একদল ঘুষি বাগিয়ে এগিয়ে গিয়েছে,—এই যে গুণ্ডার সর্দার, এখন দিই দফা নিকেশ করে ?

কোথায় তোমার পেয়ারের গুণ্ডার দল ?

বলো সেদিনের হত্যার জন্য দায়ী কে ?

এতক্ষণ ধরে সুরাবর্দি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়েনি।

হত্যার দায়িত্ব কার প্রশ্নের উত্তরে বল্ল, আমাদের সকলেরই।

তার মানে বলতে চাও যে লোকগুলো মরেছে তাদেরও। মারহাব্বা।

বাপুজি বাইরে এসে দাঁড়া'লেন। তাঁকে দেখে লোকজন মোটরের পথ ছেড়ে দিল, সুরাবর্দি গট গট করে হেঁটে এসে ঢুকলো।

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো, তোরা তখন কি'করছিলি ?

আমরা তো বাপুজির হাতের পুতুল, যেখানে দাঁড়াতে বলেছিলেন দাঁড়িয়ে আছি, এগোবার পিছোবার পালাবার হুকুম নেই।

তারপরে কি হ'ল বল।

তারপরে প্রার্থনা সভা। প্রথমেই রামধুন, রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম।

কত লোক হয়েছিল ?

অন্য দিনের চেয়ে বেশি, সাধারণত হাজার পঞ্চাশেক লোক হয়। কাজেই লাখের কাছাকাছি হবে। রামধুন শেষ হ'লে আবার গুঞ্জন আরম্ভ হল, লোকের পছন্দ হচ্ছে না সুরাবর্দির উপস্থিতি। বাপুজি নিষেধের ভঙ্গীতে ডান হাত তুললেন অমনি সব শান্ত। সত্যি মা না দেখলে বিশ্বাস হ'তো না। একি জাদুকর না দেবতা !

সে কথা সময় মতো ভাবিস। কি বললেন প্রার্থনা সভায় ?

গান্ধীজির বক্তব্য সব সময়ে সরল আর সংক্ষিপ্ত। মুসলীম লীগ পাকিস্তান চেয়েছিল, পাকিস্তান হয়ে গিয়েছে, হিন্দু মুসলমানে আর তো ঝগড়ার কারণ নেই।

এমন সময়ে কাগজের টুকরোয় লিখিত প্রশ্ন আসতে লাগলো।

পাকিস্তান যদি হয়ে গেল কেন তবে মুসলমান আবার এখানে কেন ? পাকিস্তানে চলে যাক না।

গান্ধীজি প্রশ্নটা পড়ে নিয়ে বললেন, পাকিস্তানেও তো হিন্দু আছে, তবে হিন্দুস্তানে মুসলমান থাকলে দোষ কি ?

এসব তো বেতারে শুনেছি, আর কি হল বল।

মাঝরাতে হঠাৎ জানলার উপরে দমাদম ইট পড়তে লাগলো, আমরা ঘুম ভেঙে

চমকে উঠলাম। উঠে দেখি তিনি শান্তভাবে জানলা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনি ঘরে যান, ঐ পাষণ্ডটা কোথায় ?

গান্ধীজির ইসারায় সুরাবর্দি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালো, তাকে লক্ষ্য করে কয়েকখানা ইট উঠলো দেখে, গান্ধীজি কাছে সরে এসে তার কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আপনিই তো যত গোল বাধান দেখছি। তার কথায় অনেকে হেসে উঠল। ফলে সে যাত্রা রক্ষা হয়ে গেল।

কই রে, এসব তো বেতারে শুনতে পাই না।

কি সর্বনাশ, এসব কি বেতারে দেওয়া যায়। আজকে মা তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, শীগ্‌গীর করে খাইয়ে দাও।

তা না হয় দিচ্ছি, কিন্তু এত তাড়া কিসের ?

বাঃ, আজ যে চোদ্দই আগস্ট। মাঝরাতে আজ স্বাধীনতা ঘোষিত হবে।

সে তো হবে দিল্লীতে।

এখানেও হবে, সাইরেন বাজবে, কামান গর্জাবে, জাহাজের যত বাঁশী বেজে উঠবে।

আজ গান্ধীজি কি করছেন ?

আজ সারাদিন অনশন আর সূত্রযজ্ঞ।

অনশন ! দেশ স্বাধীন হল, তবে অনশন কোন্ দুঃখে ?

ভারতখণ্ডনে বাধা দিতে পারলেন না—তারই প্রায়শ্চিত্ত।

অদ্ভুত তোদের এই গান্ধী লোকটি।

তোদের ! কেন তোমার নয় ?

অন্ততঃ আমার নয়—বলে হঠাৎ কুশ ঘরে প্রবেশ ক'রে ঘাড় থেকে ভারি থলিটা নামিয়ে মেঝের উপরে রাখলো। এক মাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল মুখের উপরে এসে পড়লো।

আরে কুশ যে! বলে রুক্মিণী উঠে বসলো. এতক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝের উপর গড়াচ্ছিল।

কোত্থেকে এলি রে ?

মা, কোত্থেকে এলি, কোথায় যাবো—এ দুটি ছাড়া আর সব প্রশ্ন করো, উত্তর দেবো। দেখো দাদা, তোমাদের এ আজাদী বেবাক ঝুটা।

কোন্ অপরাধে ? বলে লব উদ্যত হয়ে বসলো।

অপরাধ এই যে এর ইনার কনট্রাডিকশন (Inner contadiction) তোমরা সল্‌ভ (Solve) করতে পারনি।

ভাই কুশ, ফরমুলা ছেড়ে মানবভাষায় কথা বলো।

বেশ তবে তাই না হয় বলছি। তোমরা একবার বলছ স্বাধীন হলো, সঙ্গে সঙ্গে বলছ কমনওয়েলথ ছাড়ছি না—একেই আমরা বলি Inner Contradiction, তোমাদের মানবভাষায় ভেজাল।

তা ভাই ওটা তোমাদের গুরুর কাছেই শেখা। খাতায়-পত্রে পোলাণ্ড, হাঙ্গারী, চেকোশ্লোভাকিয়া সবাই স্বাধীন তবে কারো পাশ ফিরবার উপায় নেই।

আর তোমাদের ?

আমাদের কমনওয়েলথ রূপ হাওয়াই সম্বন্ধ হাওয়ায় মিলিয়ে দেব যেদিন খুশী।

এরাও পারে।

রক্ষা করো ভাই।

মা এতক্ষণ ওদের বিতর্ক শুনছিল, এবারে বলে উঠল, যাই খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে, হঠাৎ কখন কুশ বলে উঠবে—চললাম মা।

শুধু কুশ নয় মা, লবও।

আচ্ছা লব, আজ তোমরা কি করবে ?

আজাদী ঘোষণা করবো। আর তোমরা ?

আমরা পথে পথে বুঝিয়ে বেড়াবো এ আজাদী ঝুটা হায়। কি, চুপ করে কি ভাবছ ?

ভাবছি লোহার শিকলকে যখন সোনার হার বলে মনে হয় তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের ষোলআনা পূর্ণ হয়েছে।

লব কুশ খেতে বসেছে। রুক্মিণী বসে বসে অতৃপ্ত স্নেহধারায় ওদের খাওয়া দেখছে, এখন আর সামনে বসিয়ে ওদের খাওয়াবার সুযোগ পায় না, ভাবে বাড়ীতে কত কি রান্না হয় আর ওরা ডাল রুটি খাচ্ছে, হয়তো সব সময়ে তাও জুটে ওঠে না। ওরা গৃহত্যাগ করবার পরে রুক্মিণী সুখাদ্য খেতো না, মলিনা জিজ্ঞাসা করলে বলতো, খিদে নেই, পেট ভাল নেই। অবশেষে মলিনা বুঝলো, সেও সুখাদ্য খাওয়া ছাড়লো। অজুহাত রুক্মিণীর মতোই। পরস্পরকে পীড়াপীড়ি করে যখন ফল হল না তখন দুজনেই সুখাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত হল। মেয়েদের খাদ্য গ্রহণ-না-গ্রহণের মধ্যে অত সূক্ষ্ম বেদনা আর আনন্দ পুরুষে বোঝে না।

লব যখন পায়েসের বাটি ঠেলে দিল, মা বলল, ওরে আজ স্বাধীনতার দিনে পায়েস খেলে বাপুজি রাগ করবেন না। কুশ বল্‌ল, এ তোমার বাড়াবাড়ি দাদা, খোঁজ নিয়ে দেখো তোমাদের বাপুজি আজ ছাগলের দুধের পায়েস খাচ্ছেন।

লব বল্‌ল, আজ তাঁর অষ্টপ্রহর অনশন।

কি অপরাধে ?

আত্মশুদ্ধির জন্যে।

কেন ?

ভারত খণ্ডন ঠেকাতে পারলেন না বলে।

মুসলমানেরা আলাদা হয়ে যেতে চায়। সংখ্যাধিক্যতার দোহাই দিয়ে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই হিন্দুর।

এমন সময়ে শচীন প্রবেশ করলো—ওদের দেখে বল্‌ল, এই যে আজ দুজনেই এসে জুটেছ দেখছি।

রুক্মিণী শুধালো, তোমার হাতে ওটা কি ?

একটা রেডিও সেট।

একটা তো আছে, আবার কেন ?

মেয়েলি বুদ্ধিতে বুঝবে না।

আমি বুঝেছি বাবা, বল্‌ল কুশ।

কি বুঝেছিস বল্।

আজ রাতে কল্‌কাতা ও দিল্লীর প্রোগ্রাম দুটোই শুনবে তাই একটার 'ক' চ্যানেল খুলে দিয়ে আর একটার 'খ' চ্যানেল খুলে দিয়ে রাখবে যাতে দু জায়গার খবর কানে আসে।

সে কি করে হবে গো, দুটো চ্যানেলে কি এক প্রোগ্রাম বাজবে ?

আজ সব চ্যানেলে এক প্রোগ্রাম বাজবে।

কুশ বল্‌ল, এই সোজা কথাটা আমাদের লব বুঝতে পারেনি।

বুঝতে পেরেছিলাম অবশ্যই তবে যেখানে বাবা আর মায়ের মধ্যে কথা হচ্ছে সেখানে কথা বলা উচিত বোধ করিনি।

লবের কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে কুশ প্রসঙ্গান্তরে গেল, বলল, বাবা, আর একটা রেডিও সেট আনা উচিত ছিল।

কেন রে ?

'গ' চ্যানেল খুলে দিলে করাচির প্রোগ্রাম শুনতে পেতে।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচির নাম শুনবামাত্র জ্বলে উঠল রুক্মিণী, বলল, রাখ তো এখন।

তারপর স্বামীর উদ্দেশে বল্‌ল, দেখো, বুদ্ধিটা ঠাকুরঝিকে জানালে তারা কলকাতা আর দিল্লীর প্রোগ্রাম শুনতে পেতো।

আমাকে এ বুদ্ধি যুগিয়েছে যে সে-ই যুগিয়ে দিয়েছে ওদের এই বুদ্ধি।

বুঝেছি, ভূপতিবাবু নিশ্চয়।

নিশ্চয়। এবারে তোমার বুদ্ধিটা তেজী হয়ে উঠেছে, মন্দী চলছিল এতক্ষণ। কালকে ভূপতি আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বাৎলে দিয়ে বল্‌ল, কিনে নিয়ে এসো একটা রেডিও সেট। আমি বল্‌লাম তোমাকে আর একটা সেট কিনে দি, তুমি গিয়ে মলিনাদের দিয়ো—ওরা শুনবে দু জায়গার প্রোগ্রাম। ভূপতি বল্‌ল, আমি সমস্ত মলিনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমার সেটটা পৌঁছে দিয়ে এসেছি। আমি বল্‌লাম, তুমি আবার পৌঁছে দিতে গেলে কেন, মলিনাই তো এসে নিয়ে যেতে পারতো। সে বল্‌ল, না হে সেদিন আর নেই, হিন্দু মেয়ের পক্ষে এখন পথঘাট নিরাপদ নয়।

আমি বল্‌লাম, বলো কি, এতদূর গড়িয়েছে!

গড়িয়েছে আর কোথায়, সবে গড়াতে শুরু করেছে।

তবে যে কায়েদেআজম ঘোষণা করলেন পাকিস্তানে সংখ্যাল্প সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বুঝলে শচীন, তাঁর মতো তিনি বলেছেন যার মতো সে কাজ করবে—ঐ যে বলে মুখে বলি হরি অন্য মনে করি ভাবনা।

এতক্ষণ লব কুশ নীরবে শুনছিল এবারে লব বলে উঠ্‌ল, কুশ ভাই, তোমাদের পার্টি অফিসে গিয়ে রেডিও সেটে 'গ' স্টেশন খুলে দিয়ো, করাচির প্রোগ্রাম বড় মধুর লাগবে। কোথায় চললে? সে তো রাতের বেলায়।

কুশ বল্‌ল, চললাম মা।

কবে আবার আসবি?

সে কি আমার উপরে নির্ভর করছে মা।

ছেলের আমার কথা শোনো। না বাপু, তোদের মতিগতি বুঝতে পারি না।

উত্তর পাওয়ার আশায় এসব কথা কথিত হয় না। তাই বাপ-মাকে একটা হাফ প্রণাম গোছের করে, সংক্ষেপে 'চল্‌লাম লব' বলে কুশ প্রস্থান করলো।

তুই তো আছিস লব?

না বাবা, প্রার্থনাসভার আগে আমাকে পৌঁছতে হবে। আজকে খুব ভিড় হবে।

কি রকম লোক হচ্ছে?

এ কয় দিন তো লক্ষের মতো হ'ত। আজ দুলাখ হলে আশ্চর্য হ'ব না। ঐ যে বাবা সব চলেছে, ঐ শোন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি।

তিনজনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলো, দলে দলে লোক নানা দিক থেকে এসে চলেছে বেলেঘাটার দিকে—মুখে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত।

অনর্গল কণ্ঠে সমুৎসারিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত অনেকদিন শোনেনি শচীন, সেই শুনেছিল প্রথম যৌবনে, সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন নিত্য নূতন গানের বুলবুলি বাসা বেঁধেছিল বাংলাদেশের গাছে গাছে বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে। সেই গানে

তরঙ্গিত হ'তে থাকতো বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার ফুল বাংলার ফল। তখন দেখতে দেখতে কোথা থেকে অতর্কিতে মরা গাঙে বান এসেছিল, বাঙালীর মন বাঙালীর আশা বাঙালীর পণ বাঙালীর ভাষা হঠাৎ কানায়-কানায় ভরে উঠেছিল। আজ ঐ দোতালার বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শুনতে শুনতে অদৃষ্টের হঠাৎ পাশা নিক্ষেপের ফেলে সেই সব দিনের মধ্যে চলে গেল শচীন। রুক্মিণী তার এমন বিহ্বল অবস্থা কখনো দেখে নি। বিহ্বল অবস্থা তারও। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শচীনের দিকে, শচীন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঐ মহাসঙ্গীত গেয়মান জনস্রোতের দিকে। শচীনের ঠোঁট নড়তে লাগলো, মনে মনে কিছু উচ্চারণ করছে; তারপরে মনের ভাব ভাষা পেলো, ক্রমে ভাষা পেলো সুর; তাতেও বুঝি সবটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হ'ল না। তখন ভাবের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, সুরের সঙ্গে তাল রক্ষা করে দুই চোখে ধারা প্রবাহিত হ'ল। কি করছে বুঝবার আগেই শচীন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেরিয়ে পড়লো, একখানা চাদর টেনে নেবারও অবকাশটুকু হ'ল না তার। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে রুক্মিণী ও লব ভালো করে বুঝতেও পারলো না। ঐ বিপুল জনস্রোতে সর্বৈব মিশে যাওয়ার আগে তার গেরুয়া পাঞ্জাবীর ছাপটা একবার মাত্র চোখে পড়লো রুক্মিণীর।

৭০

সমস্ত দিনাজশাহী শহরটা অনিশ্চয়তার কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ভোরের আলো তেমনি হয় তবে সে যেন স্বপ্রকাশ নয়; রাত্রে তারা তেমনি ফোটে তবে যেন অর্ধনিমীলিত নেত্র; সন্ধ্যায় পথে পথে বিদ্যুতের আলো তেমনি জ্বলে তবে সে যেন অন্ধকারকে প্রকাশ করে; দেবালয়ে কাঁসর ঘণ্টা আজও তেমনি বাজে তবে কেমন যেন কুন্ঠিত কণ্ঠ। পথে লোক চলে, বাজারে বেচাকেনা হয়, টমটম গাড়ী ছোটে—সমস্তই কেমন যেন অবাস্তব। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীঘর লোকে পূর্ণ, সেগুলির দরজা-জানলা খোলা, মাঝে মাঝে দু'চারটে বাড়ী বন্ধ, বিদ্যালয়ে আজ ছুটি, কোর্ট কাছারী আজ বন্ধ। কালকে ও আজকে অনেক প্রভেদ। একদিনের মধ্যে যেখানে এমন প্রভেদ ঘটে বুঝতে হবে গুরুতর কারণ আছে। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুসারে দিনাজশাহী পাকিস্তান-ভুক্ত হয়েছে। গুরুতর কারণ আর কাকে বলে।

হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমানেরা দখল করে নিয়েছে, সে-সব বাড়ীর দরজা জানলা খোলা, এমন বাড়ীর সংখ্যাই সমধিক। যে-

সব দু'চারটে বাড়ীর দরজা জানলা বন্ধ, সেগুলো হিন্দুদের। তারা এখনো বাড়ী ছেড়ে যায়নি, পাড়ার মুসলমান মাতব্বরেরা এসে অভয় দিয়ে গিয়েছে, ভয় কি আমরা আছি, কায়েদেআজমের ঘোষণা শুনেছেন, তবে আর কি। তবু দরজা জানলা বন্ধ করে রাখাই সুযুক্তি।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনীত পাঠান পুলিশ ও সিপাহি পথেপথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের উপরে কড়া হুকুম, দেখো কোন হিন্দু কলকাতা বা দিল্লীর রেডিও যেন না শোনে ; কোন বাড়ীতে ঐ অশ্রাব্য ভাষণ শোনা গেলে অবিলম্বে রেডিও সেট বাজেয়াপ্ত করবে। এ কাজ তো বাঙালী মুসলমান পুলিশ দিয়েই হ'তে পারতো। পাঠানেরা না জানে বাংলা না জানে ইংরাজি। আরে যা উর্দু নয় তাই বাংলা। ইংরাজ নেহরুর হাতের মুঠোয়, দেখলে না ফাঁকি দিয়ে পোকায় কাটা পাকিস্তান গছিয়ে দিল আমাদের।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভূপতি নিজের বাড়ির রেডিও সেটটা লুকিয়ে নিয়ে দিয়ে গিয়েছে যজ্ঞেশবাবুদের বাড়ীতে। শচীনের সঙ্গে যে যুক্তি হয়েছিল বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে মলিনাকে, বলে দিয়ে গিয়ে গিয়েছে 'ক' 'খ' চ্যানেল ভেদে কলকাতা ও দিল্লী দু'জায়গার অনুষ্ঠান শুনতে পাবে, তবে খুব সাবধান মলিনা, এতটুকু শব্দ যেন বাইরে না যায়। দরজা জানলা বন্ধ করতে যেন ভুলো না দিদি, আর আলো না জ্বালানোই ভালো। আমাদের পাড়ার পাঠান পল্টনদের সর্দার ওয়ালি খাঁ যেমন শয়তান তেমনি গুণ্ডা। আর দিদি তুমি নিজে খুব সাবধানে থাকবে।

কেন ভূপতিদা ?

দাদা হয়ে এর বেশি বলা যায় না।

মলিনার বুক দুরদুর করে উঠল, একবার মনে পড়লো অরবিন্দর কথা।

মৃত ব্যক্তি স্মৃতিরথের নিত্য আরোহী, সে রথ সর্বগ।

আর দেখো তোমার বাবাকে এত কথা জানাবার প্রয়োজন নেই।

নিষেধ করছেন বলবো না, তবে শুনলেও ভয় পাবেন না।

কি যে বলো মলিনা, ভয় পাবেন যজ্ঞেশবাবু, তাহলে কি তিনি এখানে থাকতেন !

তুমিও তো আছ দাদা।

আমার কথা ছেড়ে দে, জেল জরিমানা চাবুকে ভয়ের নাড়ীর উপরে কড়া পড়ে গিয়েছে।

তাই বলে ওয়ালি খাঁর সঙ্গে আবার লড়াই করতে যেয়ো না।

না, ইচ্ছে করে যাবো না।

অনিচ্ছাতেও যেয়ো না।

আচ্ছা আচ্ছা—বলে হেসে উঠলো ভূপতি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, এখন যাই, আর দেরী হলে হয়তো অনিচ্ছাতেই লড়াই বেধে যেতে পারে পথে। ঐ বোধ হয় ভারি জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তুই চ্যানেলে রেডিও চালাবার কৌশলটা মনে আছে তো—ভুলিস না।

না ভুলবো না। দাদা কাল দুপুরে এখানে খেয়ো না?

হঠাৎ।

হঠাৎ আর কি। তুমি এলে গল্প করা যাবে, শহরের সংবাদ পাওয়া যাবে, সারা দিন-রাত তো ঘরে ইঁদুরের মতো বন্ধ হয়ে আছি।

বেশ আসবো, তবে বেশি কিছু আয়োজন করিস নে।

না, না, বেশি আয়োজন করায় অনেক বাধা। কালকের নিমন্ত্রণে গল্পটাই প্রধান।

দেখিস তোদের সবজিবাগানে বেগুন যদি থাকে তবে বেগুনপোড়া করতে ভুলিস না।

অবশেষে দাদা এত খাদ্য থাকতে বেগুনপোড়া।

বেগুনপোড়ার তুলনা হয় না বোন, দেবতারা স্বর্গে বেগুনপোড়া পায় না তাই অভাবে অমৃত পান করে। আচ্ছা আসি আমি।

এসো, কিন্তু কাল আসতে ভুলো না, তোমার যে ভোলা মন। তোমার জন্যে কালকে বেগুনপোড়া ও আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

দেখি কে কথা ঠিক রাখে—বলে ভূপতি বিদায় হয়ে গেল, বাইরে গিয়ে বলল, দেখিস আলো আর আওয়াজ যেন না বাইরে আসে।

তারপরে আবার ফিরে এসে বল্‌ল, হাঁরে আজ তো সারাদিন রায় মশায় অনশন করে আছেন।

হাঁ দাদা, এক বিন্দু জল গেলাতে পারেনি।

ভূপতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে মনে বল্‌ল, খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।

আচ্ছা চললাম।

এসো, কালকে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবো, ভুলো না।

না, ভুলবো কেন রে, প্রতীক্ষা করে থাকিস।

ভূপতি বিদায় হয়ে গেলে মলিনা পিতার কাছে গিয়ে দেখল দেয়ালে ঠেস দিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, যেন ধ্যানস্থ।

বাবা।

কি মা ?

আজ তো সারা দিন কিছু খেলে না।

আজ যে অনশন।

সে তো সকলের হয়ে গান্ধীজি করছেন।

তাঁর সহযোগিতা করতে হবে না ?

আচ্ছা বাবা, দেশ স্বাধীন হ'ল, এ তো আনন্দের ব্যাপার, তবে আবার অনশন কেন ?

নরকের অন্ধকারলোক পার হ'লে তবে তো স্বর্গের নন্দনলোক দেখতে পাওয়া যায়—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা ভেবে দেখ।

সে না হয় পরে ভাববো, এখন আর কিছু না হোক একটু জল খাও।

হাঁ জলপানে বাধা নেই, দে। তবে তোদের ঐ কলের জল নয়, ওতে শুধু পেট ভরে, তৃষ্ণা দূর হয় না।

তবে ?

এক কাজ করতে পারিস ? আমাদের ঐ যে পুরানো ইঁদারাটা আছে, শহরে জলের কল হওয়ার আগে ওটার জল ব্যবহার করা হতো, ওটা যেমন পাতাল-স্পর্শ ওর জল তেমনি শীতল, পান করলে দেহ মন জুড়িয়ে যায়। ওর জল তুলে আনতে পারিস ?

কেন পারবো না বাবা! বাড়ীতে লম্বা রশি আছে, ছোট একটা বালতি বেঁধে জল তুলে আনছি।

বাবাকে জানালো না যে এখন বাইরে যাওয়ায় বিপদ আছে।

তার আগে এক কাজ কর। রেডিও সেট দুটো খুলে দে।

প্রোগ্রাম শুরু হবে রাত বারোটায়, এখন দশটাও বাজেনি, অনেক দেরী বাবা।

তা হোক, একটা শব্দও আজ বাদ পড়তে দেওয়া হবে না।

মলিনা বুঝলো বুড়ো মানুষকে বোঝানো যাবে না। রেডিও সেট দুটো খুলে দিল।

দেখিস চ্যানেল ভুল করিসনে, দিল্লীর 'ক' আর কল্‌কাতার 'খ'।

আজ সব চ্যানেলেই সব প্রোগ্রাম রিলে হবে।

হবে বইকি মা, তবু আলাদা খাত বেয়ে না আসলে চলবে কেন, তারপরে লোকের মনে এসে মিলিত হবে গঙ্গা যমুনা।

বাবা তোমার উপমায় একটু খুঁত রয়ে গেল, গঙ্গা যমুনা যেন হ'ল, সরস্বতী গেল কোথায় ?

সরস্বতী তো লুপ্ত, লুপ্ত সরস্বতী থাকবে মানুষের ধ্যানে।

পিতাপুত্রীর সংলাপের সময়ে মলিনা রেডিও সেটের চ্যানেল ঠিক করে দিচ্ছিল।

নাও বাবা ঠিক করে দিলাম।

ভুল করিসনি তো, দিল্লী আর কলকাতা—অন্য কোন স্টেশন নয়।

না বাবা ভুল হবে কেন, ঐ ডান দিকেরটায় শোনো বাংলা কথা, আর ঐ বাঁ দিকেরটায় হিন্দি কথা।

হাঁ হাঁ, ঐ তো বলছে, ইয়ে দিল্লী বেতারসে বোল রহা হ্যায়। আবার ঐ যে, এ সংবাদ বলা হচ্ছে কলকাতা আকাশবাণী থেকে। বড় আনন্দ দিলি মা, চিরজীবী হয়ে থাক।

তুমি বসে বসে শোনো, আমি জল তুলে আনি তোমার জন্যে।

মলিনা রশি বালতি সংগ্রহ করে সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ইঁদারার দিকে চল্‌ল। প্রশস্ত বহিঃপ্রাঙ্গণের এক কোণে সেই ব্যাদিত মুখ গভীর ইঁদারা। যার জল যেমনি শীতল তেমনি মধুর।

মলিনা যতই সতর্ক, যতই সন্তর্পণ হোক, লোহার বালতি ইঁদারার ইটে একটু শব্দ করবেই, আর বারে বারে ইঁদারার গায়ে ঠোকা খেতে খেতে বারে বারে শব্দ করবেই। মলিনা বুঝলো নিঃশব্দ রাত ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে শব্দটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে, আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, কিন্তু তাই বলে তো তৃষ্ণার্ত পিতার পানের জন্য জল সংগ্রহ বন্ধ রেখে ফিরে যাওয়া যায় না। আর ইঁদারার গভীরতর অংশ থেকে প্রতিধ্বনিতে পরিবর্ধিত হয়ে বালতির শব্দ ছড়িয়ে পড়লো।

কোন্ হ্যায় রে?

মলিনা ভাবলো আর কাউকে বলছে। সে পাতালস্পর্শ ইঁদারায় বালতি নামিয়েই চলেছে। আবার শব্দ।

আবার, কোন্ হ্যায় রে?

এবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক বিজলি মশালের আলোর ছটা এসে পড়লো।

মলিনা মুখ তুলে দেখতে পেলো মশাল বাতির পিছনে কর্কশ কণ্ঠের মালিক ওয়ালি খাঁ, ক্ষুধিত নেকড়ের লুব্ধদৃষ্টি তার চোখে।

মেরিজান, ইতনা রোজ কিধার থা?

মলিনার বালতি জলতল স্পর্শ করেছে।

আরে বিবি পহেলা মেরি পিয়াস তো মিটাও—এগিয়ে এসেছে ওয়ালি খাঁ।

মলিনা ভাবলো লোকটার হয়তো সত্যিই তৃষ্ণা পেয়েছে, সাহস সঞ্চার করে বল্‌ল, ওখানে দাঁড়াও পানি দিচ্ছি।

উৎকট হাস্য করে লোকটা বল্‌ল, আরে জবান মরদকা তিয়াস কভি পানি মে মিটতি হ্যায়! তুম্‌ভি জবানী, ময়ভি জবান—আভি সমঝ লেনা।

ওয়ালি খাঁ এগিয়ে এসে ধরতে চায় মলিনাকে, মলিনা ইঁদারা ঘিরে ঘোরে— ইঁদারার ব্যাস মুখ প্রকাণ্ড, ধরা সহজ নয়। বার দুই ইঁদারা পরিভ্রমণ করলো দুজনে।

বাস্‌ বাস্‌ বহুৎ খেল্‌ হুয়া, আভি আও মেরি দিল, মেরি কলিজা—বলে লাফিয়ে গিয়ে তার আঁচল ধরলো।

মলিনা বুঝলো আজ রক্ষা পাওয়া কঠিন, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, বাবা—

আরে বিবি, বাপজীকা দেখনে কো চিজ এ নেহি হ্যায়—

মেয়ের আর্তকণ্ঠ প্রবেশ করলো গিয়ে পিতার কানে।

কি হল মা, কি হল? বলে তিনি দোতালার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দরজার কাছে পৌঁছে দেখলেন—ওয়ালি খাঁ ধরেছে মলিনার আঁচল, টানছে কাছে। মলিনার হাতে তখনো দড়ি বালতি।

তুম কোন্‌ হ্যায়, ছোড়ো মেরী লেড়কী-কো।

তুমহারা লেডকী মেরী দিল্‌—

আভি ছোড়ো! বলে গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ সিংহ।

ওয়ালি খাঁ এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের মাথায় এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়ে এক ধাক্কায় তাঁকে ঢুকিয়ে দিল ঘরের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শিকল দিল বন্ধ করে। মুহূর্তের জন্য হয়তো তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন, জ্ঞান পেয়ে দেখলেন প্রচণ্ড শক্তিমান ওয়ালি খাঁ মলিনাকে সবলে আকর্ষণ করছে নিজের দিকে। এক হাতে ধরেছে ওর এক হাত, আর এক হাতে আঁচল।

প্রবলবেগে যজ্ঞেশবাবু ধাক্কা মারতে লাগলেন দরজায়। এক সময়ে তিনিও শক্তিমান ছিলেন, কিন্তু আজ কিছুই হল না। শাল কাঠের দরজা অটল।

ভয় নেই মা, আসছি আসছি, দরজায় পদাঘাত আর ঐ অভয় বাণী।

মলিনার এক হাতে বালতির রশি, আর এক হাত দিয়ে মারছে ওকে। কিন্তু তাতে ওর কিছুই হচ্ছে না। বরঞ্চ খুশি হয়ে উঠছে—বিবি বড়ি তেজী, বাহা বাহা!

রশি ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে পাষণ্ডটাকে মার মা।

পিতার জন্য জল সংগ্রহের আশা তখনো ছাড়ে নি মলিনা, তাই রশি

ছাড়লো না।

রশি ছেড়ে দে, মার মার।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, আঁচল প্রায় সবটাই লোকটার হস্তগত। এবারে বুঝি শেষ আব্রুটুকুও গেল, চোখ বন্ধ করলেন তিনি, পিতার পক্ষে এর বেশি দেখা আর সম্ভব নয়।

বাবা বাবা, নিজের বাড়ীতে আমার ইজ্জৎ গেল, নারায়ণ, নারায়ণ।

দুই হাতে চোখ বন্ধ করে পিতা বলে উঠলেন—মা, ইঁদারা ইঁদারা, জল হচ্ছেন নারায়ণ, তিনিই রক্ষা করবেন ইজ্জৎ, ইঁদারা ইঁদারা মা ইঁদারা।

মলিনা ইঙ্গিতটা বুঝলো। সবলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে সবেগে আত্মনিক্ষেপ করলো সেই পাতালস্পর্শ ইঁদারাব মধ্যে, জলই নারায়ণ।

যজ্ঞেশ রায় চোখ থেকে হাত নামিয়ে দুই হাতে দুই কান চেপে ধরেছিলেন—তবু অতল থেকে উত্থিত গভীর গম্ভীর একটি শব্দশলাকা প্রবিষ্ট হল তাঁর কর্ণদ্বয়ে—ঝপ্।

মূর্ছায় মুমূর্ষায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে, সম্বিতে অসম্বিতে যজ্ঞেশ রায়ের মগ্ন চৈতন্যের পটের উপরে দীর্ঘজীবনের দৃশ্যাবলীর চন্দ্রমালা একে একে ভেসে ভেসে উঠে স'রে সরে যেতে লাগলো।

মহারাণীর শ্রাদ্ধবাসর—

কবিতাটি আমার লেখা—বলে নিজের দিকে ইঙ্গিত।

শচীন, শচীন কোথায় গেল!

তাজপুর রাজবাড়ী থেকে বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে দেওয়ানজি।

অবিনাশ মাস্টারকে শহর থেকে তাড়াবো।

সুশীল, ঐ স্কুলে তোর পড়া চলবে না।

আরে রাখো রাখো, ছেলেদের মারছ কেন!

মাথায় লাঠির আঘাত।

এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

একি শৈলেন খুড়ো, জেলের দরজায় যে রথের মেলা বসিয়েছ!

রায়বাহাদুর লেখা পাথরের ফলকটা দে ফেলে ঐ ডোবার জলে।

যজ্ঞেশ রায় জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট।

প্রবীণ দেশবন্ধু।

তরুণ সুভাষচন্দ্র।

বাপের মুখ রক্ষা করেছিস বাবা।

রাধার সঙ্গেই দেব স্থশীলের বিয়ে।

যমজ পৌত্র লবকুশ।

ওরা ঠিক একরকম দেখতে হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন।

জেল, জরিমানা, লাঠি।

জেলে জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছ, মলির কি বিয়ে দেবে না?

দেবো গিন্নি দেব, ও মেয়ে পড়ে থাকবার নয়।

গান্ধী।

নাতি দুটো মানুষ হবে।

মা কোথায় বাবা?

বাবা বিশ্বনাথ তাঁকে চরণে স্থান দিয়েছেন।

ডাণ্ডি মার্চ।

লবণ তৈরি কর, ওরে লবণ তৈরি কর্।

গান্ধীজি।

নেতাজী।

কলকাতা, নোয়াখালি, বিহাব।

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

পাকিস্তান।

আজ তো আমার অনশন মা।

না জলে আপত্তি নেই—

কলের জল নয়, ঐ ইঁদারার জল যেমন শীতল তেমনি মিষ্টি।

রেডিও দুটোর চ্যানেল ঠিক করে দে।

ইঁদারা ইঁদারা ইঁদারা, মা, জল নারায়ণ, তিনিই রক্ষা করবেন ইজ্জৎ।

গভীর গভীর মর্মান্তিক শব্দ—ঝপ্।

নীচতলায় অন্ধকার ঘরে অন্ধচৈতন্যের গুহায় শায়িত নবতিপ্রায় বৃদ্ধ।

আর দোতলায় দিল্লীর চ্যানেলে অতি পরিচিত আবেগাকুল একটি কণ্ঠ ঘোষণা করে চলেছে—"Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.... At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes,

which comes but rarely in history, when we step out fro the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance."

অন্য চ্যানেলটিতে ধ্বনিত হচ্ছিল

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।

এতক্ষণ ঘড়িতে বারোটা বেজে চলেছিল, এবারে তার ধ্বনিটি অনন্তে মিশিযে গেল।

দুইদিন পরে ভুপতির পত্রে সমস্ত বিবরণ অবগত হল শচীন। ভূপতি লিখেছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি এ সময়ে তোমাদেব কাছে আমার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভাই তার উপায় নেই, রায়মশায়ের কাছে হাসপাতালে আমাকে রা ন উপস্থিত থাকতে হয়।

চিঠিখানা পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছে শচীন, এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী। ও কার চিঠি গো? বলে টেবিলেব উপব থেকে তুলে নিয়ে পড়লো, পড় সাঙ্গ হতে না হ'ত মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

পরিশিষ্ট

কয়েকদিন পরে শচীনের নামে দু'খানা খামের পত্র এলো, হাতের লেখা দেখে শচীন বুঝলো দু'খানাই লব আর কুশের। যমজের চেহারার সাদৃশ্য হস্তাক্ষরেও প্রতিফলিত।

লব লিখেছে—

বাবা ও মা, বাপুজির ইচ্ছায় নোয়াখালি চললাম, সেখানে আর্তদের মধ্যে বাস করতে হবে, সেইসঙ্গে কিছু লেখাপড়াও হবে শেখাতে। আসেমা পিসীর ঠিকানাতে চিঠি দিয়ো, তাহলেই পাবো। বাপুজি তোমাদের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। সেবক লব

কুশ লিখেছে—

বাবা ও মা, পার্টির নির্দেশে চললাম কয়লাখনি অঞ্চলে। সেখানে মজুরদের মধ্যে কাজ করতে হবে। সময় পেলে মাঝে মাঝে তোমাদের চিঠি লিখবো।

সেবক কুশ

পুথি সমাপ্ত